যুগলমূর্ত্তি ত্রিগুণ তৈল একটি অনন্যসাধারণ কেশতৈল। ইহা আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রস্তুত। ত্রিগুণ তৈলের সুনাম আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অখণ্ড বিশ্বাস ও অনুরাগের দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে এই সুনাম এবং এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে একাগ্র সাধনা, সংযম ও নিষ্ঠা। যুগলমূর্ত্তি ত্রিগুণ তৈল চুলের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করে এবং মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় শিরোরোগ দূর করে।

যুগলমূর্ত্তি
ত্রিগুণ তৈল কেশবিন্যাসে অপরিহার্য…

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৩৪

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

DATE LABEL ই

University

বাংলার সকল সুখ্যাত turned within the

শুতি শা

সাউথের কাপড়

দেখতে ভালো • প'রে সু

আপনার কাছাকাছি যে

পছন্দমত কে

কলিকাতা: ২৩, গড়িয়াহাট রোড, ৫

[illegible]

১২৯ এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (বিধান

চন্দ্র রোড • ৯১, আচার্য জগদীশ চ

হরকাশ রোড • ১৮১, বেলেঘাটা

ষ্ট্রীট • ১১৮, রাজডাঙ্গা রোড • সি-৪

৩ পাইকপাড়ার স্ট্রিটের জেলায় আমাদে

টাকা ভরি ১০ পয়সা কিলো কিলো

॥ মুটীর ছাঁচ বাক্সর উপর ॥

সবচেয়ে ছোট প্রথমটা 'তন্তুজ' পাবেন

সবচেয়ে মাঝারি দ্বিতীয়টা 'তন্তুজ' পাবেন

সেন্টাল সেল্ ডিপো:

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স

কো-অপারেটিভ

সোসাইটি লিমিটেড

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন: ৩৪-৩১৫৮

Programme 1M-B

ফোন: ৩৪-১৪৮০

আসন গহনার জন্য .....

রিলায়্যাবল জেমস্ ষ্টোর্স

১২৪, ১২৪/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট (কহবাজার) কলিকাতা ১২

ঐ শোনা যায়
গ্রামে গ্রামে
পাড়ায় পাড়ায়
ঘরে ঘরে

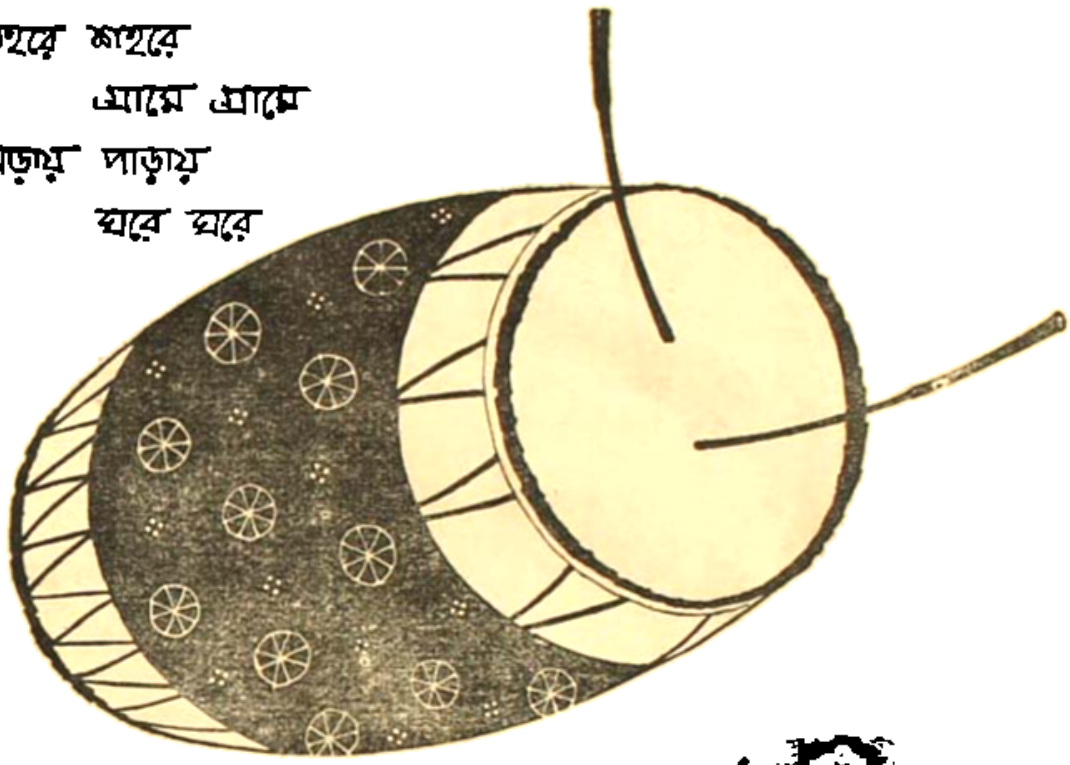

ঢাকের বাদ্যে মুখরিত
আকাশ বাতাস,
আবার মা আসছেন ঘরে

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

আজ সকলের প্রিয়, পুজোর বাজারে আর
সব কিছুর সঙ্গে চাই — বোরোলীনও
ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায় তার জুড়ি নেই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক

ছুঁয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন-সৌরভে
ভরপুর রাখবে

মলয় স্যাণ্ডা... ...ণের মনভোলানো দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাণ্ডাল ট... ...এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার—ছুঁয়ে মিলে আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে তুলবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপের স্নিগ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে সারা দেহে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক ছড়িয়ে দিন—দেখবেন দিনভর বড় করবরে ও ঘামা বোধ করেন। মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ এমন এঁকে ক্লান্ত মুহূর্তগুলিতেও আপনাকে ঘিরে থাকবে।

ডোটা কেমিক্যাল কোং লিমিটেড-এর তৈরী

MLT XIV A

রাজেন্দ্র সাংকৃত্যায়নের বিখ্যাত উপন্যাস

সিংহ সেনাপতি ৮·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত- **পোড়ামাটি ভাঙা ঘর**

গজেন্দ্র মিত্র— **স্বপ্ন সন্ধ্যা** ৩·০০

হে নিরুপমা ২·০০

ভ্যারাইটী পাবলিশার্স

১৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

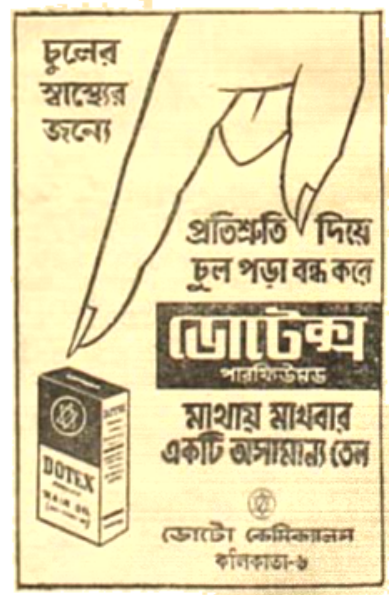

ছোটোদের জুতো দেখেশুনে কিনবেন
নতুবা পায়ের গঠনে
আজীবন খুঁত থেকে যেতে পারে

সবসময় লিলিপুট ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি।
কোমল আর নরম চামড়ায় এমন হোঁচলে এর গড়ন যা পায়ের সঠিক
মাপে অবিকল মিলে যায়। সামনে আঙুল খেলার যথেষ্ট জায়গা, যাতে
আরামে পা বাড়তে পারে। এমন মোড়ানির কাটিংয়ে যা চলতে ফিরতে সহায়তা
করে। নমনীয় আর মজবুত এর জুতোর তলি, অবলীলায়
পা-সঞ্চালনের সহায়ক। আর হেমলি এর মোড়ানি, যা পায়ের পক্ষে হড়বড়ে না।
বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী এমনভাবে তৈরি নির্মাণে, ছোটোদের
আদর্শ জুতো বলা লিলিপুট। বাজারে হাল আমলে স্টাইল
এমন বাহারি ছোটোদের পাওয়া যাচ্ছে। তাদের কিনতে আসুন, তাদের
কিন্তু আগে কিনে বলা লিলিপুট, দেখবেন কেমন
খুশিতে ভরে ওঠে ছোটোদের মন।

Bata
লিলিপুট
ছোটোদের বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি

চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরে পেতে হলে

কেয়ো কার্পিন

ব্যবহার করুন

কেয়োকার্পিন তেলটি মোটেই চটচটে নয়—অথচ এতে চুল এমন ভাবে বসে যায় যে সারাদিনেও এলোমেলো হয়না, এর গন্ধটিও মনোরম। কেয়োকার্পিনে চুলের গোড়া শক্ত হয় আর চুলও ভাল থাকে।

M/KE/D—4/B

কেয়ো-কার্পিন

একটি রিলিস্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিসিন্স ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · পাটনা · কানপুর
পাটনা · কানপুর · লক্ষ্ণৌ · হায়দ্রাবাদ · আহমদাবাদ · বাঙ্গালোর

খেতে ভাল

মেঘনা

বিড়ি

প্রস্তুতকারক :

শ্রীগোপেশচন্দ্র সাহা

প্রধান অফিস :

আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অন্যান্য শাখা ও উপশাখা :-

শিলচর (আসাম), আগরতলা, ধর্মনগর (ত্রিপুরা), আওরঙ্গাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ), জামসেদপুর, রাঁচী, চক্রধরপুর (বিহার), রাউরকেল্লা, ব্রহ্মপুর (বেহালী) সম্বলপুর, টিটাগড় (উড়িষ্যা), জগদলপুর, কোণ্ডাগাঁও, (মধ্যপ্রদেশ), ভিলাই, রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় (মধ্যপ্রদেশ)।

পূজার নূতন বই পড়ুন

তরেশ দত্ত ভারতের সাধিকা	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সুরা-নারী-নমস্কী ৭·০০
কৃপাল চট্টোপাধ্যায় ভারত কন্যা কেরালা ৬·০০	নীল লোহিত মেঘা না মেঘা
রমাপতি বসু ভালবাসার রীতিনীতি ৬·০০	চিরঞ্জীব রামধনু ছোক ইউনি ২·০০

জ্ঞানতীর্থ। ১, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষের [illegible] উজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

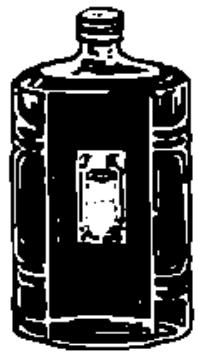

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ●

কানপুর ●

গ্রাম: এস্ জুয়েলার
ফোন: ৩৪-৯২০৩, ৩৪-৯৪৮০

মনের মত জড়োয়া গহনা ও প্রস্তুতের জন্য

বি. সরকার এণ্ড সন্স

১২৪, ১২৪/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট (বহুবাজার) কলিকাতা-১২

বিবাহে ও উপহারে বেনারসী

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা। ফোন ঃ ৩৩২৩৩৩

প্রতিটি ইমারত প্রস্তুতকারক।

ক্ষমা ইলেক্ট্রো ওয়ার্কস

২৬।২, প্রিন্সেপ স্ট্রিট রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা-৭৬।

সেরা জুতো

রক্কি

ফুটওয়্যার

কলেজ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

ঝকঝকে ছাপার জন্যে

চাই

উৎকৃষ্ট টাইপ

নানারকমের ইংরেজি, বাঙলা ও হিন্দী সেরা টাইপ
আর ছাপাখানার জন্যে সবরকম সাজ-সরঞ্জাম
আমরা দ্রুত সরবরাহ করি

সেরা টাইপের জন্য সর্বদা "শ্রী মা" টাইপ চাইবেন

শ্রী মা টাইপ ফাউণ্ড্রি

২৫৯, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৮

ফোন : ২২-৬৩১২, ৫৫-৩৫৪৭

With the Best Compliments

from

Financiers & Distributors

Satyanaryan Kamal Kumar

4, Jagmohan Mullick Lane (Ist Floor)
CALCUTTA-7

উর্বশী স্নানাগারের রাণী

দক্ষিণ কলকাতার মহিলারা উর্বশী তেই কেনাকাটা পছন্দ করেন—

উর্বশী (মার্কেটিং) প্রাইভেট লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস

১৩৮, বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা ১০

ফোন : ১৫-১৮১৭

শোরুম : ২৮।২, ঘড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

ফোন : ৪৪-১৮-৫৩

শোরুম : ৪২এ, কালী টেম্পল রোড, কলিকাতা-২৬

DUNLOPILLO

খাট. চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, ড্রেসিং আলমারী,
পূজোয় প্রিয়জনের মনের মত উপহার চাই !

আমাদের নিকট
ন্যায্যমূল্যে সর্বপ্রকার আধুনিকতম ফার্ণিচার পাওয়া যায়।

PHONE 34-2911

ELITE FURNISHERS

INTERIOR DECORATORS & FURNISHERS.

Stockists
DUNLOPILLO and ***RILAXON***

240/4, BEPIN BEHARI GANGULI STREET, (Bowbazar) CALCUTTA-12.

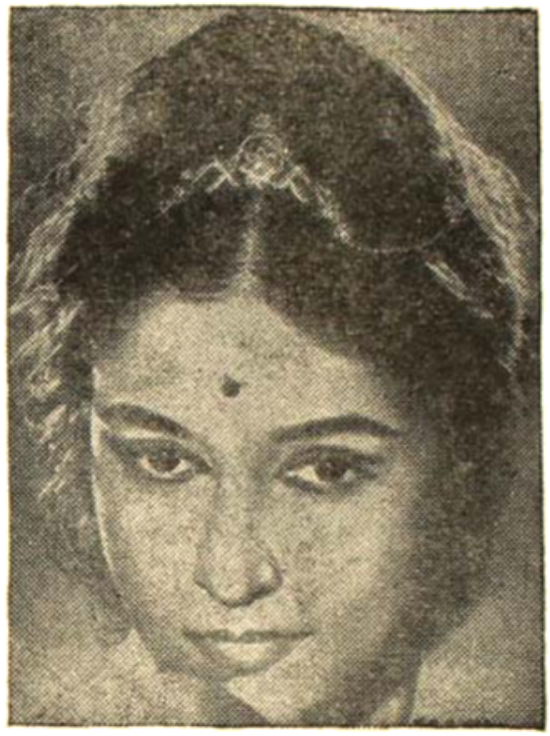

আপনার এবং আপনার
প্রিয়জনের জন্য

মদির—মনোহারিণী

প্রিয়া
সুরভি

প্রস্ফুটিত ফুলের মতই আপনাকে
সারাদিন সুরভিত রাখবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী

নূতন রহস্য, নূতন আঙ্গিকে লেখা, নূতন উপন্যাস

সমরেশ বসুর

আঁখির আলোয়

অন্তীন মুখোপাধ্যায়ের

শেষ দৃশ্য

ইবনে ইমামের
মীনা বাজার ৭·০০

সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের
ভাগ্য বলাকা ৬·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
দ্বীপপুঞ্জ ৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
লাল মাটি ৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প পঞ্চাশৎ ২০·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের
বিস্মৃত যাত্রী ৪·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রাণুর প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ ৪·৫০
রাণুর তৃতীয় ভাগ ৪·৫০

সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কলঙ্ক ডোর ৪·০০

জিম করবেটের
টেম্পল টাইগার ৫·০০

গোলাম কুদ্দুসের
বাঁধী ৬·৫০
সম্বোধন ৪·০০

কমলাই পাকড়াশীর
টীলাপাড়ার বাঘ ৩·০০

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা
ও কাব্যরূপ ১০·০০

পূর্ণ ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

মুকুন্দ পাবলিশার্স ॥ ৮৮ বিধান সরণী, কলিকাতা—৪, ফোন ৫৫-০১৩৪

বই, পাত্রিকা, কার্টন, বেবেব

কি ছাপাতে চান ?
আমাদের কাছে ছেড়ে দিন কারণ—
ন্যায্য দরে, ঠিক সময়ে, ভাল কাজ
আপনি আমাদের কাছেই পাবেন।

আমাদের নিজস্ব নিজাগে
আমরা উৎকৃষ্ট ব্লক ও ডিজাইন করে থাকি।

দীপক প্রিন্টিং অ্যাণ্ড টাইপ ফাউন্ড্রি

(প্রাইভেট লিমিটেড)

১৩৮, মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা-৯

টেলিফোন : ২৪-২৩৯৭

ক্যালকাটা প্রেসেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
২৪১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৩-৩১০৮

একটি বিশেষ ঘোষণা

দীপান্বিতা

শারদীয়া সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা

আগামী ১লা নভেম্বর নবকলেবরে

নতুন আকারে প্রকাশিত হবে।

পরিবর্তিত আকার :—ডবল ডিমাই ষোল পেজি কর্মা।
মোট ২৪০ পৃষ্ঠা।

মূল্য বর্ধিত হবে না ॥ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রের মুখপত্রিকা।

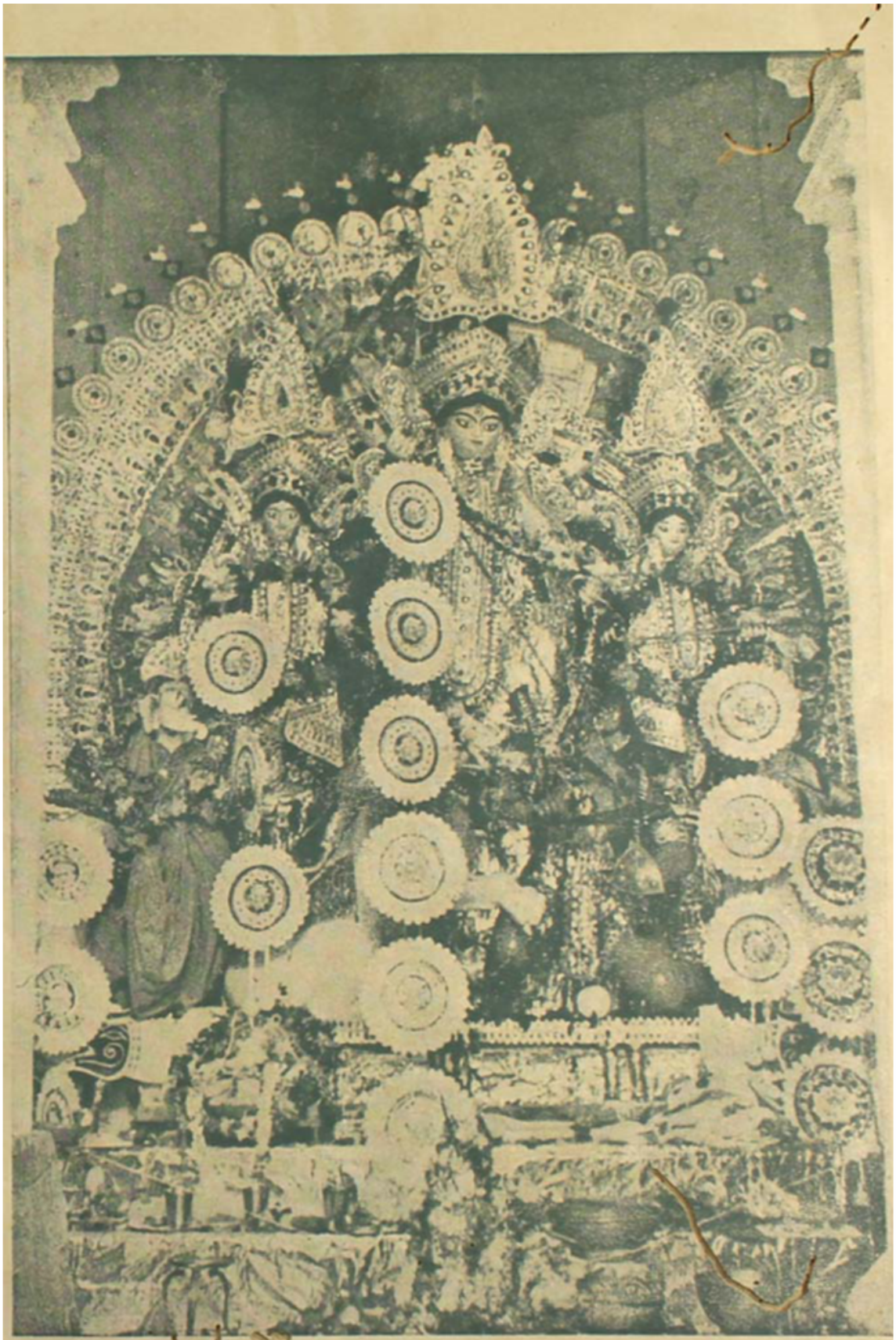

কালকাতার প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন প্রতিমার প্রতিচ্ছবি

সূচীপত্র

756.3
.008/9

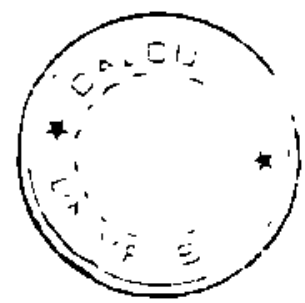

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এল পথিক (উপন্যাস)	সুবোধ ঘোষ	২৫
জীবন মৃত্যু (গল্প)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৫
আহুতি (গল্প)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৭১
তমসা (গল্প)	শক্তিপদ রাজগুরু	৭৭
ইস্পাতের পাত (গল্প)	আশাপূর্ণা দেবী	৮৪
কবিতা		
অন্ধেতে নদীর সিন্ধি	বিষ্ণু দে	
দূরভাষ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
এখন আমি আর একা নই	নবীন্দ্র বাগ	
শুধু তুমি থাকো	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	
আমায় কেউ চেনে না	পরিণীতরঞ্জন বসু	

গ্রীষ্মের দাবানল
পরিহারের জন্য হিমালয়ের
শৈলশিখরেই হোক...

মুসৌরী

বারাণসী

উত্তরবাহিনী তীরে
ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত
তীর্থক্ষেত্রেই হোক...

মনোরম ভূমিমুখরিত
সমুদ্র সৈকতেই হোক...

পুরী

লীজো হোটেল

সর্বত্রই আপনার ও
আপনার পরিজনবর্গের
সেবায় উন্মুখ

হেডঅফিস: ২৪৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন ৩৪-০১০৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা		
ডানা থেকে দিতে পারো	বাণী বসু	
কনসার্ট	গোবিন্দ চক্রবর্তী	
প্রকৃত উক্তি	কৃষ্ণ ধর	
বয়স	তরুণ সান্যাল	
অন্তরে-বাইরে	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	
চাঁদের বধ্যে উড়ছে ঘুড়ি	রোহিত চট্টোপাধ্যায়	
যার যেমন	তারাপদ রায়	
চাবি	পবিত্র কর	
ঝড়	সুনীল বরণ	
এপার ওপার	সুনীল ঘোষ	
স্বাদ	অনুপম সাহ	
বোধন (প্রবন্ধ)	অরিন্দম মজুমদার	
সঙ্গীত সমালোচক (প্রবন্ধ)	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	
স্বর্ণচক্ষু (উপন্যাস)	সমরেশ বসু	
পরিত্রাণ (গল্প)	মতি নন্দী	
শব (গল্প)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	
বাজুরিয়ার বাঠ (গল্প)	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাসাঙ্গনা (গল্প)	যাবেশচন্দ্র শর্মাচার্য	
অন্তিম ইচ্ছা (গল্প)	পবিত্র গুপ্ত	

এবার পূজায় নতুন নাটক !

নাট্যামোদী দর্শকদের অভিনন্দন ধন্য
বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে
পরিপূর্ণ হেমন্তাগমে চলছে

দ্বি ধা

নাটক ও নির্দেশনা : **বিধায়ক ভট্টাচার্য**

আলো ও মঞ্চ পরিকল্পনা : **তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত**

—: চরিত্র চিত্রণে :—

তৃপ্তি মিত্র ॥ **অসীমকুমার ॥**

লতিকা দাসগুপ্তা • বনানী ভট্টাচার্য
ভানু চট্টোপাধ্যায় • সীতেশ চক্রবর্তী
কালিদাস গাঙ্গুলী • রুণু সরকার
সুবোধ মুখার্জী • বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

অসিতবরণ ॥ এবং **তরুণকুমার ॥**

শীশমহল

সালকিয়া—চৌরাস্তা—অরবিন্দ মার্কেট
ফোন : ৬৬-৪৫৬৩

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ টায়
প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনে বেলা ৩ টা ও সন্ধ্যা ৬॥০ টায়

নিয়মিত ভাবে অভিনয় চলবে

হাওড়া ষ্টেশন থেকে আসবার পথ : বাসে—৫১, ৫৪, ৩৬বি ও ২৪। ট্রামে—৪১ ও ৪২। এছাড়া আহিরীটোলাঘাট থেকে সালকিয়া বাঁধাঘাটের মধ্যে মিটবার সার্ভিস আছে। অভিনয়ের শেষে ট্রাম, বাস ও অন্যান্য যানবাহন পাওয়া যায়। সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত বুকিং খোলা থাকে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সঙ্গিনী (উপন্যাস)	বিমল কর	
যে নদী মরুপথে (গল্প)	সুনীলকুমার ঘোষ	
মানুষ বেচা কেনা (গল্প)	সুনীল গুহ	
জল ডাকাতের গল্প (গল্প)	নরেন গঙ্গোপাধ্যায়	
ঠিকানা (গল্প)	বুদ্ধদেব গুহ	
হরিণী (উপন্যাস)	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	
মন খারাপ (গল্প)	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৮
বোমা বারুদ (গল্প)	দিব্যেন্দু পালিত	২৭৫
সহোদর (গল্প)	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	২৮২
স্বর্ণ চাঁপার দিন (উপন্যাস)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৮৯
চেনা অচেনা (গল্প)	নিখিলচন্দ্র সরকার	৩৩৭
টুটুর জন্য মাছ (গল্প)	শিশির লাহিড়ী	৩৪৮
হৃদয় নিয়ে (গল্প)	সত্যেন্দ্র আচার্য	৩৫৫
অভিনেত্রীর সাজ-সজ্জা (ছবির ফিচার)	বাসবী নন্দী	৩৬১
কেশ পরিচর্যা (ছবির ফিচার)	সুমিতা সান্যাল ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়	৩৬৩
জেলখানার লেখক (প্রবন্ধ)	রবিদাস সাহারায়	৩৭২
ক্রন্দন সঙ্গীত (প্রবন্ধ)	ভারতপুত্রম্	৩৭৪

প্রচ্ছদ ॥ সুধেন্দু পত্রী

অলঙ্করণ ॥ সমীর সরকার, সুবীর মৈত্র ও নিতাই ঘোষ

DO YOU WANT

HIRE PURCHASE FACILITIES

Let's step in

MODI FINANCE CO.

FOR 2nd HAND VEHICLES, BUS, LORRY, CAR, TEMPO AND LAND.

CONTACT :

Calcutta's Leading Centre

MODI FINANCE CO.

P-14, Sahitya Parishad Street, Calcutta-6

Phone : 55–9856

বাংলার ঘরে ঘরে এখন আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা পৌঁছে গেছে, বর্ষার নিরাভরণা, ক্লেশকর্কশা, দুর্দর্শনীয়া প্রকৃতিভাবিনী এখন এই শরতে পুষ্পাভরণা স্নিগ্ধা মধুরা, মধুর কেবলা কান্তিমতী বরবর্ণিনী।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক, কাল সকলেই সুভূষিত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—সবই

সুপরিচ্ছদে শোভিত। প্রকৃতিদেবী আজ অধিশ্বরীর আগমনোল্লাসে উল্লসিত হইয়া এই ধরামণ্ডলকে নবসাজে সাজাইতেছেন। স্বর্গীয় পরিচ্ছদে ভূষিত করিতেছেন।

আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। এই নিরানন্দময় আকালের যুগেও এখন আমাদের উৎসব আসিতেছে। মা আনন্দময়ী আসিবেন। এখন পাষাণ হৃদয়ও আনন্দে প্লাবিত।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

সেই জগন্ময়ী আদ্যাশক্তি নিত্যা সমুদয় চরাচরই তাঁহার সৃষ্ট।

"দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

ভক্তবৎসলা দুষ্টবিনাশিনী শিষ্ট পালিনী জগদম্বা দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য কখনো কখনো আবির্ভূতা হন। তিনি নিত্যা হইলেও সেই আবির্ভাবকেই লোকে উৎপত্তি বলিয়া থাকে, জননীর এই সকল আবির্ভাবে এক মূর্ত্তি নহে। মা আমার কখনো সহস্র বাহু, সহস্র প্রহরণ ধারিণী কিরীটোল্লিখিতাম্বরা ভীমাময়ী অত্যুগ্র-মূর্ত্তি. কখনো বা ঈষৎ হাস্যমধুরা কোমলাময়ী রমণীয় মূর্ত্তি. এইরূপ কত শত মূর্ত্তিভেদ আছে। তাহা ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা হউক আজকের এই শারদীয় মূর্ত্তি মহিষাসুর বধের জন্য ভগবতী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীরামের জন্য এই শারদীয় পূজা ব্রহ্মা করিয়াছিলেন, যথা—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তন্ত্রী কৃতঃ পুরা:।"

(কালিকাপুরাণ)

শরৎকাল দক্ষিণায়ন। দেবগণের রাত্রি। এ সময়ে ব্রহ্মা মায়ের বোধন করেন। রাবণবধ এবং রামের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ হইবার জন্য।

আজো সেই অসুররূপ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মায়ের সন্তানদের একই লড়াই। মায়ের আশীর্বাদ নিয়া তাঁহার কোটী কোটী সন্তানেরা আজো রাবণ রাক্ষসের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া চলিতেছে। জানি সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন ও কিছুই হইবার নহে। যদি নিতান্তই কিছু করিতে হয়, তবে হে মাতৃচরণদর্শনাভিলাষী অতৃপ্ত সন্তানগণ, সবে মিলিয়া একবাক্যে কাতরকণ্ঠে বলি —মা।

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী কাত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।"

আজ এই মানুষটিকে দেখে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবে যে, ইনিই এককালে আট ক্রোশ পথ একটানা হেঁটে পার হয়ে দিতে পারতেন? বললেও কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, ইনিই একদিন রাগ করে রেল-লাইনের একটা লেভেল ক্রসিং-এর তালাবন্ধ বেড়া-গেট এক লাথিতে ভেঙে খুলে দিয়েছিলেন। গেট বন্ধ করে

কোথায় যেন চলে গিয়েছিল গোঁয়ার; এদিকে আষাঢ় মাসের ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যাটাও ঘনিয়ে উঠেছিল। আর দুটো গরুর গাড়িতে বসে বর ও বরযাত্রী আট-দশটি মানুষ ছটফট করছিল। এখনও যদি গেট না খোলে, যদি ক্রসিং পার হয়ে ওদিকের পথে উঠতে না পারা যায়, তবে শীতলদীঘির নন্দীবাড়িতে ওরা পৌঁছবে কখন? আজ রাতে? না, পর রাতে? কিন্তু বিয়ের লগ্ন যে রাত ন'টার মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আর, এই একুশে আষাঢ়ই তো এই মাসের মধ্যে শুভবিবাহের শেষ দিন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ছটফট করেনি বর ও বরযাত্রীর দল। দুই গরুর গাড়িকেও আর বেশিক্ষণ হতাশ হয়ে বসে থাকতে হয়নি। হঠাৎ চমকে উঠেছিল আর খুশির চোটে হেসেও ফেলেছিল বর ও বরযাত্রীর দল। কে এক ভদ্রলোক, বয়স ত্রিশ বছর হবে, সাইকেল থেকে নামলেন। বন্ধ গেটের দিকে কটমট করে তাকালেন। তার পর গেটের গায়ে একটা লাথি মারলেন। তালাটা খুলে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল। সেই গেট পার হয়ে, আবার ওদিকের গেটের কাছে গিয়ে ঠিক এইরকমই একটা কাণ্ড করলেন সেই ভদ্রলোক, গেটের গায়ে নিখুঁত এক পদাঘাত। ঝিঁঝিডাকা আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে খোলা গেট পার হয়ে চলে গেল দুই গরুর গাড়ি, আর বরযাত্রীর খুশির হল্লা। তখন নয়, সেদিনও নয়, অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিল শিমুলডাঙার বর ও বরযাত্রীর দল, আর শীতলদীঘির নন্দীবাড়ি, ওই ভদ্রলোকের নাম লোকনাথ রায়, রায়গঞ্জ হাই স্কুলের মাষ্টার। কিন্তু ভদ্রলোকের পা দুটো কি লোহার পা?

সেই লোকনাথ রায়, সেদিন যাঁর বয়স ছিল তিরিশ, আজ তিনি পঁচাত্তর বছর বয়সের একটি অনড় ও অক্ষম দেহ। দুই পায়ে বাত, একটি পঙ্গু মানুষ। বালিশের তেল খেয়ে খেয়ে পা দুটো যেমন চকচকে, তেমনিই কালো হয়ে গিয়েছে।

লোকনাথ রায়ের জীবনে আজ আর সেই রায়গঞ্জ নেই, সেই মাষ্টারীও নেই। পঁচিশ বছর আগের সেই জীবনের ঠিকানা যেন কবে মুছে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রায়গঞ্জ, রায়গঞ্জের সেই বাড়ি, রায়গঞ্জের বাসকেত আর কেশে খালের সেই জংলা মাঠ, তাঁর কাছে একটা স্মৃতি মাত্র, একটা পুরনো বস্ত্রের ছায়াও বলা যায়।

কলকাতার ভবানীপুরের গলিতে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। সাতঘর ভাড়াটে লেন। নীচে দুটো, উপরে একটি ঘর। উপরের সেই ঘরের কোণে একটা খাটের উপর শুয়ে পড়ে থাকা এই জীবন যে একটা আধা-কবর, কিংবা জীবন্ত সমাধিরই মত একটা জীবন, সেটা খুবই বোঝেন লোকনাথ রায়। কারণ, বুঝিয়ে দেবার মত একটা প্রাণের নিঃশ্বাস এখনও তাঁর এই ঝিরঝিরে বুকের ভিতরে ছটফট করে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর বুকের ভিতরে সেই নিঃশ্বাস যখন একটু বেশি ছটফট করে, তখন হাতের উপর ভর দিয়ে ও কোমরটাকে শক্ত করে দিতিয়ে দিয়ে শরীরের উপর অংশটাকে কোনমতে খাড়া করে খাটেরই উপর বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে বসিয়ে রাখতে পারেনও। তারপর হাত দিয়ে পা দুটোকে টিপে টিপে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

কী ছাই আর বুঝবেন। শুধু মনে পড়ে যায়, এই তো সেই দুটি পা। রায়গঞ্জ থেকে সদরের কাছারিতে বেলা দশটার সময় পৌঁছতে হলে সূর্য ওঠার আগে শেষরাতেই রওনা হওয়া উচিত। লোকনাথ রায় কিন্তু সূর্য ওঠার পর, অবাকুসুম সংকাশং ক'রে স্নান দেবে দিয়ে, পাঁচটি পাকা কলা দিয়ে দুধ-মুড়ি খেয়ে নিয়ে তারপর রওনা হতেন।

পথে যেতে বুড়ো বুড়ো কত বটের ছায়া পাওয়া যেত। কিন্তু কোন ছায়াতে এক মিনিটের জন্যও জিরোতেন না লোকনাথ রায়, জিরোবার কোন দরকার আছে বলে বোধ করতেন না। কারণ, সেই দুই পায়ে কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ ছিল না। যদি নদীটার কাছে পৌঁছবেই দেখতে পাওয়া যেত, শিবমন্দিরের সাধুবাবার চাতালের উপর শুয়ে পড়ে আর পা এলিয়ে দিয়ে পথটাকে ক্লান্তির আরাম দেয়ে নিজে হাটে যাবার হাটুরে মানুষগুলিও; চোখে পড়তেই হেসে ফেলতেন লোকনাথ

হাত, আর তাক দিয়ে বলবেন, কী ব্যাপার হে কৈলাসচন্দ্র এক ক্রোশ পথ হেঁটেই পা ধরে গেল নাকি!

সেই কৈলাস আজ এসে কোথায়? সে কি এসে সেই শিবমন্দিরের চাতালের উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর দুই পা দুলিয়ে দুলিয়ে পথচলা ক্লান্তির আরাম সেরে নিচ্ছে? শিবমন্দিরটার কি আছে? বুলো কাঁটা লতায় মন্দিরের সারা গা ছেয়ে গিয়েছিল, আর যত্রতত্র কাটলের ভিতরে শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে বাসা বেঁধেছিল দুটো বড় বড় পাখি। লোকে বলতো, ওরা ধনঞ্জয় পাখি। ওদের মধ্যে পুরুষ পাখিটা একেবারেই অন্ধ, সেটা বাসাতেই থাকে। শুধু মাদি পাখিটা উড়ে উড়ে বাইরে যায় আর আসে।

দুই হাতে বিদ্যুৎবেগে দুই পা টিপে দেবার পর, আর ছোট জানালা দিয়ে পাশের পড়ো বাড়িটার আঙিনাতে জলা সূর্যমুখীর ঝোপের উপর নতুন ফড়িং-এর ফুর্তির খেলা দেখতে দেখতে পশু সোবহানাথ রায়ের দুই চোখ যখন অদ্ভুত হয়ে চক চক করে ওঠে, তখন একবার ঘরজামাই দরজার দিকে তাকান। শিবমন্দিরের গায়ের ফাটলের বাসিন্দা সেই পুরুষ পাখিটা, সেই অন্ধ ধনঞ্জয়টা তো চোখে দেখতে পেত না। কিন্তু লোকনাথ রায়ের চোখে তো এখনও দৃষ্টি আছে। জীবন্ত দৃষ্টি। সেই চোখে দেখবার আশাটাও তো জীবন্ত। তাই আশা করেন, তাই দরজার দিকে মাঝে মাঝে তাকাতেও ইচ্ছা করেন। আর মনে হয়, হাঁ, এইবার বোধ হয় নীরজা আসবে। কোন কাজ না থাকুক, দরকার না থাকুক, শুধু একবার আসবার কথা কি ভুলেই যাবে নীরজা?

খুব ভেঙেছে তোর পাঁচটায়; তারপর পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে লোকনাথ রায়ের এই পশু শরীরটাই যে বাত করেছে, সে কার চোখে দেখতে পেলে ভোজবাবুর বড় ডাক্তারও চমকে উঠবেন, আর কলকাতের পাকা মানুষেরও দুই চোখ কুঁচকিয়ে বকল হয়ে যাবে। ঘাটের পাশের ভেঙালের গায়ে লোহার গজালের সাথে বাঁধা একটা দড়ি ছাদের ওদিকের একটা ছোট্ট ঘরের ভাঙা দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পায়ের জোর তো প্রায় বিশেষ হয়েই গিয়েছে, কিন্তু হাতের জোর আছে। ডাক্তারবাবু বলেন—লোকনাথের হাত দুটো কিন্তু এখনও লোহার হাত। প্রায় ঘুলে ঝুলে, হাতেই ভোরে পশু শরীরটাকে গড়িয়ে সরিয়ে ও টেনে-টেনে ছাদের ওই চায়গাটা ওই ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে পারেন লোকনাথ রায়। তারপর ফিরে এসে যদি দেখতে পান যে, ঘরের ভিতরে ও দরজার কাছেই রাখা বালতিটাতে জল আছে; তার মানে, বুড়ি কি সবর মত মনে করে আর দুই ঘরে জল রেখে দিয়ে গিয়েছে, তবে ঘটি দিয়ে সেই জল মাথাতে ও গায়ে ঢালেন। আকাশে সূর্য না থাকুক, তবু বিড় বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আর ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়ও পরেন। কারণ, হাতে জোর আছে।

কে রেখে দিয়ে গিয়েছে এই জল? নীরজা? না, নীরজা নয়। নীরজা যদি এঘরে জল রেখে দিয়ে যেত, তবে তো বুঝতেই পারেন লোকনাথ। নীরজার হাতের চুড়ির শব্দটাই টুং টাং করে বুঝিয়ে দিত, আর কেউ নয়; সেই নীরজা এসেছে। ঘরটা যত দুঃসহ গ্রোক না কেন, চোখ দুটো বন্ধ করে থাকলেই বা কি? আর ঘরে আলো না থাকলেও কিবা আসে যায়? নীরজার চুড়ির শব্দ শুনতে পাবে না লোকনাথ, এমন ব্যাপার হতেই পারে না। বুড়ি কি, যার নাম রাজুর মা, সে-ই জল রেখে যায়। ভাতের থালাও পৌঁছে দিয়ে যায় রাজুর মা।

আজ থেকে দশ বছর আগে, যেদিন হারাণগঞ্জ ছেড়ে কলকাতায় ভবানীপুরের এই বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়ে ছিলেন লোকনাথ রায়, সেই দিন এরা সবাই তো, মেয়েতে গেলে, কিন্তার ছেলেমানুষ আর শিশুই ছিল। বড় ছেলে মুকুল বয়স তখন সবর বছর' বড় মেয়ে টুনির বয়স বছর, আর ছোট মেয়ে টুনির গোছ।

হারাণগঞ্জ ছাই মুকুলের মাহারী, তাদেরটা খুব সুখের না হলেও কম মানুষের জীবন ছিল না। মাহারীর মাইনের পঞ্চাশটা টাকা খুব বড় সবল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সে-জন্য খুব দুশ্চিন্তা করবার তেমন কোন ভয় ছিল না। বাড়িটা তো নিজেরই বাড়ি। তিন পুরুষ বাস করেছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি। সেই বাড়ির ঠাকুর ঘরের ভিতের গায়ে সাদা পাথরের ফলকে কালো অক্ষরে তিন পুরুষ আগের শ্রীযুক্ত রায় হাতে একটি আপার নিবেদনও সংস্কৃত ভাষার শ্লোকে লেখা ছিল, যার অর্থ, পণ্ডিতেরা বলেন লক্ষ্মী চঞ্চলা; কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় এই গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বিরাজ করবেন।

বাড়িটা খুব বড় নয়; কিন্তু বাগানটা আর পুকুরটা বেশ বড়। কলকাতার পাইকার এসে সেই বাগানের আমকল আর বাতাবী লেবু গো-গাড়িতে বোঝাই করে সেবীনগরে রেল ষ্টেশনে নিয়ে যেত আর কলকাতায় চালান দিত। ওই মন্বীগ্রামেই অবিশ্যি বাড়ির এক বিয়েতে কাজের জন্য লোকনাথ রায়ের সেই পুকুর থেকে একবার একশটি আধমনী চিতল তোলা হয়েছিল। কাজেই সেই লোকনাথ রায় যখন জগদ্ধাত্রী পুজোতে অনেক ঘটা করতেন, আর গাঁয়ের সব মানুষকে কাঁচা-পাকা দুবকমেরই প্রসাদ পেট ভরে খাওয়াতেন, তখন তাঁকে টাকা ধার করতে হতো না। বাগানের আয়; আর ওই বাগান ও পুকুরের আয়ের টাকায় জগদ্ধাত্রী পুজোর ঘটা খুব ভাল করেই ঘটে যেত।

হ্যাঁ, সে-সব দিনের ছবি যেন কুয়াশার সঙ্গে উবে যাওয়া একটা জীবনের ছবি। দশ বছর আগে যেদিন নিজেই শখ করে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে ঘরে ফিরলেন লোকনাথ রায়, সেদিন হঠাৎ বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কোমরে যেন অদ্ভুত রকমের একটা ব্যথা নিয়মিত করে কাঁপছে। একদিন দু'দিন তারপর তিন মাসের মধ্যেও যখন ব্যথাটা একটুও সারলো না,

বরং আরও কনকনে হুয়ে বই দিয়ে শুরু করলো, যখন ওই নীরজাই খুব রাগ করে একদিন ঝগড়া করেছিল—না, তোমার আপত্তির কোন কথা আর শুনবো না।

হেসেছিলেন লোকনাথ রায়—কোন আপত্তি করছি তবু আর একটা দুটো মাস একটু ধৈর্য ধরে···

নীরজা—না ; যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে।

তার মানে, কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। নিতাই কবিরাজের ওই ছাই পাঁচন আর-বেশি খেলে, আর ওই কালো ঘি আর-বেশি মাখলে পঙ্গু হয়ে যেতে হবে। যাদবপুরের সুবাদি বার বার অনেক চিঠিতে বেশ কড়া ভাষায় অনেক কথা লিখেছেন। কলকাতায় এসে ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করালে এক মাসের মধ্যেই ওই রোগ একেবারে সেরে যাবে। কিন্তু দুটো পয়সার মায়া করে যদি তোমরা পাঁয়ের করবেরী যন্ত্রণায় পঙ্গু থাকতে চাও, তবে তাই কর।

রায়গঞ্জ থেকে চলে আসবার দিন নিতাই কবিরাজও দেখা করতে এসেছিল। কেঁদে ফেলেছিল নিতাই কবিরাজ। আজও নিতাই কবিরাজের ঘুঘুর সেই কেঁদোমুখো লোকনাথ রায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিতাই কবিরাজের আঙুর পায়ের উপর একটা ময়লা উড়ুনী। সেই উড়ুনীর খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে নিতাই কবিরাজ—আমি আবারও বলি, কলকাতায় যাবেন না রায় মশাই। আমি আবার বলছি, আর বড় জোর তিনটে চারটে মাস লাগবে, আমার গুণেই আপনার কোমর-ব্যথা চিরকালের মত সেরে যাবে।

কলকাতায় এসে থাকবার ও চিকিৎসা করবার জন্য কিছু টাকা চাই। তিন বিঘে ধানজমি বেচে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করা হয়েও গেল। কিন্তু তখন কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন লোকনাথ যে, সব ধান জমি বেচে দেবার দরকার হবে ? পারেন নি। সব ধানজমি বিক্রির যাবার পরেও কি সামান্য একটু সন্দেহও করতে পেরে ছিলেন যে, পুকুর আর বাগানটাকেও বেচে দিতে হবে ? পারেন নি। ভবানীপুরের সেই বাসা বাড়িতে একটানা দশটা বছর পার হয়ে যাবার পর একদিন ডাক্তার বর্ধনবরের একটা ঘরের ভাঙা চিৎকার করে ডুকিয়ে দিল, এই রোগটা ঠিক পায়ের বাত বাবার রোগ নয়, এটা তাঁর ভাগ্যেরই একটা অন্য রোগ। সাত মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, তাই বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর দারোয়ান এসে চিৎকার করছে—হয় এখনি বকেয়া ভাড়ার সব টাকা মিটিয়ে দাও, নয় এখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

সেদিন মনে মনে একটা হিসাবও করেছিলেন লোকনাথ। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনটাকে পুষতে গিয়ে মোট ছাপান্ন হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে শুধু এক ডাক্তার ডাক্তারকেই প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। খুব ভাল ও খুব নাম করা ডাক্তার ডাকতে হয়েছে, নীরজার ওই সুবাদিরই কেমন-যেন ধারণা হয়। আর, সুবাদির দেবর বলেই, কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই, তা ছাড়া সুবাদি একটু বলে দিয়েছিলেন বলেই, ডাক্তার ডাক্তার তাঁর প্রাপ্য ফী-এর বাইরে আরও কিছু নিয়েছেন।

আরও একটা হিসাব করেছিলেন লোকনাথ। রায়গঞ্জে থাকতে তিন বছরে নিতাই কবিরাজের পাঁচন কিনতে খরচ পড়েছিল একুশ টাকা। ঠিক কথা, কোবরেজ কনকনে ব্যথাটা সারাতে পারে নি নিতাই কবিরাজের সেই একুশ টাকার পাঁচন ; কিন্তু তবু তো সেদিন এই দুই পায়েরই জোরে পথ হেঁটেছিলেন লোকনাথ। স্টেশন যাবার পথে শিবমন্দির পর্যন্ত হেঁটেই চলেছিলেন, তারপর গো-গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ কোথায় গেল সেই পাঁচন খাওয়া শরীরের দুটি খোঁড়া পায়ের সেই জোর ? দেখলে আজ নিতাই কবিরাজ বোধহয় ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবে, এ কী হলো রায় মশাই ? আপনার পা দুটো যে শুকিয়ে লক্ লাঠির মত হয়ে গিয়েছে।

সুবাদি বলেন, পাঁয়ের করবেজ আপনাকে করেই মেরে ফেলতো রায় মশাই। আজও যে আপনি বেঁচে আছেন, সেটা আমাদের ডাক্তার ডাক্তারেরই চিকিৎসার গুণ বলে জানবেন।

—হতে পারে। বলতে গিয়ে সুবাদির সামনে সেদিন

যেমন হেসেছিলেন লোকনাথ, তেমনই আরও অনেকবার হেসেছেন, যখনই মনে পড়েছে, তখনই।

কিন্তু তারপর? চৌধুরীবাবুর ব্যাপারটার যখন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর কলকাতায় থাকা চলবে না। থাকতে হলে আরও টাকা চাই। কোথা থেকে আসবে টাকা? এখন তো সেই রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাড়িটা তো এখনও আছে; সেই বাড়ির অন্তঃসারহীন পুরুষার মধ্যে বেঁচে থাকার অনেক অনুবিধেও আছে। কিন্তু চৌধুরীবাবুর ব্যাপারটা তো সেখানে গিয়ে বলবার আর চিৎকার করবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ সুধাদি এসে, আর সত্যিই যেন চিৎকার করে হেসে উঠলেন—ওরে নীরু, তোদের রায়গঞ্জের বাড়িটার ভিতের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় কী যেন লেখা আছে? লক্ষ্মী না কি, সে বাড়িতে চিরকাল অচলা হয়ে বাস করবেন?

নীরজা হাসে—হ্যাঁ, বড়দি। সত্যি তাই লেখা আছে।

সুধাদি আরও হাসেন—কী চমৎকার সত্যি কথাই না লেখা আছে। যাক্ সে-সব কথা, এখন আসল কথা হলো, বাড়িটাকে শিগ্‌গির বেচে দেবার ব্যবস্থা কর।

নীরজা—আমি তো তাই ভাবছি।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা অলজ্জে আভা হঠাৎ জ্বলে চমকে ওঠে। প্রদীপে তেল নেই, পলতেও পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু যেন একটা জ্বালা জ্বলছে, সেই রক্তের বাতির মত চোখ। লোকনাথ বলেন—না, তা হয় না। কখ্‌খনো না।

সুধাদি—কেন?

লোকনাথ—আমি জানি, আমাকে সেদের বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে।

সুধাদি হাসেন—আপনি তাহলে সবই দেখছেন।

হাসতে হাসতে চলে গেলেন সুধাদি।

[দুই]

ঠাট্টা করে কথাটা বলেছেন সুধাদি, কথাটা যেন ধারাল ছুরির মত লোকনাথের বুকের ভিতরে একটা খোঁচাও দিয়েছে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, আমি স্বপ্ন দেখছি না, সুধাদি।

রায়গঞ্জের হাসপাতালবাবুকে কবেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে রেখেছেন, হ্যাঁ, বাড়ির নীচের তলার বারান্দা আর তিনটে ঘর ছেলে হোস্টেল প্রাইমারী স্কুলের জন্ত ভাড়া দিতে পারি। আর, পুবদিকের বাগানে যদি আলুর চিনির কারবার জন্ত হাসপাতাল ভাড়া নিতে চান তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আর কোন ঘর নয়। আমি শিগ্‌গির দেশে ফিরবো।

হ্যাঁ, রায়গঞ্জের সেই বড় নদী, বোশেখ মাসে যার পাঁক শুকিয়ে ঘটঘটে হয়ে যায়, আর আষাঢ়ের প্রথম জলের ঢল গড়িয়ে যেতেই যার উপর ভিড় ভাসিয়ে বাংলোপাড়ার ছেলের দল কাছিম শিকার করে বেড়ায়, তারই ভাঙা ঘাটের চাতালের উপর বসে আজও কি গান গায় না শীতলদীঘির বিন্ত বৈরাগী? উপরতলার দক্ষিণ-দিকের ঘরের জানলার কাছে রাতের বেলায় দাঁড়ালে আর মাঠের দিকে তাকালে সেই ভোলা ভাগনের মত দুঃসাহসী ছেলের গা'ও ছমছম করতো। মাঠের উপর আলেয়া নাচছে। রায়বাহাদুরবাবুর বাড়ির বকুলবাগানে নিশ্চয় এখনও আছে। সেই বকুলের বাতাস মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে একেবারে হরনগর পর্যন্ত চলে যায়। রাজেশ্বর ঘোষের পুকুরকিনারায় সেই অবাগাছ, যারোবাস যাঁর গায়ে শুধু পাতা ঘরে আর ঝরে, তার একটি ডালে শুধু একটি ফুল ফুটবে ঠিক সেদিন, যেদিন শ্যামাপূজা। সেই-বছর একবার কে-যাত্রে ফুল সরকারের বাড়িতে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন চলছিল, কার্তিক পূর্ণিমার সেই রাতে ফুল-বাড়ির খেলার মাঠের পাশে সেই কদম গাছের কাছে কী দেখেছিলেন রতনমণির মা? চুপটি ক'রে কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে, তার গলায় বনফুলের মালা। কিন্তু শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র, আর তাকে দেখা গেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বুঝতে পারেন, লোকনাথ, একা তিনি ছাড়া এবাড়ির আর কেউ যেন ফিরে যেতে রাজি নয়।

ভবানীপুরে এই বাসাবাড়ির জীবনটারও স্বপ্ন আছে, আর সে-যে কী চমৎকার একটি রঙীন স্বপ্ন, তা'ও জানেন লোকনাথ। ধানজমি-বেচা, পুকুর-বেচা আর বাগান-বেচা ছাপান্ন হাজার টাকার মধ্যে সাত হাজার টাকা তারক ডাক্তারের চিকিৎসার ধরা কিনতে খরচ হয়েছে, কিন্তু বাকি উনপঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে, এই ঘর-বন্ধুর সত্যিই একটা স্বপ্ন কেনা হয়েছে। সাথে আর আসবাবে এই বাসাবাড়ির একটা ঘর যেন সুধাংশু যাদবপুরের বাড়ির নীচতলার ছোট ঘরটার একেবারে ট-কপি। লোকাতে ঠিক সেইরকম চকচকে কালো পালিশ আর লাল ডেলভেটের গদি। জানালাতে লেসের পর্দার ওপর ঠিক তেমনই আসবাবী নীল। এবাড়ির ঘরে যে রেডিও বাজে, তার গড়ন আর চেহারাও ঠিক সুধাংশুর বাড়ির আপাদী রেডিওটারই মত, যেন ছোট্ট একটি খেলনা জাহাজ নীল সাগরের জলের উপর ভেসে রয়েছে। খাঁটি বর্মা সেগুনের একটা আলমারি এবাড়ির এই ঘরেও আছে। সুধাংশু বলেছিলেন, তিনি ওই আলমারি পার্ক স্ট্রীটের যে দোকান থেকে কিনেছিলেন, তার নাম নিউ মডার্ণ ফার্নিশার্স। নীরজাও একদিন সেই নিউ মডার্ণ ফার্নিশার্সের দোকানে গিয়ে আর বেছে-বেছে ঠিক ওই রকমের এই আলমারি কিনেছিলেন। ছেলে আর দুই মেয়েও নীরজার সঙ্গে গিয়েছিল। এই আলমারিতে যে সব খেলনা আর পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সে-সবও সুধাংশুর বাড়ির ওই আলমারির পুতুল আর খেলনাগুলির মত। রঙীন কিতাব দিয়ে তৈরী একজোড়া মুসলমান, কাশ্মীরের আখরোট কাঠের পাখি, শঙ্খের কুকুরছানা, সাদা পাথরের হাত-কাটা ভেনাস আর প্লাস্টিকের আঙুর-থোকা। সুধাংশুর বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের মত এবাড়ির এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার বর্ডারও পল-তোলা।

এই দশ বছরের মধ্যে রায়গঞ্জের কোন আলো-বাতাসের ছোঁয়া অবশ্য লোকনাথের এই জীবনের গায়ে লাগেনি, কিন্তু রায়গঞ্জের রামদয়ালবাবুর সঙ্গে অনেকবার কথা বলবার সুযোগ হয়েছে। রামদয়ালবাবু তাঁর কাজের ব্যাপারে মাঝে-মাঝে যখন কলকাতায় আসেন, তখন পুরনো বন্ধু লোকনাথের সঙ্গে একবার দেখা করে যান। যেদিন আসেন রামদয়াল সেদিন লোকনাথের প্রাণে যেন রায়গঞ্জের আলো-বাতাসের উৎসব মেতে ওঠে। কত গল্প, কত হাসি, পুরনো ঘটনার কথা নিয়ে কত তর্ক আর মন কষাকষি। রামদয়াল বলেন, মা তুমি খুব ভুল বুঝেছো লোকনাথ, আসল দোষ গগন সাহেবের মা, ওর দ্বিতীয় পক্ষের মানুষটির। লোকনাথ বলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, আর একশোবার বলবো, গগন সাহেবই নিখোঁ সন্দেহের বাতিকে বৌটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলেই···। রামদয়াল চেঁচিয়ে উঠেন—ভুল ভুল, তুমি বুঝতে খুব ভুল করেছো।

রায়গঞ্জের জীবনের প্রায় কুড়ি বছর আগের একটি জীর্ণ-পুরাতন ঘটনার কথা, কিন্তু দুই বন্ধুর বাদ-প্রতিবাদের শব্দ শুনে মনে হবে, যেন আজই এই কিছুক্ষণ আগে গগন সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি চলে গেল। গগন সাহেবের উপর লোকনাথের মনের সব রাগ বিরক্তি আর তিক্ততা যেন টাটকা ক্ষতের জ্বালায় মত চটচট করে আবার উঠেছে।

রামদয়াল বলেন—কিন্তু তুমি ভেবে দেখেছো কবে?

লোকনাথ—এই এবার; আর তো এখানে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। কোন দরকারও নেই।

রামদয়াল—হ্যাঁ, যে জন্যে এখানে আসা, সেটাই যখন একটা···।

লোকনাথ—কী?

রামদয়াল—একটা প্রতারণা হয়ে গেল; তখন আর এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

লোকনাথ—ঠিকই বলেছো রাদু; আজ বুঝতে পারছি, সে দিন নিতাই কেন কেঁদেছিল।

রামদয়াল—সে প্রতারণা তো আছেই, কিন্তু তারচেয়ে বড় প্রতারণা বোধহয় তোমার এই···। হঠাৎ কথা থামিয়ে দিয়ে রামদয়াল বলেন—ওই ঘরে এখন এত জোরে রেডিও বাজাচ্ছে কারা?

লোকনাথ হাসেন—বাসা বাড়ায়, তারাই বাজাচ্ছে। ওরা আছে ওদের স্বপ্ন নিয়ে।

রামদয়াল—তোমার ভবিষ্যৎ বা আমাদের বা আর পুরুষের টাকার পরই কি হারাবে···।

লোকনাথ—না সব নয়। বেশির ভাগ, ওদের ওই স্বপ্নের ঘরকান্নায় গরজ করেছে।

রামদয়াল এইবার ক্রুদ্ধ করে কথা বলেন—খুবই অদ্ভুত কথা বলতে হবে। এরকমটি কখনও দেখিনি। চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতাম না যে, এরকমটি কখনও হতে পারে। আমার সন্দেহ হয় লোকনাথ, তুমি যদি আরও দু'এক বছর চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় থাক, তবে তোমার এই বাড়ির ওই ঘরে হয়তো একটা টেলিভিশন সেট এসে পড়বে।

লোকনাথ—অন্তত একটা রেফ্রিজারেটর যে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায়ই শুনছি, ওরা বলাবলি করছে, আর বাদলপুরের সুধাদিও প্রায় অতি রাগ করছেন, একটা রেফ্রিজারেটর না হলে আর মানায় না।···যাই হোক, আমি কিন্তু এবার তৈরী হয়েই আছি রামদয়াল। আর এখানে নয়। এবার সন্ধ্যা বেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল।

প্রত্যেকবার ছোঁয়া পেয়ে ভয় পেয়েছেন লোকনাথ। সুধাদির গাড়ির হর্নের শব্দ শুনলেই তাঁর বুকটা ভয় পেয়ে দুরদুর করে। তারপর ডাক্তারের নাম শুনলেই চোখের তারা দুটো যেন সাদা হয়ে যায়। কিন্তু তবু এই দশ বছরের মধ্যে দশবার প্রতিজ্ঞা করেও শেষ পর্যন্ত রাধাগঞ্জের আলো বাতাসের কাছে চলে যেতে পারেননি লোকনাথ। কারণ, ওই একটি বাধা। নীরজার দুই চোখের অদ্ভুত সেই ছলছল সজলতা। নীরজার সেই চোখের জল বড় বড় ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে না; চোখের কোণে লেগেই থাকে আর চিকচিক করে। মনে হয়, নীরজার বুকের ভিতরে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস যেন পাথর হয়ে আটকে রয়েছে; তাই কোন কথা বলতে পারে না নীরজা; শুধু লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ, যেন তাঁর প্রতিজ্ঞার সব কঠোরতা এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। নীরজাকে অসুখী করে; নীরজার দুই চোখ জলে ভরিয়ে দিয়ে রাধাগঞ্জে ফিরে গেলেই বা কী হবে? লোকনাথ কি সুখী হতে পারবেন? অসম্ভব।

কিন্তু মাঝরাতে আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন হঠাৎ একটা ঢিল কোথা থেকে ছুটে এসে আচমকা তাঁর বুকের পাঁজরের উপর আঘাত খেয়ে পড়েছে। স্বপ্নে যেন রামদয়ালবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছেন লোকনাথ; তাই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। রামদয়াল বলছেন, তুমি এত তোয়াজ আদরে আমাকে যে কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলে, সে-কথা তবে নিতান্ত একটা বানান কথা।

—কী বলেছি তোমাকে?

—বলেছো, যদি রাধানাথের রোগের একবাটি বিচুড়ি হোয়া ছুটে যায়, তবে তোমার বাকী জীবনটা সুখেই কেটে যাবে। তোমার কাছে নাকি রাধানাথের প্রাসাদের চেয়ে বড় সুখ কিছু নেই।

—হ্যাঁ, তা তো বলেছি।

—ঠিক বিশ্বাস করে বলেছো কি?

—নিশ্চয়, ওই বিশ্বাসটুকু ছাড়া আমার জীবনে এখন তো আর কোন সম্বলও নেই। ওই বিশ্বাসের জোরেই তো বেঁচে আছি।

—তবে তোমার নীরজার চোখের জলের মায়া ছেড়ে দিয়ে রাধানাথের কাছে আজও চলে আসতে পারছো না কেন? কাজের বেলায় তো দেখা যাচ্ছে যে, তোমার কাছে নীরজার মুখের হাসিই তোমার সব চেয়ে বড় সুখ।

নিতান্তই তর্ক, তা'ও আবার স্বপ্নের মধ্যে। তবু বুকের ভিতরটা এমন করে চমকে আর ছটফটিয়ে ওঠে কেন? ঘুম ভেঙে যায় কেন? রোগে ভুগে ভুগে, আর নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তাই কি? কিন্তু খুব সত্যি কথা, দেবতার কাছে মনের ফাঁকি লুকিয়ে রাখা যায় না। রাধাগঞ্জের মন্দিরের রাধানাথ, যাঁর শাসনে গোকুলের পাগল বেনোজল রাধাগঞ্জের ক্ষেতের ধান ভাসিয়ে ও পচিয়ে দিতে পারে না, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা নেই। কলকাতায় আসবার পর, এই দশ বছরের মধ্যে নীরজা বোধহয় একটি দিনও ঠিক লোকনাথের

কথা মনে করে লোকনাথের কাছে এসে বসেন নি। হ্যাঁ, কতবার এসেছেন বসেছেন ও কত কথা বলে চলে গিয়েছেন নীরজা; কিন্তু সবই তো এই কলকাতার জীবনের মত দরকারের কথা। সুধাদি বলে দিয়েছেন, কোন্ দোকানে শাড়ি কেনা উচিত, এ সপ্তাহে কোন্ ছবি দেখা উচিত; আর মেয়েদের বাড়িতে পড়াবার জন্য একজন গ্রাজুয়েট মাস্টার চাই। দরকারের কথা বলে দিয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে যান নীরজা। ব্যস্ত না হয়ে আর ওভাবে চলে না গেলেই বা চলে কী করে? নীরজাকেই তো দরকারের সব দাবি সাধ্যমতে আর মেটাতে হয়।

[তিন]

পাশের ঘরে বসে কথা বলছেন যাদবপুরের সুধাদি: যে সংসারের পুরুষ মানুষ পঙ্গু আর অকর্মণ্য, সে সংসারে মেয়ে-মানুষকেই সাহস করে সব দায় নিতে হয়। তোর জামাইবাবুর বন্ধু প্রফেসর শশীবাবু যে বলেন, এ যুগ আর আগামী যুগটাও মেয়েদের যুগ, বউদি; সে কথা তো বাড়িয়ে বলা কথা নয়। এই ঘর আমারই কথা; আমি যদি নিজের হাতে না চালাতুম, তবে কি তোর ওই জামাইবাবুর বিদ্যে-বুদ্ধিতে তিনতলা বাড়ি আর দুটো গাড়ি করা সম্ভব হতো।

ঠিক কথা; নীরজাও সে-সব কথা জানেন, ছোট মামার বড় মেয়ে সুধাদি, তাঁর স্বামী কমলবাবু কখনও কলেজে পড়েননি, কোন পাস-টাস করেননি। কোনদিন কোথাও বড়-রকমের কোন চাকরি-বাকরি করেছেন, এ কথাও কখনও শোনা যায়নি। সুধাদির শ্বশুরবাড়ি বলতে মানবপুরে যে বাড়িটার অনেক কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলেন নীরজা, সে বাড়িকে কোন বড়লোকের বাড়ি তো মনে করাই যায় না; বরং বেশ খারাপ রকমের একটা গরীব বাড়ি বলেই মনে করতে হয়। টিনের চালা আর মাটির দেয়াল, সেই বাড়ির কর্তা তাঁর বড় ছেলের বিয়ে দেবার এক মাস পরেই সাপের কামড়ে মারা গেলেন। পুরো পাঁচটি বছর মানবপুরে ওই বাড়িতে দুঃখের নরকযন্ত্রণা সহ্য করবার পর, সুধাদি একদিন নিজের বুদ্ধিতে কমলবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। হ্যাঁ, সুধাদিই কমলবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন। কমলবাবু তো ওই টিনের চালার বাড়ি থেকে নড়তেও চান নি। সুধাদি অনেক অনুরোধ, অনেক সাধাসাধি বকাবকি ও ধমকধামকেও কোন ফল হয় নি। তারপর, সুধাদি যখন একাই একটা ছোট বাক্স হাতে তুলে নিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলেন, তখন কমলবাবুও পিছু পিছু চলে এলেন।

সকলেই জানেন, নীরজাও জানে, সুধাদিই কমলবাবুকে শিখিয়ে বুঝিয়ে আর বুদ্ধি দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। কমলবাবুর সঙ্গে ইনকম ট্যাক্সের সাত আট জন অফিসারের অন্তরঙ্গ মেলামেশা আছে। অন্তত সাত-আটটা সরকারী বেসরকারী অফিসে কমলবাবুর যাতায়াত আছে। নিজে কোন অফিসের কেউ-বিষ্টু অবিশ্যি হতে পারেন নি কমলবাবু, কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে হয় নি। তাঁর ভাগ্যটা সাত-আট বছরের মধ্যেই সুখের তিনতলায় উঠে গিয়েছে। আজ আর শুধু একা সুধাদির হাতের আঙুলে নয়, তাঁর তিন মেয়ের আঙুলেও হীরের আংটি ঝিকমিক ক'রে হাসে। সুধাদি, এই সেদিনও হাসতে হাসতে বলেছেন—ভদ্রলোককে একবার জিজ্ঞেস কর তো নীক, কে প্রথম বুদ্ধিটা দিয়েছিল? কে প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, দু'চার জন বড় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, বড় বড় অফিসে যাওয়া-আসা করতে হয়। তা না হ'লে ভাগ্যি খোলে না। মানুষটাকে শুধু এইটুকু বোঝাতেই আমার ছ'মাস লেগেছিল, এমনই অদ্ভুত নিরেট মানুষ।

সুধাদির ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যটার তুলনা করতে গিয়ে অনেকবার মনে মনে কেঁপেও ফেলেছেন নীরজা। আবার ফিরে যেতে হবে সেই বাগবাজারে, যেখানে সন্ধ্যা হতেই শেয়াল ডাকে, আর কাদাটানের বউ বিশ্রি একটা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে যখন-তখন এসে ছাই-চন্দ্র যত বাজে ব্যাপারের খবর শোনায়। ভট্টাচার্যের মেয়ের নাকি এই মধ্যে সাত মাস; অঘ্রাণে যার বিয়ে, বোশেখ না পেরোতেই তার সাত মাস হয় কী করে? হয় হিসেবের ভুল, না হয় মেয়েরই ভুল। দেখা যাক, আর দু'টো মাস পার হলেই যা বোঝবার তা ঠিকই বোঝা যাবে।

এমন এক রায়গঞ্জের কথা কেন যে ভদ্রলোক বলেছেন, সত্যি কিছু বুঝে উঠতে পারেন না নীরজা। আজ না হয় কাল, সুকুর একটা চাকরি হয়েই যাবে। তিনবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেনি সুকু। দোষই বটে। আজ ওর বয়স পঁচিশ বছর; কিন্তু দেখতে তো একেবারে ছেলেমানুষ। ওকে কি কোন অফিসে কাজ করবার সুযোগ পেতে হলে আরও একটু বয়স্ক হতে হবে? আর একটু নাম করে নিতেও পারবে না? এই তো, এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটি, যার নাম বহু, কোথাকার বনাইবাবুর ছেলে। বহুও লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেনি। কিন্তু কে না জানে, সিনেমা-ছবির বহু এখন মাসে অন্তত তিন-চার হাজার টাকা রোজগার করে।

লোকনাথ কোন খোঁজ খবরের ধার ধারেন না, তাই জানেন না যে, টুনি আর টুসি, দুই বোনের নামও বদলে গিয়েছে। টুনির নাম এখন আর প্রতিভা নয়, মিতালী রায়। টুসির নামও এখন আর বিজয়া নয়, পিয়ালী রায়। কলকাতার জীবনে যে নাম মানায়, সেইরকমই দুটি নাম নিয়েছে ওরা। সুধাদি বলেন—খুব সুন্দর নাম হয়েছে। আর একটা বছর পার হলেই মিতুর বি-এ পরীক্ষা। আর পিয়ার হবে স্কুল টেন। কিন্তু ছেলে আর মেয়েদের জীবনের জন্য বাপের মনে সত্যিই কোন দরদ আছে কি? দরদ থাকলে কি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা কেউ বলতে পারে? কী আশ্চর্য, দশবছর ঘরে চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েও ভবানীপুরের এই বাসাবাড়ির জন্য সামান্য একটু মায়া কি করতে পারেন না ভদ্রলোক? সত্যি খাটি রায়গঞ্জেরই মানুষ বটে। দেখে কতবার আশ্চর্য হয়েছেন নীরজা, মিতু আর পিয়ার খোঁপার দিকে কী বিশ্রী রকমের চোখ ক'রে তাকিয়ে দেখেছেন ভদ্রলোক। উনি চান, ওরা যেন কালাচাঁদের বউ-এর মত ঝিঁড়ে খোঁপা বেঁধে চিরটা কাল রায়গঞ্জের টুনি আর টুসি হয়েই থাকে।

সুকু, মিতু আর পিয়া অবশ্য নীরজাকে অনেকবার বলেছে—তুমি মিছিমিছি কেন এত আশ্চর্য হও, আর কেনই বা বিরক্ত হও, মা? বাবাকে বাবার মুখে পড়ে থাকতে দাও। বাবার কোন কথা কানে তোলবারই দরকার নেই।

নীরজা হাসেন—কিন্তু তোমাদের বাবা যে রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রী করে দিতে রাজী নন।

সুকু চেঁচিয়ে ওঠে—তার মানে?

নীরজা—তার মানে, কলকাতার এই বাসা ছেড়ে দিয়ে সবাইকে আবার সেই রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

মিতু হেসে ফেলে—সবাইকে যেতে হবে কেন? আমরা যে এখানেই থাকবো, সে-কথা কি বাবা জানেন না?

নীরজা হাসেন—না, জানেন না।

পিয়াও হাসে—বাবা কি শোনেননি যে, আমি নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

নীরজা—না, শোনেননি। দাদা আর দুই বোন এইবার একসঙ্গে হাসে—বাবাকে কিছুই বলবার দরকার নেই।

সুধাদির গাড়ির হর্ণের শব্দ শোনা যায়। সুকু বলে—বড় মাসি অনেকদিন পরে দয়া করলেন।

নীরজা—হ্যাঁ, কে জানে, কিসের জন্য এতদিন আসতে পারেন নি।

মিতু বলে—বড় মাসিকেও কিছু বলবার দরকার নেই।

পিয়া বলে—বড় মাসির সব ভাল, কিন্তু কেমন-কেমন একটু.....।

মিতু হাসে—বলেই ফেল না।

পিয়া—বড় মাসির ধারণা, উনি অনেক বড়, আর আমরা কিছুই নই।

মিতু—হ্যাঁ, বড় মাসির ধারণা, শেষ পর্যন্ত আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে; আর আমাদের আবার বনের পাখি হয়ে রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

নীরজা হাসেন—চুপ কর।

—দার্জিলিং-এ একটা বাড়ি কিনতে হলো, নীরু। তাই এই একটা মাস বড় ব্যস্ত, ছিলাম। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন সুধাদি।

আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে সুধাদি একটু অদ্ভুত ভাবে সবারই মুখের দিকে তাকান।—কী খবর? রায়-মশাই কী বলেন?

নীরজা—যা বলবার, তা তো সেদিনই বলে দিয়েছেন।

সুধাদি—বললেই হলো। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রী না করে এখন উপায় কী?

বলতে বলতে উঠে গিয়ে দোতলায় গেলেন সুধাদি।—আয় নীরু; আয় একবার বলে দেখি।

লোকনাথের ঘরে ঢুকেই বেশ চমৎকার—কড়া বংকারের মত স্বরে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করেন সুধাদি—আপনার রায়গঞ্জের ওই অদ্ভুত লক্ষ্মীমন্ত বাড়িটাকে কি আপনি সত্যিই বিক্রী করবেন না বলে ঠিক করেছেন?

লোকনাথ—আমি এবিষয়ে আপনাদের কাছে আর কোন কথা বলতেই চাই না; মাপ করবেন। দুই চোখ বন্ধ ক'রে পাশ-বালিসটাকে জড়িয়ে ধরেন লোকনাথ, আর কোন কথা বলেন না।

এই নীরবতাও যেন একটা কঠোর অবজ্ঞা, সুধাদির পাউডার-মাখা মুখের অদ্ভুত হাসিটাকে এখনি এখান থেকে সরে যেতে বলছে। ঠিক কথা, সুধাদির এই পাউডার-মাখা মুখের হাসিটাকে শুধু ভয় করেন না লোকনাথ, ঘেন্নাও করেন। ষাট বছর বয়স হয়েছে, তবু কী আশ্চর্য! তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য, নীরজাও মুখে পাউডার মাখবার অভ্যাস ধরেছে। দেখতে পেয়ে সেদিন কী লজ্জাই না পেয়েছিলেন লোকনাথ, যেদিন নীরজা একটা ঝলমলে রঙীন শাড়ি পরে আর মুখে পাউডার মেখে ওইখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, আর রামদয়ালের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভুলতে পারেন না লোকনাথ, রামদয়ালের দুই চোখ যেন কাঁটার খোঁচা লেগে কুঁচকে গিয়েছিল। রামদয়াল তো কখনও স্বপ্নেও বিশ্বাস করতে পারে না যে, রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের স্ত্রী, যার বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ, সে মানুষ কখনও মুখে পাউডার মাখতে আর রঙীন সাজে সাজতে পারে। সুধাদি সত্যিই একটি অঘটনঘটন পটীয়সী মায়া।

দুই চোখ বন্ধ করে আর বালিস আঁকড়ে এইভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ, সুধাদি চলে গেলেন। সুতরাং, এই ঘরের ভিতরে এখন একমাত্র যে-জন বসে আছে, সে হলো লোকনাথ রায়ের জীবনের সেই নীরজা, যার চোখে জল দেখলে লোকনাথ রায়ের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের বাতাস যেন বাধা পেয়ে উতলা হয়ে যায়। নীরজা যদি অসুখী হয়, তবে লোকনাথ রায় কিসের স্বামী? কিসের পুরুষ? পঁচিশ বছর আগের রাজপুরের একটি উৎসবের ঘরে, বাসরজাগা বাতির আলোতে যে মেয়ের ভিজে চোখ দেখতে পেয়ে লোকনাথের বুকটা ব্যথার ভরে গিয়েছিল, সেই বিশ বছর বয়সের মেয়েটিই তো আজকের ওই নীরজা। সেই ভিজে চোখ চুমো দিয়ে মুছে দিতে গিয়ে যে লোনা স্বাদের স্বাদ লেগেছিল আর ভিজে গিয়েছিল লোকনাথেরই ঠোঁট, সেই স্বাদ যে আজও বুকের ভিতরে অনুভব করতে পারেন। যে বাতের রোগে পঙ্গু হয়েছে তাঁর দুই পা, সেই রোগের উপর তাঁর রাগের কারণ শুধু এই নয় যে, রোগটা বড়ই কষ্ট দেয়; নীরজা হতাশ হয়, নীরজার জীবনটা অসুখী হয়ে গিয়েছে, নীরজার চোখে দুশ্চিন্তার কষ্ট রাতে মাঝে ছলছল করে কাঁপে, তাই রোগটার উপর এত বেশি রাগ হয়।

ঘরে এখন আর কেউ নয়, শুধু একা নীরজা। কিন্তু চোখ খুলে নীরজার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও পারছেন না লোকনাথ। ভয় হয়, সেই ভয়। নীরজার চোখে সেই রকম অভিমান বোধহয় আবার ছলছল করে কাঁপছে। সেদিন রাজপুরের সেই উৎসবের রাতে সেই বাসর ঘরে নীরজা স্বীকার করেনি, আজও নিশ্চয় স্বীকার করবে না, এই অভিমান হলো তাগোরই সঙ্গে একটা অভিযোগের নীরব বিলাপ। ত্রিশ বছর বয়সের স্বামী, গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টার সেদিন চন্দনের লবঙ্গ-ছাপ দিয়ে আঁকা একটি মুখের সুন্দর ছাবর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি সত্যি বলবে, তোমার চোখে জল কেন? আমাকে খুবই গভীর ঘরের মানুষ বলে মনে হয়েছে, তাই কি? নীরজা বলেছিল—না। কথা শুনে সেদিনের লোকনাথের ত্রিশ বছর বয়সের বুকটা খুশিতে ভরে

গিয়েছিল, চোখ দুটো হেসে উঠেছিল। বলেছিলেন লোকনাথ—তবে আমিও বলছি, না, আমি প্রাণ থাকতে তোমাকে অসুখী হতে দেব না।

তাই তো, চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবেন লোকনাথ, নীরজার দুই চোখ ভিজে গিয়েছে। সেই ভেজা চোখ যেন হতাশায় অপলক হয়ে দুঃসহ একটা দুর্ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—নীরু। ডাক দিয়ে মুখ ফেরান আর চোখ খোলেন লোকনাথ। —নীরু তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস কর, এখন হায়দ্রাবাদে ফিরে গেলে আমাদের সবারই ভাল হবে।

চমকে ওঠেন লোকনাথ। কই? নীরজার চোখে তো কোন রকম অভিযোগ নেই, অভিমানও নেই। ভিজে চোখ নয়, শুকনো ঘটঘটে চোখ। বরং মনে হয় নীরজার এই দুই চোখ খুবই উজ্জ্বল হয়ে হাসছে।

লোকনাথের মুখের দিকে নয়, দরজার পর্দাটাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নীরজা তাকিয়ে আছে নীচের তলার ঘরের কোন একটা চমৎকার বস্তু কিংবা ঘটনার দিকে; তা না হলে অমন করে উজ্জ্বল হয়ে হাসবে কেন নীরজার দুই চোখ।

—কী হলো? কী দেখছো নীরু। লোকনাথের মুখের জিজ্ঞাসাটাই যেন দুঃসহ একটা বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরজা কি শুনতে পেল সেই মুখরতার কোন শব্দ?

না, নীরজার কানে বোধ হয় লোকনাথের এত ব্যস্ত জিজ্ঞাসার কোন শব্দ পৌঁছয়নি। জবাব দেন না নীরজা। চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন আর নীচের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। সে হাসির সঙ্গেও অদ্ভুত একটা মায়াময় তৃপ্তির ঝংকার। এমন ক'রে, এত অদ্ভুত সুরেলা শব্দ করে নীরজাকে কোনদিন হাসতে দেখেননি লোকনাথ।

হায়দ্রাবাদে কতবার দেখেছে লোকনাথ, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ কেটে গিয়ে যখন আধখানা চাঁদের আভা ফুটে উঠতো, তখন বাবানাথের মন্দিরের কাছে কদম গাছের মাথায় ঘুমন্ত কাক উলঘুস ক'রে জেগে উঠে ডাক শুরু করে দিত। কী অদ্ভুত খুশির ডাক, যেন ভোর হয়েছে।

নীরজার প্রাণটাও কি তেমনি কোন আধখানা চাঁদ হঠাৎ দেখতে পেয়ে হঠাৎ ডেকে উঠেছে? হাতের জোরে শরীরটাকে হঠাৎ টান ক'রে আর কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসেন লোকনাথ। ডাক যেন—একটা কথা শোন, নীরু।

আবার চমকে ওঠেন লোকনাথ। শূন্য গুহার কাছে কথা বললেও সাড়া পাওয়া যায়; প্রতিধ্বনি বাজে। কিন্তু লোকনাথ যেন নিতান্ত একটা শূন্যতারই কাছে কথা বলছেন। নীরজা কোন সাড়া দিলেন না। আরও আশ্চর্য হয়ে, আর চোখ বড় করে তাকাতে গিয়ে শুধু দেখতে পেলেন লোকনাথ, নীরজা ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কিসের ব্যস্ততা?

[চার]

ভিতরের ঘরের ওদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল যে আগন্তুক যার সঙ্গে আস্তে-আস্তে হেসে হেসে কথা বলছিল বড় মেয়ে মিতালী রায়, তারই দিকে তাকিয়ে-ছিলেন নীরজা। এবং তাই তাঁর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল হয়ে হাসছিল।

মিতালী আর সেই আগন্তুক ছেলেটি; দু'জনে কথা বলতে বলতে পাশের ঘরে চলে গেল, আর রেডিওর গানের শব্দটা আরও জোরাল হয়ে উঠলো। তাই এবার ঘরের ভিতরে এগিয়ে গেলেন নীরজা। তখুনই ডাক দিলেন—পিয়ালী, তুই কোথায়?

—আমি এখানে আছি।

—মা, এখানে চলে আয়।

পিয়ালীর হাতে রঙীন কাগজের একটা বাক্স, তার মধ্যে এক জোড়া রুমাল। চৌরঙ্গীর এক কাশ্মীরীর দোকান থেকে কেনা কাশ্মীরী রেশমের রুমাল। রুমালের গায়ে তাল ফুলের একটি পল্লবন, তার গায়ে লেগে ভেসে হয়েছে লাল রঙের শিকারা। পিয়ালী বলে—সত্যি কথা, দেবুদা কোন কথা একটুও ভুলে যায় না। কবে বলেছিলাম,

নতুন রকমের রুমাল এনে দিতে পারেন? সে কথা মেহুদার ঠিক মনে আছে। এই দেখ, কী সুন্দর ছবিতোলা কাশ্মীরী রুমাল।

পিয়ালী বোধহয় বুঝতে পারেনি যে, এই ঘরের ভিতরে একটা খাটের উপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে এই বিকালে এখনও শুয়ে রয়েছে যে, সে সত্যি ঘুমিয়ে পড়েনি। বুঝতে পারলে এত চেঁচিয়ে কথা বলতো না পিয়ালী।

মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে আর এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুকুমার কথা বলে—গোটা তিনেক রুমাল আমাকে দে।

চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে পিয়ালী—দাদাকে একটু শোভ সামলাতে বল, মা। আমি এই রুমালের একটাও কাউকে দেব না।

সুকুমার হাসে—একটা অন্তত দে।

পিয়ালী—কেন?

সুকুমার—দরকার আছে?

পিয়ালী হাসে—সত্যি করে বল তো, কার জন্তে দরকার? তোমার নিজের জন্তে, না তাঁর জন্তে?

লজ্জা পেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করে সুকুমার—মিছে কথা বাড়াচ্ছিস কেন? যখন সন্দেহ করেই ফেলেছিস, তখন আর·····

ঠিক কথা। যাকে এইরকম একটি রুমাল উপহার দিতে পারলে সুখী হবে সুকুমার; তারই জন্ত অন্তত একটি রুমাল সে পেতে চায়। নীহারা জানেন, মিতালী আর পিয়ালীও জানে, সুধাদি তো জানেনই শুধু এক লোকনাথ জানেন না, কার দরকারের জন্ত এইরকম একটি কাশ্মীরী রুমাল আজ সুকুমারের দরকার হয়েছে।

বড় শান্ত ও লাজুক স্বভাবের মেয়েটি, নাম তার বীণা, সুধারই এক দেবরের মেয়ে। সুধাদি বলেন, মেয়েটার বয়স যখন মাত্র সাত বছর; তখন ওর মা ইচ্ছে করে বিষবড়ি খায়। আত্মহত্যার কারণ, স্বামীর উপর রাগ। সেই যে সাত বছর আগে, মেয়েটার জন্মের ঠিক এক মাস আগে কাউকে না বলে-কয়ে উধাও হয়ে গেল তাঁর সেই দেবর, তার পর আর ফিরে এল না। এক বছর পরে খবর পাওয়া গেল, জার্মানীতে আছে বীণার বাবা, সুধাদির সেই দেবর শ্রীঅমল সেন। ঠিকানাও পাওয়া গেল। সাত বছর ধরে কতো সাতশো চিঠি লিখেছিল বীণার মা, ফিরে আসবার জন্ত কত অনুনয় আর আবেদন। জবাবে মাত্র সাতটি চিঠি এসেছিল; অমল সেন শুধু একটি কথাই বার বার লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ জীবনে আর দেশে ফিরবেন না। সেই অমল সেন এখনও জার্মানীতেই আছে, কিন্তু জানে না বোধহয় যে, তার স্ত্রী আর এ জগতে নেই। কিন্তু বীণা নামে তাঁর যে একটি মেয়ে এ জগতেই আছে, সে-কথাও বোধহয় জানে না। কারণ, চিঠি দিয়ে মেয়ের সামান্ত একটু খোঁজখবরও করেননি অমল সেন; জানেনও না যে, সেই মেয়ের বয়স এখন কুড়ি বছর পার হতে চললো, আর বিয়ে দিয়ে দেবার দরকারও হয়েছে।

সুধাদিরই বাড়িতে, সুধাদির কাছে থেকে বড় হয়েছে, বীণা; কিন্তু শুধু চেহারাতেই বড় হয়েছে; শিক্ষাতে নয়। সুধাদির তিন মেয়েই শিক্ষিতা। বড় মেয়ে অরুণি, মেয়ে স্কুলের টিচার, চিরকুমারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে বলে পণ করেছে, কে জানে কেন এমন পণ; তাই সে সুধাদিরই কাছে থাকে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে যে দুই মেয়ের, তারাও সুধাদির কাছে থাকে। এক জামাই থাকেন হাওড়াতে, আর এক জামাই শ্রীরামপোরে। পড়া আর ট্রেনিং শেষ করে জামাইয়েরা দেশে ফিরতে এখনও ছয়-সাত বছর বাকী।

সুধাদি বলেন—বীণার জন্তেও যে বিলাত-ফেরত বর তিনি আনতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু ভালবাসার দামটাও তো তুচ্ছ করা উচিত নয়। বীণা যখন সুকুকে ভালবাসে, আর সুকুও বীণাকে ভালবাসে, তখন সুকুর সঙ্গেই বীণার বিয়ে হলে তিনি সুখী হবেন।

কিন্তু·····নীহারার এই কিন্তু কিন্তু ভাবের আসল কারণটা কী, তাও জানেন সুধাদি। আসা কথা, আপত্তি করবেন লোকনাথ। তিনি বলবেন, যে ছেলে পঁচিশ বছর বয়সের এতটা জোয়ান হয়েও এখনও রোজগারের কোন কাজ ধরতে পারলো না, তার কি বিয়ে করা উচিত?

কখনই নয়। তা ছাড়া, এখন নিরোজগেরে ছেলের হাতে কোন ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে দিয়ে দেবেন? কেউ নয়। সুধাদি কিন্তু বলেছেন; সব সময়েই বলেন, আমি কিন্তু সব জেনে শুনেও তোমাদের ঘরে আমার বীণাকে দিতে চাই, নীরু। আমার কোন আপত্তি নাই। সুকু এখনও রোজগারের কোন কাজ করতে পারলো না ঠিকই, লেখাপড়াও শিখলো না, কিন্তু ওরা মানুষ তো, আর মানুষের ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

আজ কিন্তু নীরজার মনে কোন দ্বিধা নেই। আজ তিনি আশা করতে পারছেন, এইবার সুকুর বিয়ে হয়ে যাবে, মিতুর কলেজে পড়া চলতেই থাকবে, আর পিয়ার অনেক দিনের ইচ্ছার সেই বস্তুটা, একটি গীটারও এসে যাবে।

সুকু বলেছে, দেবু আমার একটা কাজ যোগাড় করবার জন্যে ভয়ানক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, মা। পিয়া বলেছে, দেবুদা আমার গীটার শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মা। শেখাবেন ধরণীবাবু, সেই ধরণীবাবু, বালীগঞ্জের জলসাতে সেদিন যাঁর গীটার শুনেছিলে। সপ্তাহে একদিন আসবেন, মাসিক মাইনে দেবেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। দেবুদা বলেছে, সে-টাকার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আর, মিতু বলেছে যে-কথা, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর বিস্ময়ের কথা। কথাটার সবটুকু ঠিক ভাল করে আর স্পষ্ট করে বলতেও পারেনি মিতু। বলতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ রাঙাও করেছে। দেবু বলছে, আমি থাকতে তোমাদের রায়গঞ্জে চলে যেতে হবে না।

—আর কি বলেছে? প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরজার দুই চোখের তারা যেন আনন্দে সুখে চিকচিক করে।

মিতু—আর কি বলবে? যা বলবার ছিল সবই বলেছে।

—তুই কি বলিলি?

—আমি বললাম, পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, পাস্ করি, তারপর যেদিন ইচ্ছে……।

—তারপর? দেবু কি বললে।

—দেবু বলেছে, তাই ভাল। আর একটা বছর অপেক্ষা করতে তার একটুও আপত্তি নেই।

সুকু আর পিয়া কখন নিজেদের মধ্যে বকাবকি আর হাতাহাতি করতেই থাকল। আর নীরজা টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে চায়ের ট্রে তুলে ধরেন। চা করতে হবে। নীরজা জানেন, দেবু যখন-তখন চা খায়। চায়ে দুধ ভালবাসেনা দেবু; দেবুকে চায়ে লেবুর রস দিতে হয়। নীরজা বলেন—বকাবকি রেখে এখন একটা লেবু কেটে দে, পিয়া।

[পাঁচ]

পাশের ঘরের দরজার পর্দাটা দুলছে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন নীরজা। পাশের ঘরে এখন মিতুর সঙ্গে কথা বলছে যে দেবু, সে দেবু সত্যিই একটি বিস্ময়। এতটা আশা করেননি নীরজা। দেবু যখন এবাড়ির ভাগ্যের মেঘলা আকাশে একটি জ্বলজ্বলে তারা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তো, মাত্র তিন মাস আগে, কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দেবুর সঙ্গে প্রথম দেখা আর আলাপ হলো সুকুর, আর চা খাওয়াবার জন্যে দেবুকে এবাড়িতে নিয়ে এল। তখন তো একটুও বুঝতেও পারেননি নীরজা যে, দেবু নামে সেই ছেলেটির প্রাণের ভিতরে এত মায়া আছে। ইচ্ছে করে, আজ এখনই একবার দেবুকে নিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জের ভদ্রলোকের চোখের সামনে একবার দাঁড় করিয়ে দিতে। আর শুনিয়েও দিতে, দেখে নাও, তোমার রায়গঞ্জ সাতজন্ম তপস্যা করলেও যে ছেলে পাবে না, সে হলো এই দেবু, এই কলকাতারই ছেলে। দশ টাকা ধার দিলে এক বছরে আট টাকা সুদ নিয়ে থাকেন তোমাদেরই বন্ধু, রায়গঞ্জের রতনবাবু, যিনি তমসুকের বোঁচকা বুকে জড়িয়ে না ঘরে ঘুমোতে পারেন না। আর, কলকাতার এই দেবু তার সামান্য ক'দিনের চেনা এক বন্ধুর বাপ-মা-বোন সবাইকে সুখী করে বাঁচিয়ে রাখবার সব খরচের দায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তোমার রায়গঞ্জের এবশো এক টি আষাঢ়ে গল্পের মধ্যেও কি দেবুর মত একটিও মানিক খুঁজে পাওয়া যাবে?

কিন্তু দোষনাথের কাছে গিয়ে এই শুভ বিস্ময়ের কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান না নীরজা।

আলোচনা করে তোমা লাভ হবে না। সেই কথা তাঁকে আজ এখনই জানিয়ে কিংবা বুঝিয়ে দেবারও তোমার দরকার নেই। তাঁর শুধু এটুকু জানিয়ে দিলেই হবে যে, রায়গঞ্জে এখন আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না; কোন দিন ফিরে যেতে হবেও না। রায়গঞ্জের বাড়ি বিক্রী করা হোক বা না হোক, সেজন্য এবাড়ির সুখশান্তির কোন সমস্যা আর হবে না।

ভাবতে বেশ আশ্চর্যই বোধ করতে হয়, রায়গঞ্জ বলতে কিংবা সেখের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে এই যাত্-শূন্য মানুষটির মনে যেন যত ভাবের কথা জেগে ওঠে। কখনও হেসে ফেলেন, কখনও চেঁচিয়ে ওঠেন, কখনও বা চোখ মুছে মুছে বিড়বিড় করেন। উনি রাগ ক'রে অভিযোগ করেন, কলকাতার নাম করতে তুমি তো ভাবে বিভোর হয়ে যাও নীরু। কিন্তু কী আছে কলকাতায়? বড় জোর চরকার ঝাঁকি ছাড়া আর কিছু আছে কী? মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করেন, তোমার কাছে কলকাতা মানে সুধাদি, আর সুধাদি মানে কলকাতা। আজ কিন্তু এমনি গিয়ে রায়গঞ্জের মানুষটিকে বুঝিয়ে দিতে পারা যায়, শুধু এক সুধাদিকে দেখছো যেন, সেই নামে একটি ছেলেকেও দেখতে পাবে; সে ছেলে এই কলকাতারই ছেলে।

বোধ বলে আর খুঁজে বের করতে হলে তোমার রায়-গঞ্জই বা কোন্ মহিমার পরিচয় পাওয়া যাবে? মিথ্যে মামলা করে তোমারই বাপের কাকা যে তোমার তিন বিঘে ধান জমি কেড়ে নিয়েছেন, সে-কথা কি ভুলেই গিয়েছ? সেকেণ্ড মাষ্টার অনাদি বাবু কী নীচতার কাজ করেছিলেন, তাও কি মনে নেই? ইন্সপেক্টরের কাছে তোমার নামে মিথ্যে অপবাদের কথা বলে তোমার কী ক্ষতি করেছেন অনাদিবাবু, সে-কথা তুমিই তো এই সেদিনও রামদয়াল বাবুর কাছে বলেছ। তবে আর কলকাতার নামে এত ভয় আর ঘেন্না কেন? রামদয়াল বাবুও বলেছেন, অনাদিবাবু ওই নীচতার কাজটি না করলে তুমিই হেড মাষ্টার হতে। তোমার এই রায়গঞ্জেই ঠাকুরঝি বিহার কামড়ে তোমার সবচেয়ে আদরের গরুটি মরে গেল, মনে আছে কি? রায়গঞ্জের নাম করে গর্ব করবার কিছুই নেই। আর খুশি হবারই বা কি আছে? আশা করবারই বা কী আছে? রায়গঞ্জে থাকলে কি তোমার ছেলের জন্য বীরার মত মেয়ে তুমি পেতে? না, তোমার মেয়ের জন্যে সেতুর মত ছেলে পাওয়া যেত? সুতনুর ভাগ্য খারাপ, কলকাতায় থেকেও লেখাপড়া ভাল শিখলো না।

রায়গঞ্জে থাকলেই বা লেখাপড়ায় মন উনি সেখানে পেয়েছিল সুধু? তুমিই জান, তোমার ছেলে বলেই সুতনুকে পরপর তিন বছর প্রমোশন দিয়েছিলেন হেডমাষ্টার; পরীক্ষায় ফেল করাই তো সুতনুর নিয়ম ছিল।

রায়গঞ্জে থাকলে মিতু আর শিরাজই বা কী লেখা হতো? দুই মেয়ের কারও কপালে কলেজে পড়বার সৌভাগ্য হতো না। আরও স্মরণ করতে পারেন নীরজা, রায়গঞ্জে থাকতে লোকনাথ প্রায়ই তাঁর এক ভাল চাকরের কথা বলতেন। সে চাকরের নাম সুরেশ। সুরেশের বাবা সনাতন সরকার সহরে মোক্তারী করেন। মিতুর বয়স তখন বার বছরও হয়নি। লোকনাথ তখনই সুরেশের সঙ্গে মিতুর বিয়ের কথা কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। বার বার বলতেন, আমি ভাবছি নীরু, সনাতন বাবুর সঙ্গে কথাটা এখনই একটু আলোচনা করে রেখে দিই।

ওই তো, ওই সুরেশ, রায়গঞ্জে থাকলে মিতুর জীবনের ভাগ্যটা ওই সুরেশ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতো, তার বেশি নয়। রায়গঞ্জের লোকনাথ রায়ের কল্পনা করবার, আশা করবার, কিংবা বিশ্বাস করবার শক্তিও ছিল না যে, তাঁর মেয়ে মিতুর সঙ্গে সেতুর মত ছেলের বিয়ে হতে পারে।

রামদয়াল বাবুর সঙ্গে গল্প করবার সময় কথায় কথায় অদ্ভুত রকমের একটা অহংকারের কথাও বলেন লোকনাথ। সে কথা শুনে নীরজার হাসি পায়, দুঃখও হয়। বেগে 'আমার পা দুটোকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে রামদয়াল, কিন্তু আমি পঙ্গু হইনি।' রামদয়াল বলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়, খুব ঠিক কথা। লোকনাথের অহংকার এইবার যেন হেসে হেসে ফুলসে ওঠে। —লোহারাদের

আকর্ষণ পড়ে মানুষ হয়েছি, যান, প্রাণের মধ্যে সেই লোহার কিছুটা আমিও আছে।

পাশের ঘরে বসে মার কথা শুনতে পেয়ে হেসে ফেলেছিল মৃদু—বাবা যে একজন লৌহমানব, সে কথা কি তুমিও জানতে, মা?

নীরজা হাসেন—চুপ কর। রোগী মানুষ, অনেক দুঃখে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই ওরকম অদ্ভুত কথা বলেন।

হেসে হেসে মৃদুকে চুপ করিয়ে দিলেও মনে মনে স্বীকার করেন নীরজা, মানুষটার প্রাণে সত্যি লোহার মত কোন বস্তু আছে। ভয়ানক শক্ত একটা বিশ্বাসের লোহা। বিশ্বাস করেন লোকনাথ, রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে রাধানাথের প্রসাদ খেতে পারলে এক মাসের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। বিশ্বাস করেন, নিতাই কবিরাজের পাঁচন খেয়েই তাঁর রোগ সেরে যাবে। বিশ্বাস করেন, রাধানাথ নিজেই তাঁকে কাছে ডেকে নেবেন। বিশ্বাস করেন, তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাই সুখী হবে, যদি এখনও কলকাতা ছেড়ে রায়গঞ্জে গিয়ে আবার সেই পুরনো বাড়িতে ঠাঁই নেয়। বিশ্বাস করেন, মোক্তার সনাতন সরকারের ছেলে বর হয়ে, সঙ্গে তাঁর মেয়ে মিতুর বিয়ে হলে খুব ভাল হয়।

কিন্তু এই অদ্ভুত বিশ্বাসের লোহা যে কোন কাজের বস্তু নয়, এই সত্যটি তাঁকে বুঝিয়ে দেবে, কার সাধ্যি? উনি বলবেন, পরের কাছ থেকে উপকার নেবার লোভ হলো ভয়ানক লোভী একটা পাপ। উনি বলবেন, তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। উনি বলবেন, কলকাতাতে সুধাময়ির মত মানুষকেই ভাল বাবার, তোমাদের একটুও মানায় না।

কাজেই, এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাবুঝির চেষ্টা করবার আর কোন অর্থ হয় না। উনি ওঁর প্রাণের লোহা নিয়ে পড়ে থাকুন। কিন্তু……।

চায়ের জল ফুটতে শুরু করেছে, কেটলিটাকে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কিন্তু মৃদু, তোরা যদি ওঁকে না ছাড়ে, যদি রায়গঞ্জে ফিরে যাবার কথা আবার তোলে, তবে কী হবে?

মৃদু বলে—তাহলে বলতে হবে, তুমি একাই রায়গঞ্জের বাড়িতে থাক। আমাদের পক্ষে এখন রায়গঞ্জে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

নীরজা—কিন্তু সেটা কী ভাল দেখাবে?

মৃদু—ভাল দেখাবে না ঠিকই, কিন্তু উপায় কী? বাবা যে আমাদের ভাল কিসে, সেটা একটুও বুঝতে পারছেন না।

নীরজা—সেই তো আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ।

পাশের ঘর থেকে ডাক দেয় মিতালী—চা হয়েছে মাকি, পিয়ালী?

—হ্যাঁ, হয়েছে। চেঁচিয়ে জবাব দেয় পিয়ালী।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে চা তৈরী করে নীরজা। সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সেই অদ্ভুত বিশ্বাসের চোখ দুটো আবার উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, দুঃখ বটে, যে দুঃখের জন্য মনের ভিতরে একটা অস্বস্তিও বোধ করতে হয় বটে। কিন্তু আর তো ভয় করবার কিছু নেই। রায়গঞ্জে ফিরে যেতে হবে না, দৈববাণীর মত একটা আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে দিয়েছে ওই দেবু, দেবকুমার বসু, কলকাতার কলেজের প্রফেসর, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, ভাড়াটাকে যার বাড়ি; নিজেরই বাড়ি।

নীরজা বলেন—তুই ওখানে চা পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি, পিয়ালী। একটুও দেরি করবি না, বুঝলি?

পিয়ালী হাসে—হ্যাঁ মা, বুঝেছি; আর বেশি বলতে হবে না।

[ছয়]

এত পরে চা, তবু তিন চুমুকেই সেই চা খেয়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়ায় দেবু—আমি এবার যাই, মিতু।

মিতালী আশ্চর্য হয়ে তাকায়—কেন? কিসের এত তাড়া?

দেবু—সত্যি, আমার বেশ লজ্জা করে, মিতু।

মিতালী—কিসের লজ্জা?

—সবাই দেখছেন, আমি একরে তোমার কাছে এতক্ষণ বসে আছি।

—কেন বসে আছ ; সেটা তো সকলেই জানে।

—হ্যাঁ ; সেই জন্যেই তো বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

মিতালী হাসে—তোমার মা জানেন তো ?

নিশ্চয়। আমি নিজেই তোমার ওটো মা'কে বলিয়েছি, তোমাদের সব কথা বলেছি।

—কী বললেন, মা ?

বললেন, খুব ভাল মেয়ে ; খুব সুন্দর মেয়ে।

—আর কিছু বলেন নি ?

—বলেছেন, তবে আর দেরি কেন ? বিয়েটা হয়েই গেলেই তো হয়।

—তুমি কী বললে ?

—তুমি যা বলেছো, তাই বললাম। আর একটা বছর পরে ; তোমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বিয়ে হবে।

—মা কী বলেন ?

—মা বলেন, তবে তাই হোক্, ভালই তো।

—স্যাঁ ? তবে তো বলতে হয়, তোমার মা সত্যিই খুব সাদাসিধে সরল মনের মানুষ।

—হ্যাঁ, মিতু। আমার মা'র মত শান্ত মানুষ আমি কখনও দেখিনি। একটা মজার গল্প শুনবে ?

—বল।

—একদিন দুপুর বেলায় একটা চোর ঘরে ঢুকে মা'র একটা কাপড় চুরি করে পালিয়েছিল। পাশের বাড়ির ঝি চেঁচিয়ে উঠেছিল, ও মা, দেখতে পাচ্ছো না, চোর যে তোমার কাপড় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর দুঃখ করলেন, চোরটা একটা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে চলে গেল রে, দেবু।

—তার মানে ?

—তার মানে, মা বলতে চান, চোর একটা ভাল কাপড় নিয়ে পালিয়ে গেলে ভাল হতো।

হেসে ফেলে মিতালী। অদ্ভুত ধারার মানুষ।

দেবু—স্যাঁ। একটা কথা, তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝলে না তো ?

—কেন, কিসের জন্য কী ভুল বুঝবো ?

—এই যে আমি, বলেছি যে, তোমাদের বাড়ির ঘরকন্নার সব খরচের দায় আমিই নিলাম, তোমাদের রান্নাঘরে চলে যেতে হবে না।

—এ কী কথা বলছো তুমি ? তুমি আমাদের যে উপকার করলে, সে উপকার এ পৃথিবীতে কে কার জন্যে করতে পারে ?

—তোমার বাবা আর মা জানেন ?

—হ্যাঁ। আমি সব বলে দিয়েছি। বাবা অবিশ্যি কিছুই জানেন না, বাবাকে কিছু বলবার দরকারও হয় না।

—ওঁরা কেউ ভুল বুঝলেন না তো ?

—কেউ না। মা বরং বলেছেন, দেবু আমাদের সৌভাগ্য।

—তবে আমার সঙ্গে একটু এস।

—কোথায় ?

—চল, তোমার বাবা আর মাকে প্রণাম করে আসি।

হেসে ওঠে মিতালী—হ্যাঁ, তুমিও দেখছি তোমার মা'র মত নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ।

—না মিতালী, আমি ওঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি বাইরের মানুষ নই, আমি এবাড়িরই একজন আপন মানুষ।

—একথা এবাড়ির কে না বুঝেছে ?

—তবু……।

—তবে, চল।

ঘর থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসে মিতালী ; হাসতে গিয়ে মাথা হেঁট করে।—শোন মা, দেবু কী বলছে।

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যান নীরজা—কী ?

মিতালী—দেবু তোমাকে আজ প্রণাম করতে চায়।

প্রণাম করে দেবু। নীরজা যেন হঠাৎ এক অদ্ভুত দুঃসহ আবেগে অভিভূত হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন—বেঁচে থাক, সুখে থাক, বাবা।

মিতালী—বাবাকে প্রণাম করবে দেবু।

চমকে ওঠেন নীরজা—অঁ্যা, উনি তো খুবই অসুস্থ, হয়তো এখন ঘুমিয়ে আছেন। আজ বরং……।

মেবু মুখের সাদৃশ্য হাসিটা আরও নিবিড় হয়ে যেন থমথম করে।—ঘুমিয়ে থাকলে আমি না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকবো। যখন জাগবেন, তখন……।

নীরজা—তা হয় তো হতে পারে; কিন্তু, আচ্ছা এস তবে।

ঘুমিয়ে না; জেগেই বসেছিলেন লোকনাথ। নীরজা বলেন—সুমুর বন্ধু মেবু তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—অঁ্যা? সুমুর বন্ধু? আমাকে প্রণাম করতে চায়। লোকনাথের গলার-স্বরে যেন বিস্ময়; দুই চোখেও যেন তেমনই একই বিস্ময় উথলে ওঠে। কলকাতার এই দশ বছরের জীবনে কেউ কোনদিন লোকনাথকে প্রণাম করতে আসেনি। এমন কি সুপ্রভাদির তিন মেয়ের কোন মেয়েও না। লোকনাথ শুধু জানেন, রায়গঞ্জের এক পঙ্গু পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, এমন মানুষ এই কলকাতাতে থাকে না, থাকতে পারে না।

প্রণাম করে মেবু। মেবুর মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করেন লোকনাথ—সুখে থাক, বেঁচে থাক।

মেবু বলে—আজ এখন চলি। আমার আবার একটা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাস করতে হয়।

নীরজা বলে—মেবু হলো কলেজের প্রফেসর। এম-এ পরীক্ষাতে সোনার মেডেল পেয়েছিল।

লোকনাথ—বাঃ, সুন্দর। শিবাতে সব কল্যাণ, তোমার সবরকম কল্যাণ হোক, বাবা। এস।

নীরজা হাসতে হাসতে ডাকেন—এস, মেবু। ওরা সবাই তোমাকে কী যেন বলবার জন্যে বহুক্ষণ এঁটেছে; তোমাকে আটক করে রাখবে বলে সবাই নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলুন। মেবুও এগিয়ে আসে, আর নীরজারই সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়।

মেবু? কে এই মেবু? মেবুর পায়ের শব্দ শুনতে থাকেন লোকনাথ, আর দুঃসহ একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা যেন ওঁর দুই চোখের ঘুমন্ত দৃষ্টিটাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে। ইচ্ছা করে, ডাক দিয়ে এখনই জিজ্ঞাসা করেন, কী মেবু? সুমু কী করে তোমার মত সোনার মেডেল-এ-এ ছেলের বন্ধু হয়? সুমু যে ক্লাশ নাইন থেকে ক্লাশ টেনে উঠতে পারেনি।

কিন্তু মেবু এখন সত্যিই নীচের তলার বাইরের বারান্দায় যেন মায়াবন্দী মুগ্ধ হরিণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সুমু, হাসছে পিয়ালী একটা হলদার কলাটের গায়ে হেলান দিয়ে মিতালীও হাসছে। নীরজা বলেন—ওরা আজ তোমাকে এখনই ছেড়ে দেবে না, মেবু?

—কেন?

নীরজা—ওদের ইচ্ছে, তুমি এবেলা এখানেই থাকবে, খাবে; বিকাল হবার পর যাবে।

ঠিকই, নীচের তলার বাইরে বারান্দাটাকে এখন সিনেমা-চবি তোলবার একটা ফ্লোর বলে মনে হবে। কিন্তু মুগ্ধ হরিণকে যারা ঘিরে ধরেছে, তাদের দেখে কারও মনে কখনও হবে না যে, ওদের মুখের হাসিতে ব্যাধ-ব্যাধিনীর উল্লাস আছে। মনে হবে, সুন্দর-সুন্দর কৃতজ্ঞতা যেন পরম এক উপকারের চারদিকে দাঁড়িয়ে প্রাণের অভ্যর্থনা নিবেদন করতে চাইছে।

নীরজা বলেন—সুপ্রভাদির বাড়িতে সেদিন কোন্ হোটেল থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছিল, নামটা কি মনে আছে, সুমু?

পিয়ালী বলে—হ্যাঁ; পার্ক স্ট্রীটে নিলেশ কার্ভালো'স কিচেন।

মিতালী—হ্যাঁ, চীনে রান্নার চেয়ে পোর্তা-নীজ রান্না অনেক অনেক ভাল।

নীরজা—তবে তাই কর, সুমু। কার্ভালোর কিচেন থেকে খাবার নিয়ে আয়।

মেবু যেন চমকে ওঠে, কিন্তু গলার স্বর শুধু একটু ভীত হয়ে আপত্তি জানায়—না, না, মাপ করবেন। আমি এসব খাবার খাই না, খেতেও ভাল লাগে না।

সুমু—এ, তুমি দেখছি নেহাতই অর্থোডক্স।

মিতালী মুখ টিপে হাসে—একবারে পরমার্থতত্ত্ব। ছুটির দিনে ঘড়িধরে বেড়াতে যেতে না পারলে মনে করেন যে, দিনটা বৃথাই গেল।

দেবু সুস্থিরভাবে হাসে—না না, সেরকম কিছু নয়।

মিতালী—দেখুনার লক্ষ্যটা কিন্তু সত্যই পরমার্থতত্ত্ব। ঘড়ির দেখে সিনেমাতে যেতে লজ্জা, তাহাকেমাটার যেতে লজ্জা, একসঙ্গে কটো তোলাতে লজ্জা।

নীহারা—কিন্তু তুমি কথা দিয়ে যাও দেবু, মাঝে মাঝে নিজেই আসবে, মনে করিয়ে দিতে হবে না।

দেবু—নিশ্চয়।

শব্দ করে ছুটে আসে একটা ছুটার। বারান্দার কাছে এসে থেমেই হাত তুলে একটা আবদ্ধা প্রীতির সঙ্কেত জানায়। মিতালীর সারা শরীরটাই দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ডাক দেয়—চলে এস, মোহন।

ছেলেটি বলে—না, এখন সময় নেই। কাল সকালে আসবো; যদি তামসত হাবিবারের হাওয়া খেতে চাও, তবে তৈরী থেক।

শব্দ করে চলে যায় ছুটার। দেবুর দিকে তাকিয়ে নীরজা বলেন—কার সাধ্যি বলবে, ছেলেটা বাঙালী নয়।

দেবু—বাঙালী নয়?

নীরজা—না। ওর নাম মোহন খোসলা। ওর বাবার মেশিন টুলের কারখানা আছে। সিঙ্গাপুর বিজনেস যাবে মোহন, নতুন মেশিনের কাজ শিখতে।

সুকু বলে—বেচারা দেবুকে এখন তবে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ঘরের ভিতরে চলে যান নীরজা আর সুকু। মিতালীও দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে। আর চলে যাবার জন্য বারান্দার সিঁড়িতে একটা পা নামিয়ে দিয়েই থমকে যায়, মুখ ফিরিয়ে তাকায় দেবু। শুনতে পেয়েছে দেবু; দরজার কাছে যেন একটা মহিমান্বিত নিঃশ্বাসের ঝাপটা শব্দ করুণ হয়ে ফুকরে উঠছে। ঠিকই, ছলছল করছে, মিতালীর চোখ। কী অদ্ভুত মায়া প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে আঁকা দুটি চোখ। ওই মিতালী যে সেদিনও দেবুর হাত ধরে বলেছে; তুমি আমাকে ভালবাস, এ সৌভাগ্য যে আমি স্বপ্নেও আশা করতে পারিনি।

দেবু বলেছিল—ও কথা বলো না। আমি জানি, তুমি আমার কে? তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

হেসে ওঠে মিতালীর ভিজে চোখ।—একথা আমি বিশ্বাস করি।

মিতালীর দুই চোখে আর কোন বাধা কিংবা অভিমানের ছায়া নেই। টলমল করছে মিতালীর কালো চোখের মায়া; তার উপর যেন ভোরের আলোর আভাও ছড়িয়ে পড়েছে। দেবু বলে, আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি যে, তোমার মত এত সুন্দর মেয়ে আমার মত মানুষকে এত ভালবাসবে।...আচ্ছা, আসি।

[সাত]

প্রশ্নটা লোকনাথের বুকের ভিতরে তখনও ছটফট করছে—কে এই দেবু? ডাক দিলেন লোকনাথ—নিরু, একবার ওপরে এস।

নীরজা আসেন। মুখে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বলতার হাসি, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরক্ত অস্বস্তির ছায়া ছটফট করেছে। নীরজা বলেন—আমার কাজের সময় এত ডাকাডাকি করো না।

লোকনাথ—কাজ?

নীরজা—হ্যাঁ, অনেক কাজ।

—কিসের কাজ?

—মার্কেটে যেতে হবে। দরকারের অনেক জিনিস, পত্তর কিনতে হবে।

—টাকা?

—টাকা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কে দিল টাকা?

—দেবু।

—কেন?

—দেবু আমাদের পর নয়। দেবু এখন আমাদেরই ছেলের মত।

—তার মানে?

—দেবুরই সঙ্গে মিতুর বিয়ে হবে।

—কিন্তু দেবু টাকা দেয় কেন?

—দেবে না কেন? দেবু তো তোমার সনাতন সরকারের ছেলেটির মত একটা হেবোহেলে সাধারণ মানুষ নয়।

—দেবুর টাকা নিও না।

—কেন?

—এরকম টাকা নেওয়া পাপ।

—তোমার মতে, তাই।

আমার মতে নয়নীক। এই সংসারের নিয়মের মতে, মানুষের জীবনের মতে ওটা পাপ।

—তুমি কবি মানুষ : কেন এসব কথা নিয়ে মিথ্যে চিন্তা করছো।

—আমার প্রাণটাও কি কবি হয়ে গিয়েছে।

নীরজা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

—কিন্তু জেনে রাখ নীরু। বলতে বলতে বিছানার ওপর উঠে বসল লোকনাথ। হ্যাঁ, উঠে বসবার ভঙ্গী দেখলে মনে হবে, রায়গঞ্জের লোকনাথের শুধু হাত দুটোতে নয়, বুকের ভিতরেও লোহা আছে।—খুব ভুল করছো, নীরু।

নীরজা—তুমি কী করে এসব বলতে পার, আশ্চর্য।

—তার মানে?

—তুমিই তো সারাটা জীবন ভুল ক'রে সবাইকে দুঃখ দিলে। এখনও রায়গঞ্জে ফিরে গিয়ে সবাইকে আরও দুঃখের মধ্যে ফেলতে চাইছো। এতদিন তোমার ইচ্ছের সব হয়েছে; কিন্তু আর নয়।

—এবার থেকে তবে তোমারই ইচ্ছায় সব চলবে?

—অগত্যা, তোমার যখন কিছু করবার ক্ষমতাই নেই; তখন তোমার এত কথা আর এসব কথা শোনাবার কোন মানে হয় না।

লোকনাথ—ভাল কথা। তবে আমাকে একাই রায়গঞ্জে চলে যেতে হয়।

নীরজা—তোমার ইচ্ছা। আমি হ্যাঁ বলবো না, না'ও বলবো না।

চমকে উঠলো লোকনাথ। যেন তার ফুসফুসটাই হঠাৎ একটা ছুরির খোঁচা খেয়ে ফুটো হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর আর কেউ নয়, সেই নীরজাই কথা বলছে। নীরজার জীবনে রায়গঞ্জের লোকনাথ আজ আর কোন সত্য নয়। লোকনাথ কাছে না থাকলেও নীরজার জীবনের কোন ভয় আর নেই। এ কেমন করে সম্ভব?

বুঝতে পারেনি লোকনাথ, যখন চলে গিয়েছেন নীরজা। ভবানীপুরের সাত নম্বর হরি বসু লেনের বাড়িটার নীচের তলায় যেন খুশি কলরবের ঝড় ছুটোছুটি করছে। সেই শুনতে পাচ্ছেন লোকনাথ। কিন্তু মনে হয়, যেন তারাই এক কালবোশেখী পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে; গাছ-পালা, ঘরের চাল, বাগানের গাছ; সেই উপড়ে ও ছিঁড়ে লুটিয়ে দিচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায়, বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর চাকরোটাকে ধমক দিচ্ছে মুহু—যাচ্ছে কথা বলবে তো চাবুক মেরে তোমার চামড়া ফাটিয়ে দেব। যাও তোমার বিল, আর টাকা নিয়ে সেলাম করে চলে যাও।

যাঃ, এ যে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প। যেতেছতী হঠাৎ এসে এ বাড়ির ভাগাটাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করেন লোকনাথ, কিন্তু মাঝে মাঝে ছটফট করে এপাশ-ওপাশ করেন যেন তাঁর বুকের পাঁজরগুলো আগুনের আঁচ লেগে পুড়ছে।

নীরজার চোখে-মুখে ওই উজ্জ্বলতার হাসি; এর চেয়ে দুঃসহ ভয়ের ছবি কোন দুঃস্বপ্নেও দেখেনি লোকনাথ। না, এ জীবনে নীরজার আর সেই ছলছল ভিজে চোখ দেখতে পাবেন না লোকনাথ। যে চোখের মায়া তুচ্ছ করে চলে যেতে পারেনি, রায়গঞ্জের রাধানাথের বিগ্রহের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারেনি।

কিন্তু আর তো দেরী করবার কোন মানে হয় না। শুধু একবার রায়গঞ্জকে একটা খবর দেওয়া, যেন কাউকে পাঠিয়ে দেয়। লোকনাথকে রায়গঞ্জে নিয়ে যায়।

রায়গঞ্জের বাড়ি আর রাধানাথের মন্দির, মাঝখানে শুধু বাঁশের কঞ্চির একটি বেড়া। সেই বেড়াটাই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই কদম, যার ছায়ার মত মিষ্টি ছায়া এ পৃথিবীর কোন গাছতলায় আছে বিনা দেখেনি। সেই ছায়াতে একটি বাদুড় পেতে সকাল-সন্ধ্যা পড়িয়ে পড়ে থাকলে মন্দ কী? সেইখানে বসে রাধানাথের প্রসাদ খেয়ে প্রাণটাও কি যুড়িয়ে যাবে না? তারপর; যেদিন রাধানাথের ইচ্ছে হবে, সেদিন ওই কদমতলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেই হলো।

সিঁড়ি ধরে পায়ের শব্দ উপরে উঠছে। চমকে ওঠেন,

কান পেতে শুনতে থাকেন লোকনাথ। কী আশ্চর্য, সত্যিই যে রামদয়াল এসেছে।

—আমি একাই রায়গঞ্জে চলে যাব রায়। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও।

রামদয়াল—কেন?

সব কথা শোনার পর রামদয়ালও স্বীকার করেন—হ্যাঁ, অগত্যা তোমার এখানে আর না থাকাই ভাল।

আরও আশ্বাসের কথা বলেন রামদয়াল—রায়গঞ্জে থাকতে তোমার এখন তেমন কিছু অসুবিধে হবে না। নীচের তিন চারটি ঘর ভাড়া দিলে আশি-পঁচাশি টাকা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কালাচাঁদ আছে; সে তোমার সব রকম যত্ন নেবে। তার উপর, নিত্যই কবিরাজ আছে। হরন ডাক্তার আছে, বীরু আর হরিনাথ আছে। সবাই, সবাই তোমাকে দেখা শোনা করবে। চিন্তা করবার কিছু নেই, কোন অসুবিধে নেই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রামদয়াল।—আমি আজই রায়গঞ্জে গিয়ে হরিনাথ আর বীরুকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তোমার হাতে এখন টাকা না থাকলেও ভেব না। আমি দেব টাকা। পরে শোধ করে দিও।

সিঁড়ির কাছে এসেই লোকনাথের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় রামদয়াল।—কী বলছো?

লোকনাথ—সত্যিই কি আমার এখন রায়গঞ্জে চলে যাওয়াই ভাল?

রামদয়াল তাঁর সাদা মাথাটাকে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটাও যেন করুণ হয়ে গিয়ে ছলছল করে—যেতে ইচ্ছে করছে না, না?

লোকনাথ—না।

রামদয়াল—কেন আর বিলের জন্য, লোকনাথ?

কথা বলল না লোকনাথ। দুই চোখ বন্ধ করে যেন নিজেই একটা অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

লোকনাথের গায়ে হাত বুলিয়ে লোকনাথের একটা হাত ধরে রামদয়াল আবার প্রশ্ন করেন—কার জন্য তবে কাঁদে লোকনাথ?

লোকনাথ—বুঝতেই তো পারছো?

রামদয়াল—নীরার জন্য।

লোকনাথ—হ্যাঁ। সংসারের বিষয়-আশয়ের ঝামেলাটের মধ্যে ওকে এখানে ফেলে রেখে, আমি যে রায়গঞ্জের রাধানাথের বসতবাড়িতে কোন স্থান পাব না, রায়।

রামদয়াল—তা হলে যাক, রাধানাথের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

[আট]

পাড়ার লোকে বলে, সাতনম্বরের গা ঘেঁষে ওই যে পুরনো পড়ো বাড়িটা, যার ছাদ দেয়াল ফুঁড়ে ছোট ছোট অশথের শিকড় ঝুলছে, অনেক রাতে সেই বাড়ির উপর-তলার ঘরের জানা জানলাতে ছায়া-ছায়া চেহারা কাদের যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শব্দ করে না, খুব বেশি নড়া-চড়াও করে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের কাক ডেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওইসব ছায়াশরীর যেন ওই পড়ো বাড়ির বাতাসের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

সাত নম্বরের লোকনাথ রায় যখন মাঝরাত পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকেও ঘুমোতে পারেন না, বিছানার উপর উঠে বসেন, আর জানলা দিয়ে পড়ো বাড়ির ছাদের দিকে তাকান, তখন তাঁরও মনে হয়, ওই তো ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশ্চর্য হয়ে বিছানায় বসা লোকনাথের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে ওদেরই জগতের একটি ছায়া-মানুষ বলে মনে হয়।

পঞ্জিকা দেখে হিসেব করলে বোঝা যায়, একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আর কপালে হাত বুলিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করলে মনে হয়, এক বছর হতে পারে, আবার পাঁচ বছরও হতে পারে। পা দুটো আরও সরু হয়েছে, মাথায় চুল আরও সাদা হয়েছে। রামদয়াল কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে এই এক-বছরের মধ্যে তার একটা চিঠিও এল না কেন?

নীচের তলার দুটো ঘরের ভাড়া যে এই এক বছরে কত রঙীন হয়ে গিয়েছে, সে সত্য, চোখে দেখে আসবার

কিংবা সুধার চেষ্টা করেন নি লোকনাথ। চেষ্টা করবার কথাও নেই। সে সংসারে নীরদাই রাজেশ্বরী। তাঁর এক ছেলে আর দুই মেয়ের যে জীবন যাপনের অভিশাপ কাটিয়ে সুখে থাকবার এক অদ্ভুত সৌভাগ্যের নাগাল পেয়েছে, সে তো নীরদারই প্রতিভার জয়। সুধাদিকে আজকাল প্রায়ই একটা কথা শুনিয়ে যেন নীরদা—আমার অন্ত এক জামাই যে বিলেতে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুধাদি।

সুধাদি হাসেন—যাবেই তো; যদি বুদ্ধি ঠিক রেখে চলতে পারিস, তবে আমার মত তোরও দুই জামাই বিলেত যাবে।

হ্যাঁ, একটি রেফ্রিজারেটর কিনে ফেলা হয়েছে। সুধাদির বাড়িতে যে রেফ্রিজারেটর আছে, ঠিক তেমনটি। মনু বলেছিল—যেন কিছু আপত্তির একটিও কথা বলে নি, মা। একটা রেফ্রিজারেটর কেনা দরকার, শুধু এইটুকু বলেছে; অমনি দেড় হাজার টাকার একটা চেক লিখে আমার হাতে তুলে দিল।

সুধাদি একবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ মিঠু আর পিয়া দুজনেই সেদিন সুধাদির দুই মেয়ে; জনা আর লীনার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে ছিল। মিঠু বলেছিল, যাই বলুন জনাদি, আপনার ওই খোঁপার স্টাইল কিন্তু খুবই সেকেলে।

—তার মানে?

তার প্রশ্নের জবাব দেয় পিয়া—আপনার ওই খোঁপাটা। হলো—জারিনা খোঁপা। ওটা আজকাল কেউ পছন্দ করে না।

লীনা—আজকালের পছন্দটা কি?

পিয়া—এই যে, আমার খোঁপা; ক্যাথরিন হেপবার্ণ স্টাইল।

জনা—কোথায় শিখলে এই স্টাইল?

মিঠু—রীতিমত টাকা খরচ করে শিখতে হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের বিউটিশিয়ান পারেলা হারিসনের নাম শোনো নি?

জনা—না।

মিঠু—তাহলে সেলুনে গিয়ে হেপবার্ণ স্টাইলের খোঁপার কায় শিখে নিয়েছি।

সুধাদি হঠাৎ চোখে দুই চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকেন, আর বেশ একটু ঝংকার দিয়ে কথা বলেন—ঠিকই তো, নীরুর হাতে যখন এত টাকা এসেছে, তখন মেয়েদের শখের জন্যে এরকম দু চারটে বড়-খরচ তো হবেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেসা করি, টাকা এল কোথা থেকে?

মিঠু—সেকথা জিজ্ঞেসা করবার কোন মানে হয় না, মাসিমা।

সুধাদি—কেন?

পিয়া আমরা তো কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি, আপনার হাতে এত টাকা এল কোথা থেকে?

সুধাদি ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকেন—সত্যি, এই এক বছরে তোরা খুব কথা বলতে শিখেছিস। ভাল।

মাস ছয় আগে হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলায় এই ঘরের ভিতরে ওভারে যখোই নীরদার গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন লোকনাথ। নীরদা ডাক দিলেন—এই দেখ কে এসেছে।

—কে? কে? দুই চোখ টান করে দেখতে থাকেন লোকনাথ। লোকনাথের বিছানারই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে একটি মেয়ে। টুনি আর টুসির সঙ্গে তুলনাই চলে না, রূপসী মেয়ে নয়, নিতান্ত সাধারণ সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। মুখে কিন্তু বেশ খানিক একটি হাসি; আর চোখের তারা দুটোও খুব কালো।

নীরদা বলেন—ওর নাম বীণা, সুধাদির এক দেবরের মেয়ে; সেই দেবর আর্জেন্টিনে থাকে। তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—প্রণাম? আমাকে? বলতে বলতে উঠে বসলেন লোকনাথ।

নীরদা হাসেন—হ্যাঁ তবে আমাদের বুকুর বউ।

লোকনাথের দুই চোখে যেন একটা আলোর শিখা ঝিকমিক করে কাঁপে—কবে হলো বিয়ে?

নীরদা—আজ।

—কেমন বিয়ে?

—আজকাল যেমন হয়, রেজিস্টারী করে।

—তোক, কিন্তু আজকাল কি বিয়েতে পাঁক বাজে না?

নীরজা মুখে আঁচল দিয়ে হাসে—হ্যাঁ, রায়গঞ্জের বিয়ের মত বিয়ে হোলে হয়, সেখানে পাঁক বাজে।

—তবে রায়গঞ্জের মত প্রথায় করাবার জন্য এই মেয়েকে এখানে নিয়ে আসা উচিত ছিল না।

নীরজা—ঠিক, যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো। মুনুও ঠিক বুঝেছে, তুমি এসব কথা বলবে বলেই মুনু এখানে আসতে চাইলো না।

লোকনাথ—ভালোই করেছে। বুঝতে পারছি না, মুনুর হউ বা কেন আসে? আমাকে প্রণাম না করলেও তো বেশ চলে যাবে, চলে যাচ্ছেও।

বীণা কিন্তু তখনি লোকনাথের দুই পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম করে ফেলে। লোকনাথ বলেন—কী বলবো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, সুখে থাক।

চলে যায় বীণা। নীরজাও তখনি চলে যেতেন, কিন্তু কথা বলে বাধা দিলেন লোকনাথ—মুনু বিয়ে করলো কেন?

নীরজা—এ আবার কেমন কথা? বিয়ের বয়স হয়েছে। একটি মেয়েকে ভাল লেগেছে। তাই তাকে বিয়ে করেছে। এর মধ্যে আবার কেন কিসের?

লোকনাথ—মুনু কি কোন কাজকর্ম করে?

—হ্যাঁ।

—কিসের কাজ?

—একটা কারখানায় কাজ করে, মেনু পাইয়ে দিয়েছে এই কাজ। মাইনে সাবাস্ত, একশো দশ টাকা মাত্র।

—মুনুর এখন বিয়ে না করাই ভাল হতো?

—কেন?

—কলকাতার মত জায়গায় এই রোজগারের ভরসায় কারও বিয়ে করা উচিত নয়।

—শুধু রোজগারটাই বড় করে দেখছো কেন? একটা ছেলের জীবনে ভালবাসার কি কোন দাম নেই?

আছে নিশ্চয়, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা হয়।

—সেই কথা, রায়মশাইবাবুকে শোনাবে; আমাকে শোনাবার কোন মানে হয় না।

—তোমাকেও শোনাবার দরকার আছে, নীরু, তোমারও শোনবার দরকার আছে।

—আমার তো মনে হয়, কোন দরকার নেই।

—তুমি একটু একলা মন নিয়ে, আর সুযোগমত বাড়িতে যাওয়া একটা মাস বন্ধ রেখো, আর পার যদি, রায়গঞ্জের রাধানাথের মূর্তিটাকে একটু ধ্যান করে একবার ভেবে দেখ, তবেই বুঝতে পারবে, এমন করে সব কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে নেই!

নীরজা—এই জন্যেই মুনু তোমার কাছে আসতে চাইলো না।

—কী জন্যে?

—যা বোঝ না, তাই নিয়ে খামকা বড় আপত্তিকর ধর্মকথা; তুমি তো কাউকে সুখে রাখতে পারলে না, আমরা যা-হোক নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টাতে সুখে থাকবার একটু চেষ্টা করছি। এর মধ্যে তুমি যে কী ভুল দেখলে, কী অন্যায় দেখলে, তা তুমিই জান, আর তোমার রায়গঞ্জের রাধানাথ জানেন।

—নীরু! চেঁচিয়ে ওঠেন লোকনাথ।

—কী বল? চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা।

—রাধানাথ সত্যই জানেন। বলতে গিয়ে পশু লোকনাথের গলার স্বর যেন একটা গর্জন হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু উদ্যত হয়ে হাসতে থাকে নীরজার দুই চোখ, আর কোন কথা বলেন না, নীরজা। —আমি আসছি বলে। বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নেমে যান নীরজা।

এই রকম এক-একটি ঘটনা; এই এক বছরের এক-একটি আচমকা বিস্ময়ের মত লোকনাথের পশু জীবনের অনেক মুহূর্তকে চমকে দিয়েছে; কখনো ব্যথা দিয়ে, কখনো বা ভয় পাইয়ে দিয়ে। সবচেয়ে বেশি উত্তাপ নিয়ে যে-কথাটা বলেন নীরজা, সেটা হলো মেনু নামে সৌভাগ্যের কথা। মেনু আমার ছেলের মত নয়, ছেলের চেয়েও আপনজন। মেনু থাকতে আমার কোন চিন্তা

নেই। বেবু ছিল বলেই তো বিভু আর শিব দুই বোনের পথ ধরে একবার বিলং বেড়িয়ে আসতে পেরেছে। বিলং-এ বাবার স্নেহের ভাড়া, বিলং-এ হোটেলে এক সপ্তাহ থাকবার খরচ, সবই বেবু দিয়েছে।

একদিন পিয়ালীর গলার স্বর শুনে লোকনাথের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। পিয়ালী এসে বলে গেল, আমি মাসের ডিগ্রোথা পেয়েছি, বাবা। মরিশুশী আর কথাকলি খুব ভাল শিখেছি। এইবার, মোহনের বোন বেবু যেমনটা বলেছে, পোলিকা আর বুদ্ধি-উদ্ধি শিখিয়ে দেবে।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল লোকনাথ।

বিভু এসে একদিন বলে গিয়েছে—আমি পাস করেছি, বাবা। ডেফিনিট সায়েন্সে আর-একটু হলে লেটার পেয়ে যেতাম। ভাবছি, এম-এ পড়বো কিনা।

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন লোকনাথ। এসব যেন উত্তর-জগতের মত কলরব, তার অর্থ কিছুই স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন না লোকনাথ। শুধু বুঝতে পারেন, তিনি হার মেনে যেখানে একবার থেমে গিয়েছেন, সেখানে এরা কেউ হার মানেনি, থেমেও যায়নি, সবাই চলছে, এগিয়ে যাচ্ছে। বাবাপর ওদের কাছে এখন একটা মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র।

আর সকাল থেকে এই সাত নম্বর হরিসভা লেনের নীচের তলার দুটি ঘরে যে উৎসবের মুখরতা উত্তরোল হয়ে বাড়ছে, সে উৎসবেরও কোন খবর রাখেন না লোকনাথ। শুধু জানেন, ওদের জীবনে নিশ্চয় কোন নতুন সুখের হাসি ফুটে উঠেছে। তাই এই উৎসব।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বীণা সেদিন এসে বলে গিয়েছিল, বিভুর চাকরি হয়েছে, বেশ ভাল চাকরি। মাইনে প্রায় তিনশো টাকা। সেই জন্য শিগগির একদিন খাওয়া-দাওয়ার একটা উৎসব করা হবে।

ঠিকই বুঝেছেন লোকনাথ। আজ এই বাড়ির জীবনে একটা নতুন উৎসবের সাড়া জেগেছে। স্পেসাল কার্টারিং কিচেন থেকে অনেক খাবার এসেছে। শুধু জানেন না যে, যাকে প্রীতি আর কৃতজ্ঞতার ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করবে, সে মানুষটি এরই মধ্যে এই সকালেই এসে নীচের তলার একটি ঘরে বসে আছে।

শুধু তাই নয়, উৎসবের সুর সুরু হতে হতে নীচেরও ঘরে গেল। বোঝা যায় না, নীচের তলার ঘরে কেউ আছে কিনা। কিন্তু সিঁড়িতে আগন্তুক পায়ের মৃদু শব্দ বাজে। বেবু উঠে এসে লোকনাথের ঘরে ঢোকে, আর বিছানার কাছে গিয়ে ডাক দেয়—কেমন আছেন ?

—কে তুমি ? তাই বল। চমকে উঠলেও বেশ উদাস স্বরে, যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলেন লোকনাথ।

—হ্যাঁ, আমি। হাসতে থাকে বেবু। —ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেনি, তবু আমি এসেছি। শুধু আপনাকে একটু দেখে যাবার জন্য।

লোকনাথ—তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি ; তবে কাকে নেমন্তন্ন করলো ?

বেবু হাসে—সুলালিতের নেমন্তন্ন ছিল। সে-ই এসেছিল।

—সুলালিত ? সে কে ?

বেবু—সুকুর বন্ধু সুলালিত সরকার ? চমৎকার মানুষ। সুলালিতের বাবা খুব বড় এটর্নি, চারটে চা-বাগান আছে। বাপের একমাত্র ছেলে সুলালিত। কাজেই, সুলালিতের জীবনে টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই।

লোকনাথ—বুঝলাম। কিন্তু সুলালিতের নেমন্তন্ন কেন ?

বেবু—সুলালিতেরই সঙ্গে আপনাদের মেয়ে মিতালীর বিয়ে হবে। সুলালিতই চেষ্টা করে মিতালীর চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে।

—তুমি মিথ্যে কথা বলছো, বেবু। হতে পারে না ; অসম্ভব। তুমি ভুল করে এসব কথা বলছো।

বেবু—না, ভুল করে নয়। আপনি সুকুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

বেবুর মুখের দিকে দুই চোখের শুভ্র সাদাটে দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ। বেবু বলে —আপনি কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অভিযোগ করতে আসিনি।

—তোমার কোন অভিযোগ নেই ?

—না।

—তুমি কি এই একটা বছর এই বাড়ির সব খরচাপত্রের টাকা যোগাওনি।

—হ্যাঁ, টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

—তোমার সঙ্গেই তো বিভুর বিয়ে হবে বলে কথা ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেসব কথা আমি এখন মনে আনি না।

—এজন্য তোমার মনে কোন রাগ নেই?

—না।

এদের ওপর একটু ঘৃণা হয় না?

—না।

—কেন?

—বিভালী সুখী হয়েছে, ব্যস্, আমার তো আর কিছু জানবার দরকার হয় না।

—তার মানে?

—বিভালী সুখী হলেই, আমি সুখী।

দুই হাত দিয়ে মেনুর একটা হাত আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ।—তোমাকে চিনলাম মেনু। রাঘোনাথ তোমাকে সুখে রাখুন।

মেনু—বিনয়ে, আপনার আশীর্বাদ যখন আছে, তখন আমি সুখে থাকবোই।

লোকনাথ—তুমি তো এই কলকাতারই ছেলে? শ্যামবাজারে থাক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আর শ্যামবাজারে থাকবো না।

—কেন?

—বাড়ি বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

—এ বাড়ির সুখের স্মৃতি বেচবার দায়ে? তাই না?

—এসব কথা তুলবেন না। যা হলো, ভালই হলো; এ বিশ্বাস আমার আছে।

চোখে হাত বুলিয়ে চোখ মোছেন লোকনাথ।—মেনু?

—বলুন।

তুমি এখন কোথায় থাকবে? আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও।

—যে আজ্ঞে।

পকেট থেকে কাগজ বের করে ঠিকানা লেখে মেনু।—যাচ্ছি দমদমের বলরামপুরে একটি ভাড়া-বাড়িতে। মস্ত বড় বাড়িটা। আমি টাকা ভাড়া।

লোকনাথ—আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও, মেনু।

—বলুন।

—আমি যদি কখনও তোমাকে ডাকি, তবে তুমি আসবে?

—নিশ্চয় আসবো। সে কথা কি বলতে হবে?

লোকনাথ—এস তবে? তুমি যদি বয়সে আমার চেয়ে এতো ছোট না হতে, তবে আমি আজ তোমার পা ছুঁয়ে

—ছি-ছি! ও কথা বলতে নেই। বলতে বলতে লোকনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মেনু। চলে যায় মেনু।

[নয়]

নীহারা বলে—কী হয়েছে? তখন থেকে এত চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছো কেন?

লোকনাথ বলেন—একটা কথা বলবার ডেকেছি।

নীহারা—বল।

লোকনাথ—মেনুর ঠিকানা আমার কাছে আছে। হয় তুমি, নয় মুকু, কিংবা টুনি একবার মেনুর কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এস।

নীহারা—কেন? কী অপরাধ করলাম যে মাপ চাইতে হবে?

লোকনাথ—ফুল ছিঁড়লে পুজোর থালায় রাখতে হয়, কাদায় উপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় না।

—একথার মানে?

—মেনুকে তুচ্ছ করো না।

—তুচ্ছ তো করছি না। বিভু বলেছে, মেনুর উপকারের সব টাকা একদিন শোধ করে দেওয়া হবে।

—টাকা শোধ হতে পারে বটে; কিন্তু স্নেহের উপকার শোধ করা সম্ভব নয়।

নীরজা হাসেন—মানুষের মন কী লোহা, যে বদলাবে না?

—কী বলছো তুমি? বুঝতে পারছি না।

মিতুর যদি মনে হয় যে, স্নেহের চেয়ে ললি অনেক—

লোকনাথ—ললি কে?

নীরজা—আমাদের সুললিত। মিতু যদি বিশ্বাস করে যে, ললির সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মিতু; তবু কি স্নেহকেই বিয়ে করবে মিতু? এটা কি আত্মবঞ্চনা নয়? শুধু এক বছর আগের একটা ঘটনার জন্য নিজের জীবনটাকে ঠকাবে মেয়েটা? ছি ছি, এমন কথা বলতে তোমার একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

লোকনাথ—লজ্জা পাচ্ছি না; কিন্তু বেশ একটু ভয় পাচ্ছি, নীরু। এরকম করে সব উল্টে-পাল্টে দিও না।

নীরজা—এই ঘরেই সুকু আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছে; বাবাকে কোন কথা বলো না, মা। বাবা শুধু বাবা হিসেবে অমি আপত্তি করতে জানে না। আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

লোকনাথ—ঠিক কথা। ঠিকই বলেছে সুকু। আমি বলছি, স্নেহকে ভুল করো না।

নীরজা—স্নেহকে ভুল করবার কোন কথাই নেই। স্নেহও তালই জানে, ললির তুলনায় সে কিছুই নয়।

লোকনাথ—কিন্তু এই সুললিত কি স্নেহর মত মায়া নিয়ে……।

—তার চেয়ে বেশি মায়া নিয়ে ললি আমাদের কাছে এসেছে। স্নেহ তো তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে যেত।

—সেটাই তো নিয়ম। তাতে হাস করবার কী আছে?

—মানুষ কি নিয়মের চাকর? না, নিয়ম হলো মানুষের চাকর?

—দুইই সত্যি।

না, আমাদের ঘরকারে যে নিয়ম খাটে, আমরা সেই নিয়ম মানবো।

—তার মানে, সুললিত তোমাদের জামাই হবে।

—জামাইয়ের তাবার কথা বলতে হলে, তাই বলতে হয়। কিন্তু জামাই নয়, ললি আমার কাছে ছেলের মত। তাই বা বলি কেন? ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলে তো আজ পর্যন্ত নিজের টাকায় নতুন বউকে একটা শাড়ি কিনে দিতেও পারলো না। কিন্তু ললি এই মাসে তোমার ছেলের বউকে সোনার হার দিয়েছে। মিতু আর পিয়াকে দুটি অফোয়া সেট দিয়েছে।

লোকনাথ—আর শুনতে চাই না।

নীরজা হাসেন—তবে চুপ করে শুয়ে থাক আর ঘুমোও।

—ললিদা! ললিদা এসেছে। শুনতে পেয়েছেন নীরজা, চেঁচিয়ে কথা বলছে পিয়া। ললির গাড়ির হর্ণের শব্দও যেন উঠলো।

নীরজা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে যান। আর পিয়া ব্যস্ত হয়ে সুললিতের গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে, পিয়ার দুহাত উরাসের শরীরটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে; হাসতে হাসতে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায় সুললিত।

নীরজা হাসেন, সুকুও হাসে, আর পিয়াও ছটফট করে হাসে—আমাকে ছেড়ে দিন, ওই ঘরের ভিতরে যান।

এই তো মাত্র তিন মাস আগে, স্নেহরই কলেজের কমনরুমে সুকুর সঙ্গে এই সুললিতের প্রথম দেখা আর আলাপ। এক বন্ধুর ছোট ভাইকে বলেকয়ে ভর্তি করবার জন্য এসেছে সুললিত, স্নেহরই ছাত্র জীবনের বন্ধু সুললিত। সুকুর সঙ্গে সুললিতের পরিচয় তো স্নেহই করিয়ে দিয়েছিল। আর সুকু নিজেই উৎসাহিত হয়ে সুললিতকে তখন চা খেতে নেমন্তন্ন করে সাত নম্বর হরি বসু লেনের এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। আর মিতুও নিজেই চা নিয়ে সুললিতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মিতুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অপলক হয়ে গিয়েছিল সুললিতের দুই চোখ। যেন অনেকদিনের

হারানো দুঃস্বপ্নকে আজ হঠাৎ ভাগ্যক্রমে আবিষ্কার করতে পেরেছে সুললিত। সুললিতের চোখে সেই বিস্ময়, আর বিস্ময়ের মধ্যেও অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা।

চা খাওয়া শেষ হতেই সুললিত বলে—ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম যখন লেরিকে দেখলেন, তখন তাঁর কী মনে হয়েছিল, জানেন তো?

মিতু হাসে—জানি না। আমি ইংলিশে অনার্স নিইনি।

সুললিত—ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনে হয়েছিল, লেরি যেন ব্যাটল অব ডিলাইট।

মিতু—আমাকে দেখে কোন বোকা ওয়ার্ডসোয়ার্থের মনেও এরকম কোন ধারণা হবে না।

সুললিত—জানি না; তবে আপনার সঙ্গে আমি কোন তর্ক করবো না।

মৃদু—ওকে আপনি আবার আপনি করে বলছেন কেন?

সুললিত—বেশ তো, আর কখনও বলবো না।

সেদিনই সুললিতের চলে যাবার সময় মিতু বলেছিল—আবার কবে আসছেন?

সুললিত—আমাকে ওরকম আপনি করে বললে কোনদিনও আসবো না।

মিতু সঙ্গে সঙ্গে বলে—কবে আসবে বল?

সুললিত—তুমি আসতে বলছো?

মিতু—হ্যাঁ।

সুললিত—তবে, কালই একবার আসবো।

সুললিত চলে যাবার পরে সেদিনই এবাড়ির সবাই বুঝতে পারে, এই সুললিত যেন একটি আশ্চর্যের ব্যক্তিত্ব। শুধু চা বাগান থেকেই বছরে আয় হয় প্রায় এক লাখ টাকা। মৃদু বলে—মেজু নিজেই সুললিতের অবস্থার অনেক কথা বলেছিল। এই সুললিতই বাপের একমাত্র ছেলে। বেহালাতে তিনতলা বাড়ি আছে। শুধু হাত খরচের জন্য বাপের কাছ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা পায় সুললিত। কিন্তু বেঁচে থাকতে ছেলের প্রতি এর চেয়ে বেশি কোন উদারতা আর দেখাবেন না এটাই নিতা, পি এন সরকার, গ্রিনলাইন সরকার। বাপের সঙ্গে ছেলের একটা মন কষাকষির ব্যাপার আছে। পি এন সরকারের ইচ্ছা, তাঁর কুটুম বন্ধুর নরেন বসুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক। কিন্তু সে মেয়ে সুললিতের একটুও পছন্দ নয়। সে মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু চার্ম বলে কিছু নেই। সে মেয়ে রাঁধে ভাল, গান করে ভাল, এম-এ পড়ে; কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আবার গীতা পড়ে।

হেসে ফেলেন নীরজা মিতু আর পিয়াও হাসে। মৃদু বলে—আমার ধারণা, মিতুকে সুললিতের চোখে খুবই চার্মিং বলে বোধ হয়েছে।

ভুল ধারণা করেনি মৃদু। দশটি দিন এবাড়িতে যাওয়া-আসা করবার পর সুললিত নিজেই একদিন বুঝিয়ে দিল যে, মিতুকে ভালবেসেছে সুললিত। সে দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল পিয়া। ওই ঘরের ভিতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর মিতুকে দুই হাতে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখে, মিতুর কপালে চোখে ও মুখে চুমোর বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়েছিল সুললিত। ফুঁপিয়ে উঠেছিল মিতু, তোমার পায়ে পড়ি লালি, আর আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না।

—মিথ্যে? সুললিত আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

মিতু—তবে এখনও স্পষ্ট করে বলছো না কেন?

—এই কথা। হেসে ফেলে সুললিত, আর মিতুর হেপবার্ণ খোঁপার সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে দিয়ে প্রাণের ভিতরে চাপা একটা স্বপ্নের ভাষা উথলে দেয়—তবে মিতু। আমার সবার আগের কাজ হবে, বাবাকে জিজ্ঞেস করা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে বাবা রাজী আছেন কিনা। যদি তিনি রাজী না হন, তোমাকে যদি আমি বেহালার বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারি, তবে আমাকেই তোমাদের এই বাড়িতে এসে থাকতে হবে।

মিতু—আসল কথাটাই তো বার দিলে।

সুললিত—কি?

মিতু—বিয়ে? সে তো এর মধ্যে যে-কোন একটি দিনে হয়ে যেতে পারে। যে দিন বলবে, সেদিনই।

সুললিতেরই পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়ে, এক হাতে সুললিতের কপালে রুমাল বুলিয়ে দিতে থাকে

মিতু। সত্যিই যে, ললির নিঃশ্বাসটা বড় উষ্ণ, কপালে কুচি-কুচি ঘামের ফোঁটাও চিকচিক করছে। মিতু বলে—কিন্তু তোমার বাবা যদি রাগ করেন, তবে তোমাকে তো মুস্কিলায় পড়তে হবে।

—কিসের মুস্কিলা।

—তোমাদের বেহালার বাড়ি, মার্কিলিংয়ের চা বাগান, তোমার বাবা তাঁর এসব সম্পত্তি কি কোনদিন তোমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইবেন?

—এই কথা! হেসে হেসে সুললিত—সে জন্যে আমার কোন ভাবনা নেই, মিতু। আমি জানি, উইল করে সব সম্পত্তি আমাকেই দিয়েছেন, বাবা। কোন দাতব্য চেরিটি মিশনকে দেন নি। তাছাড়া, বাবার রাগ! সে তো ক্ষণস্থায়ী। রাগের পরে দু'চার দিন মেজাজ গরম করে রাখবেন, তারপর একদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন, তারপর এই রাগ টুপ্ করে ঝরে পড়ে যাবে।

ডালিয়াস এসব কথা কান পেতে শুনতে পেয়েছিল পিয়া; তাই মীরজা আর সুকৃত জানতে পেরেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর যা দেখেছিল, এবং আর যে-কথা শুনেছিল পিয়া, আর সবই একটা নতুন প্রাণের জগতের বিস্ময় হয়ে পিয়ার চোখ দুটোতে চমৎকার একটা সুখের বেদনা ভরে দিয়ে নিবিড় করে দিয়েছিল। আনন্দার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে নি পিয়া। সত্যি, এই ললিয়া যেন চুম্বে-যাওয়া আর ভড়াভড়ি করা একটা উৎসবের হিরো। ভালবাসার কত নাটক-নভেল পড়েছে পিয়া কিন্তু তার মধ্যে ললিয়া'র মত কোন হিরোর সাক্ষাৎ পায় নি। সেই গোবেচারা রেমুদা, মিতুদির সঙ্গে এক লোকায় বসতে যার শরীরটা লজ্জায় মুইয়ে যেত, তার সঙ্গে এই ললিয়ার কত তফাৎ। টিপ টিপ করেছে পিয়ার বুকটা, তবু আনন্দার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। কী আশ্চর্য, মিতুদি যে একটি বারও 'না' বলে সামান্য একটা আপত্তিও করলো না। হেমবার্ণ খোঁপার ছাঁদ খুলে গিয়েছে। যেন এলোমেলো ফুলের গুচ্ছের মত ভাজা-ভাজা হয়ে লোকার উপর পড়ে গেল মিতু দি। কী অদ্ভুত ভাবে আর কত শক্ত ক'রে মিতুদির ওই নরম শরীরটাকে আঁকড়ে ধরলেন ললিয়া! না, ললিয়া সত্যিই অদ্ভুত চমৎকার সুখের সাহসের আর আনন্দের মানুষ।

সেদিন শুধু একা পিয়ালীই বুঝতে পেরেছিল, ললিয়ার সঙ্গে মিতুদির বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে, বাকী কিছু নেই। শুধু বাকী আছে একদিন রিয়ের রেজিস্টারের কাছে যাওয়া, আর খাতায় সই করা।

আর তিনমাস পরে, যেদিন মিতালীর পাশের ঘরের বের হলো, সেদিন নয়। আরও এগারো পরে, যেদিন মিতালীর একটা চাকরি হলো, সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্টারের সামনে যখন দুজনে বসেছিল, তখন সুললিতের গায়ের বুকের বোতামঘরে মস্তবড় একটি লাল গোলাপ পরানো ছিল। আর মিতালীর হেমবার্ণ খোঁপার সঙ্গে একটি হলদে গোলাপ।

শাঁক বাজেনি, তবে চায়গঞ্জের মানুষটি বুঝবেন কি করে যে, এবাড়িতে দুই-জীবনের মিলনের উৎসব হয়েছে। বিয়ে হওয়ার পর পুরবধূ সেই বীণা, যার মুখে সদা-সর্বদা একটা অদ্ভুত শান্তির হাসি লেগে থাকে, সে-ই উপরতলায় ঘরে এসে চায়গঞ্জের বর মানুষটিকে জানিয়ে দিল, সুললিতবাবুর সঙ্গে আজ মিতুর বিয়ে হয়ে গেল।

চমকে উঠলেন না লোকনাথ; বন্ধ চোখ দুটোকে খুলে একবার তাকালেনও না; একটি কথাও বললেন না।

হা, মিতু আর সুললিত একবার উপরতলার ঘরে এসে লোকনাথের খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই আগমন আর উপস্থিতির কোন সাড়া লোকনাথের গভীর মুখটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিতে পারেনি। মিতু শুধু বলে যাবা মুখোমুখি, ভালই। ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই।

মিতু আর সুললিত চলে যাবার পর চমকে ওঠেন, ধড়ফড় করেন, আর চোখ মেলে তাকান লোকনাথ। বোধহয়, কোন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। ঠিকই, অনেকদিন পরে পুত্রবধূ বীণার কাছে একটা স্বপ্নের গল্প বলেন লোকনাথ। স্বপ্নে দেখা গেল, একটা শ্মশানের

মাঠ, রাতের অন্ধকারে সেই মাঠের বুকে অনেক আলেয়া দৌড়চ্ছে। আলেয়াগুলো যেন ঝকঝকে ও সুন্দর এক-একটা হাসিমুখের মলজ্জ ছবি। শ্মশানের মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আলেয়াগুলো যেন কালা নদীর একটা কালাক্কের উপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লো।

বীণা বলেছে, তাই জানতে পেরেছেন লোকনাথ, টুনি এখন চাকরি করছে। আর টুনির স্বামী সুললিত এখন এই বাড়িতেই থাকে।

নীরজা কি উপরতলার এই ঘরে আজকাল আর আসেন না? আসেন বইকি। মাঝে মাঝে আসেন। একদিন এসে খুশির আবেগে নিজেই বলে গিয়েছেন—ললিত চেষ্টাতেই মিতুর চাকরিটা হয়েছে। ললিত এক সিন্ধী বন্ধুর কারবারের অফিসে কাজ পেয়েছে মিতু। অফিসের গাড়ি মিতুকে নিয়ে যায়, আবার অফিসের গাড়ি এসে মিতুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। মিতু বলে—কাজ বলতে তো এই কাজ, ঘুটেঘুটিনটে বোস আর বিয়োগ, ব্যস্। বস মিষ্টার বাসবানি বলেন, মিতালী সরকার আমার অফিসের শুধু একজন অ্যাসিস্টেন্ট নন, উনি আমার অফিসের নতুন চার্ম অ্যাণ্ড বিউটি।

শুনতে শুনতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লোকনাথ; তাই কোন কথা বলেন নি। আর নীরজাও সেই অদ্ভুত অসাধুতার কাছে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনেক কাজ রয়েছে নীরজার। বীণা অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারে না কিংবা ভুলেই যায় যে, সকাল দশটায় ললিতকে আর একবার কফি দেওয়া দরকার। সকাল ন'টার সময় কারখানার কাজে যায় মুকুল; তার পরেই যেন আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। হুঁস থাকে না যে, দশটা বাজতে চলেছে। নীরজা তাই মাঝে মাঝে বেশ জোর গলায় চেঁচিয়ে বীণাকে ডাক দেন—কী গো মেয়ে মুকুল লুচি তৈরী করে দিয়েই কি সব কাজ হয়ে গেল, মনে কর? ললিত জন্য কফি তৈরী করতে হবে না?

ঠিকই বলেছেন নীরজা। মুকুল কারখানার কাজে যাবার আগে, ঠিক সকাল ন'টার সময় মুকুল জন্য আট-দশটা লুচি ভেজে রেখে ওপরে যেন হাঁপিয়ে পড়ে বীণা। হঠাৎ উদাস হয়ে যায়; চুপ করে বসে থাকে।

নীরজা মাঝে মধ্যে মাঝে স্পষ্ট করে এ বাড়ির নীরব সত্যটাকেও বুঝিয়ে দেন—যার জন্যে এ বাড়ির সব সুখ আছে, তারই কথা ওভাবে করে ভুলে গেলে চলবে কেন, বীণা? বুঝতে পেরে বীণা সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ললিতের জন্য কফি তৈরী করতে থাকে।

অনেক দিন পরে একদিন, সেদিন সকাল থেকেই ঝুরঝুর করে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সে বৃষ্টি আর থামছে না। লোকনাথের ঘুমের ঘোর আর স্বপ্নের ঘোর দুইই যেন একটা শব্দের আঘাত পেয়ে ভেঙে গেল। ঝড়ে উঠেছে লোকনাথের খাট, খাটের নড়বড়ে পায়াটাও যেন ঘেমে বিশ্রী একটা শব্দ করেছে।

—কে? কে? চমকে ওঠেন, আর প্রশ্ন করেন লোকনাথ।

বীণা বলে—ছাদের কার্নিশ দিয়ে জল ঢুকে আপনার বিছানাটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই খাটটাকে টেনে একটু সরিয়ে দিলাম।

শুধু ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ। বাড়িটার কোন ব্যস্ততার সাড়া-শব্দ শোনা যায় না। বীণা বলে—আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

লোকনাথ—বল।

বীণা—আমি আর এবাড়িতে থাকতে পারবো না, থাকবো না।

—কেন?

—আপনাদের জামাই আমাকে তাঁর একজন সেবা-দাসী বলে মনে করেন।

—তার মানে?

—মিতু যখন অফিসে যায়; পিয়া কলেজে যায়; আর মা যাদবপুরে বেড়াতে যান, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, তখনই সুললিতবাবু আমাকে তাঁর ঘরে যেতে ডাক দেন।

—কেন?

—তাঁর পা টিপতে বলেন।

—তুমি কী বল ?

—আমি বলেছি, আমার স্বার্থ কারও নয়।

—সুকুর মা এসব কথা জানে—তাকে বলেছো।

—জানে, বলেছি।

—কী বলেন সুকুর মা ?

—উনি আমারই ওপর রাগ করেন। উনি বলেন, আমারই মতো ছোটলোকের মন হয়ে গিয়েছে।

—ঠাট্টা করেছে। সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলেন নীরজা। চমকে ওঠে বীণা ; কে জানে কখন, বোধহয় এই মাত্র বালেশ্বর থেকে ফিরেছেন উনি।

বীণা বলে—তাই যদি মনে করেন, তবে আমাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুন।

নীরজা—চাই, তাই বলছি। তুমি ললিকে অপমান কর, তবে এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হতে পারে না।

বীণা—তবে তাই হোক, আমি আর এখনই চলে যাব।

লোকনাথের ধোঁয়াটে চোখের চাহনিটা জলজল করে, আর নীরজার দুই চোখের তারা যেন কী ভয়ে ছটফট করতে থাকে। কারণ, দুজনেই দেখতে পেয়েছেন, ওই বীণার মুখের শান্ত হাসিটা যেন আগুনের শিখা হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সুকুমার আসে, আর্ত হয়ে ডাকায়—এখানে কিসের এত ঘৃণা ?

নীরজা বলেন—তোমার বউ আর এ বাড়িতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তবে তুমিও···।

সুকু—তুমি আমাকেও চলে যেতে বলছো ?

নীরজা—তোমাদের মনে যদি ললির মান-সম্মানের জন্য কোন দরদ না থাকে, তবে তোমাদের এখানে থেকে লাভ কি ?

সুকুর ভীত চোখ দুটো অদ্ভুত হয়ে কাঁপতে থাকে। —আমি তো তোমাকেই বলে, তবু আমাকেই চলে যেতে বলছো ?

নীরজা—আপন ছেলে তুমি আজ পর্যন্ত মা বাপ বোনের জন্য কোন সুখের কাজটা করতে পেরেছো ? আপন ছেলেও আপন নয়, যদি সে সংসারের কোন কাজে না আসে। আর পরের ছেলেও আপন হয়, যদি সে আপনজনের মত কাজ করে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুকু—এরপর আমি আর কী বলতে পারি ?

সুকুর গলার স্বরে যেন জলে ডুবে যাওয়া মানুষের আর্তনাদের বুদ্বুদের মত মৃদু-করুণ শব্দ। বীণা এগিয়ে এসে সুকুর হাত ধরে টান দেয়—চল।

সুকু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—যাঁ ? সত্যিই যাবে ?

—হাঁ

দুই খাবেনি ; কিন্তু আর দেরি করে না বীণা। সুকুর একটা হাত ধরে রেখে আর টান দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যায়। তারপর ওদের আর দেখা যায় না।

বিদ্যুৎ চমকে উঠেছে। বাঁ দিকে কথা বলেন লোকনাথ—এইবার একটা বাজ পড়লেই ভাল হয়।

নীরজা—তুমি যেন আমাকেই ঠাট্টা করছো বলে মনে হচ্ছে ?

লোকনাথ—ঠাট্টা নয় ; ঠাট্টা করবারও শক্তি আমার নেই। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই···।

—কী ?

—সত্য হোক, সুকু তোমারই ছেলে। পাগল হোক ছাগল হোক, তবে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।

—কিন্তু ললি কি আমার কাছে ওই ছেলের চেয়েও বেশি আপন ছেলে নয় ?

—ভগবানই জানেন।

[দশ]

—তবে তুমি আর কথা বাড়িও না।

অনেক শিখিয়ে আর বুঝিয়ে দিলেও রান্নার কালা ঠাকুরটা কফি তৈরী করতে পারে না। অগত্যা নীরজা নিজেই সকাল দশটার কফি নিজেরই হাতে তৈরী করেন।

সারাদিন ঘরেই থাকে ললি, শুধু সন্ধ্যা হলে এক-একদিন বালিগঞ্জের ক্লাবে তাস খেলতে যায়।

ললির বাড়ির গাড়ি এ বাড়িতে আর আসে না। কারণ, বিয়ের পর যেদিন এবাড়িতে এসে নতুন জীবনের পাট বেঁধে ফেলেছে ললি, সেদিন থেকে বেহালার বাড়ি থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে।

ললির বাবা এটর্নি প্রিয়নাথ রায়, সত্যিই একটু বেশি কড়া স্বভাবের মানুষ ; তা না হলে এরকম কাণ্ড করবেন কেন ? ভাবতে গিয়ে নীরজা প্রায়ই মাঝে মাঝে বেশ অপ্রসন্ন হয়ে যায়।

ললির মনে কিন্তু বাপের উপর একটুও অপ্রসন্নতা নেই। নীরজা কথাটা উঠালেই হেসে ফেলে ললিত।—আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরুন। দেখতেই পাবেন, বাবার চিঠি এসে আমাকে ডাকছে। সত্যি, বাবার বাইরেটা যতই কঠোর হোক, ভেতরটা খুবই নরম। আমাদের

বাড়িতে আমার বাবা-মা'র যত ফটো আছে, তার সব গুলিতেই দেখতে পাবেন, আমি মায়ের কোলে নয়, বাবার কোলে বসে আছি।

বাবার কাছ থেকে প্রতিমাসে যে একটি হাজার টাকা সুললিত তার হাত খরচের জন্য পেত, সে টাকাও আর সুললিতের হাতে আসে না। টাকা যেবারা বন্ধ করে দিয়েছেন প্রিয়নাথবাবু।

—কিন্তু আর কতদিন? বলতে গিয়ে হেসে ফেলে সুললিতা। একদিন মা-মরা ছেলের জন্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবেন পিতা, আর লোকের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

নীরজা হাসেন—সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি।

মিতুও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই চমকে ওঠে। সুললিতের মুখের দিকে-যেন একটু আশ্চর্য হয়েই তাকায়, মিতু, আর হাসতে থাকে।

সুললিত—হাসছো কেন?

মিতু—একটা ম্যাজিক মনে মনে হচ্ছে, তাই হাসছি।

সুললিত—কিসের ম্যাজিক?

মিতু—আমি তো স্নিগ্ধের ক্যাম্বারাইডিন ব্যবহার করি, কোন দেশী তেল আমি মাখার মাখি না।

সুললিত—তার মানে?

মিতু—তার মানে, আমার বালিশে চামেলী আতরের গন্ধ এল কি করে? মোহন মোদলা তো পিয়াকে চামেলী তেল উপহার দিয়েছে; পিয়া আজকাল ওই তেলই মাখায় মাখে।

সুললিত হাসে—হুঁ, ম্যাজিকই বটে। তবু মনে হয় আমি যখন লোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় তোমার ছটফট স্বভাবের বোনটি এই ঘরে এসে আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে তোমার বালিশে মাথা রেখেছিল।

মিতু—তাই হবে।

সন্ধ্যা হতেই যখন তাস খেলতে বালিগঞ্জের ক্লাবে চলে যায় সুললিত, তখন উঁকিঝুঁকি দেয় মিতু—ওরে পিয়া, একবার এঘরে আসবি?

—যাই।

পিয়ালী ঘরে ঢুকতেই এক হাত দিয়ে মুখের হাসিটাকে চাপা দিয়ে কথা বলে মিতু—কী করছিলি?

—শুয়েছিলাম।

—কেন?

—খুব ক্লান্ত, তাই।

—ক্লান্তই বা কেন? আজ তো কোন জলসাতে তোর নাচের প্রোগ্রাম ছিল না?

—না।

—তবে?

—এমনি।

—না, এমনি নয়। নিশ্চয় ললির সঙ্গে অনেক গল্প করেছিস।

—হুঁ।

—তাই আমার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলি।

—আঁ্যা? হুঁ।

—তাই তোর ললিদা খুব মজা করে তোকে খুব পাড়িয়ে দিয়েছে।

হুঁ।

—তাই তোর ঠোঁটের কোণটা এখনও লালচে হয়ে ফুলে রয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তাই তোর ঘাড়ের ওখানে দাঁতের দাগটা এখনও রয়ে আছে।

—কী যে বলছো, কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোর ললিদার অভ্যেসটা তো আমার জানতে বাকী নেই। এইবার তুইও জানলি তাই না?

মুখ ফিরিয়ে আর বিড়বিড় করে কথা বলে পিয়া—হ্যাঁ, ললিদা যার যার ডাকেন, না দিয়ে উপায় কি?

মিতু—আজ প্রথম ডেকেছিল?

পিয়া—না, আরও অনেকবার ডেকেছে। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করছো কেন।

মিতু—তোর ওপর একটুও রাগ করছি না। শুধু জেনে নিলাম।

জেনে নেবার পর মিতালীর দুই চোখের হাসি আরও দুরন্ত হয়ে ছটফট করে। আজ বাইনে পেয়েছে মিতালী। নীরজার কাছে গিয়ে, নীরজার হাতের কাছে মাইনের টাকার প্যাকেটটা ফেলে দিয়েই আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—আমি এখনই একবার বের হব, মা।

—কেন? কোথায় যাবি?

—একটা পার্টি আছে। তাতে আমারও নেমন্তন্ন আছে। মিস্টার বাসবানি আমাকে অনেক করে বলেছেন, আমি যেন অবশ্যই যাই।

নীরজা হাসেন—তবে যা, এ তো ভাল খবর। শুনতে পেয়ে কত খুশি হবে ললি।

সন্ধ্যাবেলা তাসের ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা শোনবার পর নিজেই খুশি হয় ললি। কী আশ্চর্য, রাত বারোটার পর যখন বাসবানির গাড়ি মিতালীকে পৌঁছে দিয়ে গেল, তখনও খুশি হলেন ললি। গাড়ি থেকে নেমে

বিতলী বাড়ির বারান্দাতে উঠতেই লিলি যেন নতুন সুরে ও ঘরে একটা বাপত সম্ভাষণের বাণী শোনায়—ওরেশ ভাল; আমি জানতাম, বাবলি একদিন তোমাকে পার্টিতে থাকবেনই; আর তুমিও কোন আপত্তি করবে না।

নীরজা বলেন—কিন্তু পিয়াটা কোথায় গেল?

বিভু—পিয়া বাড়িতে নেই?

নীরজা—না।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রশ্ন করে সুলসিত—মোহন ঘোষালের স্কুটারের শব্দ শোনেন নি?

নীরজা—হ্যাঁ, শুনেছি।

সুলসিত—তবে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, মোহনের সঙ্গেই বের হয়েছে পিয়া।

নীরজা—কিন্তু কোথায়?

সুলসিত—পিয়ারও নিশ্চয় একটা প্রোগ্রাম আছে।

নীরজা—কিসের প্রোগ্রাম?

সুলসিত—কোন অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ নাচতে গাইতে হবে, এই আর কী!

না, বাড়ি ফিরতে খুব দেরি করেনি পিয়া। মোহনের স্কুটার বাড়ির সামনে এসে থামে আর চলে যায়। পিয়া এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। —উঃ, পুলিস সার্জেন্টটা কী বদমাস! প্রায় একটি ঘণ্টা পথের উপর আটক করে রাখলো, আর পুরো দশটি টাকা ঘুষ নিয়ে তারপর ছেড়ে দিল। নইলে, আরও কত আগে বাড়ি পৌঁছে যেতাম।

না, আর বেশিক্ষণ নয়। সাত নম্বর ফ্ল্যাটের লেনের বারান্দা নীরব হয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, দোতলার ঘরে একজন সুস্থ মানুষের নাক-ডাকার শব্দ, আর পাশের পড়ো বাড়ির অশ্বিনাতে নিমগাছের মাথার পেচার ডাকের শব্দ।

[এগার]

কী আশ্চর্য, পড়ো বাড়ির অশ্বিনাতে সেই নিম-গাছেরই পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে আজ একটা কোকিল ডাকছে। পত্রিকা হাতের কাছে না থাকলেও বুঝতে পারেন লোকনাথ, সেই যে কবে, রামবয়াল যেদিন শুকনো মুখ নিয়ে আর দুঃখিত হয়ে চলে গেল, তারপর প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। বেঁচে আছে কী রামবয়াল? বেঁচে থাকলে একটা চিঠিও দেয় না কেন?

বাবা চলে যাবার পর থেকে এই বাড়ির নীচের তলার দুটি ঘরের কোন নতুন খবর শুনতে পাননি লোকনাথ। আর নতুন করে জানবারই বা কী দরকার আছে! বুঝতেই পারা যায়, আজ এই সকালবেলাতে নীচের তলার ঘরে যে উচ্ছল হাসি আর কলরব এখন উঠছে, সেটা নীরজারই স্বপ্নের ঝরাপালি। তবে সত্যিই কি নীরজার চোখের জল আর কোনদিনও দেখতে পাওয়া যাবে না! অদ্ভুত আশা, অদ্ভুত কল্পনা। লোকনাথ মনে করেন, অভিশাপে জলে যাওয়া জীবনের আশা আর কল্পনা এরকমই হয়ে থাকে।

নীচের তলার ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে তর্ক গল্প আর হাসির যে হর্ষ মেতে উঠেছে, সে হর্ষের ভাষা লোকনাথের কানে পৌঁছয় না ঠিকই, তবু বুঝতে পারলো, এটা নীরজার নিজের হাতে গড়া একটি সুখী সংসারের হর্ষ।

তখনকার কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন নীরজা—শত্রুরে কী না বলে? যত ছাই আবোল—তাবোল মিথ্যে কথা।

হ্যাঁ, কে এক কিস্তীশ বিশ্বাস নীরজার কাছে একটি চিঠি লিখেছেন: খুব জানবেন, এটর্নী শ্রীনাথ রায় তাঁর একমাত্র ছেলেকে তাঁর বাড়ি গাড়ি ও টাকার কিছুই দেবেন না। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সব সম্পত্তি তাঁর ছেলে সুলসিতই পাবে।

নীরজা বলেন—মিথ্যুকের হাতের লেখাটা, কী আ অনেকটা লালির হাতের লেখার মত।

সুলসিত—এই কিস্তীশ বিশ্বাস হলেন আমার আপন মামা। কিন্তু এরকম একটি হিংসুকে লক্ষ মামা থাকার পৃথিবীর কোন ভাগ্নেরই নেই।

নীরজা—চিঠিটাকে আমি ঘেন্না করে আর একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

হাসে সুললিত—চিঠিটার উপর এত রাগ করবার কোন মানে হয় না। যা হোক তবু আসল সত্যটা তো আর লুকোয় নি। বাবার সব সম্পত্তি একদিন যে আমিও পাব, তাতে গিয়ে বুক ফেটে গেলেও সত্য কথাটা স্বীকার করেছেন মামা।

পিয়ালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আর ফিসফিস করে কী যেন বলে সুললিত। পিয়ালী ভ্রূকুটি করে হাসে আর সুললিতের পিঠের উপরে আস্তে একটা চাপড় মারে।—ছাই!

—কী হলো? নীরজা প্রশ্ন করতে গিয়ে হেসে ফেলেন।

সুললিত—পিয়ালীকে ওর গ্র ও সাকসেসের জন্য অভিনন্দন জানালাম।

উঠে দাঁড়ান নীরজা—আমি বাবা রায়গঞ্জের সেকেলে গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এত ইংরেজী কথার মানে বুঝি না। যেখি, কানা ঠাকুরটা আবার কাপড়ী লেবু চটকি চড়িয়ে দিল কোথায়।

চলে যায় নীরজা। বিতালী আরও চা খায়; বিতালীর কপালের আস্তে আস্তে দুলছে আর কাঁপছে চুলের যে কাল, সেটাই হাতের আঙুল দিয়ে টানে আর ছাড়ে, ছাড়ে আর টানে। কী যেন ভাবছে বিতালী।

সুললিত বলে—নিচু বাসবানির ওই পার্টিতে কি কোন দেশী মানুষ ছিল?

বিতালী—মাত্র একজন, আর সবই বিদেশী।

সুললিত—তাদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বাসবানি?

বিতালী—হ্যাঁ।

সুললিত—ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় তোমাকে নেমন্তন্নও করে রেখেছে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—এ মাসের শেষে মাসগো থেকে মেসিন টুলের ইণ্ডাস্ট্রির এজেন্ট হয়ে এসেছেন যে মাঞ্জার ভেভিল, তিনি এ মাসের শেষেই বোম্বে থেকে কলকাতায় ফিরবেন। তখন বাসবানিই আমাকে জানিয়ে দেবে, কবে নেমন্তন্ন হবে।

পিয়ালীর পিঠে একটা চিমটি কাটে সুললিত—তুমি তাহ'লে কলেজে আর যাবে না বলেই ঠিক করেছ?

পিয়ালী—হ্যাঁ।

সুললিত—কেন?

পিয়ালীর—বাংলার কৃষ্ণাদি বোধহয় খোঁটা দিয়ে একটা কথা শোনাচ্ছেন। কাজেই···।

সুললিত—কী কথা?

পিয়ালী—কৃষ্ণাদি বলেন, আমার সাড়া পেলে ক্লাসের মেয়েরা সবাই নাকি মুগ্ধ হয়ে শুধু আমারই দিকে তাকিয়ে থাকে; কৃষ্ণাদির লেকচারে কেউ কানও পাতে না, শোনেও না।

বিতালী—ওই খোঁটা আমাকেও কত শুনতে হয়েছিল।

সুললিত—কোথায় আর কিসের প্রোগ্রাম তোমার ছিল, পিয়া?

পিয়া হাসে—বলবো না।

সুললিত—বলো না। তবে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। বেশ গোল-গাল মোটা-সোটা চেহারার এক গোয়ানীজ—কালো-সাহেব, চমৎকার বেহালা বাজাতে পারেন। একটা হোটেলের ডিনারের একটা ঘরের ভিতরে স্টেজের এককোণে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন ওই কালো সাহেব ঠিকুর; আর বাবা যেন স্টেজের উপর দুলে দুলে নাচছে। আর···।

—তোমার স্বপ্নের নিকুচি করি। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর লাফিয়ে চলে যায় পিয়ালী।

বিতালী বলে—তুমি দেখছি, সব খবরের রয়টার।

সুললিত—তা বলতে পার।

বিতালী—পিয়ালীর প্রোগ্রামের এই খবরগুলো কোথায় পেলে?

সুললিত হাসে—স্বয়ং ঠিকুরই আমাকে বলেছে। একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছে, ওর লাইট ব্রাদার আসলে এখন সব চেয়ে চমৎকার স্ক্রিপ করতে পারে একটি নতুন

বিস্কুট, একটি বাঙালী মেয়ে, নাম তার পিয়ালী রায়। ফিরিঙ্গী মেয়েগুলো ফ্রকের শেষ পোষে তবু একটু ঢাকা-ঢুকির বালাই রাখে, প্যান্টিটা থাকে। কিন্তু নতুন বিস্কুট নাকি তার শেষ পোষে ছবির ডেনাদের চেয়েও বেশি অনাবৃত হবে, শুধু ছোট্ট একটি জাপানী পাখার ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

—আমি যাই। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মিতালী।—এখন আমি অন্তত পুরো পাঁচটি ঘণ্টা ঘুমোব।

সুললিত—ঘুমোও। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। তুমি আর পিয়ালী, দুজনে কখনও একই দিনে কোন পার্টি বা প্রোগ্রাম রাখবে না।

মিতালী—কেন?

সুললিতের দুই চোখ জলজল করে। —আমার বড় অসুবিধে হয়। একেবারে একলা হয়ে পড়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়।

একদিন খাবার টেবিলের কাছে এসেই নীরজাকে আরও একটা কষ্টের কথা বলে ছিল সুললিত। —অন্তত দুপুরের খাওয়াটায় এমন দুর্দশা হলে তো চলবে না।

নীরজা—অ্যাঁ। দুর্দশা?

সুললিত—হ্যাঁ। না আছে চিকেন, না আছে পুডিং, না আছে এক-আধটুকু বিরিয়ানী পোলাও।

নীরজা লজ্জিত হয়ে হাসেন—ঠিকই বলেছো। কিন্তু।···

সুললিত—আর তো কোন কিন্তু নেই। আপনাদের তো এখন টাকার কোন অভাব নেই!

নীরজা—অভাব আছে বই কি, হ্যাঁ, ভাগ্যের জোরে আর নিজের গুণে মেয়ে দুটো মাঝে মাঝে এক আধটা প্রোগ্রাম পায়, তাই চলে যাচ্ছে। সুললিত—আপনি তো জানেন, মিতু খাঁটি পালে'র দুটো সেকলেস কিনেছে। পিয়ালী তো আধ ডজন খানেক বালুচরই কিনে ফেলেছে।

নীরজার গলার স্বর এইবার বেশ মৃদু হয়ে ও বুঝিয়ে হয়ে যেন মার্জনা চায়—আমি খুব বুঝতে পারছি বাবা, তোমার মত মানুষের এরকম একটা কানা ঠাকুরের রান্না খুবই খারাপ লাগে।

গভীর সুললিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন নীরজার গলার স্বরটা যেন একটু সাহস পেয়ে কথা বলে—তোমার বাবার কাছ থেকে কোন সাড়া তো এখনও পাওয়া গেল না, ললি।

—কিসের সাড়া?

—তোমাকে আর টাকা পাঠালেন না, নিজের কাছে ডাকলেনও না, এবার তাঁর গাড়িটাকেও এখানে পাঠালেন না!

—সে জন্য আপনার দুশ্চিন্তা কেন? যখন সময় হবে, তখন সবই হবে। অন্তত এটুকু বিশ্বাস করতে তো কোন অসুবিধে নেই যে, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পাব।

—তাই তো বিশ্বাস করতে চাই।

—বিশ্বাস করতে চাই নয়, বিশ্বাস করতে হবে।

—তুমি বাবা একদিন নিজেই যাও।

—কোথায়?

—তোমার বাবার কাছে যাও, সব কথা তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল।

—সেটা সম্ভব নয়।

—কেন?

—আমার অপমান।

—সেটা বুঝি। তবু·····।

—আবার তবু কিসের?

—তবু, তোমার সম্মানের কথাটাই বড় না হোক, তোমার তো তবে একটা ভাল রোজগারের কাজ ধরা উচিত।

—না।

—বাবার কাছে যাবে না, কোন কাজও করবে না; এটা যে একটা কথা হলো।

ওরকম তর্ক আমার সঙ্গে করবেন না। শুনে নিন তবে, আমি যেমন আছি, তেমনই থাকবো। আমি নড়বো না।

পাশের ঘর থেকে মিতালী আর পিয়ালী দু'জনেই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে, যেন দুটি ভীরু শুকনের অনুরোধ

জোর ক'রে হেসে-হেসে কথা বলে—তুমি মিথ্যে কেন এসব তর্ক করছো, মা। কোন দরকার নেই। বিহার সুললিত সরকার হলেন মেয়াদের একটি ঐশ্বর্য।

সুললিতের হাতের কাছে কফির বাটি এগিয়ে দিয়ে নীরজা আবার হাসতে চেষ্টা করেন—বেশ তো, আর তর্ক করবো না। কিন্তু কী এমন বাজে কথা বলেছি যে, তুমি এত রাগ করবে?

সুললিতও এইবার হাসে—এই তো আবার তর্ক শুরু করলেন।

পাশের ঘরে মিতালী আর পিয়ালী দুজনে একসঙ্গে এইবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।—চুপ্ সীন। চুপ সীন নাম্বার এবার।

হ্যাঁ, চুপ সীনই পড়ে গেল। নীরজার হাত থেকে কফির তোলবার চামচটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর কাঁচের পেয়ালায় লেগে ঝনঝনে আর্তনাদের মত অদ্ভুত একটা শব্দ করে বেজে উঠলো। আর কোন কথা বলেন না নীরজা।

[বারো]

রাত কত? দশটারও বেশি হবে। কী সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টিও চলছে। হাওয়ার ঝাপ্টা লেগে সাত নম্বর হরি ঘোষ লেনের সব জানালা কাঁপছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু ঘরের একটা দরজা খোলা রেখে, আর দরজার কাছেই বারান্দার উপর একটা চেয়ার রেখে, তার উপর বসে আছে সুললিত। কত শক্ত হয়ে, যেন পাথরের মূর্তিটি হয়ে বসে আছে সুললিত।

নীরজা এসে বার বার তিনবার জিজ্ঞেসা করেছেন, কফি তৈরী করে দেব?

সাড়া দেয়নি সুললিত। তবু আবার এসে জিজ্ঞাসা করেন নীরজা—কফি খাবে?

সুললিত—না। কফির চেয়ে ভাল জল খেয়েছি। কফির দরকার নেই।

চমকে ওঠেন নীরজা।—তবে এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়।

সুললিত—না।

সুললিতের গলার এই 'না' শব্দটা যেন একটা গর্জন।

নীরজা—তুমি রাগ করেছো, মনে হচ্ছে।

সুললিত—কেন রাগ করবো না? আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা দুজনে কখনও একই দিনে কোন প্রোগ্রাম রাখবে না। তবু আমার কথা অমান্য করে আজ ওরা দুজনেই বাইরে বের হয়েছে।

নীরজা—একটু পরে ওরা তো বাড়িতে ফিরবেই; তোমার কথার অমান্য কেন হবে?

সুললিত—না, ওরা আজ ফিরবে না।

নীরজা—ফিরবে না? এ কেমন কথা।

সুললিত—হ্যাঁ, এই রকমই কথা। একজন গিয়েছেন ডেভিসের সঙ্গে টাটানগর। আর-একজন গিয়েছে মোহন খোসলার সঙ্গে, দীঘা।

নীরজা—এ তো বড় বেশি দুঃসাহসের কথা।

সুললিত—কল গার্ল দুঃসাহসী হবে না তো কি ভিরু কাপুরুষ বা দুঃসাহসী হবে।

নীরজা—কল গার্ল? তার মানে?

সুললিত—কল গার্ল মানে কল গার্ল। রূপসী মেয়েটি হয়ে পয়সাওয়ালা মানুষের ফূর্তির সহচরী হয়, তার সঙ্গে রাত কাটায়, আর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

সুললিতের মুখে হাসি। বার বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলেই সুললিতের মুখের হাসিটাকে দেখতে পাচ্ছেন নীরজা। কিন্তু দেখতে পেয়েও যেন অন্ধের মত তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে নীরজার কাছে এগিয়ে আসে সুললিত। নীরজার একটা হাতও ধরে ফেলে। আর-এক হাতে নীরজার গলাটাকে জড়িয়ে ধরে।—এস, আমার ঘরে এস।

—একী সর্বনেশে কথা। চেঁচিয়ে ওঠেন নীরজা; অন্ধকারের পাকে জড়ানো একটা তীব্র ঘৃণিত যন্ত্রণার চিৎকার।

পাশের পড়ো বাড়ির আঙিনায় নিমগাছে কোন পেচা আর ডাকে না। ঝড়ের ভয়ে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু

দাত নম্বর বাড়ি ঘর লেনের দোতলায়, ওঠবার পুরনো সিঁড়ি ঘরে দুড়দাড় একটা শব্দের আছাড় যেন মরিয়া হয়ে উপরে উঠতে থাকে। অনেক চেষ্টা ক'রে অন্তরঙ্গের পাশ থেকে শরীরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন নীরজা।

—কে? কে? শব্দ শুনে চমকে উঠছেন পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়। সত্যিই যে খুবই অদ্ভুত শব্দ। কে যেন দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলো, আর লোকনাথেরই রোগশয্যার খাটটাকে ছুঁয়ে লোকনাথের মাথার কাছে ঘরের মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়লো।

—কে তুমি? আবার ডাক দিলেন লোকনাথ।

—আমি। যেন হাঁসফাঁস করে একটা বোবা নিশ্বাস কোন মতে কথা বলে ওঠার চেষ্টা করে।

—তুমি নীরু?

হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার?

—ভয় পেয়েছি।

—ভয়?

—হ্যাঁ।

—তবে শিগগির আলো জ্বাল, তোমার হাতের কাছেই বোধহয় সুইচ আছে।

আলো জেলে দিয়েই আবার লোকনাথের খাট ছুঁয়ে মেঝের উপর ধুপ করে বসে পড়েন নীরজা।

—কিন্তু, কিসের ভয় নীরু? খাটের উপর উঠে বসেন, আর নীরজার সেই ধমনাটীক মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকনাথ।

নীরজার চোখে জল কিন্তু চোখ লুকোয় না নীরজা, চোখের জলও মোছেন না। নীরজার হাতটা থরথরিয়ে কাঁপছে, তবুও নীরজার সেই হাত খাটটাকে খুব শক্ত ছুঁয়ে রয়েছে।

—সর্বনাশ! আবার চমকে ওঠেন আর ভয় পেয়ে ছুঁপিয়ে ওঠেন নীরজা। এই ঘরেরই ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে সুললিত। কী শান্ত, কত শক্ত, আর কী দুঃসাহসী সুললিত। পঙ্গু রোগী লোকনাথ রায়কে বোধহয় একটা মরা টিকটিকির চেয়েও নিষ্ঠুর অস্তিত্ব বলে মনে করে সুললিত। শুধু একা সুললিত কেন? নীরজাও জানেন, বাড়ীসুদ্ধের এই লোকনাথ রায় আজ একটি পঙ্গু অক্ষম ও অশক্ত রোগী মাত্র। নইলে এতো এসে, লোকনাথ রায়েরই শিয়রের কাছে মেঝের উপর বসে, আর লোকনাথের খাট এত শক্ত করে ছুঁয়ে থেকেও এত ভয় পাবেন কেন নীরজা?

হাত তুলে ইসারায় ডাক দেয় সুললিত—চলে এস। ঘরের দেয়ালের গায়ে সেই ইসারার ছায়াটা নড়ছে ও দুলছে; যেন অতিকায় এক দানবের হাতের ছায়া।

নীরব নিঃসঙ্গ ও নিঃসাড়, লোকনাথ, লোকনাথ তাঁর খাটের উপর বসে শুধু দেখছেন, নীরজার চোখে জল কিন্তু কী আশ্চর্য, পঙ্গু লোকনাথের দুই অশক্ত চোখে যেন খুশি জোনাকির আভা চিকচিক করছে।

দুই পা এগিয়ে আসে সুললিত। এইবার শুধু হাতের ইসারাতে নয়, চাপা ধমকের মত ভঙ্গীতে গলার স্বর যেন তীব্র করে নিয়ে ডাক দেয়—চলে এস বলছি।

দুই চোখ বন্ধ করে মাথাটাকেও খাটের শক্ত কাঠের উপর নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে থাকেন নীরজা।

—মনে হচ্ছে, হাত ধরে টেনে নিয়ে না গেলে, তুমি আসবে না। বলতে বলতে নীরজার কাছে এসে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় সুললিত, আর পকেট থেকে সিগারেট বের করে নিজেরই হাতের পাঞ্জার উপর ঠুকতে থাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুললিতের হাত থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। পঙ্গু লোকনাথের দুটি হাত, কী ভয়ানক শক্ত হাত, সত্যি যেন লোহা আছে সেই হাতে, সুললিতের গলা টিপে ধরেছে। দুই হাত ছুঁড়ে, বার বার লোকনাথের মুখটাকে ধাক্কা দিয়ে, লোকনাথের হাতের সাঁড়াশি থেকে গলাটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সুললিত। লোকনাথের সাঁড়াশি হাত কিন্তু একটুও কাঁপে না। আর মুখে কী ভয়ানক এক সুখের উল্লাস কাঁপছে লোকনাথের দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সারিটা টিকরে পড়ছে, যেন একটা জন্তুর বীভৎসতা।

সুললিতের দুই চোখের তারা উল্টে গিয়েছে। মুখের

দুই কষ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা লালচে লালা ঝরে পড়ছে। এইবার খাটেরই কাঠের উপর সুলালিতের মাথাটাকে চেপে ধরেন, আবার চুকতেও থাকেন লোকনাথ। সুলালিতের গোঙানির শব্দটাও এইবার আরও অদ্ভুত হয়ে যায়। যেন মাথা চুকছে একটা বোবার আর্তনাদ।

হঠাৎ ঝুপ ক'রে মেজের উপর পড়ে গেল সুলালিতের শরীর। লোকনাথের সাঁড়াশি হাতের পেষণ থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল সুলালিতের গলা। বোধহয় সুলালিতেরই গলার ঘামে পিছল হয়ে গিয়েছে লোকনাথের হাত; তাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুলালিতের সেই পতিত দেহটার একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেন লোকনাথ। সুলালিত বলে—আমাকে ছেড়ে দিন; আমি এখনই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুলালিতের হাত ছেড়ে দিলেন লোকনাথ। খুব জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন।

আর শব্দ নেই, বৃষ্টিও নেই। ছরিদর লেনের রাত একটার অন্ধকারের গায়ে শুধু কতগুলি গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কোথা থেকে এসে যেন লুটিয়ে পড়ছে আর ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কে কাঁদে? দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এসে আর রাস্তারই উপর দাঁড়িয়ে প্রথম যিনি একটা বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা চিৎকার করে শোনালেন ও পাড়া জাগিয়ে তুললেন, তিনি হলেন অন্নপূর্ণার বাবা, অর্থাৎ সামনের বাড়ির মহীতোষ বাবু।

ওদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন হরেনবাবু—কী ব্যাপার, মহীদা?

মহীতোষ—এই সাত নম্বরের বাড়িতে কোন একটা ব্যাপার হয়েছে। মনে হচ্ছে, মহিলাই কাঁদছেন।

পাড়ার জিতেন একটা টর্চ হাতে নিয়ে ছুটে আসে—হ্যাঁ, মহীকাকা, আমিও শুনেছি।

মহীতোষ—কিছু কিছু দেখেছেন কি?

জিতেন—না।

মহীতোষ—আমি দেখেছি। একে তো আমার চোখে অনিদ্রা রোগ, রাতের অন্ধকারেও চোখের দৃষ্টি বেশ ভালই চলে। তার ওপর কানেও একটি বেশি শুনি। রাতের বেলা পাড়ার ভেতরে একটা বিড়াল ঢোকে গেলে আমি শব্দ শুনতে পাই।

জিতেন—কী দেখেছেন বলেই ফেলুন না।

মহীতোষ—তখন থেকে দেখছি আর শুনছি, এই সাত নম্বরের ভেতরে যেন একটা ভূতের কাণ্ড ছুটোছুটি করছে। এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির জামাইবাবু একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে আর হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।

একে একে আরও অনেকে আসেন। প্রদীপবাবু, অরন্তবাবু, আর হেম বিনয় ও চারু সরকার। সাত নম্বরের বাড়ির সামনে সাত-আট জন প্রতিবেশী মানুষের উৎকণ্ঠ ভিড়টা এইবার বেশ স্পষ্ট আর আকর্ষ হয়, বাড়ির তিনটি দরজাই খোলা। জিতেন বলে—ডাকাতি।

চারু সরকার—পারিবারিক কলহ।

প্রদীপ বাবু—শোকের ব্যাপারও হতে পারে।

বলতে বলতে সকলেই একটু ব্যস্ত হয়ে সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দোতলার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

প্রদীপ বাবু—আমি ঠিকই অনুমান করেছি, শোকের ব্যাপার।

মহীতোষ বাবু—আমার সন্দেহ হয়, কান্না যে।

হেম—তবে তো পুলিশে খবর দিতে হয়।

বিনয়—একটু সবুর করুন।

জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়েন নীরজা, সেই সঙ্গে কান্নার সব শব্দও ফুরিয়ে যায়।

মহীতোষ বাবু এইবার নীরজার শুষ্ক চেহারাটার দিকে তাকিয়ে এবং বেশী বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—আপনার তো চুপ করে থাকলে, চলবে না।

নীরজা—বলুন, কী বলবো?

মহীতোষ—এই ভদ্রলোক কি জ্ঞান হারিয়েছেন, না মরেই গিয়েছেন?

নীরজা—দেখুন আপনারা।

জিতেন খাটের কাছে এগিয়ে যায়, আর লোকনাথের

চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—এ মরেই গিয়েছেন।

মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে উঠল—এ নিশ্চয়ই মার্ডার, প্রদীপবাবু! কেউ ভদ্রলোককে খুন করেছে। কিন্তু খুন করবে কে?

প্রদীপবাবু—মহিলাকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন।

নীরজার দিকে হাত তুলে আর কড়া শাসানির একটা ভঙ্গী থরথর ক'রে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করেন মহীতোষ—আপনি বলুন কে খুন করেছে? আপনি?

নীরজা—হাঁ।।

চমকে ওঠে পাড়ার মানুষের সেই উৎসুক ভিড়; প্রদীপ বাবু সেই মুহূর্তে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ঘরে নেমেই চলে যান।

মহীতোষ ছটফট করেন—আপনারা সবাই এবার বলুন তাহলে, অতঃপর কী করা উচিত। পুলিশ ডাকবেন?

স্নেহ হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এই মহিলার কথাই বা চট্ করে বিশ্বাস করে ফেলতে হবে কেন? হতে পারে শোকে মাথা খারাপ হয়েছে, তাই ওরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলছেন।

বিনয়—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জয়ন্তবাবু—সবার আগে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনা উচিত।

স্নেহ—আমি যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকেন, ডাক্তার সুরভদা। ডাকলেই আসবেন, যত রাত হোক না কেন।

স্নেহের পায়ের শব্দ সিঁড়ি ঘরে দুদ্দাম করে নীচে নেমে যায়। মহীতোষ আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—শুনছেন আপনি?

নীরজা—হাঁ।।

মহীতোষ—আমাদের কথার জবাব দিন।

নীরজা—বলুন।

মহীতোষ—আপনার ছেলে কোথায়?

জানি না।

মহীতোষ—আপনার জামাই বা এই রাত্রে হঠাৎ ওভাবে চলন্তবস্ত হয়ে কোথায় চলে গেল?

জয়ন্তবাবু বলেন—থাক মহীদা, আর কেরা করে লাভ নেই। আমি বলি, মহিলার যখন কেউই নেই, তখন সৎকারের ব্যবস্থা আমরাই করি। চাঁদা করে সকলেই কিছু কিছু দিলে···।

বিনয়—তুমি একবার দেখে তো নিতেন, ভদ্রলোকের বিছানার ওপর ওই পাঁজির ভেতরে কারও ঠিকানার কাগজ-টাগজ আছে কিনা।

পঁজিকা হাতে তুলে নিয়েই চিৎকার করে—আছে। দেবকুমার বসু, বসাক বাগান লেন, বরানগর। ওঁ্যা! এরা আবার কী লেখা রয়েছে; যদি খবর পাও তবে অবশ্যই তুমি একবার আসিবে, মেজু। অনুরোধ, তুমি আমাকে লইয়া গিয়া রাখালদাসের চোখের কাছে করমচুকের ছায়াতে রাখিয়া দিবে।

জয়ন্ত বাবু—বাঃ, চমৎকার। এ যে খুব ধার্মিক মানুষের কথা বলে মনে হচ্ছে।

মহীতোষ বলেন—এঁদের আর-একজন কুটুম আছেন, যাঁর গাড়ি এবাড়িতে প্রায়ই আসতো।

জয়ন্তবাবু—কে?

মহীতোষ—যাদবপুরের কমল সেন।

বিনয় হাসে—বলুন, কমল দালাল।

জয়ন্তবাবু—তবে আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি এখনই ফোন করে কমল বাবুকে চলে আসতে বল। আঃ, আমারই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ব শালে চলে যাও। দুটক দেরি করো না।

বিনয়ের পায়ের শব্দ দুড়দাড় করে বাজতে বাজতে আর সিঁড়ি ঘরে নীচে নেমে যায়।

ভোর হয়ে এসেছে। পড়ো বাড়ির আঙিনার নিম গাছে খুব ভাকা কাক আস্তে আস্তে একটা ডাক ছেড়েছে। ডাক্তার এসে সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে অনেকক্ষণ সময়ই চলে গিয়েছেন—হঠাৎ হার্ট ফেল ক'রে মৃত্যু।

পাড়ার মানুষেরা এখন আর উপরতলার ঘরে নয়;

নীচের বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে যেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, তেমনই একটা অদ্ভুত ভালোলাগা বোধ করছেন।

আবার সাড়া জাগে। পরপর দুটো গাড়ি এসে নম্বর বাড়ির সদরদরজার কাছে থামতে গিয়ে মিছামিছি গরবাতে থাকে। হ্যাঁ, স্নেহ ঠিক এসেছে যাদবপুরের সুধাদি ও তাঁর স্বামী কমল সেনও এসেছেন।

স্নেহ বলে—সব খরচ আমার, আমিই ওঁকে ওর দেশ বারাসতে নিয়ে যাব। আপনারা শুধু তাড়াতাড়ি একটা লরি যোগাড় করে দিন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লরি নিয়ে আসে স্নেহ। কে জানে পাড়ার কোন্ দুরন্ত বাড়ির বাগান ভেঙে দশ মিনিটের মধ্যে একঝুড়ি টগর নিয়ে আসে বিনয়। আর, অন্নপূর্ণাও মা পনর মিনিটের মধ্যে চন্দন আর তুলসীপাতা পাঠিয়ে দিলেন।

এইবার লরিতে একটা ধোওয়া সাদা চাদর বিছিয়ে যাও। ওরে অন্নপূর্ণা, মা'কে বল একটা সাদা চাদর এখুনি পাঠিয়ে দিক। চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন মহীতোষ।

তারপর আর পাঁচ মিনিটও দেরি নয়। রায়সাহেবের পঙ্গু লোকনাথের দেহটাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে এসে লরির উপর তুলে দিল, স্নেহ বিনয় আর জিতেন।

—চলুন। লরির ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কথা বলে স্নেহ। অমলবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে আরে, ও কী? থামুন একটু। মহিলাকে আসতে দিন।

স্নেহ—মহিলা আসবেন না। তাঁর আসবার কোন কথাও নেই।

অমলবাবু তার মানে? উনি কি তাহলে এখানেই একা-একা……।

উচ্চকিত শব্দ তুলে, লরিটা যেন অমলবাবুর বিস্ময়ের প্রশ্নটাকে হঠাৎ ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

হাঁক ছাড়েন অমলবাবু—মহীদা, আমি এবার চলি।

স্নেহ—আসিও ভাই।

জিতেন—আসিও।

কিন্তু ও কী, কমল সেনের বহিনা? বারান্দার লাগা ঘরের দরজার কাছে বসে কপাটের গায়ে মাথা হেলিয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখছেন না কিছু; চোখ বন্ধ করেই রয়েছেন।

সুধাদির দিকে তাকিয়ে মহীতোষ চেঁচিয়ে ওঠেন—এই যে, আপনি এসেছেন। আপনি তো এবাড়ির একজন আত্মীয়া মহিলা।

সুধাদি—হ্যাঁ।

মহীতোষ—তবে এতক্ষণ শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কিছু বলছেন না কেন।

সুধাদি—কী বলবো?

মহীতোষ—এই মহিলা কি এখানেই একাবে পড়ে থাকবেন?

কমল সেনের মুখের দিকে তাকাল সুধাদি। কমল সেন তখনই সুধাদির একেবারে কাছে এসে আর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে-আস্তে ফিসফিস করে কথা বলেন—তোমার রান্নার লোকটা, কী যেন নাম?

সুধাদি—গুরুচরণের মা।

কমল সেন—তিন মাস হলো সে তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছে, সে কি আর আসবে?

সুধাদি—না। চিঠি লিখেছে তার শরীর একটুও ভাল নয়। আর কাজ করতে পারবে না।

কমল সেন—তবে?

সুধাদি মাথা নাড়েন—হ্যাঁ।

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে আর বাক্যস্বরে ডাক দেন সুধাদি—চলে আয় নীরু। আমার সঙ্গে চল।

উঠে দাঁড়ালেন নীরজা। সুধাদির পিছু-পিছু হেঁটে গাড়ির ভিতরে উঠলেন ও বসলেন।

যাদবপুরের সুধাদির গাড়িটা ছুটে চলে যেতেই মহীতোষ একটা হাঁপ ছাড়লেন—এর পর আর কী করবার আছে রে জিতেন।

জিতেন—কিছু না। শুধু ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটাকে বাড়িওয়ালা চৌধুরীবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিন।

—শেষ—

চিরদিন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

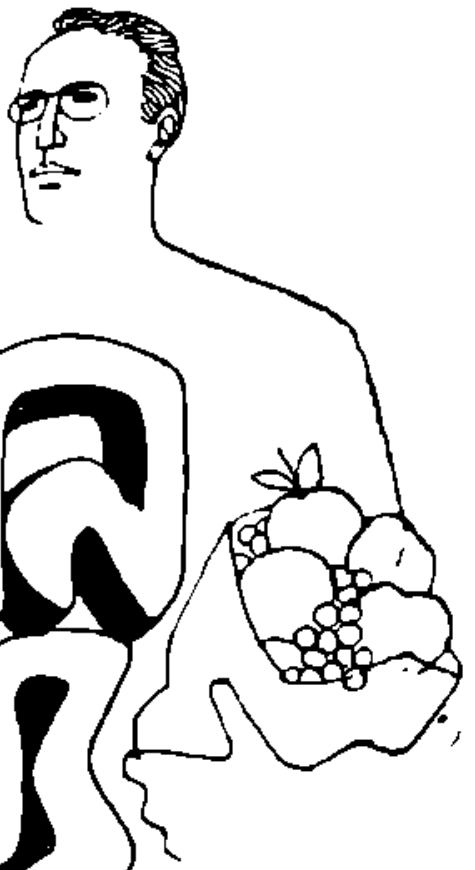

হাসপাতালের একটু দূরে গাড়িখানা পার্ক করে অসুস্থ বন্ধুকে দেখবার জন্যে ভিতরে ঢুকলেন নীরদ-বরণ।

আগে পর্দার উপর এই চিত্রাভিনেতাকে অনেকেই দেখত। ষ্টেজেও দেখা যেত তাঁকে। এখন ইচ্ছা করেই নেপথ্যে সরে গেছেন। চিত্র-পরিচালকের কাজই বেশি করেন। অভিনয় প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। তাই পথে নামলে আগে যেমন তাঁকে দেখবার জন্যে হাজার হাজার চোখ উৎসুক হয়ে থাকত এখন, আর তা হয়না। কথাটা রাস্তায় নামলে প্রায়ই মনে পড়ে। এখনো পড়ল। কতলোক ঢুকছে বেরুচ্ছে। কেউ তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ায় না। দূরে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে না। তিনি যেন অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাতকুলশীল কোন বহিরাগত।

ভিজিটিং-এর সময় পার হয়ে গেছে। গেটের সামনে ভিড়। ফলওয়ালারা ঘুনিকে দাবি নিয়ে বসেছে। কেউ কেউ ফল কিনছে। নীরদবরণও বন্ধুর জন্যে ফল কিনলেন। আপেল আর বেদানার বেশ একটা বড় ঠোঙা হাতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল শিবু তো কিছু খেতে পারে না।' কিন্তু খেতে না পারলেও নিতে হয়। খালিহাতে যাওয়াটা কেমন দেখায়। তা ছাড়া ওর আত্মীয় স্বজনই বা কি মনে করবে।

তিনতলায় শিবতোষের বেড। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আজকাল একটু কষ্ট হয়। কেমন যেন হাঁপ ধরে। হার্টফেল স্পেশালিস্ট সাবধান হতেও বলেছেন। কিন্তু আত্মীয় বন্ধুর কাছে সে কথা জাহির করেন না নীরদবরণ। বয়স হয়েছে একথা লোককে জানতে দিয়ে লাভ কী। জরা মৃত্যুর ভয় মানুষের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে তিনি চেষ্টা করেন। রোজ শেভ করেন, জামা কাপড় রোজ বদলান। গাড়ি থাকতেও হাঁটা চলা, বাস ট্রামে ওঠা নামার অভ্যাস রাখেন। যৌবন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না কিন্তু শরীরকে সুস্থ, দৃঢ় আর কর্মঠ রাখা চাই।

তিনতলায় উঠে সিঁড়ির সামনে বড় একটি হল ঘরে ঢুকলেন নীরদবরণ। সারি সারি রোগী আর তাদের আত্মীয় স্বজনের ভিড়। এ সব জায়গায় বড় একটা আসেন না তিনি। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেই বা আদালতে যায় কেই বা হাসপাতালে আসে। এখানে এলে নীরদবরণ অস্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। কোন কোন ওষুধের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না। রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া, রক্ত দেওয়ার সময় যে সব "ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া" চলে যে সব বিদঘুটে যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয় সেগুলি দৃষ্টি সুখকর নয়। এসব ব্যাপারে নীরদবরণের এক ধরনের এলার্জি আছে। তাঁর জীবনে রোগ ব্যাধি হাসপাতাল বড় একটা নেই। জীবনে এদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। আপদকালে এসব যেন বড় বেশি চোখে পড়ে। এরই নাম বয়স। মনে মনে হাসলেন নীরদবরণ।

সারি সারি রোগী। কে কোন রোগে ভুগছে জানবার জন্যে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করলেন না। তিনি একটি মাত্র রোগীকেই দেখতে এসেছেন। তার সঙ্গেই দেখা করতে চান।

কিন্তু যে বেডে শিবতোষ আছেন বলে নীরদবরণ জানেন সেই বেডে অপরিচিত এক রোগীকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ব্যাপার কি। কিছু একটা হয়ে গেল নাকি। এর আগেও দুদিন এসে এই সতের নম্বরে শিবুকে তিনি দেখে গেছেন। বলা যায়না। ক্যানসারের রোগী। যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু হতে পারে। ডাক্তাররাও সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু তেমন কিছু হলে তিনি কি একটা খবর পেতেন না। শিবুর ছেলে মেয়েরা তো তাঁর সঙ্গে তো প্রায় নিত্য যোগাযোগ রাখছে। নীরদবরণকে কি এ খবরটা তারা জানাত না?

একটি নার্স চলে যাচ্ছিল। নীরদবরণ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিসটার সতের নম্বর বেডে আগে যে পেসেন্ট ছিলেন তিনি কোথায়?'

নীরদবরণের গলায় একটু শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল। নার্সটি থেমে দাঁড়াল। তারপর মৃদু হেসে নীরদবরণের দিকে চেয়ে বলল, 'শিবতোষ চক্রবর্তীর কথা বলছেন? তাঁকে যে দেওয়ার জন্যে এই সাতার নম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই যে ওদিকে।'

নার্সটি খানিক দূরে সামনের দিকের আর একটি সারি দেখিয়ে দিল।

নীরদবরণ স্বাস্থ্যবতী তরুণী নার্সটিকে লক্ষ্য করলেন। বেশ চোখা নাক চোখ। মুখের ডৌলটুকু বেশ মিষ্টি। ইচ্ছা করলে ওকে সিনেমায় নামানো যায়। নায়িকা না হলেও উপনায়িকার ভূমিকায় বেমানান হয় না। অল্পবয়সী মেয়েদের সাদা পোশাক সাধারণত পছন্দ করেন না নীরদবরণ। কিন্তু নার্সদের মানায়। ওদের ওই আঁটসাঁট সাদা পোশাক, মাথায় সাদা চূড়া বেশ ভাল লাগে দেখতে।

নীরদবরণ দেখে খুশি হলেন। নার্সটি সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়নি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দেখছে। কে জানে তাঁকে চিনতে পেরেছে কিনা। যদি নাও পেরে থাকে নিশ্চয়ই দর্শনীয় তাঁর মধ্যে কিছু পেয়েছে। পঞ্চাশ পেরিয়েও নীরদবরণের চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, গায়ের গৌরবর্ণ অমুজ্জ্বল হয়নি। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে এখনও মেয়েরা তাঁর দিকে না তাকিয়ে পারে না। নীরদবরণ তা জানেন।

'এই যে ভাই আমি এখানে।' শিবতোষ তাঁকে

হাত বাড়িয়ে ডাকলেন। আমাকে এখানে সরিয়ে দিয়েছে।'

নীরদবরণ একটু চকিত হলেন, লজ্জিতও হলেন। শিবতোষ না ডাকলে তিনি হয়তো আরো দু এক মিনিট মার্বেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাকে দীর্ঘ করিয়ে রাখতেন। আরো কিছুক্ষণ ভুলে থাকতেন এখানে কি জন্যে এসেছেন।

নীরদবরণ এগিয়ে এসে রুগ্ন বন্ধুর সামনে দাঁড়ালেন। শিবতোষ তাঁরই সমবয়সী। সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। কিন্তু শিবতোষকে আরো বেশি বয়স্ক বলে মনে হয়। মাথার চুলে পাক ধরেছে। শরীর জীর্ণ হয়েছে। তারপর এই করাল ব্যাধি।

বন্ধুকে দেখে শিবতোষ হাসলেন, 'এসেছ বসো। ওই টুলটা টেনে নিয়ে বসো।'

নীরদবরণ বন্ধুর নির্দেশ মানলেন। খাটের তলা থেকে টুলটা টেনে আনলেন। ফলের ঠোঙাটা লকারের মাথায় নামিয়ে রাখলেন।

শিবতোষ ফলের ঠোঙাটা লক্ষ্য করে বললেন, 'কিছু খেতে পারিনে। কেন অনর্থক খরচ করছ?'

একটু রহস্য করলেন নীরদবরণ। তারপর বন্ধুর হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, 'কেমন আছ শিবু?'

সঙ্গে সঙ্গে শিবতোষের দুটি চোখ জলে ভরে উঠল। গলা ধরে গেল।

তিনি বললেন, 'আর থাকা, এখন তো তাই কবে আছি কবে নেই। ঘুচে যাবার অপেক্ষায় বসে আছি।'

এইজন্যেই আসতে চান না নীরদবরণ। শিবতোষ বড় কান্নাকাটি করেন। রোগেশোকে মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা নীরদবরণ খুঁজে পান না। তিনি তর্ক করতে পারেন, বক্তৃতা করতে পারেন, মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে ছুড়ি নেই। কিন্তু মানুষের রোগেশোকে মৃত্যুতে গতানুগতিক কয়েকটি সান্ত্বনার কথাও তাঁর মুখ থেকে বেরোতে চায় না। তাঁর মনে হয় তিনি যা বলবেন তাই কৃত্রিম শোনাবে না হয় তুচ্ছ নিরর্থক।

নীরদবরণ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অত ভেঙে পড়ছ কেন? অমন হতাশ হবার তো কিছু নেই।' সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল কয়েকটি শেখানো বুলি তিনি আউড়ে গেলেন মাত্র। সত্যিই কি আর শিবতোষের জীবনের আশা কেউ রাখে? শিবতোষ বললেন, 'তাই আমাকে মিথ্যে স্তোক দিতে হবে না। আমি সব জানি। সব টের পাই। মরতে একদিন সবাইকেই হবে। আমি না হয় দুদিন আগেই যাচ্ছি। দুঃখ সেজন্যে নয়। দুঃখ ছেলেমেয়েগুলির কোন গতি করে যেতে পারলাম না। মেয়ে দুটির বিয়ের বয়স হয়েছে। একটির সম্বন্ধ ঠিক করেও রেখেছি। কিন্তু আমার একটা কিছু হয়ে গেলে সব আবার বেঠিক হয়ে যাবে। ছেলে-গুলি এখনো স্কুল কলেজে পড়ে। স্ত্রী সামান্য লেখাপড়া জানে। ওই বিদ্যায় সে কোন চাকরিই বা করবে? সারা জীবন স্কুল মাষ্টারি করেছি, টিউশনি করেছি। একটি পয়সাও কোথাও নেই। বরং ঋণের বোঝা ভারি করে চললাম।'

নীরদবরণ বললেন, 'ও সব কথা ভেব না শিব।'

'তবে কী ভাবব?'

এই মৃত্যু পথ যাত্রীকে ঈশ্বরের কথা ভাবতে বলবেন এমন জোর কই নীরদবরণের? তিনি নিজে কি ওসব বিশ্বাস করেন? তাঁর নিজের কি কোন অধ্যাত্ম চিন্তা আছে? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি তাঁরও একমাত্র জগৎ নয়? বন্ধুর হাতে একটু চাপ দিয়ে নীরদবরণ বললেন, 'ওসব কথা ভেবনা। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। আমরা তো আছি।'

নৈরাশ্য পীড়িত রোগীর মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। শিবতোষ বললেন, 'আমি জানি। তোমরা নও তুমি আছ। আশে পাশে তোমার মত আমি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে।'

নীরদবরণ অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কী যে বলো।'

শিবতোষ বললেন, 'আমি জানি তুমি ওদের দেখবে। মুখ ফুটে বললেও দেখবে না বললেও দেখবে তা আমি জানি।'

আটটি ছেলেমেয়ে শিবতোষের। স্ত্রী আছেন। বৃদ্ধা বিধবা মা আছেন। এত বড় একটি পরিবারের ভার নেওয়ার ক্ষমতা নীরদবরণের নেই। কিন্তু পারব না পারব না বলে প্রতিবাদ জানানোও বৃথা। নিষ্ঠুরতা। নীরদবরণ তাই চুপ করে রইলেন।

শিবতোষ বললেন, 'আমি তোমার কাছ থেকে সেই কথা আদায়ের জন্যে এখানে তোমাকে ডেকে আনিনি। ছেলেমেয়েদের আর ওদের মাকে দেরি করে আসতে বলেছি অন্য কারণে। নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে দুটি কথা বলব।'

নীরদবরণ একটু হাসলেন। 'শুধু কথা বলার জন্যে?'

শিবতোষ বললেন, 'হ্যাঁ ভাই। তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ ভাই না? ভেবে দেখ আমার এই অসুখ হবার পর এই মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যে তুমি যতবার আমার বাড়িতে এসেছ, হাসপাতালে এসেছ গত পঁচিশ বছরের মধ্যেও ততবার আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ বছরের পর বছর আমরা একই শহরে কাটিয়েছি, কখনো কখনো একই পাড়ায় একই রাস্তায়। তবু দেখা সাক্ষাৎ হত না। যে ভাবে দেখা হত তাকে দেখা বলে না।'

নীরদবরণ বললেন, 'শিবতোষ জীবনে সব দিন কি সমান যায়! সব বয়সে কি বন্ধুত্বের একই চেহারা থাকে! কাজকর্ম থাকে দায়িত্ব—'

শিবতোষ বললেন, 'আমি জানি নীরদ আমি জানি। কলেজে পড়ার সময় আমরা যে ভাবে আড্ডা দিতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতাম। সকাল নেই দুপুর নেই সন্ধ্যা নেই রাত্তির নেই, শুধু আমাদের অফুরন্ত কথা আছে। শুধু কথা বলেই আনন্দ। শুধু কাছাকাছি বসে থাকাতেই আনন্দ। সেই বন্ধুত্ব বেশি বয়সেও আশা করব আমি অত বড় নির্বোধ নই নীরদ। যদিও বুদ্ধি বড়াই আমি কোনদিন করিনি।'

নীরদবরণ চুপ করে রইলেন। এসব প্রশ্নের কি কোন জবাব আছে? মানুষের প্রীতিপ্রণয় বারবার কেন ক্ষেত্রান্তরিত হয়, যাকে এক সময় দেখলে থাকা যেতনা, সে আধ ঘণ্টার বেশি সামনে বসে থাকলে কেন অসহ্য লাগে তার জবাব দেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া কেউ কেউ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবেগের পাত্রটিকে কানায় কানায় ভরে রাখতে পারে কেউ বা তা পারে না। প্রৌঢ় বয়সে জড়তা নীরসতা জীবনকে আক্রমণ করে। মরুভূমির মতই তার বিস্তার। নীরদবরণের মনে হল যদিও রস রস নিয়েই তাঁর কারবার, স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরা সংসারে তাঁরও বাস তবু এই জড়তার আক্রমণ থেকে তিনিও রেহাই পান নি। কত রকমের মৃত্যুই আছে সংসারে। এই আবেগের মৃত্যুও আর এক রকমের মৃত্যু।

শিবতোষ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি ভারি অকৃতজ্ঞ ভাই না নীরদ?'

নীরদবরণ বললেন, 'অকৃতজ্ঞ কেন হবে?'

শিবতোষ বললেন, 'তুমি আমার জন্যে কত করেছ। আজকাল কি ভাই ভাইয়ের জন্যে, বন্ধু বন্ধুর জন্যে এতখানি করে? সাধ থাকলেও করে না। তুমি আমার ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছ, ছেলেমেয়েরা যখন যা চাইছে দিচ্ছ। এত কি কেউ দেয়? এত কি কেউ পায়! আমার আগে বর হল ভাই। মরবার আগে তোমাকে ফের পেয়ে গেলাম। ভাই জীবনে আমি কিছু করতে পারিনি। তোমার মত খ্যাতি না, প্রতিপত্তি না, বাড়ি না, গাড়ি না কিছু না। আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছিলাম ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমি একটি অকর্মক ক্রিয়া, আমি একটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

নীরদবরণ মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'কী যে বলো।' শিবতোষ বললেন, 'আমি ভাই জীবন ভর শুধু বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম ভালোবাসা চেয়েছিলাম। কিছুতেই বুঝতে চাইনি সেই বন্ধুত্ব সনির্ভর তাও নয়। বিত্ত প্রতিপত্তির ওপর ভর করে চলে। তাতো আমার হয়নি ভাই। তাই তাঁদের মাঝে আমার অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু তুমি সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলে।

চির বিদায় নেওয়ার আগে তোমার বুকে আবার স্থান পেয়ে গেলাম ভাই।'

সেই নার্সটি এসে দাঁড়াল। শিবতোষের টেম্পারেচার মেপে। টাঙানো চার্টে লিখে রাখবে। নীরদবরণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন একটা সর্ট নেওয়ার দৃশ্য। নীরদবরণ বললেন, 'জ্বর আছে?'

নার্সটি হাসল। 'না জ্বর নেই। ভালোই আছেন উনি।'

নার্সটি চলে গেলে শিবতোষ বললেন, 'সব মিথ্যে ভাই, সব মিথ্যে। অবোধ শিশুকে বোঝানো?

নীরদবরণ ভাবলেন শিবতোষের কথাগুলি বড় নাট্যরসাস্থিত। তাঁর এই বন্ধুটি কোনদিন অভিনয় অভিনয় করেছেন বলে নীরদবরণের জানা নেই। থিয়েটার সিনেমা দেখার সখই কোথায় ছিল। কমপ্লিমেন্টারি কার্ড দু একবার পাঠিয়ে দেখেছেন শিবতোষের দেখা মেলেনি। কিন্তু জীবনের এই পঞ্চাশোর্ধ্বের শেষ দৃশ্যে ও যেন গোটা নাটকটা ফের একসঙ্গে একা অভিনয় করে চলেছে।

বন্ধুকে ফের বুকে টেনে নিয়েছেন নীরদবরণ। অতবড় বুক কি আর আছে? কোথায় সেই হৃদয়ের উত্তাপ? এখন আছে শুধু কর্তব্য বোধ। সেই বোধও অবিমিশ্র নয়। মাঝে মাঝে বিরাগবিরসতাশ্লিষ্ট। এসব কথা মরণোন্মুখ বন্ধুর কাছে গোপন রাখতে হয়। নিজের মৃত্যুর কথা মৃত্যু ভয়ের কথা সেই অতল অন্ধকারের কথা যার দীপ এক্ষুনি নিভে যাবে তাকে জানিয়ে লাভ কী।

মৃত্যু! মৃত্যু তো একরকমের নয়। যারা ভীরু কাপুরুষ তারা শুধু অনেকবার মরে না, অনেক প্রকারে মরে। মুহূর্তে মুহূর্তে সেই মৃত্যুর ত্রাস কি অনুভব করেন না নীরদবরণ? বাইরে থেকে তাঁকে সুস্থ সবল স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ক্ষয় আর পচন শুরু হয়ে গেছে। সেখানে মৈরাশ্যের শেষ নেই। সেখানে সমগ্র সত্য বলে কিছু নেই। সব চূর্ণিত বিচূর্ণিত। বিস্ত প্রতিপত্তি। তা এত ক্ষণিক, এত অসারী। এই নশ্বর জগতে তার মত অতি নশ্বর বস্তু আর কিছু নেই। একটার-পর একটা ছবি চুপ করেছে নীরদবরণের। গত দু বছরের মধ্যে কোন নতুন কনট্রাক্ট পাননি। তিনি যে একসময় দক্ষ অভিনেতা ছিলেন তা পর্যন্ত লোকে ভুলতে বসেছে। অভিমান অভিযোগ অর্থহীন। নিরালায় একান্তে দাঁড়িয়ে এই মৃত্যু যন্ত্রণাকে হাসিমুখে সহ্য করে যাও। ভিতরে কাপুরুষটা মুখ চুণ করে ভয়ে মরুক, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাক, কিন্তু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তোমার বীরের মৃত্যুর অভিনয় করে যেতে হবে। এই মিথ্যাচারের মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই। আছে প্রত্যয়-হীনতা, নিজের ক্ষমতার ওপর সংশয়, ক্ষয় আর অপচয়ের অনুভূতির নাম মৃত্যু।

'কী ভাবছ নীরদ?'

বন্ধুর কথায় চমকে উঠলেন নীরদবরণ। বললেন, 'কী আবার ভাবব?'

শিবতোষ বললেন, 'তুমি ভাবছিলে আর আমি চেয়ে দেখছিলাম। তুমি যখন নিজের মনে ভাবো তখনো তোমাকে সুন্দর দেখায়। যখন যাকে কথা বলো তখনো। এখনো মেয়েরা বোধ হয় তোমার প্রেমে পড়ে। পড়বে তার আর বিচিত্র কী। ওরা তো শুধু যৌবনকে ভালবাসে না। ওরা খ্যাতিকে ভালোবাসে, ক্ষমতাকে ভালবাসে। সেই ক্ষমতা তোমার আছে।'

আছে! এই ইলিউসন নীরদবরণ ভাঙতে চান না। শুধু ভেঙে ভেঙে যায় মুছে যায় বারে। নীরদবরণ স্মিতমুখে বললেন, 'কী যে বলো।'

এর চেয়ে বেশি প্রতিবাদ করবার নেই। বন্ধু যদি বন্ধুর কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হতে চায় কিছুক্ষণ থাকনা সেই মোহাবরণ। নীরদবরণ নিজে জানে এই আকর্ষণ বিকর্ষণের নাম প্রেম নয়। এ দীর্ঘকালের এক দৈহিক অভ্যাস মাত্র। প্রেমের মধ্যে যে ত্যাগ যে মধুর আত্ম-বিস্মরণ আত্মবিলোপ আর একাত্মতার সেই নিবিড় অনুভূতি এসব কোথায়? এখন শুধু সতর্ক পদক্ষেপ। জল মেপে মেপে নামো। অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন আর নেই। এখন শুধু দুই কূল রক্ষা করার চতুর বিচক্ষণতা।

এ প্রেমকে সৃষ্টির কাজে লাগানো বড় কঠিন, বড় কঠিন।

'নীরদ তোমার কমলার কথা মনে আছে?'

বন্ধুর কথায় ক্ষেত্র একটু অবাক হয় নীরদবরণ। তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'কোন কমলা?'

শিবতোষ একটু হেসে বললেন, 'তোমার জীবনে হয়তো অনেক কমলা এসেছে। আমিতো একটি কমলাকেই চিনতাম। সেই যে কলেজে আলাপ হয়েছিল। বিমল পুরোকায়স্থের বোন কমলা পুরোকায়স্থ।"

নীরদবরণের মুখখানা এবার একটু গম্ভীর হল।

'এখনো তার কথা তোমার মনে আছে?'

শিবতোষ লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ছিলনা। পড়ল। যাবার বেলায় পিছু ফিরে তাকাতে তাকাতে কতজনের মুখই না দেখলাম। এখন তো আর সামনে কিছু নেই ভাই। সব পিছনে। অনেকের মুখই মনে পড়ছিল। সেই সঙ্গে তার মুখও। মুখখানা ভারি সুন্দর ছিল। মুখের কথাগুলি কী মিষ্টি। সে আমাকে প্রথম ভালবাসার কথা জানিয়েছিল। ভেবে দেখ আমার মত এমন মানুষকেও অমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে ভালোবাসতে পারে। তারপর তুমি আমাদের মাঝখানে এলে আর আমি এক পাশে সরে গেলাম। পথের প্রান্তে পড়ে রইলাম। তোমার কাছে গোপন করব না। সেই ধাক্কা সামলাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।'

নীরদবরণ একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর খুব আস্তে বললেন, 'শিবু তুমিকি এখনো সেই কথা মনে করে রেখেছ? সেই আমি আর এই আমি কি এক?'

শিবতোষ ক্ষেত্র আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—'নিশ্চয়ই নয় ভাই, নিশ্চয়ই নয়। আমি অধম অকৃতজ্ঞ। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ। তোমার উদারতার তুলনা নেই।- তুমি মহৎ।'

শিবতোষ বন্ধুর হাত চেপে ধরলেন। তাঁর দুই চোখ ক্ষেত্র জলে ভরে গেল।

আশ্চর্য এতক্ষণ নীরদবরণের চোখও সজল হয়ে উঠেছে।

নীরদবরণ ভাবলেন মহৎ তিনি নন। পৃথিবীতে কজন মানুষই বা মহৎ হতে পারে। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে প্রত্যেকেরই মহৎ হবার সাধ হয়। কোন কোন মুহূর্তে প্রত্যেকেই অনুভব করে সে নিজেকে যতটুকু বলে জানে তার চেয়ে আরো একটিটে বড়।

জল মুছবার জন্যে হাত সরিয়ে নিলেন নীরদবরণ। শিবতোষের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা এবার এসে পড়েছে।

আহুতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোমনাথ চাটুজ্জের কাছে আজও একে একে পাঁচ ছ'দফা লোক এলো। প্রত্যেকের কাঁধের ঝোলায় বিল পঁচিশখানা করে বই। বইগুলো তারা সোমনাথবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে বখশিস নিয়ে চলে গেল। সোমনাথবাবুর থমথমে মুখ। বাড়ির চাকর সে বইগুলো তাঁর নির্দেশে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে মানে রান্নাঘরের সামনে ঠিক করে রাখল সেগুলো।

তিনদিন ধরে বাড়িতে লোকে যত তাজ্জবকাণ্ড দেখছে কর্তার। বাড়ির লোক বলতে এখন ঠাকুর-চাকর সোমনাথবাবুর গৃহিণী, আর ছোট মেয়ে সুদেষ্ণা। আরো একটি জীব আছে, প্রভুর কাণ্ড দেখে সেও কম অবাক হবে না। সে কোন লোক নয়, সোমনাথবাবুর অ্যালসেসিয়ান 'উল্ফ'। এই জীবটিও হতভম্বিয়ে গেছে।

সব থেকে বেশি হতভম্ব সোমনাথবাবুর স্ত্রী শশীরানী। ডাক্তার ডাকার কথা কদিনই ভাবছেন। একটা ফোন করলেই ডাক্তার এসে পড়বে কিন্তু শশীরানী ভরসা করে তাও ডাকতে পারছেন না। ডাক্তার এলে এই মানুষ আবার কোন্ মূর্তি ধরবে কে জানে।

সোমনাথবাবু হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কদিনের এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না মানুষটা হাসতে জানে।

সোমনাথ চাটুজ্জে তেমনি গম্ভীর মুখে উঠলেন। চাকর যেখানে বইয়ের ঠিকি করেছে পায়ে পায়ে সেখানে

এলেন। বইগুলো দেখলেন একটু চেয়ে। ঝকঝকে বই, নতুনের গন্ধ লেগে আছে।

—কটা এলো?

চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, আজও একশ ত্রিশ—

পুরনো চৌকস চাকর। তার হিসেবে বিশ্বাস করা যায়।

বললেন, বেশ, আরো খান বিশ পঁচিশ আসবে।

…প্রথম দিন আনা হয়েছিল পঁচাত্তরখানা। দ্বিতীয় দিনে একশ দশ। তৃতীয় দিনে একশ পঁচিশ। আজ আসবে কম করে একশ পঞ্চাশ। মনে মনে একটু হিসেব করে নিলেন সোমনাথবাবু। মোট দাঁড়াল চারশ পঞ্চাশ।…আরো দেড়শ কিনলে এ-যাত্রার কাজ শেষ।

ভিন্ন ভিন্ন বই নয়। একই বইয়ের কপি সব। উপন্যাস। নাম 'অনুরাগ চক্র।' এই বইয়ের টীকির সবগুলোই 'অনুরাগ চক্র'। আজ চারদিন ধরে থাকে-থাকে যেগে যেগে কেবল 'অনুরাগ চক্র'ই আসছে সোমনাথবাবুর বাড়িতে। আরো দেড়শ এই বই-ই আসবে।

উপন্যাসখানার দাম আট টাকা। মোট ছ'শ বই যদি কিনতে পারেন সোমনাথবাবু তাহলে দাম দাঁড়াল চার হাজার আটশ টাকা। বই যাদের দিয়ে কেনানো হচ্ছে তাদের মারফত কমিশন পাওয়া যাচ্ছে পঁচিশ পারসেন্ট। তার মানে বারো শ' টাকা বাদ। তাহলে খরচা দাঁড়াল তিন হাজার ছশো। এ ছাড়া ওই লোক-গুলোকে—যারা বই কিনে আনছে—তাদের বখশিস দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে দশটাকা করে।

যে দেড়শ বই আগে আসবে তার দাম বাদ বাকি সব টাকা সোমনাথবাবু দিয়েই দিয়েছেন।

এ বই, অর্থাৎ 'অনুরাগ চক্র'র লেখক সোমনাথ চাটুজ্জে নিজেই।

হ্যাঁ, এই চারদিন ধরে বিভিন্ন লোক মারফত নিজের বই-ই কিনে চলেছেন তিনি। কালকের মধ্যে নতুন চার পাঁচজনকে দোকানে পাঠিয়ে আরো দেড়শ অন্তত কিনবেন।

বাইরে পরিচিত গলার হাঁক শোনা গেল। কার গলা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিব্রত এবং বিরক্ত। যাঁর পদার্পণ তিনি যে আসবেনই জানা কথা। ওই ভদ্রলোকের হন্তদন্ত হয়ে আসার মত একটা অস্ত্র সোমনাথ চাটুজ্জেই নিক্ষেপ করছেন। তবু বিব্রত, তবু বিরক্ত।

বাইরের ঘরে চেনা-গলার হাঁক শুনে আড়াল থেকে মনে মনে আশান্বিত কেউ যদি হয়ে থাকেন, তিনি শশীরানী। অন্যদিন হলে খুশি মুখে তিনিই বেরিয়ে আসতেন। আজ পারলেন না। আজ সঙ্কোচ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা ঘরের মানুষের এই মতির কিছু হদিস মিলতে পারে এবার।

গাড়ি হাঁকড়ে যিনি এসে হাজির হয়েছেন তাঁর নাম বিজয় ঘোষ। বাংলা দেশের এক নামজাদা প্রকাশক তাঁর অনুগ্রহ সরস্বতীর দপ্তরে প্রবেশের ছাড়পত্রের সামিল। অনেক মামারি লেখককেও প্রচারের মাধ্যমে প্রথম সারিতে এনে হাজির করেছেন তিনি, এ-দেশের লেখককুল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমনাথ চাটুজ্জের সম্পর্কে আজ অন্তত ঠিক একথা খাটে না। তিনি মামারি নন। একেবারে সামনের সারির একজন। বিজয় ঘোষের সঙ্গে তাঁর বহু দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব এখন অপর লেখক এবং প্রকাশকের চোখ টাটানোর মতো ফলপ্রসূ—এই শুধু বলা যেতে পারে।

সোমনাথ চাটুজ্জে বাইরের ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘোষ গলার কাপড়ের খুঁটটো জড়িয়ে নিয়ে দু'হাত জোড় করল।—কি অপরাধ বলো।

মিনমিন করে সোমনাথবাবু জবাব দিলেন, অপরাধ আবার কি, বোসো…।

গম্ভীর মুখে আসন নিয়ে বিজয় ঘোষ পকেট থেকে একটা রেজেস্ট্রি খাম বার করলেন।—আমি কি বিশ্বাস করব এটা তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ?

সোমনাথবাবু তেমনি মিনমিন করেই জবাব দিলেন, হ্যাঁ ভাই…পাঠাতে হ'ল। বিজয় ঘোষের গোল মুখের ওপর স্থির হল একটু।

—তোমাকে কে কি বলেছে?

—কেউ কিছু বলেনি।

—আমার থেকে কেউ বেশি টাকার ফেলেছে?

—না।

—আমি বাইশ শ' ছেপে দু'চার হাজার ছেপেছি এ-রকম রিপোর্ট কেউ দিয়েছে তোমাকে?

—না সেদিন যখন তুমি আমাকে টেলিফোন করেছিলে, আমি জানিয়েছিলাম সেভনহাজারের বেশি কপি বিক্রি হয়ে গেছে। হঠাৎ এই চারদিন ধরে বাকি কপিগুলো মুড়ি মুড়কির মত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে—আর সেভেন বইও নেই। তবু আমি ঠিকমত তোমার বই বিক্রি করতে পারছি না—এ-কথা কেউ বলেছে?

—না, সে-সব কিছুই না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বিজয় ঘোষ বলে উঠলেন, তাহলে আমার ওপর এই চিঠির বজ্রাঘাত কেন খুলে বলবে তো?…এই কদিনের বিক্রি দেখে রাতারাতি পরের এডিশন ছাপার জন্য আমি একসঙ্গে চারটে প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি—তার মধ্যে তোমার এই হুকুম জারি, এই বই আমি ছাপতে পারব না।

—ইয়ে, পরে সব তোমাকে বলব'খন।

—এখনো পরে বলবে। তোমার এই চিঠির হুকুমই পাকা তাহলে?

—হুকুম আবার কি, বিশেষ দরকার হয়েছে তাই।

—কিসের দরকার? টাকার?

—না।

—তাহলে আমাকে ছাড়ার?

…তা আমাকে ছেড়ে এ বই কাকে দিচ্ছ এখন, কে নিচ্ছে?

সোমনাথবাবু নিরুত্তর। একটু চুপ করে থেকে বিজয় ঘোষ সখেদে বললেন, তুমি বই তুলে নিচ্ছ সে জন্যে দুঃখ নেই; কি হয়েছে বলছ না বলেই দুঃখ। তার মানে এমন অপরাধ করেছি যার কোন ক্ষমা পর্যন্ত নেই কি বলো?

ক্ষমার কথা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমনাথ চাটুজ্জে।

কেন বারবার এসব কথা বলো, অপরাধ কারো যদি হয়ে থাকে এ দুনিয়ায়, আমারই হয়েছে বুঝলে? বলতে বলতে আরো উত্তেজিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জানতে চাও এ বই কাকে দিচ্ছি? কে নিচ্ছে জানতে চাও?

হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ধরে টানলেন, এসো, দেখবে এসো—

বিমূঢ় বিজয় ঘোষকে টেনে নিয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্না ঘরে ঢুকলেন তিনি। সন্ত্রাসবীর আড়াল খুঁজে যেতে তিনিও হটস্থ।

রান্নাঘরে চাকর সেই বড় উনুনটা ধরিয়েছে। সেই বইয়ের পাঁজা এক একটা করে নিয়ে সজোরে টেনে ছিঁড়ে উনুনে দিচ্ছে। এক—একটা করে বই গনগনে উনুনে পুড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিষম হচকচিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন বিজয় ঘোষ। নিজেই বাধা পেলেন। সোমনাথবাবু হাত ধরে থামালেন তাকে। বিরস কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন, আমার হুকুমেই একাজ করেছে। …বই কাকে দিচ্ছি কে নিচ্ছে দেখলে? চারদিন ধরে তোমার এত বই বিক্রি হচ্ছে কেন বুঝতে পারলে?

বিজয় ঘোষের দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। এমন কাণ্ড তিনি এতকালের ব্যবসায়ী জীবনে আর দেখেননি। এই ধ্বংস যজ্ঞ আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তার ওপর বিষম ঘাবড়ে গেছেন তিনি। লেখকের মাথা হঠাৎ সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেছে তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। এখন বই পোড়াতে পোড়াতে যদি বইয়ের প্রকাশকের মাথাও এমনি করে উনুনে গোঁজার রোখ চাপে—তাহলে? মনে হওয়া মাত্র তখনকার মত

উর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করলেন তিনি। এরপর একেবারে ডাক্তার—টাক্তার নিয়ে তবে বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।

মাথা যে সাঙ্ঘাতিক রকমের খারাপ হয়েছে শশীরানীরও তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সুখের সংসারে কেন এরকম বিপর্যয় ঘটে গেল, তা তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারেন। কিন্তু অনেকটাই দুর্বোধ্য এখনো।

শশীরানী প্রথমে ভেবেছিলেন ওই হতভাগা ছেলে আর বড় মেয়েটা মুখে এ ভাবে চুন-কালি দিল বলেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। মানীলোক, চারদিকে কত নামডাক—মাথা খারাপই হবার কথা। দুঃখে ক্ষোভে আজ কদিন ধরে তাঁর নিজেরই তো বুকের ভেতরটা হু হু করে জ্বলছে!

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর জন্যে ছোটও কম দায়ী নয়। বাপে আর ওই ছোট মেয়েতে সেদিন কি কাণ্ডই ঘটে গেল। দেখে শুনে ভয়ে ত্রাসে অস্থির তিনি। অথচ বলতে গেলে ওই ছোট মেয়েই বাপের একেবারে চোখের মণি। তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাপের এত আদর কেউ পায়নি। সুখের সংসারই তো ছিল এক-সময়। একটা মানুষ কলম চালিয়ে এতবড় বাড়ি করবে গাড়ি করবে, এত সম্মান প্রতিপত্তি হবে, একি যত্নেও কখনো ভেবে ছিলেন তিনি? ওই ছোট মেয়ে যেদিন কোলে এলো সেদিনই এক মস্ত সুখবর। কোন সিনেমা কোম্পানী স্বামীর একখানা গল্প কিনেছে, বেশ কয়েক হজার টাকা ঘরে এসেছে।

সেই থেকে বাপের কাছে ছোট মেয়ের কদর। তারপর থেকে সত্যিই দিনে দিনে ভাগ্য ফিরেছে আর মেয়াকী মেয়ের আদর বেড়েছে। অন্য ভাই বোন দুটো এ-জন্যে যে ওকে হিংসেই করে মনে মনে, শশীরানী সেটা বেশ বুঝতে পারেন।

আর, ওই ছোট মেয়েও ছিল বাপ-অন্ত প্রাণ। ওর বাপের সম্পর্কে কেউ কখনো একটু বিরূপ কিছু বলেছে কি, রক্ষে নেই। লিখতে থাকলে সামনে ঘুর ঘুর করেছে, কতক্ষণে বাবা লেখা ছেড়ে উঠবে আর ও তখন লেখা গোছগাছ করে রাখার নামে ছাপার আগেই একদফা পড়ে নেবে। সেই মেয়ে কিনা এত লেখা-পড়া শিখে এম. এ পাস করে বাপের সঙ্গে এই ব্যবহার করল! সেই ব্যাপারের পর থেকেই বাড়িতে এই পাগলের কাণ্ড চলেছে। মেয়ে দিনরাত হোস্টলার ঘরে বসে থাকলেও নীচে কি ঘটছে কদিন ধরে, সে কি জানে না? সব জানে। শশীরানী সর্বপ্রথম ওর কাছেই তো ছুটে গেছেলেন। সব শোনার পরেও মেয়ে সেই আগের মত শুম হয়ে রইল তো রইলই। তার ওপর এই কদিনের মধ্যে একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকল

এখনো ওর রাগই বেশি! সবক'টা স্বার্থপর সবক'টা অমানুষ।

সোমনাথ চাটুজ্জের এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে সুদীপ, আর মেয়েরা শ্রীলেখা আর সুলেখা। সুদীপ টেলেটুনে বি, এ পাস করেছিল, তারপর সেই থেকে ভালো কিছু ব্যবসা করা যায় কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে। চাকরিতে ঘেন্না তার।

শ্রীলেখা দু'বার বি, এ ফেল করে স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, পড়াটড়া আর তার দ্বারা হবে না। কিন্তু সে চৌকস মেয়ে নয়, এমন কথা কেউ বলবে না। সপ্তাহে গোটা তিনেক ইংরেজি বাংলা সিনেমা একটা দুটো থিয়েটার দেখে, আর কালচারাল নাটক-টাটক করে তার ফুরসৎ নেই বললেই চলে। ছোট মেয়ে সুলেখা ছায়ার সেকেণ্ডারিতে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিল, বি এ-তো খুবই ভালো, আর এম এ-তে তো কথাই নেই—বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একেবারে। কাগজে যখন ওর ছবি বেরিয়েছিল, তখনকার মেয়ে সে সে-কথাও লেখা ছিল। এখন রিসার্চ করছে, তার জন্যে টাকাও পাচ্ছে।

শ্রীলেখা পড়ে না, একটা বই নিয়ে শুলেই তার ঘুম পায়—যেটুকু পড়া হয়েছে সেটুকুই আবার নতুন করে পড়তে হয়, নইলে কিছুই মনে থাকে না—আর, সেই

চেষ্টা করতে গিয়ে আবার ঘুর। এই কারণে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সোমনাথবাবুর মনে একটা খেদ ছিল। সেটা গেছে ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে উঠতে। তারা সকলেই বাপের লেখার ভক্ত। বিশেষ করে ছোট মেয়ের তো কথাই নেই। লাইন মুখস্ত বলে দিতে পারে অনেক বইয়ের। ওর মাকে বলে, বাবার দর্শনতত্ত্বর কত কথা যে আমি পরীক্ষার খাতায় মেরে দিই, ঠিক নেই।

অনেক আধুনিক চটকদার মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্র ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ দিয়ে লেখক সমাচার ছাপায়। সে-রকম লোক এলে সোমনাথবাবু সুলেখাকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, আমার সম্পর্কে আমার থেকেও ওই ভালো জানে। বাপের সম্পর্কে ছোট মেয়ের বিবৃতিই ফলাও করে ছাপা হয়।

এমনি একটা ব্যাপারে প্রায় বছর খানেক আগে এই মেয়ের কাছ থেকেই প্রথম আঘাত পান সোমনাথবাবু। সুলেখা সবে এম, এ পরীক্ষা দিয়েছে তখন নীচের ঘরে এমনি এক কাগজের সম্পাদকের কাছে সুলেখাকে পাঠিয়ে ঘণ্টা খানেক বাদে দেখেন, সম্পাদকের কাছে বাপের সম্পর্কে ফলাও করে বলছে শ্রীলেখা। সুলেখা সেখানে নেই। পরে বড় মেয়ের কাছে যা শুনলেন তিনি, প্রায় অবিশ্বাস্য। সম্পাদককে নাকি সুলেখা বলে দিয়েছে, বাবার ইদানীং কালের লেখা সে পড়ে না, অতএব কিছু বলতেও পারবে না। অবাক হয়ে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেছে, কেন? ও জবাব দিয়েছে, ভালো লাগে না দিদির ভালো লাগে, তাকে ডেকে দিচ্ছি।

শুনে রাগের থেকে সোমনাথবাবু অবাকই হয়েছেন বেশি। এই মেয়েটা যে এত বোকা তিনি কল্পনা করেননি। সাহিত্যে নতুন বাস্তবের বাতাস নিয়ে আসছেন তিনি। সে-বাস্তব অনেক সময় নির্মম, কুৎসিত, নগ্ন। কিন্তু উপায় কি, যে কালের যা। কালের এই রসদ যোগানোর ফল তো সকলেই দেখছে। তাঁর শেষের চার চারটে বই বাজারে হৈ-হৈ করে বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ গোঁড়ামি যাঁদের, তাঁরা সমালোচনার ফুল ফোটাচ্ছে বটে। কিন্তু সাহিত্যে বিপ্লব আনতে হলে সকলকে খুশি করা যায় না। মেজরিটি যে খুশি, বইয়ের বিক্রিই তার প্রমাণ।

তারপর শেষের এই বই—অনুরাগ চক্র। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা বই নিয়ে এত হৈ-চৈ বাংলা দেশে বোধহয় আর কোনো বই নিয়ে হয়নি। গোঁড়ারাও অবশ্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের কাগজে তারা গালাগাল করেছে। তার উত্তরে সোমনাথবাবু নিজের খাতিরের কাগজে লিখেছেন, জীবনে সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে, জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। কুৎসিতকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেই অস্বীকার করা।

এর জবাবে সেই গোঁড়াদের কাগজ ফলাও করে একজনের প্রশ্ন ছেপেছে। প্রশ্ন, সাহিত্য-যাত্রা বলতে জীবনের কুৎসিত থেকে সুন্দরের দিকে যাত্রা বুঝব না সুন্দর থেকে কুৎসিতের দিকে? জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে না আলো থেকে অন্ধকারের দিকে?

এই প্রশ্ন ফলাও করে ছাপা হয়েছে তার কারণ ওই প্রশ্ন করেছে সুলেখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ছোট মেয়ে।

ছাপার অক্ষরে ওই নাম দেখে শুব্ধ হয়েছিলেন সোমনাথ চাটুজ্জে। তারপর খুব সই একটা জবাব লিখবেন ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু সে-অবকাশ পেলেন না। তার আগেই বাড়িতে দ্বিতীয় বিস্ফোট আর এই দ্বিতীয় বিস্ফোটে মাথাই খারাপ হবার দাখিল সোমনাথবাবুর।

প্রথম বিস্ফোট গেছে মাস তিনেক আগে। তখনো 'অনুরাগ চক্র' বেরোয়নি। বড় ছেলে সুদীপ পাড়াতে একটি বড় ঘরের কায়স্থ মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ল। সেই সঙ্গে বাপের মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়েছে। লিখে রেখে গেছে, তার বাবা কে, উদার, অসবর্ণ বিয়ে এখানেই হতে পারত, কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোক ভয়ানক গোঁড়া, বলেই আপাতত পালাতে হচ্ছে। স্ত্রীর কাছে ছেলেকে যথেচ্ছ গালাগাল করেই ক্ষান্ত হয়েছেন সোমনাথবাবু।

কিন্তু দ্বিতীয় বিস্ফোট তার চতুর্গুণ। বলা নেই, স্ত্রী হঠাৎ এক রাত্রে তাঁর লেখার ঘরে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লেন। তারপর ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত তিনি।

বড় মেয়ে শ্রীলেখা অন্তঃসত্ত্বা। কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর সন্দেহ হচ্ছিল। আজ যে করে হোক স্পষ্টই টের পেয়েছেন। আর যে-গতিক দেখে শ্রীলেখাও স্বীকার করেছে। বলেছে, সেই ছেলে তাকে বিয়ে করবে, তাই আর দেরী না করে ব্যবস্থা করা দরকার।

মাথায় আগুন এক রকম জল ঢেলেই নেভাতে হয়েছে সোমনাথবাবুকে। সেও এক কায়স্থের ছেলে। ছোটাছুটি করে আর হয়রানির একশেষ হয়ে দরকারি কাজ

আগে সম্পন্ন করেছেন তিনি। সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের চুপিচুপি বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন তাকে। বাপ তাঁর গলায় গামছা দিয়ে এক কাঁড়ি টাকা আদায় করেছে।

বকল শেষ হতে মাত্র পাঁচ দিন আগে অন্তর্ধান করেছিলেন তিনি। বিষণ্ণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে আর বড় মেয়েকে ত্যাগ করলেন তিনি, আর তাদের মুখ দেখবেন না, কোন সম্পর্কও রাখবেন না—তাঁর বাড়ি ঘর টাকা কড়ি সব তাঁর ছোট মেয়ে পাবে—আর কেউ এক কপর্দকও পাবে না।

পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়ে সুলেখা সটান তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। —কেন পাবেনা তারা? কেন তাদের ত্যাগ করবে তারা কি দোষ করেছে?

প্রশ্ন ছেড়ে মেয়ের এই মূর্তি দেখেও সোমনাথবাবু হতভম্ব। শশীরানীও। তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে সুলেখা আবার বলে উঠল, জীবনের এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার চোখে এমন কি অন্যায় কাজ করেছে তারা? তারা যা করেছে সে-রকম ঘটনা তোমার এক একটা বইয়ে অনেকবার করে ঘটেছে—আর শেষের বইটাতে তো, কথাই নেই। তোমার অবাধ্য তো কেবল আমি হয়েছি তাড়াতে যদি হয় আমাকেই তোমার তাড়ানো উচিত।

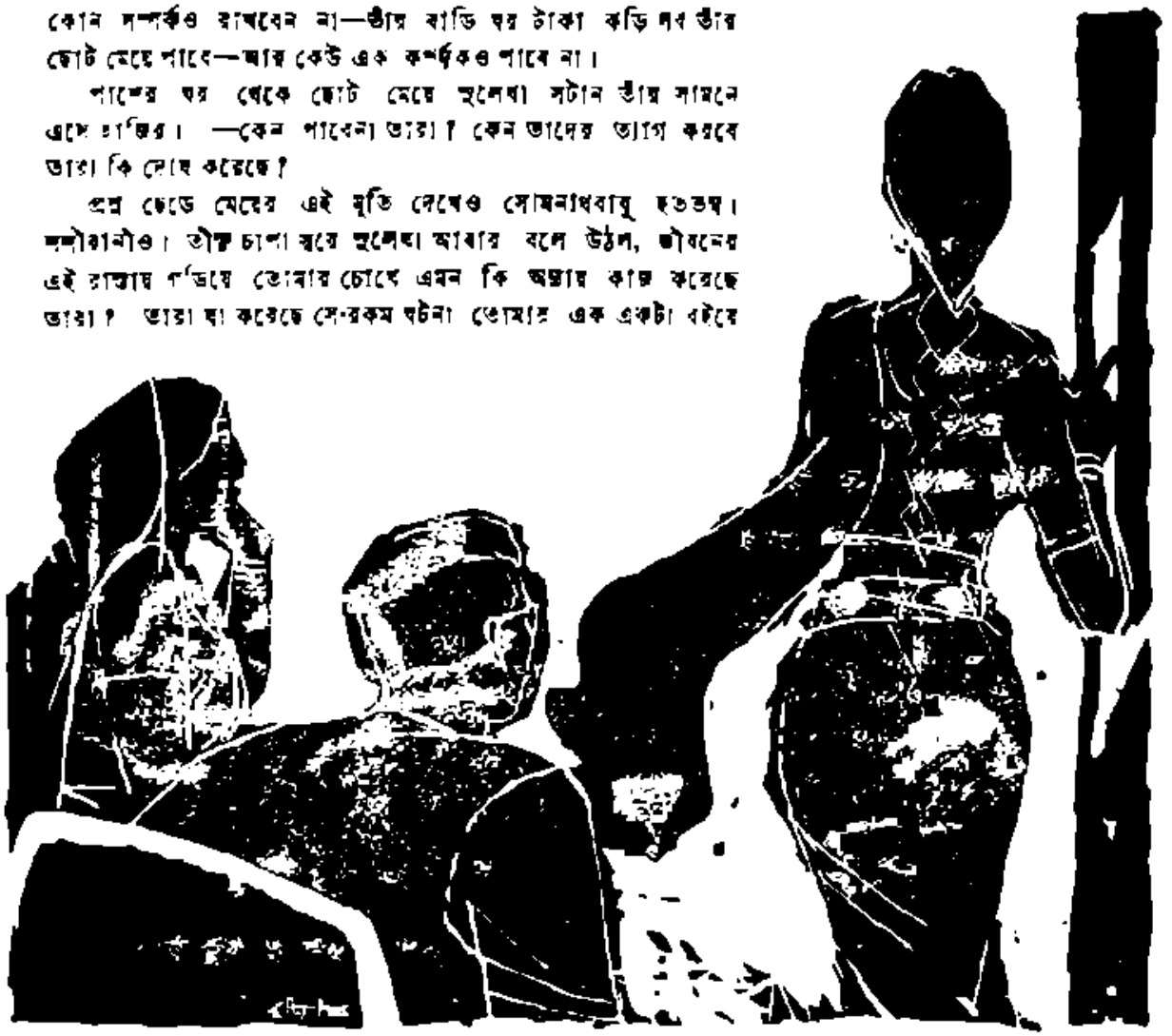

সোমনাথবাবু নির্বাক। হঠাৎ শশীরানী বলে উঠলেন,তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, মুখের ওপর এ-সব কি বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি মা। বাবা না তাড়ালে এ বাড়িতে আর থাকার ইচ্ছে নেই আমার—আমি অন্য জায়গা খুঁজছি। কার মেয়ে বলতে পর্যন্ত এক এক জায়গায় লজ্জায় পড়তে হয় আমাকে। সে-কথা থাক্, কিন্তু বাবা কি বলে ত্যাগ করে এসব কথাই বা বলে কেন?

যেমন এসেছিল, তেমনি এক ছটকায় সুলেখা আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

এ-ঘরে শশীরানী নির্বাক বিমূঢ়।

চাটুজ্জে বিবর্ণ, চিত্রার্পিত।

তমসা

শক্তিপদ রাজগুরু

সকালের মিষ্টি রোদ গিলি কোনার বং বুলিয়েছে গাছ গাছালির মাথায়। ঘুঘুর সুর ওঠে পাখীগুলোর কলরবে। সকালের এই ভালো মনের ওমোট আবহাওয়াকে একটু হালকা করে আনে। কেয়া অনেক ভেবেছে। এই অন্ধকার হতাশা আর বেদনাময় জগৎ থেকে সে এই আলোর দিকেই এগিয়ে যাবে।

কেয়া সকালের সোনা রোদে চুপ করে বসে আছে। ভাবনাগুলো যেই হারিয়ে গেছে। কয়েকটা হাতাবে পাখি বারান্দার নীচে মাটি ধুলোবালি ঠোঁট দিয়ে তুলে ডানার ঝাপটে সবাঙ্গে মাখছে। বাতাসে মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। জুবকো লতার প্রান্তে কয়েকটা ফুটন্ত কলি। কোনটা ফুটেছে কোনটা আধফোটা. অধীর কি আগ্রহে কি প্রতীক্ষা নিয়ে ওরা ফোটার দিন গুনছে। হঠাৎ বাতাসে একটা ফুল ঝরে পড়ল কেয়ার রক্ত লাল শাড়ির আঁচলে। কেয়া ওই ঝরা বিবর্ণ ফুলটার দিকে চেয়ে থাকে—তার মনে অমনি করে যাবার ভয় আর বেদনা। সেই ভয় থেকে সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মাঠের কাজার ক্ষীণ সুর ভেসে আসছে। মল্লিকা

কাঁদছে। এদিক থেকে কালাচাঁদের হুঙ্কার কানে আসে। কেয়ার কাছে এসব আলাদা একটা অনুভূতি। বিষিয়ে দিয়েছে তার সবকিছু। এখান থেকে তাই মুক্তির পথই বেছে নিয়েছে সে।

ওর মা ওই মল্লিকা এগিয়ে আসছে। কেয়া ওকে আজ ঘৃণা করে। মা বলতে কেমন একটা মিষ্টি বুক জুড়োনো অনুভূতি জাগতো সারা মনে। ওই অনুভূতিটা অন্ধকারে মনে হতো একটু আলোর মতই আশ্বাসময়।

আজ কেয়ার সবকিছু হারিয়ে গেছে। মাকেও ঘৃণা করে সে।

—নালিশ করা হচ্ছে বুঝি?

হেঁড়েগলায় কালাচাঁদ মল্লিকাকে শাসাচ্ছে বাইরে যাবার মুখে। কালো খলখলে চেহারা, দুচোখের উপর পুরু খানিকটা মাংস এসে জমছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল মোষের চোখের মত। টলছে লোকটা।

ওই কালাচাঁদ এককালে ছিল সৌখিন; বাহার ইঞ্চি কোঁচানো ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবী চকচকে পাম সু পরে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির হতো তাদের জীর্ণ দোতলা বাড়িটার সামনে। ওর তখন হোঁয়ার চারু কারবার। দিনরাত পান চিবুতো জাবরজাব করে। ঠোঁট দুটো পুরু ঝুলে পড়েছে।

তার মাংসল দেহের নীচে হাড়গুলোও ছিল তেমনি শক্ত। কালাচাঁদকে দেখে আজকের মত ফুঁসে উঠতো না মল্লিকা। সেদিন ওর চোখে ছিল কি বিশ্রী একটা লালসা। কেয়া অতীতের সেই দিনগুলোকে ভোলেনি।

বেদনাময় সেই দিন।

কেয়া সেদিনের মল্লিকাকে দেখেছিল, আজকের এই মায়ের সঙ্গে তার মিল নেই। সেদিনের কালাচাঁদের ওই শক্ত আঙুলগুলো কঠিন ওই দানবটার হৃদয়ের মতই। সেই কাঠিন্যের পরিচয় কেয়া অনেকবারই পেয়েছে।

কালাচাঁদ সেদিন পর্যন্ত তাকে চড় মেরেছে, শক্ত কঠিন হাতের আঘাতে ছুঁড়ে ফেলে উঠেছে কেয়া। মা তাকে বাধা দেয়নি। কালাচাঁদ রেগে উঠলে ওই শক্ত সাঁড়াশীর মত হাত দিয়ে কেয়ার নরম গলাটা টিপে ধরেছে; ওর ঘুঘে-চোখ দুটো জ্বলে ওঠে—নাকের দাঁড়াটা ফুলে ওঠে ঘুণী কোন দৈত্যের মত। জানাতো সে—শেষ করে দেবে আপদকে।

আপদই! কেয়া তাদের কাছে আপদই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সায় দিত মল্লিকাও।

—ওকে মারাই ভালো। কেমন বাপ দেখতে হবে তো? সব গেছে তবু ওই আপদ গেলনা।

কেয়া সেদিনও প্রতিবাদ করতে পারেনি। ভয়ে শিউরে উঠতো। কাঁদতো আড়ালে। মা দেখতে পেলে বকবে। মা তার কাছে কোন সান্ত্বনার ঠাঁই হয়ে দেখা দেয়নি। ও ছিল তার কাছে যন্ত্রণার আধার। বাবা! বাবাকে তার মনে পড়ে না। সেই স্মৃতি শুধু আবছা দুটো কাতর চোখের চাহনিতেই মিশে আছে কি এক ব্যথার দেখা দুঃস্বপ্নের মত।

তবে বাবা হারিয়ে গেছল অমনি বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। সেই আগেকার কথাগুলো আজ ক্ষীণ হয়ে মনে পড়ে কেয়ার।

ক্রমশঃ বড় হয়েছে কেয়া, দেখেছে তাদের বাড়িতে আসে ওই কালাচাঁদবাবু। রোজ সন্ধ্যাবেলায় ওর গাড়িখানা তাদের জীর্ণ চুণবালি খসা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় তার থেকে নেমে আসে কালাচাঁদবাবু। বাহার ইঞ্চি কোঁচানো মিহি ধুতি। গিলেকরা পাঞ্জাবী পায়ের জুতোটা চকচকে পায়ে ফুর ফুরে সেন্টের তীব্র মদির সুবাস।

এই চুণবালি খসা এদো ঘরে সেই পোশাক আশাক বেমানান। কেয়াও দেখছিল তার বাবা রতিলাল তখন থাকতো না।

যখন বাবা থাকতো না সেই সময়ই আসতো ওই কালাচাঁদ। হাতে গোড়ের মালা জড়ানো, অন্যহাতে সন্দেশের প্যাকেট। কেয়ার সন্দেশের ভক্ত খুব লোভ,

বাবাও মাঝে মাঝে আনতো, তাও বাজে গন্ধ ওঠা এইটুকু টিকলির মত পদার্থ। তাই খেতো সে। কিন্তু কালাচাঁদ-বাবুর আনা সরেস সন্দেশও তার মুখে বিশ্রী ঠেকতো।

মল্লিকা বলতো মেয়েকে, খা। ভালো সন্দেশ!

কেয়া মুখ বুজে থাকতো। মল্লিকা ওর একরোখা ভাবটা দেখেই বলতো.

—পায় না মিয়ানো বুড়ি, মিঠাই মণ্ডার ছড়াছড়ি, এ সব রুচবে কেন?

তোর বাপ, কোন দিন দেখেছে?

কেয়াও দেখতো-সন্ধ্যার পরই মা সাজগোজ করতো, কালাচাঁদবাবুর সঙ্গে মা কোনদিন বের হতো, বোধহয় সিনেমায় যেতো, না হয় থিয়েটারে।

কেয়া চুপ করে বসে থাকতো, একা একা।

কোনদিন কান্না আসতো বুক ঠেলে। দেখতো আশপাশের ঘর থেকে অনেকেই খোঁজ করতে আসে। ওদের মুখে কৌতুকের হাসি।

কেয়া জবাব দিতো কারুর সঙ্গে বের হয়েছে।

ও পাশের ঘরের পল্লবুড়ি দাঁত পড়া মাড়ি বের করে বিশ্রী ভাবে হাসতো।

—হাঁরে, ফিরবে তো?

কেয়া ওদের হাসির অর্থ তখন বুঝতো না।

ক্রমশঃ বুঝেছে। তখনই মনে হয়েছে মা অনেক ছোট। রতিকান্ত ফিরতো রাত্রি করে। সামান্য চাকরী করে। মাকে প্রায়ই বলতে শুনেছে কেয়া, তার বাবা নাকি মাকে এ নিয়ে অনেক কথা বলতো।

কেয়ার ঘুম ভেঙে যেত মাঝ রাতে। একটা তক্তা-পোষ তাতে পাতা থাকতো একটা পুরানো তোষক, জরাজীর্ণ তার অবস্থা। শীতের দিন জানলা দিয়ে হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। ঘুম ভেঙে যায়।

বাবা ফিরেছে বাড়িতে। কোন অফিসে যেন বাবার চাকরী করে। তারই জন্য মায়ের যত রাগ। ওই রতিকান্ত নাকি বিয়ের সময় মল্লিকার মা বাবাকে বলেছিল ও অফিসে কেরানীর কাজ করে, প্রমোশনও পাবে শীঘ্রই।

কেয়ার ঘুম ভেঙে যায়।

আজ রতিকান্ত বাড়ি ফিরেছে। ওর ঘুমচোখ থমথমে। তাকেই ওদের মা বাড়িতে নেই। বাবার কানে আসে নানা কথা। মাকে মাঝে কেয়া শুনতে পায় মা বাবার সেই ঝগড়াটা। বাবাকে বড় একটা রাগতে দেখেনি কেয়া। মা-ই চোখমুখ কপালে তুলে বাবার মুখের উপর চীৎকার করে।

—তুমি ঠগ, জোচ্চোর। বিয়ে করার সময় মনে ছিল না? কেরানী আমি? দু পাঁচ বছরের মধ্যেই আমি বড়বাবু হবো। মিথ্যুক কোথাকার। বাবা কি বলবার চেষ্টা করে। কেয়া সঠিক তা শুনতে পায় না। মা সে কথা তো শোনেই না, উল্টে শাসায়।

—আমাকে ঠকিয়েছো, আমার বাবাকে ঠকিয়েছো। কেস করবো তোমার নামে। জেল খাটাবো তোমাকে। জোচ্চর কোথাকার। আমার সম্বন্ধে আবার কথা বলো?

কেয়ার দুচোখ জলে ভরে আসে। এতদিন তবু তাদের সংসারে এমন অশান্তি ছিল না। মা কাঁদাকাটা করতো আড়ালে। কিন্তু এমনি ব্যবহার সে বাবার সঙ্গে করেনি। এটা শুরু হয়েছে কালাচাঁদবাবুর আসার পর থেকেই।

রতিকান্ত চুপ করে থাকে। কেয়াও দেখেছে বাবাকে কেমন গম্ভীর হয়ে থাকতে। আগে লোকটা হাসতো, হৈ চৈ করতো। ক্রমশঃ চুপচাপ হয়ে গেছে তার বাবা।

কেয়া বাবা ফিরলে এগিয়ে যায়। ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে। তবু শুধু ঘরে একা সে বাবার পথ চেয়ে থাকে। ওই যেন তার এ দুনিয়ায় সবচেয়ে আপন জন। মা গর্বভরে তাকে দেখে, বোধহয় কালাচাঁদবাবুর সঙ্গে হেসে কথা বলতে বা রসিকতা করতে অসুবিধা হয় সে থাকলে। কালাচাঁদবাবুও কেয়াকে দেখতে পারে না। বোধহয় ওদের স্ফূর্তি—সেই হাসির আবেগ, বিলাসের প্রাচুর্য এমনি বস্তি বাড়িতে মানায় না, আরও অন্যান্য ঘরের মেয়ে বউ বুড়িরা কানাঘুষো করে, তাই বের হয়ে যায় ওরা কেয়াকে এই নিজস্ব প্রায়ান্ধকার ঘরে ফেলে রেখে।

মা-ও গজরায়। বলে কালাচাঁদ বাবুকে—চলো, পড়ে থাক ওই পাপের কাঁটা। মরেও না! কেয়ার দুটো ঠোঁট রুদ্ধ অভিমানে ফুলে ওঠে। মায়ের ওপর রাগ হয়।

রাত হয়ে আসে।

—তুই খেয়ে আছিস কেয়া?

বাবা ফিরেছে। এখন রতিকান্ত আপিস বের হয় খাকির সেই পোশাক পরে।

সে যে বেয়ারা সেই পরিচয়টা এতদিন ঢেকেছিল। সেই দুঃখের মাশুল দিতে হবে এমনি করে তা জানতো না রতিকান্ত। তার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে মল্লিকা। রূপ তার ছিল—তাই ভেবেছিল সে ভালো ঘর-বরেই পড়বে। কিন্তু রতিকান্ত সেদিন ভুল করে তার জীবনে এসে পড়েছিল।

আজ তার জন্য রতিকান্তের দুঃখের অবধি নেই। ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর তার মেয়ে, গরীবের ঘরে বেমানান। কেয়াকে দেখেই মনে হয় রতিকান্ত তাদের এই নিষ্করুণ দারিদ্রের সংসারে এসে মস্ত ভুল করেছে। স্ত্রীর কাছে তার লজ্জা নেই। মল্লিকা তার আচরণের শুধু প্রতিবাদ করেনি, প্রতিশোধও নিতে বলেছে আজ।

কালাচাঁদবাবু যে এমনি করে তার মত গরীবের সর্বনাশ করতে এগিয়ে আসবে তা ভাবেনি। ওরা সব পারে। রতিকান্তের জীবনে মল্লিকা এনেছে দুঃসহ অপমান। কেয়াও সেই আঘাতে যেন মুষড়ে পড়েছে।

বাবার কথায় ওর দিকে মুখ তুলে চাইল।

রতিকান্তের লজ্জা করে কেয়ার দিকে চাইতে। ও তার কাছেও অপরাধী। কেয়া বলে হাত মুখ ধুয়ে নাও বাবা। রুটি কিনে এনেছি।

রতিকান্ত জানে এসব কালাচাঁদের ব্যবস্থা। মল্লিকাকে সেই-ই বলেছে দাদা ঘরে না খেতে, আগুনের তাপে রং নাকি পুড়ে যায়। বাসন মাজলে নরম হাত কড়া হয়ে যায়। তাই শালপাতায় রুটি আর খানিকটা পচা ফুলকোর তরকারী গিলে রাত কাটাতে হয় রতিকান্ত আর কেয়াকে। মল্লিকা বাইরেই খাওয়া সারে। পুষ্টিকর খাদ্য তো খায় সে ভালো হোটেলে না হয় রেস্তোরাঁয়।

রতিকান্তের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। চারিদিক থেকে সে অনেক কথাই শুনেছে। অফিসের সহকর্মীরাও বলছে তাকে, তার স্ত্রীকে দেখেছে তারা মোটরে করে ঘুরতে অনেক জায়গায়। সঙ্গের লোকটার যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে মনে হয় কালাচাঁদের কথাই। ওর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার পরিচয়। সেই সুবাদেই এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা। আজ বাড়িওয়ালাও তাকে ডেকে শুনিয়ে দিয়েছে বেশ করে। মাসের ভাড়া দিতে পারেনি রতিকান্ত। সেই রাগটা বোধহয় তাই এমনি করে ঝেড়েছে বাড়িওয়ালা। অন্য ভাড়াটেরা তাকে নাকি নালিশ করেছে। জানিয়ে দিয়েছে রতিকান্ত যদি বৌকে ভাড়া খাটাতে চায় এবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাক, না হ'লে তারাই এর সমুচিত ব্যবস্থা করবে।

—বাবা খাবেনা?

রতিকান্ত মেয়েকে কি করে জানাবে তার মনের এই কালো মেঘ ঢাকা ঝড়ের কথা। তার মনে আজ ঝড় উঠেছে। অনেক সয়েছে সে। এর একটা হেস্ত নেস্ত করতে চায়।

কেয়ার সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। রাত কত জানেনা। ঘুমচোখে বাবার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। ...মা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ফরসা মুখের রং-এ প্রলেপ, চোখে কাজল দিয়েছে। শাড়িটা পড়ে গেছে গা থেকে। বিশ্রী লাগে তাকে দেখতে। ঠোঁটের রংটা কদর্য হয়ে ফুটে উঠেছে। চীৎকার করছে মল্লিকা।

আর কালাচাঁদবাবুর মোটা শরীরটা শক্ত হয়ে উঠেছে। তার বাবার টুঁটি টেনে ধরেছে। দীর্ঘ রতিকান্ত ওই বলিষ্ঠ যণ্ডামুতের মত লোকটার আক্রমনে ভীত হয়ে উঠেছে। কালাচাঁদের শক্ত হাতদুটো রতিকান্তের গলায় চিপে বসছে। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। দুহাত দিয়ে মুক্তির ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মল্লিকা চীৎকার করছে বিশ্রী ভাবে।

—ঠগকে মেরে ফেললেও পাপ নেই। যুযোদ নেই —মর্যাদি আছে!

কেয়া চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। ওরা তার বাবাকে মেরে ফেলছে।

—বাবা! কেয়া ছুটে যায় বাবার দিকে। মল্লিকাই তার গালে সজোরে এক চড় কষে গর্জে ওঠে।

—বাবা! খবরদার এগোবি। এতদিন সয়েছি। আর নয়।

কালাচাঁদবাবু ওই কেয়ার চীৎকারে ছেড়ে দিল রতিকান্তকে। ক্লান্ত পরাজিত অবসন্ন রতিকান্তের সব শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেছে। তার অর্দ্ধ অচেতন দেহ পড়ে গেল মেঝেতে।

কেয়া ছুটে বাবার দিকে এগিয়ে যাবে, মল্লিকা ওকে জোর করে টেনে সরিয়ে দেয়—খবরদার এগোবি। বাবা! —পথের ভিখেরীর আবার সন্তান! গায়ে হাত তুলতে যাস! সতীপনা ফলায়!

কেয়া বাবার দিকে এগোতে পারে না। রতিকান্তের কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে, চুলে জমেছে সেই রক্ত, নাকটা ফুলে গেছে। তখনও হাঁপাচ্ছে কি যন্ত্রণায়। বোধ হয় ওর পেটা পেয়েছিল..বিদেও। দু'দিন সে খায়নি আজ। কেয়ার কান্না উথলে উঠেছিল। রাতের অন্ধকারে তারাগুলো চিকচিক করে একফালি আকাশে।

তার বাবা তেমনি কোন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। মিশে গেছে। সে আজ অনেক দিনের কথা। কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে জানে না কেয়া। সেই রাতের পরই রতিকান্ত কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তার আর খোঁজ পায়নি কেয়া। মাও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। খুশী হয়েছিল।

আড়ালে কেঁদেছিল কেয়া; সেই বেদনাকাতর রক্ত-মাখা পাণ্ডুর মুখ—কান্না ভরা দুচোখের চাহনি সে ভোলেনি।

—এই যে! ঠায় বসে আছিস সাড়া দিচ্ছিস না?

মল্লিকা মেয়েকে দেখে জ্বলে ওঠে। আজকাল সেই জ্বলুনি তার বেড়েছে। ক'বছরের মধ্যেই মল্লিকার সেই নিটোল স্বাস্থ্য রূপ যৌবন সব কোনদিকে মিলিয়ে গেছে। অন্তরের ভিতরে যে নির্লজ্জ লোভী শয়তানটা চাপছিল রূপের অতলে—সেই শান পালিশ উঠে যাবার পর তার কদর্য রূপটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

কেয়ার কাছে অতীতের ওই মল্লিকার সব পাপ সব ভুলের হিসাব জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে।

কেয়া সেই প্রতিবাদের আগুন নিয়ে জন্ম মুখ আগ্নেয়-গিরির মত হয়ে আছে। আজ বড় হয়েছে। দীর্ঘ এই দিন গুলো কেটেছে, স্কুলে বাইরে—পথে ঘাটে। দেখেছে তাকে ঘিরে নানা বিদ্রূপ, শুনেছে নানা বিশ্রী কথা। সেগুলোয় কান দেয়নি। সব সহ্য করেছে মুখ বুজে আর রাগের মাত্রাবেড়েছে মায়ের উপর। কালা-চাঁদকে সেই-ই প্রশ্রয় দিয়েছিল টাকার জন্য; শুধু নেশার ঘোরেই মা তার বাবাকে খুন করাতে চেয়েছিল। কেয়া দেখেছে ওর মায়ের হাতে যেন রক্তের লাল দাগ।

কেয়া মায়ের ডাকে ওর দিকে চাইল।

কালাচাঁদবাবু আজকাল কম আসে।

তার নেশা যেন কেটে আসছে। মল্লিকার দিকে চাইল কেয়া। যে মন নিয়ে কালাচাঁদবাবু প্রথম রতিকান্তকে মেরেছিল ঘুষ করে দিয়ে মামলা করেছিল তার মাকে দিয়ে সেই মন আর নেই।

কেয়া সেদিন বাবাকে আর খুঁজে পায়নি। তাদের মামলাতেও রতিকান্ত আর আসেনি। বিনা প্রতিবাদে মা মামলায় জিতেছিল। সেদিন কালাচাঁদবাবুর কি হৈ হৈ। মা আর কালাচাঁদবাবু দুজনে কোথায় বেড়াতে বের হয়েছিল কেয়াকে ফেলে রেখে। ক্রমশঃ কেয়া দেখেছিল মা তাকে যেন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একক একটি সত্তা। নিজের এই একাকীত্ব আর ঘৃণাই কেয়ার মনে দৃঢ়তা জাগিয়েছিল, ওই আনন্দের মেশালাগা জগৎ কায়-ার তৃপ্তি তার তরা এই নরককে সে ঘৃণা করে সারা মন দিয়ে চেয়েছে এখান থেকে মুক্তি পেতে।

দেখেছে ক্লাশের অন্য মেয়েদের বাড়িতে একটা শ্রী। বাবা চোখের সামনে শ্রদ্ধা কর্তব্য আর দায়িত্বের মূর্ত প্রতীক, সংসারের সব দায় দায়িত্ব তুলে নিয়েছে কোন

স্নেহময়ী মা।

বিভোর।

কিন্তু তার জীবনে স্নেহের স্পর্শ নেই। কোন আদর্শ নেই। বাবার জন্য কোন শ্রদ্ধা নেই। যাকে দেখেছে সব দারিদ্র এড়িয়ে কেবলমাত্র নিজের লালসায় পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। কালাচাঁদবাবু সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতীক।

কেয়া দেখেছে ঘৃণায় মন ভরে উঠেছে। দুঃসহ সেই ঘৃণা। তার চোখের সামনে দুঃস্থ রোগ ভরা পাপী ভাকা পৃথিবীকে কি অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। নিজেই নিজের পথ খুঁজেছে। ঘরে বাইরের আঘাত আর জ্বালায় জ্বলে ওঠা মন তাই মানবকে দেখে প্রথমেই ভালবেসে ছিল। অনেক আশা নিয়েই এগিয়েছিল কেয়া।

মল্লিকার পাপ তবু এড়াতে পারেনি সে। মানবও মাঝে মাঝে এবাড়িতে এসেছে। সুন্দর একটা স্বাস্থ্যবান যুবক। মুখে চোখে বুদ্ধির শানিত দীপ্তি। চাকরীও করে মন্দ নয়।

কেয়া আর সে দুজনে কি স্বপ্ন দেখে। কেয়া ভুলে যাবে এই দুঃসহ জ্বালা আর অপমানের কথা। মনের মধ্যে জোর পেয়েছে কেয়া।

পাশাপাশি আজ দেখেছে জীবনে হারানো আর পাওয়ার বেদনা আর আনন্দ। মনে মনে খুশী হয়েছে সে। বাবাকে ওরা নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জর করে ভুলে সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছে; সেই কালাচাঁদ আজ নিজ মূর্তি ধরেছে আবার। তেমনি দানবটা ক্ষেপে উঠে আজ তছনছ করতে চলেছে সব কিছু।

মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়, শোনে কেয়ামল্লিকা চীৎকার করে; কালাচাঁদও মদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। চোখদুটো লাল হয়ে ওঠে। দু একটা চীৎকারের পর জেগে ওঠে মানুষটা। আজ তার রূপের সেই নেশা ফুরিয়েছে। অন্যত্র সে তার লালসার ইন্ধন যোগাতে ব্যস্ত।

মল্লিকার শীর্ণ রুক্ষ দেহ মনে সেই ব্যর্থতার জ্বালা প্রকট হয়ে ওঠে। যে ঘর একবার ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল সেই ঘর আর বাঁধতে পারেনি সে। দ্বিতীয় মানুষটাকে চরম আঘাত দিয়ে ওই কালাচাঁদের সঙ্গেই বের হয়ে এসেছিল। আজ তাকেই গালাগাল দেয়। কালাচাঁদের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে। সব হারিয়ে গেছে তার ওই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে।

মল্লিকার চুলের মুঠি ধরে লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু তারও ঠাঁই কোথাও নেই, আবার মাতাল হয়ে টলতে টলতে ফিরে আসে।

কেয়া দেখেছে এই জঘন্য দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। মায়ের কান্না শোনে। মনে পড়ে অতীতের কোন রাত্রে ওই কালাচাঁদ আর মল্লিকা তার বাবাকেও এর চেয়ে কঠিন আঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

কেয়ার মনে আজ মায়ের জন্য কোন মায়া দয়া নেই। শুধু ঘৃণার পাহাড় জমে আছে। মা—ওটিত্রাণ পবিত্র মনের সেই অনুভূতিটাকে ওরা মেরে ফেলেছে। কেয়ার কাছে এ দুঃসহ কোন যন্ত্রণা।

এই যন্ত্রণা আর হতাশার মাঝেই মানবকে প্রথম দেখেছিল। ওই মানবই তার সামনে এনেছিল মুক্তির অবকাশ। কেয়ার অন্তরের আবেগময় নতুন একটা সত্তাকে সে জাগিয়ে তুলেছিল। কেয়া বাঁধতে চেয়েছিল নতুন ভাবে মানবকে কেন্দ্র করে।

নিজের সম্বন্ধে তার বিশ্বাস হারিয়েছিল, মনে হয়েছিল দুনিয়াটা কালাচাঁদের মত অমানুষের ভিড়ে ভর্তি। এখানে মল্লিকাদের মেয়েরাই কাঁদে আর বোঝা টেনে চলে। নিজের সম্বন্ধে এই কথা ভেবে শিউরে উঠেছিল কেয়া।

মানবের স্পর্শে ওর চোখে নতুন কোন পথের সন্ধান পেয়েছে কেয়া। আজ সে তার পথ ঠিক করেছে। এখানে আর নয়।

—কেয়া!...

মায়ের ডাকে কেয়া ওর দিকে চাইল। আবছা অন্ধকারে দেখে মল্লিকার দুচোখে জল নেমেছে। শীর্ণ

চেহারা মল্লিকার সেই লালসাময় রূপ—সেই উদগ্র যৌবন আর নেই। শীর্ণ—চেহারা চোখের কোলে কালির দাগ। জীবন যুদ্ধে ও বিজ্ঞ পরাজিত কোন নারী। আগেকার আলো ধরানো দৃষ্টি আজ নেই। কেবার মনে পড়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া তার বাবাকে। ওকেও চরম আঘাত দিয়েছিল মল্লিকা।

আজ মল্লিকার ওই পরাজিত বেদনামলিন চেহারা দেখে কেরা মনে মনে খুশি হয়েছে। কোন দুঃখবেদনা তার নেই। মল্লিকা ভাবায়—কেরা, তাহলে কি সে কাউকে ভালবেসেছিল? চলে যাবি এখান থেকে? মল্লিকার কণ্ঠে ব্যাকুলতার স্পর্শ। সব হারিয়ে যাবে তার। যে কেরাকে ও সেদিন ছিনিয়ে এনেছিল রতিকান্তের বুক থেকে জোর করে, সেই কেরাই আজ তাকেও চরম অবহেলায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কেরা মনস্থির করে ফেলেছে। তাই ঘাড় নেড়ে জানায়। যে তাণ্ডব—যে সর্বনাশের কালোছায়া—যে লোভের কুশ্রী কদর্য রূপ সে দেখেছে ওই মল্লিকা আর কালাচাঁদের মধ্যে তার থেকে সরে যেতে চায় সে। ওদের ভয়াবহ বেদনাময় পরিণতিটাকেও দেখেছে কেরা।

ওর দুচোখ ফুটে উঠেছে কাঠিন্য। পুঞ্জীভূত সেই বিদ্রোহই তাকে পথের সন্ধান দিয়েছে। বাবার রূপ—মায়ের লালসা—কালাচাঁদের মানবের লোভ সব দেখেছে সে।

এখানে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

এ সবই তার একালের শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা। ওদের ভুলগুলোই আগামী দিনের মানুষকে শুধরে দিয়েছে।

কেরা অনেক বেদনা—আলা বয়ে বয়ে আজ শান্তির সন্ধান পেয়েছে। তাই চলেই যাবে সে।

সবচেয়ে ভালবাসবে একজনকে। এই যন্ত্রণার মাঝে শান্তি পাবে. তাণ্ডবের মাঝে নতুন করে তার ঘর বাঁধার সেই চিরন্তন ভালবাসার স্পর্শে সজীব করে তুলবে তাকে।

মল্লিকা চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। নিজের জীবনের দুঃসহ গ্লানি আর যন্ত্রণায় তার সারা মন বিষিয়ে উঠেছে। সামনে তার অতল অন্ধকার।

তার মনে পড়ে হারানো সেই রতিকান্তের কান্নাভেজা দুচোখের চাহনি। ছোট সেই ঘরে মল্লিকা সেদিন আগুন জ্বালিয়েছিল. হারিয়ে গেছে অপমানিত সেই মানুষটা, এমনি দুঃসহ যন্ত্রণার অতলান্ত তমসায়।

তবু কেরা সুখী হোক—ওরা ভাল থাকুক। ওরা শান্তি পাক—সুন্দর হয়ে উঠুক এই কুশ্রী অন্ধকারের মাঝেও।

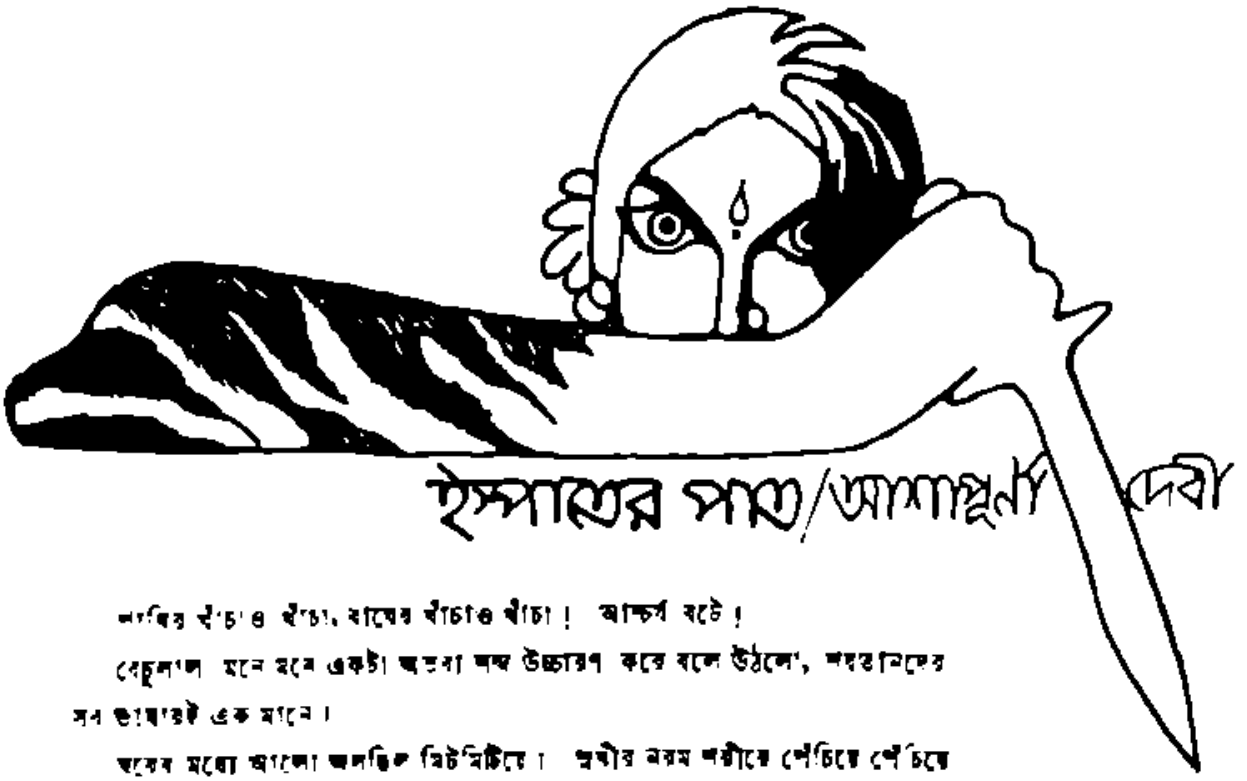

ইস্পাতের পাত/আশাপূর্ণা দেবী

পাখির খাঁচাও খাঁচা, বাঘের খাঁচাও খাঁচা! আশ্চর্য বটে!

বেচুলাল মনে মনে একটা অথবা অন্য উচ্চারণ করে বলে উঠলো, শয়তানদের সব ভাষারই এক মানে।

ঘরের মধ্যে আলো অন্ধকার মিটমিটে। সুখীর নরম শরীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরা ডুরে শাড়ীর মোটা ডোরাগুলো ঘরের ফাঁক থেকে চিড়িয়াখানার বাঘের গায়ের ডোরার মত দেখতে লাগছিল।

অন্ততঃ নিজের বাড়ির অন্ধকার ইঁচতলায় প্রেতের মত ঘুরে বেড়ানো বেচুলালের তাই মনে হচ্ছিল।

চিড়িয়াখানার খাঁচার ভয়া বাঘ ছাড়া কে আবার কবে বাঘ দেখছে, বেচুলাল মনে মনে বললো, বাঘ গুলো শুধু, ছ পা চুপ ক'রে খাঁচার মধ্যে বসে থাকে!' কিন্তু বাঘ-ডুরে শাড়ী পরা সুখীটা অনবরত নড়ছে, পাক খাচ্ছে, শরীরটা নিয়ে মোচড় দিচ্ছে।

তার মনে লীলা খেলা হচ্ছে।

বেচুলাল একবার দাঁতে দাঁত পিষলো, তারপরই কেমন একটা বারকোষ উল্লাসের ভঙ্গীতে একা একাই দাঁত খিঁচিয়ে হাসলো।

তারপর মনে মনে ওই কথাটা উচ্চারণ করলো বেচুলাল, পাখির খাঁচাও খাঁচা, বাঘের খাঁচাও খাঁচা। শয়তানদের সব ভাষারই এক মানে।

এ স্থলে পাখি কে, বাঘ কে, এবং শয়তানেরাই বা কে, তা অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। তবে নিজেরই বন্ধ ঘরের কানাচে কানাচে পাক খেয়ে বেড়ানো বেচুলালকেও অনেকটা চিড়িয়াখানার বাঘের মত দেখতে লাগছিল।

বেচুলালের গলায় ঝোলানো চাঁদির চাকতিটা ঘামে ঘামে কোথাকার যেন আলো এসে পড়ে চকচক করে উঠছিল, আর বেচুলালের কপালের শির দুটো দপ দপ করে জ্বলে উঠছিল।

হঠাৎ একবার মাটিতে একটা পা ঠুকে বেচুলাল হিসহিসিয়ে বলে উঠলো, 'কাল একটা আস্ত সুখী কিনে আনবো। সুখীর মতন মোটাসোটা নরম নরম। কসে লঙ্কা দিয়ে রাঁধবো, ঝালে ঝোলে চাট হবে।'

ভাবী সেই মুরগীটার চেহারাটা—ভাবতে ভাবতে বারবার বেচুলাল সুখীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে লাগলো।

আগে সুখীকে পাখি পাখি দেখতে লাগতো। গলা সরু রোগা পাখি। বেচুলালের পায়ের কাছে পড়ে ছট পট করতো আর বলতো, 'আমি পারবো না।

বেচুলাল তার জানা ঘরে টেনে তুলতো, কড়া গলায় বলতো, 'পারবিনা মানে? তোর ঘাড় পারবে।'

'আমি তোমার যে' কথা পরিবার না।'

বেচুলাল হলদে হলদে দাঁত বার করে হা হা করে হাসতো, 'তা সেই জন্যেই তো তোর ওপর আমার সুখো দখল। আমি তোর পরম গুরু যুবলি? আমার সব হুকুম মানতে হয়।'

'তাই বলে এই হুকুম করবে তুমি আমায়?'

বেচুলাল তখন আবার সুখীর গায়ে মাথায় আদরের চাপড়া মেরে মেরে বলতো, তাতে কি! শয়তানদের নাকে ঝামা ঘষে তাদের পকেটের কিছু খসিয়ে আনা বৈ তো নয়। শয়তানেরা তো তোকে 'বস্তির রাণী' ভিন্ন আর কিছু বলে না, রাস্তায় আমাদের দেখলে এমন করে নাক সিঁটকোয়, যেন মেথো কুকুর দেখলো। যায় এখন? আরে ওই যে সামনের তিন তলার বিবি? যিনি রাত তোর শূন্য ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদেন, আর সকাল হলেই অহঙ্কারে মট মট করতে করতে মাছি পেছলানো মুখে মটর গাড়ী চেপে বাজারে বেরোন? ...ঝাসনা একদিন তোর গা ঘেঁষে বসতে? ওলি করে মারতে আসবে। অথচ তিনি যার জন্যে কবিয়ে মরছেন, সেই লোকের নাকে ঝামা ঘষবি তুই। বলি এটা কম আহ্লাদের কথা না কি?'

বেচুলাল বলতো আর হাঁপাতো!

সুখী কিন্তু এর মধ্যে আহ্লাদের কিছু খুঁজে পেতোনা। সুখী বলতো, 'তাই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবে তুমি? চোরের ওপর রাগ করে তুঁয়ে ভাত খাবে? বড়লোকে তোমাদের সেবা করে বলে তুমি বড়লোককে এনে—।'

সুখী ডুকরে উঠতো, 'ও সব তোমার ছলের কথা, রূপসী পরিবারকে দিয়ে রোজগার করাতে ইচ্ছে তাই বল।...আমি পারবো না, আমি পারবো না।'

তখন বেচুলাল ওর সেই দুপুরের রোদের মত চোখ ঝলসানো ঝকঝকে ছোরা খানা বার করে দেখতো।

বলতো, 'না পারবিতো—এই!'

নরম শরীরে ছোরা গেঁথে দেবার হিংস্র একটা ভঙ্গী করতো বেচুলাল।

'তা' তাই করো—সুখী নির্ভয়ে বলতো, 'ওই ছুরিখানা দিয়ে আমার কুটি কুটি করে কেটে বরং বেহুন বানিয়ে খেয়ে ফেলো।'

বেচুলালের প্রাণে মমতার বালাইমাত্র নেই, বেচুলাল নিষ্ঠুর আর নির্লজ্জ হাসি হেসে বলতো, 'একদিন খেয়ে আর কী হবে? জীইয়ে রাখলে রোজ রোজ ভাঙিয়ে খাওয়া যাবে।'

'তুমি আমার ধর্মসাক্ষী স্বামী, তুমি আমায় দিয়ে এত বড় অধর্ম করাবে?'

'ধর্ম? অধর্ম?' বেচুলাল হা হা করে হেসে উঠতো, 'ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্যি ও সবই শয়তানদের বানানো কথা, বুঝলি? দেখবি কিছুর মধ্যেই কিছু নেই। মদকে মদ বলিস তো মদ, জল বলিস তো জল। সবই কথার খেলা। এই যে আমি? তোর মতন ধর্ম সাক্ষীর পরিবার ছেড়েও যাই না ইদিক উদিক? পরসা থাকলে আরো খেতাম। রোজ এক তরকারী ভাল লাগে? রোজ একই ঘাস?'

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সুখী।

হঠাৎ মাটি থেকে উঠে বসেছিল ধড়মড়িয়ে। তারপর খোঁপাটা আলুথালু অবস্থাতে অবস্থাতে বলেছিল, 'বেশ তোমার যা ইচ্ছে।'

'যা:। এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা।'

বেচুলাল নিজের বক্তৃতা মাহাত্ম্যে নিজেই মোহিত হয়ে গিয়েছিল, নিজের যুক্তি সৌন্দর্যে নিজেই মুগ্ধ।

এতো বাক্যচ্ছটা যে বিস্তার করতে পারবে সে

ভাবেওনি, আসল ভয়টা ছিল সেই রোদ ঝলমলে ছোয়া খানার ওপর। এক ভয় ঘেঁষটে অন্য ভয় ডাকবে।

আর—প্রাণের ভয়ের কাছে অন্য কোন ভয়? ধর্ম ভয়? পাপ পুণ্যের ভয়? লোকলজ্জার ভয়? কোঃ

কিন্তু বেচুলালের বচনেই অনেক কাজ হলো।

সুখী নখে নখ ঘুটে বললো, 'কিন্তু আজ থেকে না।'

আজ থেকে নয়।

তার মানেই কাল থেকে।

তার মানেই সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া।

সামনের তিনতলার ওই বাবুটা অধিরতই বেচুলালকে ধরছিল। মোটা বখশীশ দিতে চাইছিল।

জানতো না—কলতলায় জল নিতে আসা অসংখ্য মেয়ের মধ্যে ওই যে চোখে পড়ার মতো মেয়েটা, ওটা বেচুলালেরই বিয়ে করা বৌ।

প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটা বেচুলালের চোখের কোণে ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। বেচুলালের ঘরের মধ্যে রাখা ছোরাটা যেন মুঠোয় উঠে আসবার জন্যে টিকরে উঠেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে বেচুলালের চোখের সেই আগুনের রং বদলালো। সেটা লোভ হয়ে জ্বলে উঠলো।

বেচুলাল যেন হঠাৎ একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বেচুলাল আসল বিলিতে 'মাল' এর স্বপ্ন দেখলো, স্বপ্ন দেখলো সাত সকালে উঠেই ঝাঁদা ফুলপুন হাতুড়ির ঘরে ঘাড়ে রাস্তায় বেরোনোর বদলে অনেক বেলা অবধি ঘরের চৌকীতে শুয়ে পা নাচিয়ে বিড়ির ধোঁয়া ওড়ানোর।

বেচুলালের মনে হোল—কী মুখ্যু, আমি কী মুখ্যু! ঘরে ধানের গোলা থাকতে আমি পেটে খিল মেরে পড়ে আছি। ছি! ছি! সামনের যে তিনতলা বাড়িটাকে দেখতো, আর লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হতো বেচুলালের, সেই বাড়িটাকে হঠাৎ বেশ মজাদার লাগলো তার। ও বাড়ির ওই নাক উঁচু বহুরানীর উঁচু নাকটা অবশ্য বেচুলালের বৌয়ের পায়ের তলার ঘসটানিতে ভেবে এক পাক নেচে নিতে ইচ্ছে হলো, আর যে বাবুটাকে পায়ের জুতো খুলে মারতে ইচ্ছে হয়েছিল, 'গুরু' বলে তার পায়ে পড়তে ইচ্ছে হলো।

গুরুই বলতে হবে।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

তারপর চলছে একই নাটক।

তিনতলা থেকে, আরো কত ওপরতলা, মাঝতলা, নীচতলা।

বেচুলাল তাদের পথ প্রদর্শক।

বেচুলাল তাদের পাতালের তলাটা দেখাতে আনে।

এই চাকরীটা থেকে তার স্বপ্ন সফল হয়েছে বৈ কি কয়াতের থলি হাতে নিয়ে বেরোনোটা আর দরকারই মনে হচ্ছে না, সেই সময়টা বাজারে গিয়ে দেখে শুনে মাছ মাংস কিনে আনছে।

আসল বিলিতি 'মাল' এবং যাবত পাচ্ছে যাকে যাকে, নানা দিক থেকেই পাচ্ছে।

সারা দিনটাই আরাম।

যন্ত্রণা বা এই রাতের অন্ধকারে নিজের বস্তু ঘরের আনাচে কানাচে ছোরা সকলকিয়ে ঘুরে বেড়ানোর।

হ্যাঁ, ছোরাটা বেচুলাল সঙ্গে রাখে। কারণ মাঝে মাঝেই সেটাকে একটা নরম শরীরে সজোরে গিঁথে দেবার ইচ্ছে দুর্বার হয়ে ওঠে বলে নরম অন্ধকারের গায়েই মাঝে মাঝে গিঁথে গিঁথে বসায়।

তবু প্রথম দিকে বুঝি এতো যন্ত্রণা ছিল না।

যখন শুধু তিনতলা নেমে আসতো চুপি চুপি চোরের মত। আর টাকাটা গুঁজে দিতো বেচুলালেরই হাতে।

তখন সুখী অমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ী পরতে শেখেনি, তাই বোধকরি পাখির খাঁচা আর বাঘের খাঁচার তুলনাটাও মনে আসতো না বেচুলালের।

এখন বেচুলাল যায় তারকার ভর্তি বাজারের থলিটা

উপুড় করে দিয়ে হেসে হেসে বলতো, 'চাঁদ দিকি সুখী হচ্ছিস। খাটছিস খুটছিস, ভালো করে খা না।'

সুখী ভারী ভাবী মুখে জিনিস গুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলতো, 'তুমিই খাও।'

'রাগ পুষে রেখেছিস তা'হলে এখনো?' বেচুলাল হেসে বলতো, 'মন থেকে রেখে ফেল, মন থেকে রেখে ফেল। তুই যেমন আমার আছিস তেমনিই থাকবি, মাঝে থেকে সংসারের একটু সুসার হলো, বুঝলি না?'

'বুঝেছি—' ব'লে ঘরে ঢুকে যেতো সুখী।

কিন্তু এখন বাতাস অন্য দিকে ঘুরেছে।

এখন সুখী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধ-ছুরে শাড়ী পরতে শিখেছে, চটি পায়ে দিতে শিখেছে, আর এখন সুখী বেচুলালকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শিখেছে। এখন সুখী আরো অনেক কিছুই শিখেছে।

'পাখি এখন বাঘ হয়ে উঠেছে—,'

হিসহিসিয়ে নিজের মনেই নিজে কথা বলে বেচুলাল, 'রক্তের আস্বাদ পেয়েছে এখন বাঘ।'

টাকা লুকিয়ে রাখে। যেন এমন করে দেয়, যেন ভিক্ষে দিচ্ছে। আবার শুনিয়ে বলে, 'আ-ছোয়ান একটা পুরুষ কী করে যে গতর নিয়ে ঘরে বসে থাকে, তা ভগবানই জানে। অমন গতরে ছাতা ধরে না গো!'

বেচুলালকে এখন এসব সয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ক্ষেপে গেছে সে। ক্ষেপে যাবার কারণ এই—আজ সুখী ওই ঘটর গাড়ী চড়া বাবুটার সামনে কি না হি হি করে বলেছে, 'লোকটা কে জানেন বাবু? আমারই অগ্নিসাক্ষীর স্বামী।'

কেন? কেন? কী দরকার ছিল তোর এ কথা বলবার?

বেচুলালের মুখটা এতে ধুলোয় ধসটে গেল না?

হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছিল বাবুর, বলে উঠেছিল, 'একটু গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসবে তো চল।'

বেশ বাড়িল বাড়িল বাহারি শাড়ী পরে চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে ছিল তাই। বেচুলালের সমস্ত শরীরে আগুনের জ্বালা ধরে গেলেও কিছুই তো বলেনি সে। কিনা হঠাৎ আহ্লাদে গড়িয়ে বলা হলো, 'গোরে চাবি লাগিয়ে তুমিও উঠে এসোনা গো! বেড়িয়ে আসবে।'

বাবুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তখন হেসে গড়িয়ে বলা হলো, 'বাবু বুঝি রাগ করছেন? তবে থাক্, তবে থাক্। লোকটা কে জানেন বাবু? আমারই অগ্নিসাক্ষীর স্বামী! গাড়ি চেড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়ার ভাগ্যি তো কখনো হয়নি, তাই মনটা কেমন করে উঠল।'

তারপর ঘপাস করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে নাকের ওপর দিয়ে চলে গেল।

না যাবে তো বেচুলাল কি দড়ি গাড়ীতে উঠে বসতে যাবে?

কিন্তু সেই থেকে যেন ফুঁসে বেড়াচ্ছে বেচুলাল।

আজ একটা হেস্ত নেস্ত করে ছাড়বে সে।

'আমার জিনিস, আমারই-থাকলি—' এ সান্ত্বনায় এখন আর ভ্রুক্ষেপও নেই সুখীর, কাজই অবহেলা দেখিয়ে জব্দ করা যাবেনা ওকে। যেটা গোড়ার দিকে যেতো।

'এখন ওষুধ হয়েছে ব্রেক এই—'অন্ধকারেও ঝলসে উঠল কষাটা, রোদে ঝকমকে দুপুরের মত।

কতক্ষণ পরে যেন 'ঘমাস' করে গাড়ীর শব্দ হলো। পাশের ঘরের লতিকা তার 'না বিয়ের বর' নন্দকে ডেকে চুপিচুপি বলে উঠল, 'দেখতে দেখতে সুখীটা কী পাহাড় হয়ে উঠলো দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি—' বললো নন্দ, 'এই তো মেয়েছেলে জাতকে বিশ্বেস নেই।'

'হ্যাঁ, সব মেয়ে মানুষই যেন এক?' লতিকা বেজার গলায় বলে, 'এই যে আমরা? এমন কিছু ভগবতী নই। তা বলে ওই রকম?'

নন্দ আর উত্তর দিলনা।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু বেচুলাল এসব বেয়ালে কান পাততে যায় না। বেচুলাল এতক্ষণ পরে নিজের ঘরে উঠে কড়া গলায় বলে, 'এই ঘুমিয়ে পড়লি না কি?'

সুখী অত দিনের পর বাবাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেনা। শুয়ে শুয়ে একটা হাই তুলে বলে, 'ঘুমোবো এইবারে।'

'ঘুমোবি কি রবরি, যা খুশী করগে যা। তার আগে টাকাগুলো ফেলে দে আমার। একটি নয়া পয়সা সরিয়েছিস কি খুন করে ফেলবো।'

সুখী এবার উঠে বসে।

ক্রুদ্ধ বাঘের গলায় বলে, 'বটে, তা কেন তুমি?'

'কৈফিয়ৎ চাইছিস্। বড় বাড় বেড়েছে দেখছি।'

বেচুলাল এতক্ষণ আস্ফালন করে বাড়ানো-জিনিস-টাকে ঝপ করে ফতুয়ার পকেট থেকে বার করে বলে, 'এটাকে তুলে গেছিস বুঝি?'

সুখীর গলায় স্বর আরো বাঁকে বেঁকে যায়, 'তুলব কেন ও জিনিস কি ভোলা যায়, স্মরণে আছে। বরং পাছে ভুলে যাই তাই ওর একটা যমজ ভাইকে গড়িয়ে রেখেছি যে—' কি কি করে হেসে ওঠে সুখী, 'দেখ্‌না?'

ঝপ করে বিছানার তলায় হাত ঢুকিয়ে সেখান থেকে সেই 'যমজ ভাই'কে বার করে উঁচিয়ে ধরে সুখী, ঠিক বেচুলালের ভঙ্গীতে।

হাত দুপুরের মিষ্টমিষ্টে আলোয়, যেন খানিকটা ভোর স্বপ্নমাখা দিন দুপুর ঝকমকিয়ে ওঠে।

বেচুলালেরটায় শুধু বাটে মরচে ধরেছে, সুখীরটা বাঁট থেকে ফলা পর্যন্ত একেবারে তাজা নতুন ঝকঝকে।

তিল তিল করে কখন যে সুখী এতখানি ইস্পাত সঞ্চয় করে তুলেছিল কে জানে।

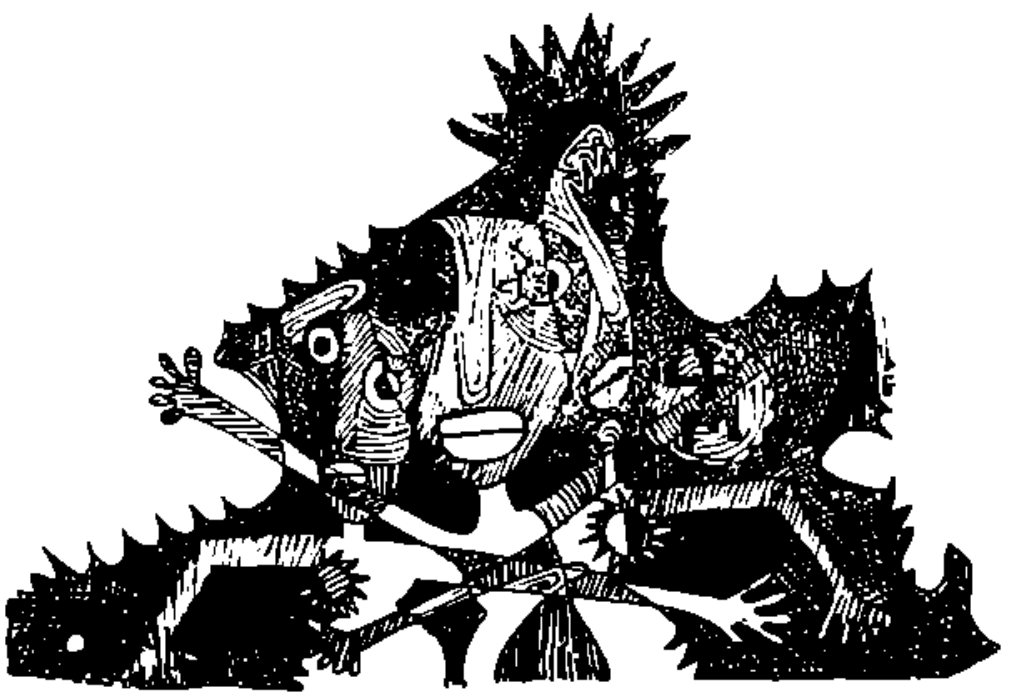

শার্ক স্টাডি চার্ট।

অদ্বৈতে নদীর সিদ্ধি

বিষ্ণু দে

তুমিই এনেছ প্রেম আমাদের শ্মশান-কান্তারে,
বিড়ম্বিত দেহ মনে প্রত্যাহের যে পরিপূর্ণতা
তার তারা জ্বালি আজ, চোখে চোখে স্তব্ধ শূন্যতা ;
আজ হোক প্রতিদিন প্রেমের ভাস্বর পারাপারে

নির্ভীক অভ্যাস, নিত্য শুভাচারে যেন ফিরে ফিরে,
নিষ্ঠুর লোভের শূন্য ভ'রে দিই আস্তিক সততে,
দেশব্যাপী ফুলে ফলে কর্মিষ্ঠের মুহূর্তে-শাশ্বতে
অদ্বৈতে নদীর সিদ্ধি, ফসলে ফসলে দুই তীরে ॥

দূরভাষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এখনও অনেক দেরি বসন্তের গলায় দুলিয়ে দিতে মালা
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে প্রতীক্ষা ফাল্গুন
আকাশ দু হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ, চোখে বিদ্যুতের জ্বালা
থেকে থেকে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকীর শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র ; জেনে রেখো, কাল নিরবধি
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের, পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে, কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায় নদী
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে হার মেনে ফিরে ফিরে আসি
কানে গুন্ গুন্ ক'রে বলা যেত যদি আমি হতাম ভ্রমর
এখন অনেক দূর থেকে একা মনে মনে বলছি : ভালবাসি—
তুমি শুনতে পেলে কোনো দৈববাণী ? অথবা আমার কণ্ঠস্বর ?

এ সংসারে দিনে রাত্রে দেহ বলো, মন বলো যখন যা চাই
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা, করো সব কিছুর যাচাই ॥

অন্তরে-বাইরে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অসংখ্য চাকলো ভরা তারা
নিচে জল পাথরের মতো···
বরং ঘনিষ্ট ভূত, পোড়োবাড়ি, প্রোথিত কামান
এদেরই তাৎপর্য আছে
মানুষের কবিতার কাছে
এদের গা-পোড়া গন্ধ, রহস্য প্রাক্তন
মূল্য দড়
বসে আছি
উড়ন্ত পাঁচিল, কথা কয় হর্মাদ তস্কর, মনে মনে·····
আমরা দ্যোতনা মানি
তদ্ভবরূপ হয়ে গেলে পর
শূন্য তোরঙ্গের কাছে ফিরে আসি স্বাভাবিকতার
বারংবার
আমরা অন্তরে-বাইরে ব্রিজ বেঁধে এখন প্রস্তুত ॥

চাঁদের মধ্যে উড়ছে ঘুড়ি

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

চোখের নীচে চোখের পাতা
বুকে থাকলে কেউ দেখেনা।
পৃথিবীতে গোপন খেলা
ঘটে যাচ্ছে সারা বেলা ;
চাঁদের মধ্যে উড়ছে ঘুড়ি
হৃদয় ছাড়া কেউ জানেনা।

ভালোবাসা রূপোর বাটি—
যে-টুকু জল সবটা খাঁটি ;
বোঝে শুধু প্রাণ-জহুরী
মাথায় নিয়ে ফুলের কুড়ি।
বুকের মধ্যে বইলে নদী
রঙিন মাছও প্রজাপতি,
সুখোয় নিয়ে ধুলো বালি
ফুল ফোটাবে বুকের মালি।
মাদল হাতে বাদল ছাড়া
এসব কথা কেউ জানেনা,
চোখের নীচে চোখের পাতা
বুকে থাকলে কেউ দেখেনা।

যার যেমন

তারাপদ রায়

যার যেমন ভালোবাসা, সেই রকম দুঃখ।

বৃষ্টির দিনে ডাক-বাক্সে ভেজা,
ধুয়ে যাওয়া চিঠির মত অস্পষ্ট,
আনুমানিক আমার সমস্ত,
অথবা,
একটিই ক্ষীণ ভালোবাসা আমার।

মহরমের তাজিয়ায়, 'হায় হাসান, হায় হোসেন,'
আমার কোনোদিন ললাটে করাঘাত করা হলো না,
কোনো প্রাসাদচূড়া থেকে
লাফিয়ে পড়ার সুদূরতম বাসনা,
কোনো অব্যর্থ আসে নিক,—

হায় হতভাগ্য,
এ কেমন ভালোবাসা আমার।

চাবি

গণেশ বসু

শাণিত খড়্গের ঠোঁটে চাবি থেকে উদ্ধার আমার,
নিজেরই বিবৃত ছায়া বলে ওঠে, বিপন্ন পাঁজরে
নিরন্তর ঝরে যায় বয়স সবার
অভিশাপ, মুখোশের আত্মঘাতী উক্তির ভিতরে
খেলা চলে, উদ্‌ভ্রান্ত দীর্ঘবেলা, বারুদে বুকের
বিস্ফোরণ ঘটে যেতে চায়
দামাল স্মৃতির ঠোঁটে ক্ষিপ্তমুখ আর্মেচার বেল্টে দাপায়।

ঝড় : অন্ধকারের স্বর

সুনীল বরণ

দরজাটা আলতো ক'রে
বন্ধ ক'রে দাও,
বাহিরে বড় ঝড়
অন্ধকারের স্বর।

আর্ত হাওয়াটা আর্তনাদে
ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে
সঙ্গে থেকে শহরের হাডটা-ও
হিম হয়ে আসছে।

ঘরের পিদিমটা ভারী দুষ্টু,
দুরন্ত ছেলের মত
দস্যিপনা ক'রে খিল্ খিল্ স্বরে হাসছে
অবশ্য, অভিজ্ঞের মতো মুখে চাপা দিয়ে।

দেওয়াল ঘড়িটা থেকে
কাঁটাগুলো পায়ে হেঁটে
জানালা দিয়ে ঝড় দেখতে যাচ্ছে,
হৃদয়ের শরীরে বড় লাগছে।

বৃষ্টি এসে কড়া নাড়ুক
আমরা যাবনা,
মন ভেঙে টুক্‌রো টুকরো হয়ে যাক
তোমাকে হারাবোনা।

বাহিরে বড় ঝড়,
দরজাটা আলতো ক'রে
বন্ধ করে দাও।

———

ভস্ম থেকে দিতে পারো

রাম বসু

ভস্ম থেকে তুমি তাই দিতে পারো রত্নমালা, তাপ
দিতে পারো পৃথিবীকে দীর্ঘতম দিন, সম্ভাবনা—
যার পরিণতি হতে পারে সৃষ্টির বিরতি।

ভস্ম থেকে দিতে পারো আমাকে আবার।

আর কোন আবরণ আমাদের মুখের ওপর তখন রবে না
কারণ নিকষ অঙ্গে আজন্মের অভিজ্ঞান দেখে
প্রেম তাকে চিনে নেবে
সত্তা দেবে নিজের দর্পণ।

যারা ভালবাসে তারা বেড়ে ওঠে গাছের মতন
যারা প্রতীক্ষায় থাকে তারা চিরকাল সুরের তরঙ্গ
তাদের পাতায় মূলে রোদ পাখি চিত্রহালা, রূপ
সায়াহ্নের আকুলতা চোখে থাকে
কণ্ঠে থাকে নদীর ভাষণ
তাদের এবং একটি কথা এক একটি বিশ্বের সূচনা
যারা ভালবাসে তারা অগোচরে হয়ে ওঠে আদি উপাদান।

ভস্ম থেকে তুমি তাই দিতে পারো রত্নমালা, তাপ।

সমাপ্তি বিহীন সুর এখন
অথবা ঈশ্বর, ঋতু পরিশ্রমী ফুল, সূর্য ও সমুদ্র
আমরা বুকে ঢাকতে পারি ক্যানসার কলকাতা
অঞ্জলিতে নিতে পারি মৃত্যু ও সভ্যতা
পাঁড়িতের গালে মুখ রেখে বলতে পারি—এইতো রয়েছি।
ভালবাসি, তাই বুঝি হতে পারি আহত গোলাপ।

ভস্ম থেকে দিতে পারো আমাকে আবার।

শুধু তুমি থাকো

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বন্ধুরা, দুঃখের দিনে দূরে থাকো।
সঙ্গীরা—অর্থাৎ যারা চায়ের দোকানে, মাঠে, ব্রিজের আড্ডায়
অনেক মুহূর্ত তপ্ত রেখেছিলে—
এখন বিরল করো নিজেদের।
বৃক্ষধর্মী প্রতিবেশী, তুমি তো শিকড় তুলে অন্য কোনো দেশের
বাতাস
গায়ে লাগাবে না,
তুমি বরাবর খুব কাছে ছিলে, কাছেই থাকবে ;
কিন্তু যাতে তোমার ডালপালা
অতিস্নেহে আমার জানলায়
আড়াল না-করে রৌদ্র, অন্তত সে-দিকে
লক্ষ্য রাখো।

আত্মীয়েরা, তোমরাও এসো না, ফিরে যাও।
বাড়িতে উৎসব ঘটলে ম্যারাপ খরচ বাঁধা হবে,
পত্রদ্বারা-নিমন্ত্রণজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমা
চেয়ে আমি ডাক দেব তখন।
এখন যে যার ঘরে, যে যার ছায়ার মধ্যে থাকো।

শুধু তুমি থাকো এইখানে, এই দুঃখের ভিতরে।
তোমাকে ছায়ার শান্তি কিছুই দিইনি.
তবু রৌদ্রের জ্বালা দিতে চাই।

আমায় কেউ চেনে না

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমিও তাই চেয়েছিলাম—
আমায় কেউ চিনবে না,
আমায় কেউ জানবে না,
তাই আমি চেয়েছিলাম।

জনসমুদ্রে আমি ভেসে চলবো,
খড়কুটোর মতো ভেসে চলবো,
কাছে থেকে জনতাকে জানবো,
আর
তাদের মতো করে তাদের
কথা বলবো—
তাই আমি চেয়েছিলাম।

সবাইকে আমি জানবো—
আমার দেশ ও দেশবাসীকে,
এই পৃথিবীকে এবং প্রকৃতিকে
ভালো করে আমি জেনে নেবো—
তাই আমি চেয়েছিলাম।
আমায় কেউ জানবে না,
আমায় কেউ চিনবে না ;
তাও আমি চেয়েছিলাম।
প্রথম আশা আমার অংশত পূর্ণ,
পরের আশাটি পুরোপুরি :
সত্যি আমায় কেউ চেনে না।

প্রকৃত উক্তি

কৃষ্ণ ধর

ভালো হে ভালো, তুমি চাইছ ভালো
চাইছ তুমি, আমার শুধু দেহটাই
আড়ি পেতে শুনছে যারা
অন্ধকারেই ছিল তারা
এখন যেন চাইছে আমার পুরোটাই।

ভালো হে ভালো, মাসি চাইছ ভালো
এনেছিলে যখন আমায় তোমার ঘরে
কথা ছিল সন্ধ্যাবেলায়
খোঁপায় দেবে মণিলতায়
এখন আমায় দেখছো কেন আড়চ করে ?

ভালো হে ভালো, মাসি চাইছ ভালো।
চাইছ তুমি নিয়ে যেতে হাট-বাজারে
ডুবছি আমি সেও ভালো
উপোস করে রইব কালও
তোমায় দেখলে মাসি আমার ঘেন্না করে।

বয়স

তরুণ সান্যাল

মুক্তি ছিল হাতের মুঠোয়, কেমন মুঠোয়
হয়নি তাও জানানো
ছিঁড়লো সুতো, মুক্তি এখন লাট খেয়ে যায়
লাট খেয়ে যায়
লম্বা গলা ধরতে ছোটে
হাতের লাটাই চমকে ওঠে

তুমি এসব কথার মানে জানো ?

সময় ছিল বুকের মধ্যে, কেমন মধ্যে
ঢিব ঢিবিয়ে সময়
কার কাঁধে যাও, খই ছিটোচ্ছে বিপুল বৃষ্টি
বিপুল বৃষ্টি
নীল শিখা কি প্রেমের ছোঁয়া
মুখ ঢেকেছে কোমল ধোঁয়া

এসব তোমার কখনো মনে হয় ?

বছরগুলি বছরগুলি হাড় মাংসে ফুল, কত ফুল
ফোটালো উদ্যানও
তোমার পায়ে কেমন সে ফুল, হায় সে কি ফুল
হায় সে কি ফুল
দুঃখগুলি নীল নাকি লাল
গ্রীষ্ম বা শীত সন্ধ্যা সকাল
জেগে ছিল কি ধ্যানে, তোমার ধ্যানে

বয়স, এসব কথার কথা মানো ?

কনসার্ট

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বাগান থেকে তাকিয়েছিল
হালফিল-কোটা এক বকুল।
তোমার চুল, কাল দীর্ঘ এলোচুল
আর রামধনু-রঙ শাড়ী,
রূপসী নারী!
আমাকে এক খুসীর হাওয়ার মতই
কোন্ অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আকাশে তখন,
পেটাঘড়ির মতন গোল তামার পাত চাঁদ।
পাতা ঝরার কথায়-কথায় চৈত্রমাসের রাত।
ভাবের মত মুখ তোমার,
ডিমের মত বুক তোমার,
ডিমের কুসুম হাত;
আমার কাছে উত্তাল, সুরের সাগে তাল
তেমনি দ্রুত এক লহরা চাইছিল।
ভুল,
সেই বকুলফুল ভুল;
সেই উলের বল তুমি,
সেই মোমের পুতুল তুমি
সেই ছায়া-ছোঁয়া ধোঁয়া-ধোঁয়া
হ'লুদ বনভূমি—
ভ্যান গ'-এর পেন্সিল স্কেচ তুমি;
আর ধূপদানিতে ধূপ,
সেই মুখে-আঙ ল-বিশ্বভুবন চুপ—

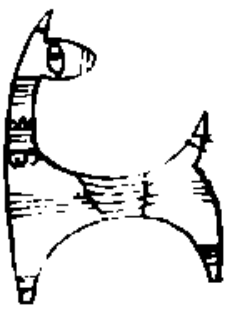

ভুল, অলীক; ভুল, ভীষণ ভুল।

সবই যেন তাকের ওপর
কাচের জারে ধরা ছিল।
তাকের থেকে হঠাৎ তাকে
কে বুঝি কে উল্টে দিল।
সুখের আয়না, সুখের আয়না
এক লহমায় গুঁড়িয়েছিল।
তবু নাটক ঐখানে কি ফুরুই?
কুচিগুলোই কুড়ুই, কুড়ুই, কুড়ুই।
নিজেই নিজের ঘান ফেলি আর তুলি—
বলবে জানি ব্যাথা কুড়ুই, দুঃখ ভুলি;
কিন্তু না যে—
কেমন সে এক বাজনা বাজে, বাজনা বাজে।
শুবার্ট আসেন, মোজার্ট আসেন
কিছুক্ষণ এ বুকের ভাঁজে।
সুরের কাজেই সময় চলে, মগ্ন থাকি।
আমি, আমার প্রাণের সোনার
গানের পাখি।

এখন আমি আর একা নই

মণীন্দ্র রায়

যখন আমি একলা ছিলাম—
গাছের কাছে, নদী কিম্বা মাঠের কাছে
জনান্তিকে স্বপ্ন খুঁজে, লোকালয়ের
গলির মধ্যে মনের পাশে,
মুখের আদল, চোখের ভাষায়
নিজের অর্থ মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়ে,
শুধুই ক্রমে মনেরই এক ঘূর্ণিপাকে
খণ্ড খণ্ড চলন্ত সব প্রতিচ্ছায়ায়
চতুর্দিকের ঘরবাড়ি আর মানুষজনকে
এই-আছে-নেই উথালপাতাল
প্রায় আমারই অবচেতন ভেবেছিলাম—
পারম্পর্যবিহীন অন্ধ ভয় যেখানে এ-ওর থেকে
ক্রমেই দূরে চায় পালাতে।

এখন তুমি আমার সঙ্গে, আমার মনে—
আমি এখন আর একা নই ; তোমার চোখে
চোখ রেখেছি, হাত রেখেছি, তোমার প্রেমে
অবগাহন ইচ্ছা আমি ; আর ভাখো তাই
গাছ-নদী-মাঠ বলছে হেসে, কেমন আছ :
প্রতিবেশীর মুখগুলো সব আয়না যেন,
তারি মধ্যে দেখছি আমার প্রতিফলন ;
সামনে পিছে, এপাশ ওপাশ ভিতর বাহির
অলৌকিকের ব্রোঞ্জেগড়া ত্রিমাত্রিকেই
প্রতিদিনের দুঃখে সুখে উঠছি ফুটে।
তোমায় ভালোবেসে আমি রৌদ্রজলে
আকাশ-ছাদের নিচে অবাক স্বপ্ন এখন ॥

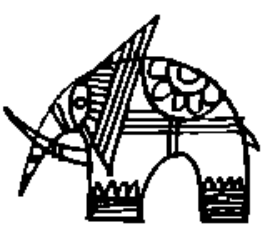

এপার ওপার

সুশীল ঘোষ

দিনের দিগন্তে এসে আজও দেখি, স্বপ্ন বলাকারা—
আয়ত আকাশে ক্লান্ত ছায়া ফেলে উড়ে যায় ; দূরে ;
সন্ধ্যায় চিন্তার চিতা অমর্ত্য-আগুনে জ্ব'লে পুড়ে
বাষ্প—মেঘ হ'লো জ'মে : এখনো সে পেলো না সাড়া।
কেনো বলো, কেন এই অবরুদ্ধ রাত্রিময় ভীষণ কারা
ঘিরে রাখে জীবনেরে ? অবিশ্রান্ত পথে-পথে ঘুরে
উদাস প্রাণে শুধু গান হয় কী করুণ সুরে
শ্রাবণ অভীপ্সা নিয়ে। বাঁচবে কি তবে সেই চারা—

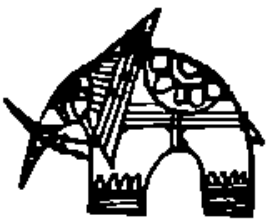

ভালোবাসা, প্রেম, স্নেহের স্মৃতি ? কবে যেন তুমি
পোপনে রোপন করে কবে কা'র শুষ্ক—শূন্য মনে
স্বপ্নের সবুজ দীপ্তি এনেছিলে নৃপ্ত মহীরুহের।

অন্ধ এই জীবন, অন্ধ এই রাত্রি, মরীচিকা-মরুভূমি :
এবার ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত যাত্রী-পৌঁছে, যাবে শেষে ক্ষণে,
তারপর অন্তহীন অভীপ্সিত সীমাহীন রাজ্য আলোকের।

স্বাদ

অনুপম রায়

অমিতা, মিনতি কিংবা আরো যারা স্বভাবত কাছে
এসে স'রে যায় দূরে ; অথবা দূরেই বুঝি আছে :
তারাও আগুন জ্বেলে দিয়েছিলো পলাশের গাছে।

আগুনের স্মৃতি আজ মনে নেই : সময়ের টানে
মাঝে-মাঝে বুঝি সেই স্মৃতিও আগুন হ'তে জানে।
অধুনা জ্বলে না কেহ হৃদয়ের স্মরণীয় গানে।

বরং পরোক্ষে সব ধরাবীতি ভুলে থাকা ভালো ;
আরো ভালো, আগুনের আঁচ নয়, সুদূরের আলো :
অমিতা-মিনতি জানে, জানে বুঝি পলাশের ডালও ॥

আশিস মজুমদার

অকাল বোধন কেন? মাস থেকে আষাঢ়—অর্থাৎ উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন, এসময়ে তাঁরা জাগ্রত থাকেন। আর শ্রাবণ থেকে পৌষ, অর্থাৎ দক্ষিণায়ন দেবতাদের ঘুমের সময়। শরৎকালে দেবীপূজার পূর্বে তাই দেবীকে বোধন বা জাগ্রত করে নিতে হয়। কিন্তু বসন্তকালে দেবীপূজায় বোধন নেই। কারণ দুর্গা-পূজার পক্ষে তা অকাল নয়। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্যে অকালে দেবীর আরাধনা করেছিলেন। সেই থেকে শরৎকালে দুর্গা পূজা চলে আসছে এবং বাসন্তী পূজার জাঁক ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। এই হোলো আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে অকাল বোধনের এই গল্প নেই। যোগবশিষ্ঠ বা তুলসীদাসেও নেই। এ-গল্প পাওয়া যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণে। কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ মাত্র করেন নি। বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে অনেক কিছু জুড়ে দিয়েছেন, তার থেকে বাদও দিয়েছেন অনেক যেমন দস্যু রত্নাকরের গল্প বাল্মীকিতে নেই। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে।

অকাল বোধনের গল্প কৃত্তিবাস কোথা থেকে পেলেন? লৌকিক বিশ্বাস, শরৎকাল বাংলাদেশের পক্ষে সুসময় বলে, এদেশে কৃত্তিবাসের আগেই শরৎ-কালীন পূজার চল ছিল। তাকে একটা পৌরাণিক মর্যাদা দেবার অভিপ্রায়ে কৃত্তিবাস রামায়ণে অকাল বোধনের কাহিনী ফেঁদে বসেছেন। কিন্তু এ বিশ্বাস ঠিক নয়। তার কারণ একাধিক পুরাণে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের গল্প পাওয়া যাচ্ছে এবং এগুলো কৃত্তিবাসের আগেই লেখা। দেবী ভাগবত, মহাভাগবত, কালিকা-পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে রামচন্দ্র অকালে দুর্গা পূজা করেছেন, এ-কাহিনী আছে।

রামচন্দ্রের আগে একাধিক দেব-দেবতা কালে বা

অকালে দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য-চণ্ডী, দেবী ভাগবত ইত্যাদিতে সুরথ-রাজার দুর্গা পূজার কথা আছে। মেধসমুনির উপদেশে রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য ভগবতীর পূজা সম্পাদন করেন।

কালান্তরে-পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

সুরথ রাজা বছরের কোন সময় দুর্গা পূজা করেন, সঠিক জানা যাচ্ছে না। প্রবাদ এই যে তিনি বসন্ত-কালে দেবীর পূজা করেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লেখা আছে যে, সমাধি বৈশ্য ও সুরথ রাজা শরৎকালে ভগবতীর পূজা করেন।

ব্রহ্মাও একবার মহামায়ার স্মরণ নিয়েছিলেন, তাঁর স্তব করেছিলেন। বিষ্ণু সমুদ্র-মধ্যে অনন্ত শয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। এমন সময়ে তাঁর কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য জন্ম নিল। তারা বিষ্ণুর নাভিস্থিত ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। ব্রহ্মা তখন নিরুপায় হয়ে মহামায়ার স্তব করতে লাগলেন। মহামায়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করলেন এবং বিষ্ণু মধু কৈটভকে শেষ করলেন।

মহিষাসুর বধকালে দেবতারা সদলবলে আর একবার দেবীর আরাধনা করেছিলেন। তৎপূর্বে অবশ্য তাঁরাই নিজেদের তেজ দিয়ে দেবীকে গড়ে তুলেছিলেন।

শুম্ভ নিশুম্ভকে হত্যা করবার জন্যে দেবতারা দেবীর স্মরণ নিয়েছিলেন একবার। তাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভকে হত্যা করলেন।

ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতারা কোন্ সময়ে মহামায়ার স্তব বা পূজা করেন; পুরাণাদিতে তা লেখা নেই। যাঁদের দুর্গা পূজার কাল বা মাসের উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গোলক-ধামে মধুমাসে অর্থাৎ বসন্তকালে দেবীর পূজা করেন।

পূজা কৃতা চ গোলকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা
সম্পূজ্য মধুমাসে চ প্রাক্তেন রাসমণ্ডলে।

—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।

এছাড়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার আশায় গোপ রমণীরা অগ্রহায়ণ মাসে, তার মানে, হেমন্তকালে দুর্গার পূজা করেন।

তবে রাবণ কোন্ সময়ে দেবীর পূজা করেছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। কারও কারও মতে রাবণ বসন্তকালে বাসন্তী পূজা করেছিলেন। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, রামের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিনিও দেবীর স্তব করেছিলেন, তবে অকাল বোধন ছাড়াই।

অচৈতন্য হ'য়ে রাজা লুটায় ভূমির।
অম্বিকারে স্তব করে হইয়া কাতর॥
কোথা মা তারিনি তারা হও গো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময়॥

—রাবণের অম্বিকাস্তব : কৃত্তিবাসী রামায়ণ

পরে তাঁর পক্ষ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে রাম দুর্গার পূজা করেন। যাই হোক, রামচন্দ্রের এই দেবী-পূজা পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি তো পেয়েইছিলো, পরন্তু তিথিতত্ত্ব, পুরোহিতদর্পণ ইত্যাদিতে তার স্থান হয়েছিল। দুর্গা পূজার মন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়িকৃতঃ পুরা।

পরবর্তী রামায়ণে এবং এতদধিক গ্রন্থে শারদীয়া পূজার উল্লেখ এবং বিবরণ রয়েছে,

রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা
তোমার বোধন কৈলা অকালে বিধাতা

—কবিকঙ্কন চণ্ডী

দুর্গা পূজার মোট সাতটি কল্প আছে। সাতটি কল্পের মধ্যে যেকোনো এক কল্পে পূজা সম্পাদন করতে হবে, এই হোলো তিথিতত্ত্বের বিধান। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-নবমী থেকে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা করা হয়, তার নাম নবম্যাদি কল্প। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা, তাকে বলে প্রতিপদ্ কল্প, আশ্বিন শুক্লাষষ্ঠী থেকে মহানবমী পর্যন্ত ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত অষ্টম্যাদি কল্প,

কেবল মহাষ্টমীর দিন অষ্টমী কল্প এবং নবমীকল্প। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখলুম, রাম কল্প বিষয়ে একটু চিন্তিত ছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে কল্প স্থির করে দেন।

বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কল্প ষষ্ঠীকল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায় বিধি যদি পুনরায়
কল্পযদ্যে সুরথ রাজন্

—অকালে দেবী পূজা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে, ব্রহ্মা নিজেই রামের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে রাবণের বধের জন্য রাত্রিকালে মহাদেবীর বোধন করেছিলেন। আর এবিষয়ে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা তো রয়েইছে।

একশ আটটি নীলপদ্মের গল্পও রামের দুর্গা পূজার অনুষঙ্গে পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে, রামচন্দ্র একশ আটটি নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দেবী ছলনা করে একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। তখন রামচন্দ্র আপনার একটি চক্ষু উৎপাটন ক'রে দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করতে এগিয়ে আসেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পূজা গ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসেও এ কাহিনী আছে।

চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥

—দেবী কর্তৃক পদ্ম হরণ :
কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

স্কেচ : ব্রজগোপাল (পেন্টারস ক্যালকাটা)

পত্র-পত্রিকায় সংগীত নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়। আমরা আমাদের বাল্যকাল থেকে কবিগুরুর লেখা প্রবন্ধ পড়ে এসেছি ; তাতে তিনি সংগীতের নানা পক্ষ নিয়ে আলোচনা করেছেন, নানা সমস্যার উল্লেখ করে তার নিরসন করেছেন সংগীতের উদ্দেশ্য, রূপ, তাৎপর্য, সার্থকতা, সদ্ব্যবহার অসদ্ব্যবহার, প্রয়োগকুশলতা, উদারতা অনুদারতা, কুশলতকতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে তাঁর সুচিন্তিত উপলব্ধ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতদের সংগীততত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখাও আমরা পাঠ করেছি। পরবর্তী কালে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও গুণী সংগীত শাস্ত্রিকদের নানা রচনাও আমরা সাগ্রহে পাঠ করেছি সংগীত শিক্ষার্থীর মন ও বুদ্ধি নিয়ে। এর উপর ভাতখণ্ডেজীর বা সমসাময়িক সংগীত তাত্ত্বিকদের রচনার কথা তো আছেই।

কিন্তু এই সমস্ত রচনার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান আহরণ করবার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া বা সংগীতের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করা। আগেকার দিনের প্রয়োজন অনুসারে সে যুগের সংগীত আলোচনা বা সমালোচনা ছিল সংগীতকে নিয়ে, শিল্পী বা তার শিল্পকর্মের পরিচয় নিয়ে নয়।

আজকের দিনে সাধারণ শ্রোতার কাছে সংগীতকে বোঝবার একটা নতুন পথ তৈরী হয়েছে—সেটা হচ্ছে শিল্পীদের সংগীত পরিবেশন নিয়ে যে সমস্ত সমালোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলি পাঠ ক'রে এবং তাদের মর্ম উপলব্ধি করে সংগীতের ক্রিয়া-স্বরূপের একটা যথা-সম্ভব ধারণা করা। বাস্তবিক, শুধু সংগীত কেন, সংসারের যাবতীয় অনেক বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের লেখা সার্থক সমালোচনা প'ড়ে যা শেখা যায়, হয়তো বা সেই সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বগ্রন্থ পাঠ ক'রেও ততোটা আয়ত্ত করা যায় না।

কাগজপত্রে সমালোচনা পাঠ ক'রে সংগীত সম্বন্ধে জানবার বোঝবার যে সুযোগ তার দ্বারা সংগীতের প্রসার বা জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে এটা আশা করা যায়। কিন্তু সমালোচকদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি যথাযোগ্য না হয় তাহ'লে শুধু সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব নয়, সংগীত জগতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বিদ্বেষ, বিভেদ এবং এক-কথায়

অশেষ বিশৃঙ্খলা আর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনারই সৃষ্টি হয়।

সমালোচনা জিনিসটা অবশ্য কাগজ পত্রের একচেটে সম্পত্তি নয়। মুদ্রাযন্ত্রের বাইরের জগতেও সমালোচক এবং সমালোচনার ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। এবং তারও প্রয়োজন আছে অর্থাৎ ন্যায্য সঙ্গত সমালোচনার, তর্ক-বিচারের, সন্দেহ-নিরসনের, যোগ্যের সমর্থনের এবং অযোগ্যকে অস্বীকারের প্রয়োজন আছে বৈ কি।

কিন্তু এখানেও সেই একই প্রশ্ন আছে যাঁরা সমালোচনা করবেন তাঁদের সে যোগ্যতা আছে কি? মানুষ যখন কোন জিনিসকে ভালবাসে এবং বাসতে থাকে তখন সেই জিনিস সম্বন্ধে তার অনিষ্ঠতা জনিত একটা আপাত ধারণা জন্মায় এবং সেই জন্য সে নিজেকে কতকটা জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার অধিকারী মনে করে। এবং তার ফলে সে নিজের সাধ্য এবং যুক্তিযুক্ত অভিমত ব্যক্ত করতে থাকে এবং নানা রকম তুলনার অবতারণা ক'রে সমালোচনা করতে থাকে। কিন্তু তুলনটা, একশোর মধ্যে নিরনব্বুই স্থানে হয়, ভুলে। অর্থাৎ তার যুক্তি জিনিসটা খানিকটা জন্মগত কিন্তু অনেকটা শিক্ষা, অনুশীলন এবং একাগ্র সাধনার বস্তু। নিজের বিচারের শক্তিকে অমোঘ অভ্রান্ত পথে চালাবার জন্য দীর্ঘদিনের ধীর শান্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। এ সাধনা সকলের জন্য নয়।

কিন্তু সংগীত যেন এমন একটা বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যা নিয়ে সকলেই নিজের মত শুধু ব্যক্ত করতে চাইছে তা নয়, যার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই মনে করছে যে তার মতই সব চেয়ে বেশী যুক্তি সঙ্গত এবং শিরোধার্য। এর পিছনে কারণঅনুসন্ধান করলে যা যা পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নলিখিত অবস্থা বা ঘটনাগুলি গণ্য হ'তে পারে:

১—কেউ হয়তো বাল্যকালে কোন বিখ্যাত বা অখ্যাত সংগীতবিদ্ বা কলাকারের সংগীতবিদ বা কলাকারের সংস্পর্শে এসেছিলেন বা তাঁদের কাছে কিছু শিখেছিলেন। অতএব তাঁর সমালোচনার অধিকার আছে।

২—কেউ হয়তো আশৈশব সংগীত শোনবার অবকাশ পেয়েছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অনেক সংগীত-আসরে যোগ দিয়ে গান বাজনা শুনেছেন যতস্ফূর্ত আগ্রহের সঙ্গে। অতএব তাঁর শিল্পীদের সমালোচনা করবার অধিকার আছে।

৩—অনেকে আছেন যাঁদের বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন অথবা কোন নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়, যশস্বী শিল্পী। অতএব তাঁদেরও ছোট বড় সব শ্রেণীর শিল্পীদের গুণাগুণ বিচার করবার অধিকার জন্মেছে।

৪—যাঁরা কোন বিখ্যাত (কর্মগুণে হোক বা ভাগ্যগুণে হোক) গায়ক বা বাদকের সাগরেদী করেছেন, অল্পদিন বা দীর্ঘদিন ধরে, তাঁদের সমালোচনা যে তীব্র হ'বে এ আশা তো করবারই কথা।

৫—আমাদের দেশে অনেক পরিবার আছে যে পরিবারের পূর্বপুরুষদের আমলে নিজেদের গৃহে বা প্রাসাদে বহু গুণী শিল্পীদের আগমন, গানের আসর, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি ঘটেছে। এই সমস্ত পরিবারের সন্তানদের উত্তরাধিকার আর কিছু না থাকুক সংগীত সমালোচনার অধিকার যে স্বতাবতঃই আছে তা অস্বীকার কে করতে পারে? কারণ প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা অথবা খুল্লতাতদের ব্যক্তিগত অনেক অভিজ্ঞতার কথা পরিবারের সকলেরই কণ্ঠস্থ।

এইভাবে সমালোচকদের আরো অনেক শ্রেণী নির্ধারণ করা যেতে পারে। যে সমস্ত শ্রেণীর সমালোচকদের কথা উল্লেখ করা হোল তাদের যে শিল্পীর শিল্পমূল্য বিচার করবার ক্ষমতা থাকতে পারে না সে রকম কোন ইঙ্গিতে করা লেখকের মোটেই উদ্দেশ্য নয় কারণ উল্লিখিত যে কোন একটা শ্রেণীর বর্হিভূত হতে পারা সার্থক সমালোচক হওয়ার পক্ষে সহায়কই হবার কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে, শুধু ভাগ্যসূত্রে কতকগুলো সুবিধাজনক সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেই সংগীতের ক্ষেত্রে সমালোচনা করবার বা সেই সমালোচনা সর্বজন গ্রাহ্য

হ'বে তা আশা করবার কোন যুক্তি নেই। প্রকৃত সংগীতের পরিবেশে থেকে, প্রকৃত গুণী-শিল্পী সংগলাভ করে, তাঁদের কাছে তালিম বা জ্ঞান লাভ ক'রে সেই জ্ঞানকে ধ্যান; সাধনা, সমীক্ষা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধির পর্যায়ে না নিয়ে যেতে পারা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকৃত সমালোচকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। অর্থের জন্য সমালোচকের বৃত্তি গ্রহণ অন্য প্রসঙ্গ।

আমরা এতক্ষণ সেই সব সমালোচকের কথাই বললাম, যাঁরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যগত সংগীতকে অন্ততঃ ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁরা দেশের প্রাচীন সংগীত সংস্কৃতির বিরোধী। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যে কোন মূল্যমান নেই এমন দাবী এই সংস্কৃতির প্রবলতম সমর্থকরাও বোধ হয় করেন না। কিন্তু আমাদেরই দেশে বহু সংগীত-অনুরাগী আছেন যাঁরা নিজ নিজ রুচির খাতিরে দেশী বা বিদেশী, প্রাচীন বা অর্বাচীন বিভিন্ন ধরনের ও ধারার সংগীতে আসক্তি পোষণ করেন কিন্তু আমাদের পরম্পরাগত প্রাচীন উচ্চাংগ সংগীতের মধ্যে কোন কিছুই এঁদের আকর্ষণ করে না। এই সংগীত সংস্কৃতির কিছুই তাঁরা জানেন না, বোঝেন না, একে তাঁরা এতোই অপছন্দ করেন যে এই শিল্পের এবং শিল্পস্রষ্টাদের কঠোর সমালোচনা করেই তাঁরা গর্ব বোধ করেন।

বাংলাদেশে কিছুদিন থেকে হঠাৎ শিল্পী সমালোচনার একটা ঢেউ এসেছে। নামকরা পত্র-পত্রিকারা সমালোচকদের আস্তর এবং প্রস্তর নিক্ষেপ। এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। শুধু একটা প্রশ্নের উদ্ভব আপনা থেকেই হচ্ছে—এই সমস্ত সমালোচকদের মধ্যে ক'জন সমালোচনার প্রকৃত অধিকারী, এঁদের সমালোচনার সমালোচনা করবার কথা কি এঁদের নিয়োগকর্তারা চিন্তা করেছেন?

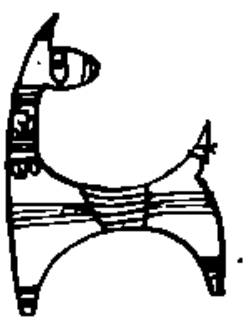

(২৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

আমার দিন ফুরিয়ে এল ; আর দেরি করে না। তোমাকে ছেড়ে আর আমি থাকতে পারছি নে। পনেরটা দিন কেটে যাওয়ার পর সুবল অস্থির হয়ে উঠলো। চম্পার সুখের কথাটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল ? তার সেই সজল চোখের চাহনি, তার অন্তরের না-বলা কথাটার কোন দাম নেই ?

তারপরই সে ছুটেছিল চম্পাদের বাসায়। গিয়ে শুনল, চম্পা বাসায় নেই, কলকাতায় চলে এসেছে। তার জন্যে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছে।

চিঠিটা সেইখানে দাঁড়িয়েই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো সুবল। তারিখ দেখে সে বুঝতে পারল যেদিন তার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই দিনই সে চিঠিটা লিখেছে, আর, সেই দিন রাত্রির ট্রেনেই সে কলকাতায় চলে এসেছে। চম্পা লিখেছে : আজকে তোমাকে আমি যেদিন প্রথম পেলাম সেদিন থেকেই তুমি আমাকে জয় করে ছিলে। হাসপাতালের দিনগুলি তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-ভবিষ্যৎ কেবল তোমাকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছিল। আমি জেগে জেগে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তোমার ধ্যান করেছি। আজ আর কিছু দেওয়ার নেই আমার। আমি আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। আমাকে কাছে পেলে তুমি অসুখী হবে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

কয়েকবার চিঠিখানা পড়লো সুবল ; তারপর, পকেটে পুরে ফেললো। সাদা দেওয়ালের দিকে কয়েক মুহূর্ত বোবা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে-ধীরে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। আগের মত আর এপাশ-ওপাশ ঘুরলো না ; সোজা হয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলো।

পরের দিন স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি সরগরম হয়ে উঠলো। ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরের লোকেশ সেনের মৃত্যু হয় নি ; তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। জাহাজের দুর্ঘটনার যখন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় "শিক রুমে" পড়েছিলেন তখন জাহাজের ডাক্তার সুবল ছট্ট চার্ট তাঁর শিরার মধ্যে "হেভি ডোজে" মরফিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সুবলবাবু তাঁর অপরাধ স্বীকার করে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ব্যাপারটা জানাজানি হওয়া মাত্র কোথা থেকে যেন দৌড়িয়ে এল চম্পা ; জেল হাজতে সুবলের সঙ্গে দেখা করল ; তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলল : এ তুমি কী করলে, এ তুমি কী করলে ? আমার ওপর অভিমান করে তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন ? আমি জানি একাজ তুমি করতে পার না।

সুবল শান্ত ভাবে বলল : কিন্তু কথাটা সত্যি।

বারবার মাথা নাড়লো চম্পা : না, না, এ সত্যি নয় ; সত্যি হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি নে।

কিন্তু সুবলকে কিছুতেই 'না' বলানো গেল না।

শুরু হল বিচার। জাহাজের ক্যাপটেন, পুলার কারগো, চীফ অফিসারদের তলব করা হল। সুবলের চাকরির যে এক নম্বরের, ও রকম নীচ কাজ করা যে তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, এই কথাগুলিই তাঁরা নানাভাবে আদালতকে জানিয়ে ছিলেন। অচৈতন্য অবস্থায় থাকাকালীন জাহাজে লোকেশবাবুর মাথায় যে এক্স-রে করা হয়েছিল, তার প্লেটগুলিও দাখিল করা হল। সেগুলি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা জানালেন যে সেরিব্রেল হেমারেজের সব কটি নিদর্শনই সেখানে বর্তমান। ও রকম মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সাধারণত শতকরা দু'ভাগ। সেই দু'ভাগের মধ্যে লোকেশবাবু পড়তেন কিনা তা বলা সম্ভব নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে লোকেশবাবু বেঁচে থাকতেন, তাহলে, একথাও সত্যি যে বিকলাঙ্গ অবস্থায়, যে-কোন সময় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই তাঁকে বেঁচে থাকতে হোত।

ডাক্তারদের সুচিন্তিত অভিমত যাই হোক, আইনের কাছে দুভাগ-একভাগ নেই। মৃত আর জীবন্মৃতের মধ্যে তার কাছে অনেক ফারাক। কী হলে কী হোত তা নিয়ে আইন ব্যস্ত নয় ; কী ঘটেছে সেইটাই হল আইনের চোখে সব চেয়ে বড় কথা। তবু, সুবলই যে লোকেশবাবুকে হত্যা করেছে সে-বিষয়ে একমাত্র আসামীর এজাহার ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ আদালতের কাছে ছিল না। রায় দেওয়ার সময়ে জজসাহেব এ-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী যেখানে নিজেই ফরিয়াদী সেখানে স্বয়ং ভগবানের-ও হাত-পা বাঁধা।

দু'বছর জেল হয়ে গেল সুবলের।

চম্পা সেদিন আদালতে হাজির ছিল।

খালাস পাওয়ার দিন জেল-গেটের সামনে এসে দাঁড়াল সুবল।

সেদিন-ও চম্পা জেল-গেটের সামনে হাজির হল।

চম্পা বলেছিল : দাঁড়িয়ে কেন ? এস।

সুবল একটু হেসে বলেছিল : না।

তারপর, মাথা নিচু করে, ধীরে-ধীরে অন্যদিকে মিশে গিয়েছিল সে।

স্বর্ণচক্ষু

সমরেশ বসু

সকাল থেকেই আজ থানায় ভিড়। একটা বিশেষ উত্তেজনাও আছে। দুটি পুরুষের মৃতদেহ বারান্দায়, কাপড় ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঢাকা কাপড়গুলো রক্তাক্ত। বাসি শুকনো রক্ত। বোঝা যায় মৃত্যুর ঘটনা গতকাল রাত্রে বা অন্য সময়ের, আজ সকালের নয়।

থানায় মেয়ে পুরুষের ভিড়। বাঙালী অবাঙালী, উভয় পক্ষই সেখানে রয়েছে। মেয়েদের কারুর কারুর কোলে বা সঙ্গে শিশুরাও রয়েছে। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কান্নাকাটি করছে। তাদের প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে সঙ্গী পুরুষেরা। সেপাইরাও কান্না থামাতে বলছে।

থানার হাজত ভরতি বন্দীদের ভিড়। একটু আগেই একদল বন্দীকে, মহকুমা হাজতে, পাঠানো হয়েছে জাল ঘেরা গাড়িতে ভরে। সেই দলটা সবাই বাঙালী। এখন যারা হাজতে রয়েছে তারা সকলেই অবাঙালী। সম্ভবতঃ তারা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশের মানুষ। কিন্তু বাঙালীদের ভাষায়, তারা সবাই বিহারী। মারা-মারি, নিহত, আহত, গ্রেপ্তার, উত্তেজনা, সব কিছুই ঘটেছে বিহারী বাঙালী দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে।

যে মৃতদেহ দুটি বারান্দায় গলা অবধি চাকা দেওয়া রয়েছে, তাদের একজনের দুস্থিত বয়স, মোটা গোঁফ। বয়স চল্লিশ পঞ্চাশের মধ্যে। আর একজনের বয়স তিরিশ বত্রিশ হতে পারে। মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফদাড়ি কামানো। দেখলেই মনে হয়, যেন, একজন অবাঙালী, আর একজন বাঙালী। দুজনই ছুটে আলাদা আলাদা এলাকায় খুন হয়েছে।

দুজনেরই আত্মীয় স্বজনেরা এসেছে। তারাই কান্না-কাটি করছে। মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনকে ফিরিয়ে না দেবারই মনস্থ করেছে থানার কর্তৃপক্ষ। কারণ, তাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এ অঞ্চলের অবস্থার আরো অবনতি হতে পারে।

গত পরশু থেকেই গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। পরশু রাত্রি থেকেই একটা মুখোমুখি দাঙ্গা বেঁধে গিয়েছিল। কারণ, রাজনৈতিক। রাজনৈতিকই বলতে হবে। কারণ, একটি কারখানার ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে, দুই দলের সংঘর্ষ বেধেছিল। প্রথম সংঘর্ষটা ছিল, আরো কয়েকদিন আগের। কারখানা কর্তৃপক্ষের কিছু পোষা লোক, তারাও শ্রমিক বলেই পরিচিত। আর অধিকাংশে, যারা ধর্মঘট করেছে, তাদের মধ্যেই সংঘর্ষ লেগেছিল। পরিণতি, পোষা লোকগুলোর মার খেয়ে পলায়ন। ধর্মঘটীরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, দালালগুলো আপাতত আর মুখোমুখি হবে না, এই আশায়।

কিন্তু জলে বাস করে, কুমীর সম্পর্কে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, এও খানিকটা সেইরকম। সহসা, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, আবার ওরা দল বেঁধে এসেছিল। আবার সংঘর্ষ। তাতেই একজনের মৃত্যু হয়। আর সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই, বিহারী বাঙালী দাঙ্গা লেগে যায়।

দাঙ্গার পরিণতি, প্রচুর গ্রেপ্তার। অনেকের পলায়ন। এবং সর্বোপরি সমাধানহীন ধর্মঘট সম্পর্কে সংশয়, হতাশা। একদিক থেকে বলতে গেলে, ধর্মঘট বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটীদের পরাজয় আসন্ন বলে মনে হয়। কারণ একবার যখন বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গা বাধানো গিয়েছে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা অনেকখানি জাগানো গিয়েছে, যারা এক সঙ্গে ধর্মঘট করেছিল, একই কারখানার লোক, তখন ধর্মঘট টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

কেমন করে সহসা এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো, কোন যাদু বলে, তার হদিস দেওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায়, শিল্পাঞ্চলে এরকম ঘটনা নতুন নয়। এবং এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত। এই কুৎসিত ছকটা যে কখন কী ভাবে, তার গণ্ডিত পুঁজ রক্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, আগে থেকে যেন কিছুই জানা যায় না।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, শাসনের স্বার্থে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ নতুন নয়। বর্তমানে, শিল্পাঞ্চলে প্রাদেশিক বিবাদ আর দাঙ্গা হল, একটা সাধারণ ঘটনা। কারখানার মালিকদের ঐক্য যাদের সমস্যা, যে কারখানা কর্তৃপক্ষ বা রাজনৈতিক দলের, তাদের সব থেকে সহজতর সমাধান হল, এই শ্রেণীর দাঙ্গা।

অতঃপর, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এই দাঙ্গার সূত্র-পাত, সেই ধর্মঘটের কথা আর কারুর বিক্রী নয়। একদিকে বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে থাকে একদল, অন্যেরা শান্তির বাণী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। স্বাভাবিক তাদেই

তখন শান্তির প্রয়োজনটাই সকলের কাছে বেশী হয়ে ওঠে। অন্য বিষয় পরে।

এখানেও বর্তমানে সেই অবস্থা চলেছে। ধর্মঘটের নেতৃস্থানীয় লোকেরাই সব থেকে আগে গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকী গুণ্ডা বদমায়েস এবং সাধারণ ধুরকেরাও বাদ যাচ্ছে না। আশেপাশের অন্যান্য কারখানাগুলোও যাতে সংক্রামিত হয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টা চলেছে। যদিও, সমস্ত কারখানাতেই হাজিরার সংখ্যা কম। যেখানে অবাঙালীর সংখ্যা বেশী, সেখানে বাঙালীরা যেতে সাহস পাচ্ছে না। যেখানে বাঙালীদের ভিড় সেখানে অবাঙালীরা ঢুকছে না। এলাকাগুলো বিশ্রিত হয়ে পড়েছে। পাড়া এবং মহল্লাগুলোরও সেই অবস্থা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় যা ঘটে। দুজনকেই পাওয়া গিয়েছে ছুটো বিচ্ছিন্ন জায়গায়। একজনকে পাওয়া গিয়েছে গঙ্গার ধারের ঘষলা ফেলা ডিপোর কাছে। আর একজনকে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তার ধারে একটা পোড়ো জমির ঝোঁপ জাওড়ার জঙ্গলে। এগুলোকে ঘুপচুক খুনই বলা যায়। সেই জন্যই, এখনো নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, আরো নিহত হওয়ার সংবাদ আসবে কী না।

সকাল আটটা প্রায়। তার মধ্যে ছটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখনো হয় তো কোথাও কেউ খুন হয়ে পড়ে আছে, লোকের চোখে পড়েনি। গতকাল রাত্রি থেকে যারা বাড়ি ফেরেনি, তাদের আত্মীয় স্বজনেরাও অনেকে থানায় এসেছে। যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। কারফ্যু-তে গ্রেপ্তার হয়ে, থানায় থাকলে, সেটাকে সুখবরই বলতে হবে। কিন্তু দেখতে না পাওয়া গেলে যা তার চেয়েও ভয়ংকর, যদি মৃতদেহ দেখতে হয়, সেই ভয়ও অনেকের চোখে মুখে রয়েছে। নানান কারণেই, থানা সরগরম। স্থানীয়, বাঙালী অবাঙালী ব্যক্তিদের যাতায়াত চলেছে। তাঁদের মধ্যে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও আছেন। পুলিশকে, যাঁর যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যাঁর যা পরামর্শ দেবার আছে, দিয়ে যাচ্ছেন। তবে, সকলেই যে পুলিশের কাছে আসছেন, তা নয়। তাঁদের কাছে পুলিশ মোটেই সন্দেহের ঊর্ধে নয়। দাঙ্গার পিছনে, তাদেরও হাত আছে কী না, এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ নন।

তবুও, থানায় অনেকেরই আনাগোনা চলছে। ঘন ঘন টেলিফোন বাজছে। এস, ডি, ও, এস, ডি, পি, ও। ডি, এম, ঊর্ধতনেরা সকলেই গতকাল ঘুরে গিয়েছেন। আজও কেউ কেউ আসবেন, সন্দেহ নেই। থানার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ছাড়াও, রিজার্ভ পুলিশের সংখ্যাই এখন এ এলাকায় বেশী। তাদের গাড়িগুলো শহরে টহল দিচ্ছে। স্পেশাল অফিসার যারা এসেছে, তাদের নিয়ে জিপ্ ছুটোছুটি করছে।

প্রায় তিন মাইল এলাকা জুড়ে, ভীতির ভাব সবত্রই বর্তমান। দিনের বেলাও রাস্তাঘাটে লোক চলাচল বিশেষ নেই। একমাত্র নিজে নিজেদের এলাকাতেই যা একটু ভিড়। মিশ্রিত এলাকাগুলোর অবস্থা সব থেকে খারাপ। সেই সঙ্গেই, গুজবের ছড়াছড়ি চারদিকে। নিহতের সংখ্যা, গুজব রটনাকারীদের মুখে মুখে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডবলের ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অগ্নি সংযোগ, লুটের খবরও কম নয়। সেই সঙ্গে নারীধর্ষণের সংবাদও আছে।

থানা ইনচার্জ-এর ঘরে কয়েকজন বসেছিল। ইনচার্জ নিজেও তার চেয়ারে বসে আছে। লোকটির বয়স বেশী নয়। বছর দুয়েক আছে এ অঞ্চলে। অবিবাহিত, যদিও বিয়ের বয়স হিসাবে, তখন বেশীই হয়েছে। চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে দু পাশের রগের কাছে। চোখ ছুটো বড় উজ্জ্বল, আর তীক্ষ্ণ, সেই তুলনায় মুখটা খলখলে। তার অভিব্যক্তি একটু বোকাটে। নাম শ্যামাচরণ।

এ অঞ্চলের একটা, সুনাম দুর্নাম, যা-ই হোক, আছে। সেটা হল, বছর দুয়েক কোন থানা ইনচার্জ এ থানায় টিকে থাকতে পারলে, লাখ দুই তিন টাকা সে পকেটে করে নিয়ে যেতে পারে। কী ভাবে, এবং কথাটা কতখানি সত্যি, এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কথাটা একটা কিংবদন্তীর মতই প্রচলিত। শ্যামাচরণের কতখানি

হয়েছে, কে জানে। বাইরে থেকে তাকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। সে মদ খায় না, বিড়ি সিগারেটের নেশাও নেই। চালচলনও সে রকম কিটকাট স্মার্ট নয়।

তার ঘরে যারা বসেছিল, ওরা সকলেই এ অঞ্চলের নাম করা গুণ্ডা আর ছিনতাই। তাদের মধ্যে বাঙালী অবাঙালী, দু পক্ষই আছে। তারা বসেছিল, দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের বেঞ্চিতে।

আর একজন, শ্যামাচরণের টেবিলের সামনে, প্রায় মুখোমুখি, চেয়ারেই গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। সে বেঞ্চির দলের নয়, বোঝাই যাচ্ছে। শ্যামাচরণ তা হলে তাকে এখানে বসতেই দিত না। এমন কি, পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যেই বয়স, ছোকরা যে ভাবে সিগারেট খাচ্ছে চোখ আধ বোজা করে, তাতে মনে হয়, বড় দারোগাকে নিয়ে, ওর কোথাও কোন সঙ্কোচ নেই। টেরিকটের অলিভ-গ্রীন সফ ট্রাউজার ওর পরনে। গায়ে তদ্রূপ কাপড়েরই লাওয়াইয়ান স্মার্ট। তেমন পরিষ্কার নয়। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া টেবিলের তলায় খোলাই রয়েছে। দুটো খালি পা মাটিতে ছড়ানো। রোগা রোগা, এক-হারা গোছের মাঝারি লম্বা গড়ন। চুল ছোট করে ছাঁটা, প্রায় কপালের দিকেই সামনে টেনে দেওয়া। অথবা চিরুনি ছোঁয়ায় নি, হাত দিয়েই কোনরকমে কাজ সেরেছে।

এমন একটা নির্বিকার ভাব ওর যে, বেঞ্চির লোকগুলোর সঙ্গে কোন মিলই নেই। বেঞ্চির লোক-গুলো চেহারা পোশাক চাউনি, সবই ভিন্ন ধরনের। হয় তো তাদেরও স্মার্ট প্যান্ট সবই আছে, তথাপি রুক্ষ চুল, চোখ মুখের অভিব্যক্তি, সবই আলাদা। একটা ভয় ভয় বিব্রত সাশেরের ভাব তাদের মুখে।

শ্যামাচরণ সেইদিকেই, এক জনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হল কানু, জিজ্ঞেস করলাম যে, কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?'

কানুর চোখ লাল, নিদ্রার অভাবেই একটু ঢুলু ঢুলু। চোখের কোল বসা। বললো, 'বাতালাম দাব, কাল রাত যে তো ঘরেই ছিলাম।'

শ্যামাচরণ ধমক দিয়ে ওঠে, 'বাজে কথা ছাড়। কে জানে, তুই বাড়ি ছিলি?'

'বাড়িতে বাবুকে পুছিয়ে দেখেন না।

চেয়ারে বসা ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলো, 'তোর কটা বউ আছে, তা-ই আগে বল্ কানু।'

কথা শেষ হবার আগেই, শ্যামাচরণ ধমকে ওঠে। 'তুমি চুপ কর অশোক, তোমার কথা আমি শুনতে চাই না। তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করব, তখন জবাব দিও।'

অশোক হাত উল্টে বললো, 'বাঃ বাবা, ভাল কথা বলতে গেলুম, আপনি চটে গেলেন। কানু বললে, ওর বউকে জিজ্ঞেস করতে, তা-ই আমি বলছি, কটা বউ আছে ওর, কোন বউকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। ন নম্বর গলির বউ না, তেরো নম্বর গলির বউ।'

শ্যামচরণ তার খলখলে মুখের চামড়ায় ঢেউ তোলে। ঘুমকে উঠে বলে, 'তার মানে?'

অশোক বললো, 'তার মানে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।'

শ্যামাচরণ বাঘের মত চোখ করে কানুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কটা বউ তোর?'

কানু বোধ হয় একটু লজ্জিত হল। মাথা নিচু করে বললো, 'তিন।'

'শাট্ আপ্ রাসকেল। কী করে তুই তিনটে বিয়ে করেছিস্, বে-আইনি না? আমি এখনই তোর হাতে হাতকড়া লাগাবো।'

কানু রীতিমত চমকিত শঙ্কিত। শ্যামাচরণ টেবিলে চাপড় মেরে আবার বললো, 'এটা মগের মুলুক পেয়েছিস্ তোরা, আইন বলে কিছুই নেই? তিনটে বিয়ে করেছিস, আবার সে কথা বলা হচ্ছে। তার্কে তোর পিঠের ছাল তুলে দেব।'

কানু শুধায় শঙ্কিত মুখটা ক্রমে, অসহায় বোকাটে হয়ে ওঠে। বলে, 'সাব্ শাদী আবার হামকো কেয়সে হবে, কে দেবে?'

'তবে?'

'ওদের আমি খাওয়াই পিয়াই, কাপড়া-চোপড়া দেতা, ঘর ভাড়া দেতা···।'

কথা শেষ হবার আগেই শ্যামাচরণ বলে ওঠে, 'তার মানে রক্ষিত।'

কানু চুপ করে থাকে। শ্যামাচরণও বুঝতে পারে, এ পর্যন্তই তার সীমা। কিন্তু রাগ আর ঘৃণা সে সামলাতে পারে না বলেই, দাঁতে দাঁত পেষে, আর মুঠি পাকাতে থাকে।

অশোক আস্তে আস্তে বলে, 'আর তিনটি স্ত্রীলোক খুনতে হলে, বুঝতেই পারছেন, কত টাকা দরকার। তাই একটু ছিনতাই ওগামি করতে হয়।'

শ্যামাচরণ টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে, প্রায় দেয়াল কাঁপিয়ে বললো, 'তুমি চুপ করবে কী না জানতে চাই।'

অশোক চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। শ্যামাচরণ ওর দিকে জলন্ত চোখে তাকিয়ে আবার বললো, 'কোন হারামজাদার কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিতে চাই না।'

অশোক বললে, 'তা বাড়ির রক থাকলে তাতে বসতে পাব না?'

'না।'

'জানেন আমাদের ঠাকুরবাড়ির বিবাহে

শ্যামাচরণের রাগ এত তীব্র হয়ে ওঠে

শক্ত করে, প্রায় থিয়েটারের রাজার মত, গলার স্বর যথাসাধ্য নিচু করে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'জানি। আর

এখন যারা বসে, তারা কতগুলো .হলার বদমাইস লোচ্চা ছোঁড়ার দল।'

অশোক বললো, 'এটা আপনার রাগের কথা হল বড়বাবু। চাকরি না করলেই বেকার হয় না, আর বাড়ির ঢেকে বসে থাকলেই শুধু বদমাইস হয় না। বাবা ঠাকুর্দারা রেখে গেছে, এরকম একটু একটু গড়িয়ে গেলে, আরো দু-এক পুরুষ চলে যাবে। আর জানেন তো, আমার দুই দাদা আর আমি কেউই বিয়ে করিনি, দরকার নেই।'

শ্যামাচরণ একেবারে কাঁপিয়ে পড়লো টেবিলের ওপরে। বললো, 'যত যে ফুটানি করছো, সেদিনও যে তোমার নামে ডায়েরী হয়ে গেছে। দশ দিনও হয় নি, বটা ঠাকুরের ছেলে নরেনকে মেরে আসনরা করেছ, জামীনে খালাস আছ। এ্যাটেম্পটেড টু মার্ডার কেস্ তো ঝুলছে। খুব যে বড় বড় কথা হচ্ছে? ভদ্রলোকের ছেলে বলে যা খাতির করে চেয়ারে বসতে দিয়েছি, এখনো গায়ে পুরি নি, সেই যথেষ্ট। বেশী কথা না বলে চুপ করে বসে থাক।'

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে, নীরিহ ভঙ্গিতে বলল, 'তা চুপ করে থাকতে বলেন, থাকছি। তবে, আপনাকে তো আগেই বলেছি, নরেশের মত ছেলেকে সরকার আর সমাজ যখন শাসন করতে পারছে না, তখন আমাদেরই টিট করতে হবে।'

'বটে?'

'তা আর কি করা যাবে। পাড়ার মেয়েকে একলা পেলেই কেউ টানাটানি করে, খিস্তি করে, শিস্ দেয়, তাদের কি করা যাবে। তাও যদি, মেয়েটার সায় থাকে, তবু একরকম।'

'আদর্শবাদী, অ্যাঁ? নিজের হাতেই শাসন তুলে নিচ্ছ?'

বলতে বলতে শ্যামাচরণের থলথলে মুখটা শক্ত আর চৌকো হয়ে ওঠে। অশোক এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'শাসন হাতে তুলে নেবার কথা হচ্ছে না। এসব হল পাড়ার ব্যাপার। ছেলে ছোকরারা অন্যায় করলে, পাড়ার লোকেরাই শাসন করে।'

ওর মুখে 'ছেলে ছোকরা' সর্বদা প্রায় হাস্যকর শোনায়। একটু পাকা পাকাও লাগে। কিন্তু শ্যামাচরণের চিত্ত একেবারে জ্বলে যায়। চোখও ধকধকিয়ে জ্বলে। তেমনি চিবিয়ে চিবিয়েই বলে, 'চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর ইয়েতে কেন ছেদা, তাই? নিজেরা দিন রাত্রি রকে বসে ইতরামো করছে যারা, মেয়েদের পেছনে লাগছে, ইশারা করছে—।'

'একদম মিথ্যে কথা।'

অশোক বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

'মিথ্যে কথা?'

শ্যামাচরণ গর্জে ওঠে। অশোক বলে, 'নিশ্চয়ই। আমাদের গ্রুপের ছেলেদের ইতরামো যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, কান ধরে ওঠ বোস্ করব, মাইরি বলছি।'

ওর মাইরি বলার ধরনটাও এমনই হাস্যকর শোনায় যেন, শ্যামাচরণ এর কথার ওপরে কোন গুরুত্বই দিতে চায় না। শ্যামাচরণ অত্যধিক রেগে ওঠে, আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তার মুখে কয়েক মুহূর্ত প্রায় কোন কথায় যোগায় না। তারপরে হাত তুলে, যেন চাপা গর্জনে গরগর করে বলে, 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সামনে ভাল ভাবে কথা বলবে নইলে—।'

দাঁতে দাঁত পেষার চাপে, আর কথাই ফোটেনা তার মুখে। অশোক ঘাড়ে একটা আলতো ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'আপনি খালি রেগেই যান। কী আর বলব বলুন।'

শ্যামাচরণ হঠাৎ অত্যন্ত চিৎকার করে দ্রুত বলতে আরম্ভ করে, 'তোমরা ইতরামি কর না? আমার কাছে কোন খবর আসেনা ভেবেছ? হরিহর চক্রবর্তীর পেছনে তোমরা লাগ না? তাকে দেখলেই টিটকারি দাও না? হরিহর চক্রবর্তী নিজে আমাকে বলেছে, তোমাদের বদমাইসগুলোর জ্বালায় সে রাস্তায় বেরুতে পারে না।'

অশোক প্রায় উৎফুল্লিত হতাশায় বলে ওঠে, 'ছি ছি, সকালবেলাই লোকটার নাম করলেন? আজ ভাত জুটবে না। ওরকম একটা চশমখোর সুদখোর ফেরেববাজ কিপটে লোকের নাম করলে, হাঁড়ি ফেটে

যায়। সেটা বলতে পারেন, ওকে আমরা টিটকারি দিই। তাও এমন কিছু না, "পদ্মবধূ পদ্মবধূ" বললেই লোকটা ক্ষেপে যায়।'

'কেন?'

'কেন আবার। সত্তর বছরের হরিহর চক্রবর্তী যদি এখন ঘোষালদের ষোল বছরের মেয়ে পদ্মকে টাকা দিয়ে কিনতে চায়—মানে, ঘোষালদের তো কেউ নেই, এক বিধবা গিন্নি ছাড়া। অবশ্যও খুব খারাপ। বাড়িটা হরিহর চক্রবর্তীর কাছেই বাঁধা। মর্টগেজ, লাইসেন্স টোন নেই, তাই বাড়িটা বিক্রি কোবালা করেই বাঁধা দেওয়া আছে। ঘোষালদের বিধবা গিন্নি, মাসে মাসে তিরিশ টাকা করে যেন গাড়া দেন, মানে সুদটা এ ভাবেই দেওয়া হয়। আপনিই বলুন, তিন হাজার টাকা ধার দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি এখন সে বিক্রি করে দিতে চায়। তা যদি না হয় তাহলে ঘোষাল গিন্নিকে সে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে, পদ্মকে সে রাখতে চায়। ঘোষাল গিন্নি আমাদের সেটা বলে দিয়েছেন। এরপরেও যদি বুড়োর পেছনে একটু না লাগি, তাহলে চলে কেমন করে বলুন। এতে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। শত হলেও শহরের একটা ধনী লোক, মানগণ্য—।

শ্যামাচরণ সমস্ত ঘটনাটা শুনতে শুনতে, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিল। এতক্ষণ পরে বলে ওঠে, 'তাতে তোমাদের কী? হরিহর চক্রবর্তী যদি কোন অন্যায় করে, সেটা আমরা দেখব। ঘোষাল গিন্নির যদি কোন অভিযোগ থাকে, তিনি থানায় বলতে পারেন।'

অশোক বলে ওঠে, 'ওই আপনাদের পুলিশের ঝামেলা। আপনারা সব ব্যাপারটা থানায় টেনে আনতে চান। আজ যদি ঘোষাল গিন্নি থানায় এসে অভিযোগ করেন, কালকেই তাঁর মেয়ের নামে শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে। তাই আবার কেউ চায় নাকি? ওসব আমরা পাড়ার ছেলেরাই ঠিক করব। চক্রবর্তীর ঘোড় আমরা দেখে নেব। সে রকম ঘটনা ঘটলে, আপনাদের ডাকা হবে।'

শ্যামাচরণ যেন অশোককে খুবই বেকায়দায় ফেলবার জন্যে বলে ওঠে, 'তাহলে তোমরাই টাকাটা দিয়ে বাড়িটা খালাস করে দাও না কেন, সব মিটে যায়।'

অশোক পিছনে এগিয়ে পড়ে বলে, 'অত টাকা আমাদের নেই, সবাই জানে। ঘোষাল গিন্নি তো তা চাইছেন না। তিনি চান, বাড়িটা বিক্রি হোক, চক্রবর্তী তার ন্যায্য পাওনাটা নিয়ে বিদায় হোক, উনি যেন না ঠকেন। কিন্তু চক্রবর্তী হয় দিও মারবে, না হয় পদ্মবধূ খাবে, দেখুন দিকি সতীর কী রকম ধড়ফড়ানি। ওসব আমরা হতে দিচ্ছি না।'

ওর কথা এত স্পষ্ট যে, শ্যামাচরণ কিছুতেই রাগ সামলাতে পারে না। বলে ওঠে, 'তবে মনে রেখ, কোন রেসপেকটেবল সিটিজেন, যদি হিউমিলিয়েটেড বা ইনসালটেড হয়ে থানায় কোনরকম অভিযোগ করেন, আমি ছেড়ে কথা কইব না। আর তোমার ওই সব 'মাইরি', 'ধড়ফড়ানি' যাদের তাদের ছোটলোকদের মত কথাগুলো আমার সামনে কখনো বলবে না।'

অশোক একইভাবে বলে, 'তা বলতে বারণ করেন, বলব না। তবে এসব তো আজকাল সবাই বলে। আপনিও আমাকে কয়েকবার ধচ্চড় টচ্চড় বলেছেন।'

শহরের নাম করা পেশাদার গুণ্ডা কয়েকজন যারা বসেছিল, তারা দুজনের কথাবার্তা শুনে অনেকক্ষণ থেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছিল। এবার অশোকের কথা শুনে, কার গলার শব্দ করে হাসি বেজে ওঠে। শ্যামাচরণ বাঘের মত চাঁকতে ফিরে তাকায় বেঞ্চির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। শ্যামাচরণ জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ হারামজাদা হাসল?'

কেউ কোন কথা বলে না। শ্যামাচরণ গর্জে ওঠে, 'কে?'

কালু বলে ওঠে, 'বাতা না রে সন্তোষ, তুই তো হাসলি?'

সন্তোষ রোগা, শক্ত হাড়ের চেহারা। গুণ্ডা হিসাবে, মুরেতেই তার নাম আছে। তাড়াতাড়ি দুহাতে দুকান মলে বলে ওঠে, 'অন্যায় হয়ে গেছে বড়বাবু। মাপ করে

দেবেন। আপনারা আপোষে এখন লড়ছেন, তাই আর কী।'

'তাই বড্ড হাসি পাচ্ছে, না? যখন পাতলুন খুলে ছ্যাকা দিয়ে দেব, তখন বোঝা যাবে।'

সন্তোষ চুপ করে মাথা নামিয়ে নেয়। চেনাশোনা জাত অপরাধীরা যেরকম ভাব করে, সেই রকম তার ভাব

অশোক আবার বলে ওঠে, 'আসলে আপনাদের কী হয়েছে, পুলিশের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে, যতরকমের—।'

'হোয়াট?'

শ্যামাচরণের গর্জন। অশোক বলে, 'আসল কাল-প্রিট্‌দের ধরতে—।'

'গেট আউট, গেট আউট, আই সে।'

অশোক সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পকেটে নিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'সেই ভাল। আমিও তো তাই চাইছিলুম। মিছিমিছি গুণ্ডা ছিনতাইদের সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেকে বসিয়ে রাখার কোন মানে হয়?

বলতে বলতে ও দরজার দিকে যায়। শ্যামাচরণ আবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'কিন্তু বাড়ি যাবে না এখন। বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা কর, এদের ছেড়ে দিয়ে, তারপরে আমি তোমাকে দেখছি।'

অশোক ফিরে না তাকিয়ে, শরীরে একটা বাঁকুনি দিয়ে বলে, 'আবার! বেশ তাই হবে। শহরে একটা হাঙ্গামা চলছে, একটু ছুতো করে এ্যারেষ্ট করলেই হল। থেকেই যাব।'

ও বাইরে গিয়ে, চারদিকের লোকজন দেখতে থাকে। আবার একটা সিগারেট ধরায়। লোকজনের যাতায়াত, মেয়ে পুরুষের কান্নাকাটি, উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত মুখের ভিড়, সেপাইদের ব্যস্ত আনাগোনা, কোন কিছুতেই যেন ওর তেমন বিকার নেই। নির্বিকার ভাবে দেখে আর সিগারেট টানে। কেবল একবারই ওর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফোটে, যখন দেখতে পায়, পুরুষোত্তম সিং আর বিজয় দাস্তিদার, দুই শান্তি কমিটির নেতা, একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে কথা বলছে। হয় তো, এ লোক দুটোই দাঙ্গার আসল কলকাঠি নাড়ছে, বাঙালী অবাঙালীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এদের কে না চেনে যে, এরা কোম্পানীর দালাল ছাড়া কিছু নয়। আর শ্যামাচরণ দারোগা ঘরের মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

চেঁচালেই যেন সব হয়ে যাবে। শ্যামাচরণ নিজেও কি কিছু জানে না? এ অঞ্চলে সে দু বছর প্রায় দারোগাগিরি করছে। হয় তো, জেনে শুনে আসল জায়গায় হাত দেবার কোন উপায় নেই তার। কথাটা বললে হয় তো শাসনের অমর্যাদা হয়। পুলিশের দুর্নাম হয়। কিন্তু পুলিশের দুর্নাম হওয়ার অপেক্ষা আছে নাকি? পুলিশকে কি লোকে সৎ ভাবে? আসলে, তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ধরতে চাইলেই তারা সবাইকে ধরতে পারে না। তারপরে দেখা যাবে, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। আসলে এটা সর্ষের মধ্যে ভূতের মত, শাসনতন্ত্রের মধ্যেই শঠতা আর অসততা রয়েছে।

কিন্তু শ্যামাচরণ তাকে ডেকে পাঠালো কেন। এখন যে সব কথাবার্তা হচ্ছে, এসব তো প্রস্তাবনা। আসল কথায় নিশ্চয় এখনো আসে নি। অশোককে সে খুব ভালই জানে! ওদের পাঁচ সাতজন বন্ধুদের যে গ্রুপ আছে, তাদেরও ভাল জানে যে, এসব দাঙ্গার মধ্যে অশোক অংশ গ্রহণ করবে না! অন্য কোন কথা নিশ্চয়ই আছে।

তবে শ্যামাচরণের কী রকম একটা অবিশ্বাস আর সংশয় আছে অশোক সম্পর্কে। সেটাও অশোক ভালই বোঝে। অশোককে যেন সে কোনরকমেই বিশ্বাস করতে পারে না। এর প্রথম কারণটা এখনো মনে আছে ওর। ওদের এই শহরেরই শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, হঠাৎ খুন হয়। খুনই যে হয়, সেটা প্রথম জানা যায় নি। শ্রীনিবাস চক্রবর্তীকে একদিন সকালবেলা উঠে আর পাওয়া গেল না।

লোকটার বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। মোটামুটি শক্ত সমর্থ চেহারাই ছিল। তা হলেও, ডাক্তার তাকে উপদেশ দিয়েছিল, রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, হাঁটা সম্ভব পারে হেঁটে বেড়াতে। তাই বেড়াচ্ছেন শ্রীনিবাস। তবে একলা নয়। সমবয়সী আরো কয়েকজন জুটেছিল, যারা তার প্রতিবেশী। সকলের প্রতিই ডাক্তারের প্রায় এক রকমই নির্দেশ ছিল। নিতান্ত একলা একলা মুখ বুজে বেড়ানোর থেকে, সে তবু একরকম সঙ্গ ছিল না। ষাট বাষট্টি বছর বয়সের কয়েকজন বৃদ্ধ এক সঙ্গে, হাতে ছড়ি নিয়ে, পুরনোদিনের প্রশংসা, সদ্যপ্রতিকালের সব কিছুই নিন্দা করতে করতে হেঁটে বেড়াতেন।

তবে, শহরের বড় রাস্তাটা বেড়াবার পক্ষে তেমন সুবিধের নয়। ভোর হতে না হতেই, সে রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলা সুরু হয়ে যায়। মিল কলের শ্রমিকদের ভিড় করে যাতায়াত। এ সবও বৃদ্ধদের একটা নিন্দার বিষয়। আগের কালে এ রাস্তা কত নিরুপদ্রব ছিল। ছেলেরা খেলা করলেও ক্ষতি ছিল না। আর সন্ধ্যার ধারটা মফস্বল অঞ্চলে বরাবরই অত্যন্ত অনাদৃত। ধারে ধারে রাস্তা বলে কিছু নেই। আছে গুচ্ছের ঘাট। সেখানে একমাত্র স্নান করতেই যাওয়া যায়। বেড়াতে যাওয়া যায় না। সে জন্য রেল লাইন পেরিয়ে, গাড়ি ঘোড়া নেই, এমন রাস্তাতেই তারা বেড়াতে যেতেন।

যাই হোক, প্রথম যখন শ্রীনিবাসের খোঁজ পড়ল, তখন তার বেড়িয়ে ফেরবার সময় চলে গিয়েছে। বাড়ির লোকেরা বলাবলি করছিল, এত দেরী তো কোনদিন করেন না। তবে হয়তো আজ আরো বেশী দূরে চলে গেছেন, তাই ফিরতে দেরী হচ্ছে।

কিন্তু যত দেরীই হোক, তারও একটা সীমা আছে। তখন বাড়ির বড় ছেলে, শ্রীনিবাসের ভ্রমণ সঙ্গীদের কাছে খোঁজ করতে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, শ্রীনিবাস সেদিন তাদের সঙ্গে বেড়াতেই যান নি, যে কারণে ধরেই নিয়েছেন তারা, শ্রীনিবাস বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ, তাই আজ আর বেরোন নি।

রাস্তার একটা কালভার্টের কাছে, একটা আলোর নিচে, সবাই তারা মিলিত হতেন। সেখান থেকে হাঁটতে আরম্ভ করতেন।

শ্রীনিবাস মোটে বেড়াতেই যান নি, এ কথা শুনে বাড়ির লোকেরা সকলেই অবাক হয়ে গেল। তা কি করে হয়। শ্রীনিবাসের স্ত্রী নিজে দরজা খুলে দিয়েছেন এবং দরজা বন্ধ করেছেন। উনি যখন বেরুতেন, তারপরেও গিন্নি খানিকক্ষণ ঘুমোতেন বা শুয়ে থাকতেন। বাড়িতে ছেলে বা ছেলের বউরেরা, চাকরেরা তখন কেউই ওঠে না। একমাত্র, পুরনো দিনের বুড়ো চাকর, সে গেটের সামনেই একটা বেঞ্চির ওপর শোয়। সে উঠে শ্রীনিবাসকে গেট খুলে দেয়, আবার বন্ধ করে।

সেই বুড়ো চাকর বলেছিল, 'দরজা আমি খুলে দিয়েছিলাম বাবুকে। আবার বন্ধও করেছিলাম। বাবু নিশ্চয়ই বেরিয়েছিলেন।

গিন্নি এবং বুড়ো চাকর, দুজনেই নিশ্চয় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে নি। অথচ ভ্রমণসঙ্গীরা সবাই বলেছিলেন, শ্রীনিবাস সেদিন কালভার্টের কাছে আসেন নি। শ্রীনিবাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মিনিট তিনেকের রাস্তা সেই কালভার্ট। তার বাড়িও অতিরিক্ত বড় রাস্তায় নয়। বড় রাস্তা থেকে, একটা ভিতরের রাস্তায় খানিকটা গেলে, চক্রবর্তীদের মস্ত বড় বাড়ি।

শ্রীনিবাসের অবস্থা খারাপ ছিল না। নানা ধরনের ব্যবসা ছিল। তার মধ্যে বড়ের ব্যবসাটাই প্রধান। এমনিতে কোন দুর্নামও ছিল না। কোন নেশা ছিল না। তবে স্ত্রীলোক ঘটিত দু একটা কথা কখনো শোনা গিয়েছে, তাও সেটা বাইরে কোথাও নয়, পাড়ার মধ্যেই, বিশেষ ঘনিষ্ট এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বেলা দশটার পর পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। ছোটখাটো শহর, বাড়িতে বাড়িতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পুলিশ নানাভাবে খোঁজ করেছিল। ভদ্রলোক এভাবে যাওয়া হয়ে গেলেন কোথায়। পুলিশ তো দিশেহারা খেয়ে গিয়েছিল। এ সব অঞ্চলে, ছেলে বুড়ো,

কেউ নিখোঁজ হলেই, আগে গঙ্গায় খুঁজে দেখা হয়। পোর্টকমিশনারের কাছে খবর চলে যায়। জাল ফেলে দেখা হয় চারদিকে। আর তা নইলে, রেল লাইনে খোঁজ পড়ে, যদি আত্মহত্যা বা অন্য কিছু ঘটে থাকে। শ্রীনিবাসের বেলায় যা যা করা উচিত, সবই করা হয়েছিল। কিন্তু তিনদিনের মধ্যেও তার কোন খবর পাওয়া যায় নি।

অশোক শুধু একার নয়। তার জীবনটা বাইরের থেকে এমনিতেও খুব মধুর বলেই মনে হয়। ওদের তিন ভাইয়েরই খাওয়া পরার ভাবনা ছিল না। অথচ, ঠাকুরবাড়ির গা চালচলন, সাদা সিধে জীবনযাত্রা, তা-ই ছিল। একটা সময় পর্যন্ত সকলেই পড়াশুনো করেছে। তারপরে যে যার নিজের নেশা নিয়ে আছে।

বড় ভাইয়ের নেশা হল, গান বাজনা। প্রপদ ধামারেই তার চেষ্টা। মেজ ভাইয়ের নেশা হল জ্যোতিষি। যত রাজ্যের জ্যোতিষি শাস্ত্র নিয়ে তার কারবার। কিন্তু কোনটাই তাদের পেশা নয়। নিতান্ত নেশা।

একমাত্র অশোকের নেশা, বন্ধুদের নিয়ে বকে বসে আড্ডা দেওয়া। তবে তার মধ্যে কথা আছে। যে কোন অপরাধ সম্পর্কেই, ওর একটা বিশেষ কৌতূহল আছে। এসব নিয়ে ওর গবেষণার অন্ত নেই, থিসিস্‌ও প্রচুর। কিন্তু শোনবার লোক বিশেষ নেই। ওর বন্ধুরা ছাড়া। খবরের কাগজের সাবাদে, বা এই শহরে, কোথাও কোন অপরাধ ঘটলে, বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করে। দেখা যায়, প্রায় সময়েই, ও যা বলে, সেই সিদ্ধান্তই খাটে।

বিশেষতঃ অপরাধ কী ভাবে ঘটেছে, অপরাধী তার ধরার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করতে পারে, এসব প্রায় নির্ভুল বলে দিতে পারে। সব ক্ষেত্রে নয়, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই। যে কারণে ওর বন্ধুরা বলে, তুই নিজেই দেখছি একটা ক্রিমিনাল। নইলে, এসব চিন্তা তোর মাথায় আসে কী করে।'

অশোকের জবাবও সেইরকম। পরিষ্কার বলে, 'আমি নিজেই অপরাধী হয়ে চিন্তা করি। দুটো জিনিস তো চাই। ঠিক মত কাজ হাসিল করা। কোন কারণেই ধরা না পড়া।'

'কিন্তু কোনো অপরাধী একেবারে নিখুঁত ভাবে কোন ছাপ না রেখে, অপরাধ করতে পারে না। ধরা সে পড়বেই।'

অশোকের জবাব, 'এ সব খিওরি বাজে। সেকেলে গোয়েন্দা গল্পেই ওসব থিওরির কথা শোনা যায়। আজ পর্যন্ত যত খুন হয়েছে, তার অধিকাংশই ধরা পড়েনি। নেহাত কাদুনে চোর ডাকাত না হলে, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে পারলে, কোন সাধ্য নেই অপরাধীকে খুঁজে বের করে। আসলে, এর জন্য দরকার যথন করার শক্তি আর আইনের পরিবর্তন।'

'সেটা আবার কী?'

'সেটা হল, কে অপরাধ করেছে, সবই জানা গেল, অথচ যেহেতু কোর্টে প্রমাণ করা গেল না, আর অপরাধী আগের মতই সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল। আইনের এসব নিয়ম চলবে না। জুরি মানেই থিয়েটারের দর্শক। আর উকীল, যত বলে করে ঘোলাতে পারবে, দরকার হলে রাগাতে পারবে, কাঁদাতে পারবে, সেই পক্ষের হয়েই জুরিরা রায় দেবে। তার মানে, জুরিন অভিনেতার অভিনয়েই সব কুপোকাত। জুরি যাদের করা হয়, তাদের চরিত্রও তো জানা আছে। অনেক সময়েই ভুবিদাল। একমাত্র জজের ওপর খানিকটা নির্ভর। ঐ একজন লোককেই এতদা ভেবে অনেক সময় রায় দিতে হয়। সেজন্য তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশী। তাও, ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার ঊর্ধ্বে আর কজন জজ উঠতে পারে।'

তবে, অশোক যে এসব চিন্তা করে, তা ওর বন্ধুরা ছাড়া বিশেষ কেউ জানতো না। আর এ বিষয়টাই ওদের, ঠাকুরবাড়ীর বকে একমাত্র আলোচনার জন্য ছিল না। নেহাত কোন ঘটনা ঘটলেই এসব কথাবার্তা উঠতো। তাতেই জানা যেত, অশোকের এসব ভাবনা

চিন্তা একটা নেশার মত। যে কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলেই, সেটা নিয়ে ভাবা, তার একটা সমাধানের চিন্তা ওর মাথায় ঘুরে বেড়াতো।

অশোকের এই সব গবেষণার কথা প্রথম বাইরের লোকেরা জেনেছিল, শ্রীনিবাসের ব্যাপারে। শ্যামাচরণের সঙ্গে, অশোকের এসব নিয়ে যোগাযোগও সেই প্রথম। আর এই যোগাযোগ থেকেই, অশোক শ্যামাচরণের কাছে কিছুটা রহস্যজনক, সন্দেহজনক, হয়ে আছে। প্রাণ ভরে কিছুতেই সে অশোককে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ, শ্রীনিবাসের নিখোঁজ হবার ঠিক চারদিনের দিন অশোক ওদের বাড়ি থেকে টেলিফোন করে, থানায় শ্যামাচরণকে জানিয়েছিল, 'যে কালভার্টের কাছে শ্রীনিবাসবাবু বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হয়েন, সেদিক থেকে উত্তরে, রাস্তার ওপরে গোটা তিন চারেক ম্যানহোল্ খুলে দেখুন, বোধ হয় ডেডবডি পাবেন।'

শ্যামাচরণ তো থ। সে জীপ নিয়ে সোজা অশোকের কাছে এসেছিল। তাকে নিয়ে, মিউনিসিপালিটি থেকে ধাওড় ডেকে, নির্দিষ্ট জায়গার পর পর দুটো ম্যানহোল্ খুলতেই, একটার মধ্যে শ্রীনিবাসের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। মৃতদেহ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঘাড়ে মাথা ও বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের গভীর চিহ্ন ছিল।

একদিক থেকে এ ব্যাপারে অশোকের বিপদই বেড়েছিল। শ্যামাচরণ আর তাকে ছাড়তে পারে নি। এটা অবশ্য ভাবে, অশোক জানল কেমন করে যে, ম্যানহোলের মধ্যেই শ্রীনিবাসের ডেডবডি আছে এবং ঠিক নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই।

অশোক ভেবেছিল, ভাই তো, ভাল করতে গিয়ে যে নতুন বিপদ ডেকে নিয়ে এল। শ্যামাচরণের প্রশ্নের জবাবে সে জানিয়েছিল, সে তিনরকম সন্দেহ করেছিল। হয় শ্রীনিবাস বাড়িতেই খুন হয়েছেন এবং সেখানেই তাঁকে কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে। অথবা, বাইরের কোন খুনী, কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে, তার নিজের ঘরে বা বাড়ির সীমানায় লাস গুম করে রেখেছে। অন্যথায়, এই শহরের মধ্যে, খুন করে, একমাত্র ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রাখতে পারে। আর সেটাই সব থেকে বেশী সম্ভব ছিল। কারণ, শ্রীনিবাস বাড়ি থেকে নিশ্চয় বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কালভার্টের দিকে যাবার আগেই, আততায়ী তাঁকে ধরেছিল। কালভার্ট রয়েছে রাস্তার দক্ষিণে। সেদিকে গেলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। আর, আততায়ীও ওদিকে যাবে না, তা হলে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত। কিন্তু কেউ যায় নি, কাউকে দেখাও যায় নি।

শহরে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্যামাচরণ কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি, এই সামান্য কল্পনা থেকেই অশোক এরকম একটা সঠিক সংবাদ দিতে পারে। অতএব তার যত সন্দেহ আর অবিশ্বাস এসে পড়েছিল অশোকের ওপরে। নিশ্চয়ই সে কিছু জানে, অথবা তার বিশেষ যোগাযোগ আছে এ ব্যাপারে। শ্যামাচরণ অশোককে অ্যারেস্ট করে নি, তবে শহর ছেড়ে যেতে বারণ করেছিল এবং রীতিমত চোখে চোখে রেখেছিল।

নিজের জালে, নিজেই জড়িয়ে পড়ায়, অশোককে অতএব, জাল ছাড়াবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। আর সেই জাল ছাড়াতে গিয়েই, প্রায় একুশদিন পরে সে আবার শ্যামাচরণকে টেলিফোন করে বলেছিল, শ্রীনিবাস-বাবুর ভোরবেলা বেড়াবার সঙ্গী, নরেশ হালদারকে অ্যারেস্ট করুন, বাড়িতে সার্চ করুন, তা হলেই সব জানতে পারবেন।'

শ্যামাচরণের মনে হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় তোজবাজী। সে বিশ্বাস তো করেই নি, উপরন্তু শহরের একজন প্রাচীন পরিবারের ভদ্রলোক সম্পর্কে এ কথা বলাতে, অশোককেই সে হুমকে উঠে যা তা বলেছিল। অশোক নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যেই এসব করছিল, এই ছিল তার বিশ্বাস। এর কার্যকারণ জানতে চাওয়ায়। অশোক খালি বলেছিল, 'আপনাকে যা বলছি, আগে তা করুন, তা নাহলে কিছুই বলব না। হবে মনে রাখবেন, নরেশ হালদারের বাড়ি যাবার আগে, বাইরে যেন কোন

খবরই জানাজানি না হয়। হালদার এখনো আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিত আছে, জানলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

শ্যামাচরণ ধমকে বলেছিল, 'ইয়ার্কি করো না। এনকোয়ারির রিপোর্ট বলছে, খুনের সময়, চার পাঁচ দিন ধরে হালদার মশাই অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়েছিলেন। বেড়াতেই বেরোন নি।'

অশোক বলেছিল, 'সেই খবরটাই তো আমাকে সাহায্য করেছিল। অসুস্থ তিনি ছিলেন না। খুনের দিন বেড়াতে তিনি বেরোন নি ঠিকই, তবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির পুরনো বুড়ো চাকরের একটা কথা বোধ হয় মনে রাখেন নি, তার মনে হয়েছিল, বাইরে বেরিয়ে শ্রীনিবাস যেন কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। চাকর ভেবেছিল, বেড়াবার বাবুরাই কেউ হবে। দরজা বন্ধ করার সময় সে কাউকে দেখতে পায় নি। তখনো বেশ অন্ধকার, তা ছাড়া শীত, মনে হচ্ছিল যেন অনেক রাত। শীতের রাত তো। আপনি আর দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি পুলিশ নিয়ে যান। হয় তো রক্তমাখা জামাকাপড় নয়, অস্ত্রটাও পেয়ে যেতে পারেন। অপেশদার খুনী তো, ভুলচুক অনেক থাকবে।'

শেষ পর্যন্ত অশোকের কথাই সত্য হয়েছিল। রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া গিয়েছিল, হালদারদের ঠাকুরঘরে। অস্ত্রটা পাওয়া যায় নি। জামাকাপড়গুলো নরেন হালদারেরই। রক্ত পরীক্ষা করেও, শ্রীনিবাসের গ্রুপ মিলেছিল।

পরে, শ্যামাচরণের অবাক প্রশ্নের জবাবে অশোক জানিয়েছিল, তার প্রথম খটকা লাগে, হালদারকে ভোরে অনুপস্থিত থাকতে দেখে, এবং পরে জানতে পারে, সে শয্যাশায়ী নয়, একটু নাকি প্রেসার বেড়েছে, তাই বেড়াতে আসছিল না কয়েকদিন। তারপরে খবর নিয়ে জেনেছিল, হাজার চল্লিশ টাকা গোপন ঋণ ছিল হালদারের, শ্রীনিবাসের কাছে। অনেক দিনের ঋণ, শোধ হবার আশা ছিল না। তার সুযোগ নিয়ে, শ্রীনিবাস হালদারের বাড়িতে রোজ যেত না শুধু, তার বিবাহযোগ্যা মেয়েকে নিয়ে, আজ এখানে কাল সেখানে বেড়াতে যাবার বায়না করতো। শ্রীনিবাসের ব্যবহারটা ঠিক, শ্রীনবীন খুড়োর মত ছিল না। শেষপর্যন্ত একটা খারাপ প্রস্তাব দিতেও শ্রীনিবাস দ্বিধাবোধ করেন নি।

গোপন ঋণের জ্বালা। পারিবারিক সম্মানই ছিল, শ্রীনিবাসকে মুখরিকল্পিত খুন করার কারণ। হালদার অন্য রাস্তা দিয়ে, প্রায় মাঝ রাত্রেই শ্রীনিবাসের বাড়ির সামনে অন্ধকারে লুকিয়েছিল। বুড়ো চাকর যে কথা শুনতে পেয়েছিল, সেটা নরেন হালদারের গলাই। শীতের ভোররাত্রে চাকরটা যদি ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়ে না শুতো, তবে প্রথম আঘাতের আর্তনাদটা হয়তো শুনতে পেত।

শ্রীনিবাসের খুন রহস্যের ব্যাপারে অশোকের বিনয়, শ্যামাচরণ কাউকেই বলে নি। অশোক ও তা চায় নি। শ্যামাচরণের খুবই সুনাম হয়েছিল এই মামলায়। এবং আরো, দু তিনটি ক্ষেত্রে, শ্যামাচরণ অশোকের দ্বারস্থ হয়েছে। অশোক যতটুকু পেরেছে, বলেছে। কিন্তু শ্যামাচরণের অবিশ্বাসটা ঠিকই আছে। অশোক যেন তার দু চক্ষের বিষ। তার কারণ, অশোককে সে ঈর্ষা না করে পারে না। সে অশোককে অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে চিন্তা করে। অথচ তার বুদ্ধি ধার করতে চায়।

তা ছাড়া, অশোক যেহেতু বেকার, সারাদিন রকে আড্ডা মারে, বয়স অল্প, সেই হেতু ও ছেলেটাকে সে কিছুতেই, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান বলে মূল্য দিতে পারে না। বরং হেয় করবারই চেষ্টা করে। কখনোই তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, এবং শ্যামাচরণের ধারণা, কোন না কোন একদিন আশোক ধরা পড়বেই। কারণ ওর ভিতরে নিশ্চয়ই অপরাধের প্রবণতা আছে।

শহরের ছিনতাই আর গুণ্ডাদের বিদায় দিয়ে, শ্যামাচরণ অশোককে ঘরে ডাকল আবার। অশোক এসে বসতেই, গম্ভীর স্বরে বলল, 'যার তার সামনে বাজে কথাটা একটু কমাও। এর মধ্যেই কোনদিন একটা কাণ্ড হয়ে যাবে।'

অশোক সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, চেয়ারে

বসে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'কী বলবার আছে বলুন, আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

'বলছি বলছি, চা খাবে নাকি ?'

শ্যামাচরণের গলা একটু নরম। অশোক বলল, 'না।'

শ্যামাচরণ একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো মোটামুটি চেন সবাইকেই এই এলাকায়। একটা হদিশ আমাকে দিতে পার ?

'কী।'

'এই দাঙ্গায় যতগুলো স্টাবিং-এর কেস্ দেখলাম, প্রত্যেকটাই খুব নিপুণ হাতের ছুরি দিয়ে মারা। এটা নেহাত লাঠিসোটা নিয়ে দাঙ্গা করা নয়। বাঙালী অবাঙালী, উভয় ক্ষেত্রেই দেখছি ছুরি দিয়ে মারার ধরনটা প্রায় এক। জানি না, ছুরিটা এক হাতেই চলছে কী না। দু হাতেও হতে পারে। তবে যারা ছুরি চালাচ্ছে, তারা একেবারে পাকা লোক এ ব্যাপারে।'

অশোক বলল, 'ভাড়াটে লোক হলে, সে দু দলকেই মারতে পারে, দুজন লোকও থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয়, তারা ভাড়াটে।'

'তা ভাড়াটে হোক, এরা কারা, বুঝতে পার ?'

'না।'

শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধ চোখে অশোককে দেখল। বলল, 'কিন্তু কাদের ভাড়াটেই বা হতে পারে ?'

'যারা ট্রাইক ভাঙবার জন্যে, দাঙ্গাটা লাগিয়েছে।'

শ্যামাচরণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার মুখ থেকে আমি রাজনীতির কথা শুনতে চাই না।'

'এতে রাজনীতির কী আছে, যা সত্যি তাই বলছি। এদের বাদ দিয়ে, গুণ্ডাদের ধরলে কী হবে। সর্ষের মধ্যেই তো ভূত, আগে পালের গোদাগুলোকে ধরুন, যাদের হুকুমে এসব হচ্ছে।'

শ্যামাচরণ ভুরু কোঁচকালো, 'তারা কারা ?'

অশোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'দেখুন হয়তো, এখন থানাতে বসেই কোন ঘরে বড় ঘড় বুদ্ধি ঝাড়ছে। শহরের গণ্যমান্যরাই কেউ কেউ থাকতে পারে।'

'কিন্তু প্রমাণ ?'

'অনেক আছে, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি তাদের ধরতে পারবেন কী ?'

'প্রমাণ থাকলে নিশ্চয়ই পারব।'

অশোক হেসে উঠল। বলল, 'পারবেন না। এমন সব লোক আছে, যাদের একটা কথায় আপনার চাকরি নট্ হয়ে যাবে।'

শ্যামাচরণের থলথলে মুখ কঠিন আর কর্কশ হয়ে উঠল, 'তার মানে ?'

অশোক নির্বিকার ভাবে বলল, 'তার মানে, আপনিও যে তাদের চেনেন না, তা নয়। জানেনও সবই, কিন্তু করতে পারেন না কিছুই।'

শ্যামাচরণ চিৎকার করে উঠল, 'থাক্ তোমাকে আর কমিউনিস্টগিরি করতে হবে না।'

'বাঃ, এতে আবার কমিউনিস্টের কী আছে।'

'আছে, তোমার কথাবার্তা সেইরকম। তুমি সেই ছুরিচালানো গুণ্ডার কথা বলতে পার কী না জানিয়ে দাও, তা হলেই হবে।'

'তাদের কথা বলতে পারি না, তবে তারা কাদের লোক তা বলতে পারি।'

'বেরোও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার ঘর থেকে।'

ক্রুদ্ধ চিৎকারে কেটে পড়ল শ্যামাচরণ। তারপরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তারপরে তোমাকে আমি দেখে নেব একবার। চাল্ আমি পাবই, জেনে রেখ।'

অশোক নির্বিকার মুখে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রদ্যোৎ ঘরে ঢুকল, 'আসতে পারি ?'

শ্যামাচরণ চোখ তুলে, তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলে বলল, 'আরে আসুন আসুন ডাক্তারবাবু, নতুন কোন খবর আছে নাকি ?'

ডঃ প্রদ্যোৎ নিঃশব্দে মাথা নাড়তে নাড়তে এসে ঘরে ঢুকল। অশোকই একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বলল, 'বসুন প্রদ্যোৎদা। অমিতাভি বাড়ি ফিরেছেন তো কাল রাত্রে ?'

প্রদ্যোৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, সেইজন্যই তো থানায় এলাম, এঁরা যদি কিছু বলতে পারেন।'

অশোক মনে মনে উৎকণ্ঠা আর বিস্ময় বোধ করল। গতকাল রাত্রি নটা নাগাদ এসেছিল, প্রদ্যোতের স্ত্রী অমিতা, বিকালবেলা বেরিয়ে, আর বাড়ি ফেরে নি। এইরকম দাঙ্গার পরিস্থিতিতে, কোথায় আর যেতে পারে? কাছে পিঠে কারুর বাড়িতে, অথবা বাঙালী অধ্যুষিত এলাকার মধ্যেই, যে সিনেমা হল আছে, বড়জোর তাই দেখতে যেতে পারে। তাও অমিতাদি যেরকম ধরনের মহিলা, এরকম পরিস্থিতিতে না বলে করে সিনেমায় যাবার পাত্রী নয়।

প্রদ্যোৎ অমিতা, দুজনেই এই শহরের ছেলেমেয়ে। সেই সুবাদেই, দুজনেই প্রদ্যোৎদা এবং অমিতাদি। দুজনেই অশোকের থেকে বড়। অমিতাদির সঙ্গে প্রদ্যোৎদার প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল। তাও যেমন তেমন না, লুকিয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। অমিতাদিদের বাড়ি থেকেই বিশেষ ভাবে আপত্তি ছিল।

কিন্তু সেসব পুরনো কথা ভেবে লাভ নেই। প্রদ্যোৎ এই ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই, রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, শহরে যথেষ্ট নাম ডাক। বাড়ি গাড়ি, দুই-ই করেছে। জনপ্রিয়ও বটে। ডাক্তারদের ক্ষেত্রে যেটা প্রায় দুর্লভ। ডাক্তারদের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া বড় কঠিন। কারণ, পশার বাড়বার এবং জনপ্রিয় হবার আগে, ডাক্তাররা যতখানি উদার আর অমায়িক থাকে, আস্তে আস্তে তা স্বাভাবিক ভাবেই কেটে যায়। একলা মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ অর্থের পিপাসা ক্রমে বলবৎ হয়ে উঠতে থাকে, দুয়ের চাপে আপনা থেকেই ডাক্তাররা অপ্রিয় হয়ে ওঠে। ডঃ প্রদ্যোৎ রায়ের বেলায় সেটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নি। কারণ, ওঁর ব্যবহারটা এখনো যথেষ্ট অমায়িক। সামাজিক সব রকম কাজেই উনি থাকবার চেষ্টা করেন। বারোয়ারী পূজার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে, শহরের খেলাধূলা, প্রগতিশীল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান, সব কিছুতেই থাকেন। তথাপি, চিকিৎসার ক্ষেত্রে দাতব্য যা বদনাম, আগের মত আর নেই। দুর্নাম যারা করার, তারা করে। কিন্তু তাতে প্রদ্যোৎ রায়ের ক্ষতি কিছু হয় নি। জনপ্রিয়তা কিছু ম্লান হয় নি।

শ্যামাচরণের থলথলে মুখে দুশ্চিন্তা আর বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বলল, 'থানায় তো কোন খবরই আসে নি। আজ সকালে কি আপনি কোন টেলিফোন করেছিলেন?'

প্রদ্যোৎ একটা চেয়ারে বসে, খানিকটা অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল। বলল, 'কাল সারা রাত অপেক্ষা করার পর নিজেই আসব ভাবলাম। আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা। কোথায় যেতে পারে অমিতা। ও তো এ ভাবে কোথাও যাবার মেয়ে নয়।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাদি বাপের বাড়ী যান নি তো?'

প্রদ্যোৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার শাশুড়ি শালী সকলেই তো ভোরবেলা থেকে আবার বাড়িতে রয়েছে। কাল সারারাত্রি ওর বাপের বাড়িতেও সকলের উদ্বেগে কেটেছে। ভোরবেলাই আমার কাছে চলে এসেছে। আমি তো কাল রাত্রি আটটায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে, বাড়িতে বাড়িতে খোঁজ করেছি। লোকালিটির বন্ধু বান্ধবির সঙ্গে অমিতার আলাপ পরিচয়, সব বাড়িতে গিয়েছি। সে সব কোন বাড়িতেই যায় নি।'

শ্যামাচরণ জিজ্ঞেস করল, 'সিনেমা হলের লোকদের জিজ্ঞেস করল হত, ওরা দেখেছে কীনা।' 'তাও জিজ্ঞেস করেছি। অমিতাকে ওরা সবাই চেনে। বুকিং অফিস থেকে শুরু করে, গেটম্যান দরোয়ান, সবাই বলছে, মিসেস রায়কে ওরা কেউ সিনেমা হলে দেখতে পায় নি।' শ্যামাচরণের থলথলে মুখটা যেন ক্রমে কাগুনের মত ফুলে উঠতে লাগল। বলল, 'তার মানে সিনেমায় যান নি, বাপের বাড়ী যান নি, চেনাশোনা কোন বাড়িতে যাননি। শহরের যা পরিস্থিতি, তাতে নিশ্চয় অবাঙালী এলাকার ভিতর দিয়ে ঘুরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

অশোক বলল, 'ঘুরে কোথাও গেলে, বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়েই বেরোবেন নিশ্চয়। শ্যামাচরণ ঈষৎ বিরক্ত

চোখে অশোকের দিকে তাকালো। এ বিষয়ে অশোকের কথা বলা তার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু প্রদ্যোৎ বলে উঠল, 'তা তো নিশ্চয়ই। দূরের মধ্যে, শ্যামপুরের কালীবাড়ি। আজকাল মাঝে মাঝে ও কালীবাড়ি যেত। অবাঙালী এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়ার একমাত্র জায়গা ওর শ্যামপুরেই। কিন্তু সেটাও আমাকে না বলে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। তা ছাড়া, এরকম নিচুরেসনে ও কোথাও বেরুবে, এটা ভাবাই যায় না।'

অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'রেল স্টেশনে খোঁজ করেছিলেন নাকি?'

প্রদ্যোৎ যেন একটু চকিত আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'না তো!'

অশোক বলল, 'যদি ট্রেনে কোথাও গিয়ে থাকেন।'

শ্যামাচরণ প্রায় ধমক দিয়েই উঠল, 'কী যা তা বাজে বকছ। এমন সহরের এ পরিস্থিতিতে উনি বাড়ি থেকে বেরুবারই লোক নন। কাউকে না বলে ট্রেনের টিকিট কেটে কোথাও যেতে পারেন?'

প্রদ্যোৎ বলল, 'সেটাও ঠিক। আর কোথাই বা যেতে পারে? যাবেই বা কেন? ট্রেনে করে একমাত্র কলকাতাতেই বা যাবে কেন। না না, এসব অর্থহীন চিন্তা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রদ্যোৎ অসহায় ভাবে দুহাতে মাথা চেপে, চেয়ারটার মধ্যে যেন, অসহায় দুশ্চিন্তায় একেবারে কুঁকড়ে গেল। মাটির দিকে চেয়ে, পাথরের মত বসে রইল। চোখ তার ঈষৎ আরক্ত, গাল বসা। চুল অবিন্যস্ত। জামার বোতামগুলো ভাল করে লাগান নেই। পায়ে জুতো নেই, বাড়িতে ঘোরাফেরা করবার স্লিপার জোড়াই রয়েছে। বোঝা যায়, গতকাল সারারাত ঘুমোয় নি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামাচরণের সঙ্গে অশোকের একবার চোখাচোখি হল। শ্যামাচরণ তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল তার। অশোক জানে, তার ওপর শ্যামাচরণের রাগ হচ্ছে এখন। হোক, কিন্তু ওর মনটা উদ্বেগে ভরে উঠতে লাগলো। কোথায় যেতে পারে অমিতাদি। গতকাল বিকেল থেকে, আজ সকাল, প্রায় নটা বাজতে চলেছে, কোন পাত্তা নেই, এ তো অসম্ভব। প্রদ্যোৎদাকে দেখে এবং কথা শুনে, আরো বেশী করে কথাটা মনে হচ্ছে। প্রদ্যোৎদা যেন নিজের মনের ভিতরটা হাতড়ে হাতড়ে খামচে খামচে অমিতাদিকে খুঁজছে, কোথায় যেতে পারে, কোথায়, কোথায়।

শ্যামাচরণ খানিকটা সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনি ডাক্তার মানুষ, অতটা একেবারে ভেঙে হয়ে পড়বেন না, একটা খোঁজ খবর পাওয়া যাবেই। শহরের গোলমালে, এখনো পর্যন্ত কোন মেয়ের দুর্ঘটনার সংবাদ থানায় আসে নি। আমি আমার সাধ্যমত, সবরকম খোঁজ খবরের চেষ্টা করছি। আপনিও একটু দেখুন সবাইকে বলে, কেউ কিছু জানে কী না।'

অশোক বলল, 'খবর হয় তো একটা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা কী রকম খবর, সেটাই হচ্ছে ভাবনার।'

শ্যামাচরণ জলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'সেটাতো তা আর হাত গুনে এখুনই বলা যাচ্ছে না। আর এসব তোমাদের রোমান্টিক কল্পনার ব্যাপার ও নয়।'

প্রদ্যোৎ বলল, 'দেখুন ইন্সপেক্টর, আমার যা খোঁজ করার করেছি, যাকে যা জিজ্ঞেস করবার করেছি, আর আমার কিছু করবার নেই। আমি কিছুতেই কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। আমি একটা এ্যাবসার্ড ভাবনার মধ্যে রয়েছি।'

শ্যামাচরণ বলল, 'সেটা বুঝতে পারছি ডাক্তারবাবু।'

তার বলার যাকথানেই, অশোক বলে ওঠে, 'আচ্ছা প্রদ্যোৎদা, অমিতাদি যখন বেরিয়েছিলেন, তখন তো আপনি চেম্বারে চলে গেছেন?'

হ্যাঁ, আমি তো সাড়ে চারটের যেমন বেরিয়ে যাই, সেই রকমই গিয়েছি।'

'তা যখন অমিতাদি বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, কি আর ঠাকুর নিশ্চয় ছিল। ওরা কী বলে?'

প্রদ্যোৎ বলল, 'ঠাকুর কিছুই জানে না, সুতরাং, আমাদের যে কি আছে, তার মুখে শুনলাম, অমিতা পাঁচটার একটু পরে, আমাকেপড় বলতে, বাড়ি থেকে

বেরিয়েছে। যাবার সময়, তাকেই বলে গেছে, "আমি একটু বেরুচ্ছি, সাতটার মধ্যেই ফিরব।'

'কোথায় যাচ্ছেন, তা কিছু বলেছিলেন?'

'না। সেরকম মাঝে মাঝে বেরোয়; সেরকমই বেরিয়েছে, সুভদ্রা তাই ভেবেছে। অমিতা কিছু বলে নি। সুভদ্রাও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।'

শ্যামাচরণের চোখ মুখ ভীষণ হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে! তার সামনে বসে, এরকম জিজ্ঞাসাবাদ, সে সহ্য করতে পারছিল না। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, অশোকের গালে সে এখুনি বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি থাপ্পড় বসিয়ে দেবে। কিন্তু সে ভাব দমন করে, গম্ভীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তুমি এবার যেতে পার অশোক।'

অশোকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি চলি। তবে রেললাইন বা গঙ্গায় একবার দেখলে হত। বলা তো যায় না।'

'সে সব তোমাকে বলতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও সে যাও। তবে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, সকলের দাদা বাবামার, তোমাদের বন্ধুবান্ধব কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। কোনরকম কিছু যদি আমি পাই, তোমাদের সব কটাকে আমি চালান করে দেব।'

অশোক ততক্ষণে দরজার কাছে, সেখান থেকে ফিরে একবার বলল, 'সে তো আপনি এখনই পারেন। ওসব আইনে, পি, ডি এ্যাক্ট-এ, যা খুশিতেই তুলে নিয়ে গেলেই হল।'

শ্যামাচরণের মুখে হঠাৎ কোন কথা যোগাল না। সে চোয়াল শক্ত করে, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। অশোক মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে। শ্যামাচরণের ক্রুদ্ধ মুখটা দেখেই ওর হাসি পেয়ে গিয়েছে। এবং একথা ও জানে, এখনি শ্যামাচরণ রেললাইন এবং গঙ্গায়, স্ত্রীলোকের মৃতদেহের সন্ধানে লোক পাঠাবে।

অশোক একটু লজ্জিত আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল মনে মনে। প্রদ্যোৎদার সামনে কথাটা এভাবে না বললেই বোধ হয় ভাল হত। এতক্ষণ পর্যন্ত, অমিতাদির অন্তর্ধান বিষয়ে; কোন কথাতেই, মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা কেউ বলে নি। অশোকের মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে এল প্রথম।

কথাটা নিতান্ত ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বলেই বলেছে। কিন্তু, অমিতাদির বেলায়, এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণই বা কী থাকতে পারে। এরকম মৃত্যু মানেই, হয় অমিতাকে কেউ খুন করেছে, অথবা আত্মহত্যা করেছে। সেটা রেললাইনে গলা দেওয়া বা গঙ্গায় ডুবে মরাও হতে পারে। তথাপি এ চিন্তার কোন কারণই; এ শহরের কারুর জানা নেই।

অমিতাদির-প্রদ্যোৎদা, মোটামুটি সুখী দম্পতীই বলা যায়। ভিতরের খবর কে আর কতটা জানে। তবু পাড়া ঘরে, মোটামুটি, এ বাড়ি ওবাড়ির খবর কিছু না কিছু জানা যায়ই। যদি, সেরকম গোলমাল কিছু থাকে। অমিতা প্রদ্যোতের সেরকম কথা কেউ কিছু শোনে নি। দুজনের যাতখানে, একটা ট্রাজেডি আছে, সেটা সবাই জানে। এতদিন বিয়ে হয়েছে, প্রায় সাত বছর, কিন্তু অমিতাদির কোন ছেলেমেয়ে হয় নি। সকলেরই এখন ধারণা, অমিতাদির আর ছেলেমেয়ে হবে না বোধ হয়। এ বিষয়ে, প্রদ্যোৎদাকে কেউ কখনো দুঃখ প্রকাশ করতে শোনে নি। সন্তানের আকাঙ্খায়, অমিতার প্রতি প্রদ্যোতের কোন বিরূপতার কথাও কেউ জানে না। হয় তো একটা খেদ, একটা দুঃখ, মনে মনেই দুজনে অনুভব করে। প্রদ্যোৎ ডাক্তার মানুষ, সন্তান না হওয়ার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণও নিশ্চয় জানে, পরীক্ষা করেছে। আর হয় তো, এই কারণেই, ইদানিং শ্যামপুরের কালী-বাড়িতে যাবার ঝোঁকটা অমিতাদির বেড়েছিল। অসহায় মানুষ মাত্রেরই মনের একটা এ ধরনের অবলম্বন দরকার হয়ে পড়ে। স্বামী থাকলেও, আর অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাস আসে, যা বস্তুজগতের বাইরে, অলৌকিক কোন কিছুর একটা আশ্রয় মন আপনা থেকেই চায়। কারণ, বস্তুবিজ্ঞান জগত যা দিতে পারে না, সেই পাওয়ার আশাটা তখন অকস্মাৎ কেন্দ্রিত হয়। অমিতার কালীবাড়ি যাতায়াত হয় তো সেই কারণেই।

পারিবারিক অন্য কোন জটিলতাও না থাকবারই কথা। প্রদ্যোৎ তার বাপ মা ভাইবোনের সঙ্গে থাকে না। সবাই জানে, সেটা অমিতাদির জন্য নয়, পৈতৃক বাড়ি ও পরিবারের পরিবেশ. প্রদ্যোতের নিজেরই ভাল লাগে না। তাই, নিজে বাড়ি করে. প্রদ্যোৎ চলে এসেছে। সেদিক দিয়ে, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার।

তারপরে আসে, দুজনের চরিত্রের কথা। দুজনেই খুব মিশুকে, সকলের সঙ্গেই ব্যবহার খুব ভাল। অমিতা সুন্দরী, ছেলেপিলে না হওয়াতে, শহরের যুবকদের চোখে ও মনে, অমিতা সেই অমিতাই রয়ে গিয়েছে। সকলেই মেলামেশা করে ঘনিষ্ট হতে চায়। অমিতা সেদিক থেকে মোটেই অনুদারও নয়। প্রদ্যোৎও, এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। কেউ কোনদিন শোনে নি বা জানে নি, অমিতার মেলামেশায়, সে কখনো আপত্তি করেছে। কিন্তু এ কথাও আজ পর্যন্ত কেউ কখনো শোনে নি, অমিতার সঙ্গে কারুর, প্রেম বা প্রেমের খেলাও চলছে। তার কোনো দুর্নাম নেই। অথচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর ছিল। শহরের যুবকেরা হয় তো অমিতাকে নিয়ে অনেক কথা বলে, বলতে ভালবাসে। কখনো কখনো বা সীমাও ছাড়ায় হয় তো। তথাপি, আজ পর্যন্ত কেউ মন্দ বা সন্দেহজনক কিছু দেখে নি, শোনে নি। তারপরেও যদি কোন লুকানো গোপন প্রেম থেকে থাকে, সে কথা আলাদা।

সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। প্রদ্যোৎকে ভালবেসে বিয়ে করেও, মনোজগতে আর কাউকে নিয়ে একটা বিপর্যয় ঘটে যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়। এ ক্ষেত্রে, স্বামী ও প্রেমিকদের ঈর্ষা, একটা সর্বনাশ ঘটাতে পারে। অথবা প্রেমিকা নিজেই আত্মবিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু অমিতাদির ক্ষেত্রে, এ সব বিশ্বাস করতে মন চায় না।

অন্যদিকে, প্রদ্যোৎ নিজেও, সুপুরুষ, অমায়িক, মেয়েদের কাছে প্রিয় ডাক্তার। প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার তো বটেই। তার বিষয়ে, শহরের মেয়েদের উৎসুক্য কম নয়। কিন্তু প্রদ্যোৎ মেয়েদের সম্পর্কে খুব দুর্বল, কেউ কিছু শোনে নি। মেয়েদের উৎসাহ, উৎসুক্যের জন্য প্রদ্যোৎ শহরের যুবকদের কিছুটা ঈর্ষাবোধ পায়। সে কারণে. তার নামে. ছেলেরা অনেক সময়েই; অনেক ইতর কথা-বার্তা বলে থাকে। কোন মেয়ের সঙ্গে নাম জড়িয়ে, বাজারে একটু গল্প ছেড়ে দিতে পারলে, কেউ কেউ বেশ খুশি। কিন্তু সে সবই, ভেজাল গল্প এবং প্রমাণহীন।

প্রদ্যোতের বিষয়ে, অমিতার কাছ থেকেও কেউ কখনো বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ শোনে নি। এমন কোন মেয়ে ঘটিত ব্যাপার ঘটে নি বা জানাজানি হয় নি, যে কারণে, অমিতা আত্মহত্যা করে, মনের এবং জীবনের জ্বালা জুড়োতে পারে। এ ক্ষেত্রে, হাজারবার থেকে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অন্য কমপ্লেকস্ অনেক সময় বেশী মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ঈর্ষা তো থাকেই। তার যন্ত্রণাও কম নয়। অথবা, স্বামীও, পথের কাঁটা সরাবার জন্যে, স্ত্রীকে খুন করতে পারে। প্রদ্যোতের দিক থেকে, সেরকম প্রেমের ঘটনা থাকলে, কিছুটা কানাঘুষা নিশ্চয়ই হত। কিছু না কিছু আগেই জানা-জানি হত। বিশেষ, যার নামে, ছেলেরা কিছু বলতে পারলেই খুশি।

অনেক মেয়ের সম্পর্কেই, অনেক কিছু শোনা যায় প্রদ্যোতের নামে। স্কুল লিভ্‌স থেকে, অনেক পরিবারে মেয়ে ঘটিত সম্পর্কেও। যে সব মেয়েরা, কোন না কোন ভাবে, প্রদ্যোতের চিকিৎসাধীনে এসেছে, তাদের অনেককে নিয়েই, কিছু কিছু ঘটনা শহরে আছে। সে সব ঘটনার কোন মূল্য দিতে গেলে চলে না।

প্রথমতঃ, অমিতার কাছ থেকে কেউ কখনো কোন অভিযোগ শোনেনি। দ্বিতীয়তঃ, অভিযোগ কিছু থাকলে, অমিতার পিত্রালয়ে, সে সংবাদ গোপন থাকতো না, এবং তারাই ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেলতো। তৃতীয়তঃ, প্রদ্যোতের জীবনযাপনের মধ্যে, বিশেষ কোন অস্বাভাবিকতা বা অসংলগ্নতা লক্ষিত হয় নি। তা হলে কী ঘটতে পারে! অশোক থানা থেকে বোধ হয়, পথ চলতে চলতে, এ সবই ভাবছিল। ওর মনের মধ্যে, ইতিমধ্যেই একটা দৃঢ় সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা নয়। বিকেল পাঁচটায়, অমিতাদির মত মেয়ে,

বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রেলে মাথা দিতে যাবে বা গঙ্গায় ডুবতে যাবে, তাহলে অসুবিধা লাগে। এত বেশী পরিচিত লোকের এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, চুপি চুপি নিঃসাড়ে কাজ সারা সম্ভবই নয়। ইতিমধ্যেই অনেকেই তা হলে বলতো, তারা অমিতাকে দেখেছে কী না। কিন্তু এখন পর্যন্ত, এই ষোল ঘণ্টার মধ্যে, এমন একজনকেও পাওয়া যায় নি, যে তাকে দেখেছে। ডাক্তারের স্ত্রী অমিতাদি। আত্মহত্যা করার ইচ্ছা থাকলে, বাড়িতেই বিষ সংগ্রহ করা কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। বোকা সোকা অশিক্ষিত মেয়েও না। কোনটা প্রাণঘাতী বিষ, তা বেছে নেওয়া কষ্টকর নয়।

আত্মহত্যা করলে, হয় নিজের বাড়িতে, না হয়, বাপের বাড়িতে গিয়ে করতো। বিষ না খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যাও, বাইরে গিয়ে হয় না। কিন্তু অমিতা বাইরে গিয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কি তাই বলেছে। ঝিয়ের কথা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, সেটা বিবেচ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, সে হঠাৎ মিথ্যে কথাই বা বলতে যাবে কেন।

তবে, এটাও ঠিক, ষোল ঘণ্টা নিখোঁজ থাকা, কোন কাজের কথাই নয়। বিশেষ, সারারাত্রি বাড়িতে অনুপস্থিত থাকা, একটা সাংকেতিকেই স্পষ্ট করে তোলে, অমিতা বেঁচে নেই।

প্রেমিকের সঙ্গে, গোপনে গৃহত্যাগের কথা ভাবা যায় কী? অশোকের হাসি পেয়ে গেল। অসম্ভব। অমিতাদিকে ঘিরে এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। তা হলে, শহরের কোন যুবকেরও নিখোঁজ হবার সংবাদ পাওয়া যেত। তাও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। যে দু চারজনের নিখোঁজ হবার সংবাদ রয়েছে, তারা সবাই কলকারখানার শ্রমিক। ধরে নেওয়া যেতে পারে, শহরের দাঙ্গায় তারা হয় তো নিহত হয়েছে। তাদের লাস হয় তো, কোথাও এদিকে ওদিকে জলা জঙ্গলা, গভীর নর্দমা বা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া, হয়েছে। সেগুলো খুঁজে বের করা যাবে। গঙ্গায় মৃতদেহ ভেসে উঠবেই। অন্তত, দুর্গন্ধেই খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু, তাঁরা কেউই অমিতার প্রেমের পাত্র হবার মত যাদুমন্ত্র নয়। অমিতাও তাদের প্রেমিকা হবার কথা চিন্তা করতে পারে না।

মনের এমন ভারসাম্য হারানোর অবস্থা হয়েছিল কি, যাতে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে, বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে, কোথাও বেরিয়ে গিয়েছে? সেরকম ঘটনা ও বিরল নয়। কিন্তু তা হলেও লোকের চোখে পড়ত। মফঃস্বলের এই ঘিঞ্জি শহরে, রাস্তায় বা পাড়ায়, কারুর না কারুর চোখে পড়বেই হবে। রাত্রির অন্ধকার হলেও একটা কথা ছিল। বেলা পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটায় সর্বত্র লোকের ভিড়। বিশেষ, শহরের দাঙ্গার পরিস্থিতি নিয়ে, এখন তো ঘোড়ে ঘোড়ে জটলা। অতএব—।

'অশোক'।

অশোক দাঁড়াল। ফিরে দেখল, ওদেরই পাড়ার একটি ছেলে, চায়ের দোকান থেকে ডাকছে। কিন্তু চা খাবার মত মনের অবস্থা এখন ওর নয়। চায়ের দোকানে বসে, আড্ডা দিতেও ভাল লাগছে না। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'এমনি একটু ঘুরছি।'

বন্ধু বেরিয়ে এল, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুরছিস, তা তো বুঝতে পারছি, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে গোলমাল জানিস না?'

অশোক যেন এতক্ষণে চোখ তুলে দেখল, ও কোথায় এসে পড়েছে। ওদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে এসে পড়েছে। সামনে একটা রেলওয়ে সাইডিং। সেটা পেরিয়ে গেলেই, সম্পূর্ণ অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকা। অশোক দেখল, সাইডিং-এর সামনেই, একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক হাত ঘুরে ঘুরেই, সশস্ত্র পুলিশ টহল দিচ্ছে। এই দিনের বেলায় আর কোন ভয়ই প্রায় নেই।

তথাপি, কী আশ্চর্য, কারখানার রেলওয়ে সাইডিং লাইন যেন, দুটো শত্রু রাজ্যের সীমানা হয়ে উঠেছে। এদিকের লোক ওদিকে যাচ্ছে না। ওদিকের লোক এদিকে আসছে না। অথচ দুদিন আগেও, এটা কোন

সীমারেখাই ছিল না। দুদিন বাদে, আর থাকবেও না। কিন্তু মাঝখান থেকে, কিছু নীরিহ মানুষের প্রাণ গেল। আর তার জন্য, কাউকেই কোন জবাবদিহি করতে হবে না। আবার সবই ঠিক হয়ে যাবে। যাতায়াত শুরু হবে। কলকারখানা পূর্বোদ্যমে চলবে। কতদিন আর মানুষ কলিয়োজগার ছেড়ে থাকবে।

অশোকের মনে হল, সাইডিং পেরিয়ে গিয়েই দেখা যাক না, কী হয়। বড় রাস্তা, ভিতরের অলিগলিতে লোক চলাচল আছে, যদিও সীমারেখা একটা আছে। তথাপি, ভিতর দিকে, এমন জায়গাও আছে, যেখানে গরীব বাঙালী অবাঙালী পাশাপাশি বস্তিতে রয়েছে। কিছু কিছু গোলমাল সে সব জায়গায় যে ঘটে নি, তা নয়। তবু তারা বাস করছে। আর এখন দিনের বেলা, কয়েক হাত অন্তর অন্তর সশস্ত্র পুলিশ, এর মধ্যে আর কী ঘটতে পারে। নিশ্চয়ই তাকে এসে কেউ, পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে না। দেবেই বা কে, সবই তো প্রায় চেনা মুখ। একমাত্র বাইরের তাড়াটে লোক যারা এসেছে, তারাই চোরাগোপ্তা হানবার ফিকিরে আছে। তবে সেটা দিনের বেলা সম্ভব নয়।

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'যাই দেখে আসি একটু।'

বন্ধু অবাক আর উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'একটা বিপদ আপদ ঘটাবি দেখছি।'

অশোক হাত তুলে, বন্ধুকে নিরস্ত আর সান্ত্বনা দিয়ে, সাইডিং পেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই, দুপাশের দোকানদার, রকে বসে থাকা লোকেরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। সকলের চোখেই একটা সন্দেহ আর অবিশ্বাস। কিন্তু অশোক দু একজনকে ডেকে কথাও বলল। তারাও জবাব দিল। মিশির পানওয়ালা বলল, 'গোলমালের ভিতর কেনো বাবা আবার ইধার এসেছ। শালা খুনী বদমাইসরা কী একটা গোলমাল করিয়ে দেবে, ঘর লোট যাও।'

অশোক বলল, 'তোমরা আছ কী করতে? বাঁচাতে পারবে না?'

মিশির বলল, 'যাবে শালা তাকুলোগ, হামলোগকো জানে খতম করনে সাকতা হ্যায়। উ বদমাস লোগকো পর কুছ করসা হ্যায়?'

একজন উৎসবার সশস্ত্র সেপাই, ওদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখল। তারপর রাইফেলটা বেঁকিয়ে বলল, 'কুছ গোলমাল হোগা তো, গোলি চালয়েগা। এয়সা অর্ডার হ্যায় হামে পর।'

অশোক একটু হেসে এগিয়ে গেল। কেন এল ও এদিকে? একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে কী? তা নয়। যদি এ তল্লাটে, অমিতাভির কোন সন্ধান মেলে। কেউ একটা কথাও বলতে পারে। যদিও, একেবারেই অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে, অমিতাভকে এ তল্লাটে আসাই যায় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যাকে, এ অঞ্চলে কেউ প্রায় দেখতে পায় নি, সে যে হেঁটে বা সাইকেল রিকশায় আসবে সেটাও সম্ভব নয়। আসারই কোন কারণ নেই।

কিন্তু কিছুই বলা যায় না। সন্ধ্যা সাতটার পরে, প্রদ্যোৎ রোজ এই তল্লাটে আসে। সাড়ে আটটা অবধি, মিশিরের গুদুরের দোকানে কফী খেয়ে। কোন কারণে, অমিতাভি কি, মিশিরের দোকানে প্রদ্যোৎদার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চেয়েছিল? সম্ভব বলে মনে হয় না। এ পরিস্থিতিতে, নিশ্চয়ই আসতো না।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, অমিতা গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। নির্জন গঙ্গার ধার। সেখান থেকে অপহৃত হয়েছে হয়তো। গঙ্গার ধারে, একটা অংশে, অবাঙালী-দের আস্তানা। মুতেশ্বরের নিরালা ঘাট থেকে, সন্ধ্যার ঝোঁকে একটি সুন্দরী যুবতীকে যদি কেউ বা কারা, মুখে চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে যায়, টের নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, সেই তো ঘুরে ফিরে এক কথা। গঙ্গার ধারে অমিতাভি গিয়েছিল কী? গেলে, কেউ কি দেখতে পেত না? এই ছোট মফস্বল শহর, প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। মুখটাও অন্তত চেনে।

মিশিরের গুদুরের দোকানের কাছে আসতেই, মিশির একেবারে বুক দিয়ে ওঠে অশোককে, 'কেয়া বাত অশোক, তুম ইধার কাঁহা যা রহে?'

বিরিঞ্চিমোহন গুপ্ত, পুরনোদিনের লোক। অশোক-দের ছেলেবেলা থেকেই দেখছেন। নিজেদেরও দু তিন পুরুষের বাস এখানে। অশোকরা বিরিঞ্চ চাচা বলে। বিরিঞ্চমোহনও চাচার মতই সব ছেলেদের দেখেন।

অশোক বলল, 'একটু ঘুরতে ঘুরতে এলাম।'

বিরিঞ্চ পরিষ্কার বাঙলায় বলেন, 'ইয়াকি! জান না, কী হচ্ছে। যাও, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।'

'রাস্তায় এত পুলিশ রয়েছে তো।'

'থাক, পুলিশ সব করবে। তুমি বাড়ি যাও তো।'

অশোক বলল, 'জানেন তো, প্রদ্যোৎদার স্ত্রী অমিতাদিকে কাল বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

বিরিঞ্চ চমকে উঠে, নিজের ভাষায় বলে উঠলেন, 'কেয়া বাত! কাল রাত মে সাড়ে আট বাজেতো প্রদ্যোৎ হিঁয়াসে ঘর গয়া। কুছ তো নহি বাতায়া?,

প্রদ্যোৎ তখনো জানতেন না। অমিতাদি পাঁচটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে, বাড়ি থেকে পুলিশকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন।'

বিরিঞ্চের মুখ উদ্বেগে অন্ধকার হয়ে উঠল। বলল, 'এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। এখন পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায় নি? দেখি তো।'

বলেই তিনি প্রদ্যোতের বাড়ি টেলিফোন করলেন। বোঝা গেল, অমিতাদির মায়ের সঙ্গে, বিরিঞ্চের কথা হল। প্রদ্যোৎদা থানা থেকে বাড়ি ফেরেন নি। অমিতার কোন সংবাদই নেই। রিসিভার রেখে দিয়ে, বিরিঞ্চ বলে ওঠেন, 'রাম রাম, এ কেয়া মুসিবৎ।

লেড়কি কাঁহা যা সাকতি? সায়েব ডাকতার, তো পাগল হো গয়া ইস্ টাইম মে।'

অশোক বিরিঞ্চের দোকানের সামনে থেকে পা বাড়াবার আগেই, বিরিঞ্চ আবার ধমকে ওঠেন, 'এই অশোক, ফির কোথায় যাচ্ছ? ঘরে যাও জল্‌দি।'

অশোক বলল, 'এবার চলে যাব চাচা।'

'তোমার কী কাজ এখন এখানে? তুমি ফিরে না গেলে, তোমার ঘাড় ধরে দিয়ে আসব।'

অশোক দেখল, আর উপায় নেই। ও হেসে আবার ফিরে চলল। যদিও, এত সময় পুলিশ রয়েছে, দুর্ঘটনার কোন সম্ভাবনাই নেই। তথাপি, সকলের উদ্বেগের একটা মূল্য আছে। অবাধ্য না হওয়াই উচিত।

খানিকটা যেতেই, চায়ের দোকান থেকে, কানু বেরিয়ে এল। কানু ওস্তা, যে কিছুক্ষণ আগেই খানায় ছিল। সে এগিয়ে এল অশোকের দিকে, বলল, 'কাঁহা যায়া অশোকবাবু?'

'এদিকেই এসেছিলাম। কেন যাবা, যাবে টাবে নাকি?'

কানু কপালে হাত ঠেকিয়ে হেসে বলল, 'হায় রাম, ক্যা বাতাতে অশোকবাবু। আপ লোগকো সাথ উসব কুছ নহি। হামলোগ ইস্‌মে নেই। ইয়ে দাদা বড়া বড়া আদমিলোগ রহিস্‌কে কাম হায়, আপ তো জানতেই হায়। পয়সা মিলবে সে কাম করে গা মগর আপলোগকা বদন পর হাত নহি উঠায়েগা।' অশোক বলল, 'জান তো, ডাক্তার প্রদ্যোৎ রায়ের বউকে কাল-বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কানুর মুখের পরিবর্তন হল। ধূর্ত শিয়ালের মত সে একবার এদিক ওদিক তাকালো। অশোক যেন মাংসের গন্ধ পাওয়া বাঘের মত, চকিতে উৎকর্ণ আর সচেতন হয়ে উঠল। কানু চুপিচুপি বলল, 'উসি বাত তো আপকো বাতানে যাঙতা। মগর, খবরদার, হাম সে কুছ শুনা, মত কহিয়ে, নাহি তো হামকো পুলিশ পাকাড় লেগা।'

অশোকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। রক্তে উত্তেজনা। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

কানু বলল, আপ তো জানতে হায়, হাম কুছ খবর বাতায়েঙ্গে, পুলিশ সমঝেগা, উ মেরা কাম।'

অশোক অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বল না, কী বলতে যাচ্ছিলে?

'মগর মেরা নাম কভি নহি বাতায়েগা?'

'না। তুমি বল কী বলতে যাচ্ছিলে।'

কানু একবার পিছন ফিরে চায়ের দোকানের দিক দেখে নিল। তারপরে বলল, 'সামনে যো চটকল হায়,

গসিকো বলল সে গলা কিনারে সে রাস্তা চলা গয়া, উসি রাস্তাকে পরেরা মুহল্লি মে, এক অওরত কো হম দেখা।'

অশোক চমকে উঠল। সন্ধ্যার ধারের রাস্তায়, গভীর নর্দমার মেয়েমানুষ? তার বুকের মধ্যে কী রকম ধক ধক করতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'মরে গেছে?'

কানু অবাক হয়ে বলল, 'কেয়া তাজ্জব বাত করতে আপ অশোকবাবু। উতনা পরেরা মুহল্লি সে কভি জিন্দা রহনে সকতি? উ এক অওরত কি ডেড বোডি। কৌন জানে, কেয়া বাত হুয়া, কৌন উসকো মারা। দেখকে মালুম হোতা, অওরত বাঙালী হুয়া। দেখনে সে ওইসাই মালুম হোতা।'

অশোক আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু এটা কী রকম আশ্চর্য ব্যাপার, তার কানেই কথাটা এল? সে নিজের কাছে নিজেই যেন কৈফিয়ৎ করতে পারে না, কেন সে এই তল্লাটে এসেছিল। কী ভেবে, একটা দৈব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, এরকম উত্তেজিত থমথমে দাঙ্গার পরিবেশে এসে পড়েছিল। এখনো পর্যন্ত যেন সে নিজের কাছে, নিজেই কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারে না। ওর ভিতরে একটা অবুঝ অব্যক্ত মন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল

কিন্তু কানু কার মৃতদেহ দেখেছে নিজের রাস্তায়। বলছে, মৃতদেহ দেখে তার বাঙালী মেয়ে বলে সন্দেহ হয়েছে। অমিতাভির মৃতদেহ কী? অশোকের মৃত

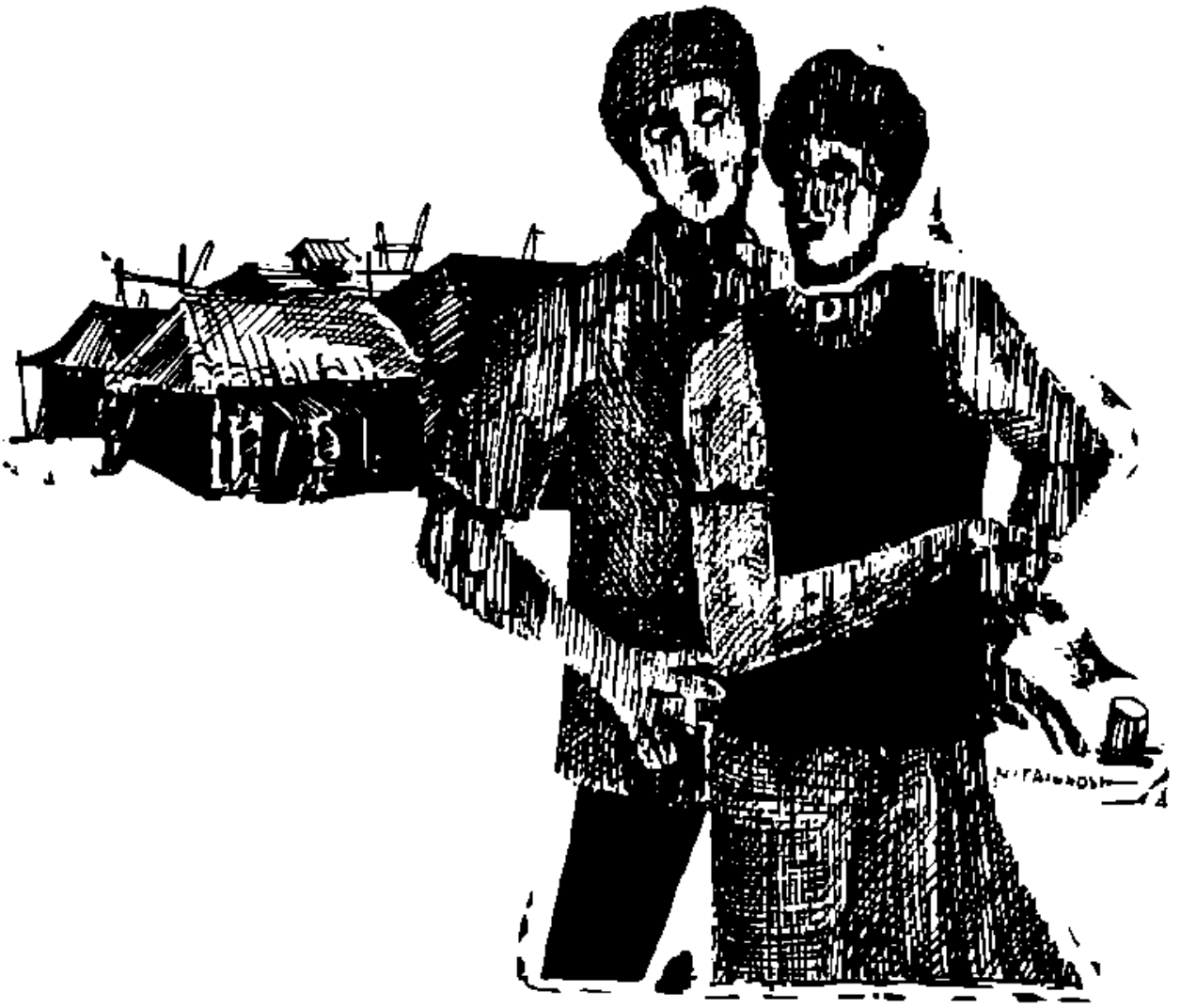

বিশ্বাস, বাঙালী মেয়ের মৃতদেহ হলে, অমিতাদিরই নিশ্চয়। তার মনটা বারে বারেই বলছিল, অমিতাদির অন্তর্ধান এখন অস্বাভাবিক আর আশ্চর্যজনক, গতকাল বিকেল পাঁচটা থেকে এ পর্যন্ত কোন সংবাদ না দিয়ে, একেবারে চুপ করে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয় জীবিত না হয় মৃত, যে কোন অবস্থাতেই, অমিতাদিকে খুন করা হয়েছে। কে করেছে, কী ভাবে করা হয়েছে, সেটা পরে বিচার্য। শহরের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, কিছুই অসম্ভব নয়।

তথাপি, মনের মধ্যে একটা, বাঁকা ধরনের কাঁটা যেন অশোকের মনের মধ্যে বিঁধে রইল। খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। কারণ যেখানে কানু বাঙালী মেয়ের মৃতদেহ দেখেছে, সেই রাস্তা বেশ খানিকটা নির্জন। দু পাশেই রেলখানার বড় কারখানার পাঁচিল একেবারে গঙ্গার ধার অবধি চলে গিয়েছে। রাস্তাটায় কোন দোকান বা গৃহস্থের বাড়ি পর্যন্ত নেই। একমাত্র কারখানার কুঠিতে যাবার জন্ত রাস্তাটা সাহেব অফিসারদেরই বলা চলে। তারাও পায়ে হেঁটে নয়। মোটরের যাতায়াতই বেশী।

কিন্তু রাস্তাটা অবাঙালী এলাকার মধ্যেই পড়ে। রাস্তাটার পরে, একটা মোটা চটকল ডিঙিয়ে, রেলওয়ে সাইডিং-এর ওপারে বাঙালী এলাকা। এমন রাস্তায় অমিতা কি, শহরের এই পরিস্থিতিতে আসতে পারে। মৃতদেহ যদি অমিতাদির নাও হয়, অন্য বাঙালী মেয়েরও হয়, তার পক্ষেই বা এ এলাকায় হঠাৎ আসা সম্ভব কী করে। বাঙালী পুরুষরাই যে ওরাটে আসছে না, সেখানে কোন মেয়ের পক্ষে আসা একেবারেই অসম্ভব।

তা হলে কি এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল?

কিছুই বলা যায় না। আগে দেখা যাক মৃতদেহ সত্যিই আছে কী না, এবং অমনি চোখে দেখে চেনা যায় কী না, কার মৃতদেহ। অমিতা কানুর মত ওতাদের বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এরকম একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, কাছাকাছি কোথাও থেকে, সুযোগ বুঝে, একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে, রাত্রের অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তায়। যা ইচ্ছে তা-ই করে, নর্দমায় ফেলে দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তার ওপরে, সেই মেয়েটির গায়ে যদি থাকে কিছু সোনার অলঙ্কার, তা হলে তো কথাই নেই।

কানুর বলে যাবার বিবরণে, ওদের ধর্মগত প্রতি-শোধের ব্যাপার থাকতে পারে। পাওনাদার গণ্ডার ব্যাপারে বিবাদ হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেচে এসে একটা মৃতদেহের সংবাদ দেবার মত সততা কি ওদের আছে। কে জানে, বিশ্বাস হয় না।

রাস্তায় দিনের বেলা কারফিউ নেই। সন্ধ্যে ছটা থেকে আছে। তবু জনসন রোডের নিরালায় ঢুকতে অশোকেরও একটু দ্বিধা হল। মিলেরই কোন সাহেবের নামে রাস্তাটার নামকরণ হয়েছে। হয়তো জনসন সাহেব, এখানকার সৌরসভার কোন একসময় চেয়ারম্যান হয়েছিল। আগের যুগে, এইসব চটকল শহরে, সৌর-প্রধান, সাহেবরাই হত। এবং এইসব চটকল কারখানা না থাকলে, এত আগে এরকম জায়গায় সৌরসভা স্থাপিত হত না।

রাস্তাটাকে দেখলেই মনে হয় হঠাৎ কোন বিদেশের নিরালা রাস্তায় এসে পড়েছি। দুপাশের উঁচু পাঁচিলের জন্ত একটা বন্ধভাবও আছে। তবু নির্জন। ধারে ধারে মোটা কয়েক গাছ, একপাশে গভীর নর্দমা। নর্দমাটা বাঁধানো, এবং লোকজন না থাকায়, কোনরকমে নোংরা করতে পারে না।

গভীর নর্দমার ধার ঘেঁষে ঘেঁষেই অশোক এগিয়ে চলল। কোন গাছের আড়ালে, কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, তা হলে, কোথাও ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়বার কোন জায়গা নেই। নর্দমার গায়ে এবং অন্তদিকে, উঁচু পাঁচিলে মাথা কুটতে হবে। চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। পাঁচিলের ভিতরে কারখানা। সেখানে আজ সবই নীরব। কেউ কাজে আসে নি। কাজে এলেও, যন্ত্র চললে, কিছুই শোনা যায় না।

রাস্তাটা গঙ্গার ধারে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাস্তার দু দিকেই দুটো বড় বড় গেট। গঙ্গার ধার জুড়ে সুন্দর বাগান, বড় চাকুরেদের কুঠি, মনোরম পরিবেশ।

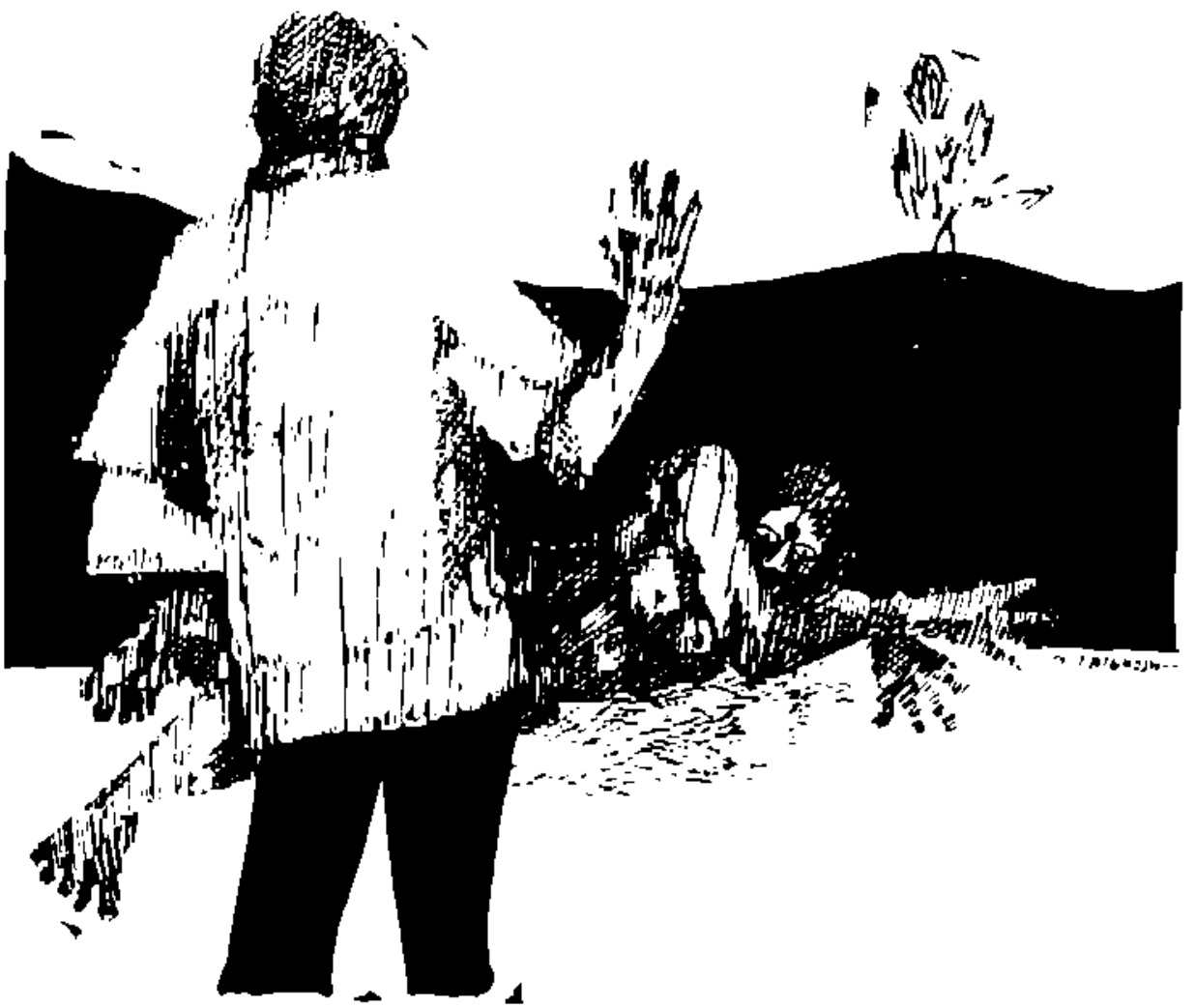

পারল অশোক, অমিতাদি। বহুই ফুলে উঠুক, এ মুখ ভোলবার নয়। ছেলেবেলা থেকে দেখা। মাথার চুল এলোমেলো জলে কাদায় ভেজা হলেও, সিঁদুর সামনের দিকে সিঁদুরের দাগ রয়েছে। হঠাৎ মনে হয়, দাঁত দিয়ে যেন নিচের ঠোঁট চেপে রয়েছে। আসলে তা নয়। ঠোঁট দুটো ফোলা, মুখও খোলা। দাঁত করা নেই, সামনের দাঁতগুলোই কেবল দেখা যাচ্ছে। সামনের পাটির দাঁতের গঠন দেখলেই চেনা যায়, এ অমিতা রায়, ডক্টর প্রদ্যোত রায়ের স্ত্রী।

কাল বিকেল পাঁচটা থেকে, অমিতার মত মেয়ের বাড়ি থেকে অন্তর্ধান মানেই, এ পরিণতি ছাড়া, আর কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। খুন। এ খুন ছাড়া আর কিছু না। পরে তাবেই হোক, যে-ই করুক।

অমিতাদির গায়ে রয়েছে, আকাশী রঙের টেরিকটের কাঁধের কাছে দুই হাতা জামা। চাকাই শাড়িটা অনেকখানিই খোলা। সেমিজ লাগানো সায়া, অনেকখানিই তোলা, প্রায় জংঘার কাছাকাছি। জামাটা বুকের কাছে, দু এক জায়গায় ছেঁড়া, বিশেষ করে বোতামের কাছে। বোতামও একটার বেশী লাগানো নেই। ব্রেসিয়ারটা জামার তলা দিয়ে, নাভিমূলের কাছে পড়েছে। মনে হয়, একদিকের কাঁধে এখনো ব্রেসিয়ারের একটা দিক আটকানো, আর একটা দিক একদম টেনে খুলে ফেলা হয়েছে। দু পাশের বুক সবটাই প্রায় খোলা। দুটো হাত, দুদিকে এলিয়ে পড়ে আছে। একটা পা একটু বাঁকানো। শরীরে কোন অলঙ্কারই নেই। এমন কি, সধবার লোহাও নেই।

মেয়েদের কেন সন্তান হয় না, এসব অশোকের কিছু জানা নেই। কিন্তু অমিতাদি বরাবরই স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দর। ফুলে ওঠা শরীরটা দেখলে, এখনো তা বোঝা যায়। একেবারে বিকৃত হয়ে যায় নি। এখন, খোলা চোখের চাহনি দেখলে, গায়ে কাঁটা লাগে। স্থির, অপলক, একটা যেন বিস্ময়ের ভাব। কিন্তু চোখ দুটি আয়ত, চাউনি সুন্দর ছিল। নাক চোখ মুখ বেশ ভালই ছিল।

অশোক ফিরে চলল। কী করে অমিতাদি এখানে এল? শহরের এ পরিস্থিতিতে কি তার পক্ষে এ তল্লাটে আসা সম্ভব ছিল? ছিল না। একেবারেই ছিল না। জীবিত বা মৃত, তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। কে বা কারা নিয়ে এল? কেমন করে? উদ্দেশ্য?

একটা সহজ উদ্দেশ্য, একজন সুন্দরী যুবতীকে জোর করে ভোগ করা। তারপরে, ধরা পড়ার ভয়ে, খুন করা। করে, এমন কোন জায়গায় ফেলে দেওয়া, যাতে হঠাৎ লোকের চোখে না পড়ে। এবং এই দাঙ্গার পরিস্থিতিতে, কোন এক জায়গা থেকে হয় তো, অমিতাদিকে কেউ বা কেউ কেউ জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

যেখানে মুখোমুখি দাঙ্গা হচ্ছে না, চোরা গোপ্তা খুন চলছে, সেখানে খুনী দাঙ্গাবাজদের পক্ষে, এরকম করাটা খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারে অমিতাদিকে? কিংবা, অমিতাদির প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাই, কেউ সুযোগ গ্রহণ করেছে? অনেকেই তো, অমিতার জন্যে পাগল ছিল। শহরের অনেক যুবকের কাছেই, অমিতাদি ছিল, প্রার্থিতা। তাদের মধ্যে কোনরকম গোপন রেষারেষির ফল কি এই বিনাশ?

কে জানে। বড় রাস্তায় এসে, প্রথমেই তার মনে হল, থানায় শ্যামাচরণকে একটা খবর এখনি দেওয়া দরকার। কিন্তু লোকটা একে গোঁয়ার, তায় বোকা। এমন সব আজে বাজে কথা বলতে আরম্ভ করে দেবে, অশোকের মেজাজটাই যাবে খারাপ হয়ে।

তা হোক, তবু খবর একটা এখুনি দেওয়া দরকার। সামনেই রয়েছে আগরওয়ালার কাপড়ের দোকান। সেখানে টেলিফোন আছে। কিন্তু সেখান থেকে টেলিফোন করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। ওরা ভুল বুঝতে পারে অশোককে। ভাবতে পারে, অবাঙালীদের কিছু, সে একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। কুণ্ডুদের রঙের দোকানের আধখানা খোলা আছে, পুরোটা নয়। ওদেরও টেলিফোন আছে, ওখানেই

বরং যাওয়া যাক। ওরাও অবিশ্যি খানিকটা ভয় পাবে, একটু টেনশনও হতে পারে। তা হোক, অশোককে ভুল বোঝবার কোন কারণ থাকবে না।

অশোক কুণ্ডুদের দোকানেই গেল। বুড়ো কর্তা একলা বসে। দুজন কুলি চুপচাপ শুয়ে আছে, এক পাশের দেয়ালে। তাদের কিছুই করবার নেই। অশোক বলল, 'থানায় একটা টেলিফোন করব?'

কুণ্ডু কর্তা ভয় পেয়ে বললেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

অশোক বলল, 'অমিতাদি, ডাক্তার প্রদ্যোৎ রায়—প্রদ্যোৎদার বউয়ের ডেডবডি জনসন রোডের নর্দমায় দেখে এলাম, তাই একটা খবর দিয়ে দিই।'

'সর্বনাশ! তাই নাকি? কবে হল, কারা করল?'

'তা জানি না। সন্ধেকাল বিকেলে পাঁচটায় অমিতাদি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপরে আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।'

ফোনের রিসিভারটা তুলে, ম্যাগনেটো ঘোরাল অশোক থানার নম্বর বলল। রিঙ হল। কথা শোনা গেল, 'থানা।'

'ও. সি. আছেন?'

'বলছি। কে আপনি?'

'আমি শার্ডপাড়ার ঠাকুরবাড়ির—।'

'মনেই হয়েছে।' হুমকানি ভেসে এল, 'কী বলছ বল।'

'অমিতাদির ডেডবডিটা দেখলাম।'

'হোয়াট?'

এটাই আশা করেছিল অশোক। একটা প্রচণ্ড সম্ভিত গলার চিৎকার। কিন্তু ও শান্ত ভাবেই বলল, 'অমিতাদি, মানে প্রদ্যোৎদার—।'

'কোথায় দেখলে?'

'জনসন রোডের নর্দমায়।'

'কে কে দেখেছে?'

'আমি—মানে, আমি একলাই।'

'তুমি একলা?'

সন্দেহের কুটিলতা টেলিফোনের তারেও ভেসে এল। 'কেন গিয়েছিলে তুমি জনসন রোডে।'

অশোক একবার একটু ঢোক গিলল, বলল, 'মানে, এমনি।'

'এমনি?'

রাগের বদলে গর্জনের মত শোনাল শ্যামাচরণের গলা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এমনি এমনি জনসন রোড গেলে, থানা থেকে শুনে গেলে, অমিতা রায় বাড়ি পৌঁছয় নি রাত্রে, আর নর্দমায় তুমিই একমাত্র দেখতে পেলে, সে সেখানে মরে পড়ে আছে, না?'

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

মনে হল, শ্যামাচরণ দাঁতে দাঁত পিষছে। জবাব এল, 'তার মানে, চিড়িয়া রোজই ছোলা খেয়ে খেয়ে পালায়। কিন্তু সে ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। এবার আমি সেই ফাঁদটা দেখিয়ে ছাড়ছি।'

অশোক জানতো, লোকটা ঠিক এইরকম ভাবে কথা বলবে। হাসিও পায়, বিরক্তিও লাগে। বলল, 'কী যে ছাই বকছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শোনাব আমি তোমাকে সেটা। তুমি এই দাওয়ার মধ্যে ও তল্লাটে গেলে কেন?'

শ্যামাচরণ আবার হুমকে উঠল! অশোক বলল, 'এমনি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিলাম।'

'কোথা থেকে ফোন করছ?'

'কুণ্ডু স্টোর্স শপ্।'

'তুমি ওখানেই থাকবে, কোথাও যাবে না, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমাকে এখন বাড়ি—।'

'কোন কথা নয়, যা বলছি, তাই কর। আমি গিয়ে যেন তোমাকে দেখতে পাই, তা নইলে মুসকিল হবে।'

হুকুম দিয়েই লাইন কেটে দিল শ্যামাচরণ। অশোক মুখ বিকৃত করে, রিসিভারটাকেই ভেংচাল। বলল, 'বুড়ু কোথাকার!'

বুড়ো কুণ্ডু মশাই, উৎকণ্ঠিত উত্তেজিত গলায় নিচু স্বরে বললেন, 'এ আর দেখতে হবে না বুঝলে? এরেই কীর্তি। বাঙলা দেশে বসে, বাঙালী মেয়েকে এরা খুন করতে সাহস করে। বাঙালীর আর কিছু রইল না।'

অশোক চুপচাপ বসে রইল। কুণ্ডু সাহেবের কথা যে তার কানে গিয়েছে এমন মনে হল না। তিনি বকবক করে যেতে লাগলেন। অশোক হুঁ হুঁ করতে লাগল। এমন কি শ্যামাচরণের হুমকিও ওর মাথায় নেই। অমিতা রায়ের কথাই ভাবছে সে। অমিতাদিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে কে খুন করতে পারে। এটা খুন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি? প্রদ্যোৎদার কোন হাত আছে কি এতে? বিশ্বাস হয় না। এদের সুখী দম্পতীই বলা যায়। দুজনে তো প্রায়ই এক সঙ্গে বেরতো, বেড়াতে। এদের দাম্পত্য সুখই কি কাল করল? এ সুখ কার সহ্য হচ্ছিল না? এমন কে থাকতে পারে?

এমন কি হতে পারে, অমিতাদির সঙ্গে আততায়ীর আগেই কথাবার্তা হয়েছিল, বিশেষ কোন জায়গায় সাক্ষাত করার? এবং সেখানেই হয় তো ঘটনা ঘটছে। আততায়ী খুন করবার মনস্থ করেই হয় তো ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে জায়গা কোথায়? আততায়ীর বাড়ি অথবা অন্য কোন নিভৃত স্থান?

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই, শ্যামাচরণের জীপটা একটা গর্জন করে এসে থামল। সঙ্গে একজন সাব ইনস্পেক্টর আর ফটোগ্রাফার। পিছনে পিছনেই এল পুলিশের ভ্যান। রাস্তায় প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশেরা সচকিত হল। আশেপাশেও একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

শ্যামাচরণের চোখ রীতিমত জ্বলছে। মুখটা ভীষণ দেখাচ্ছে। আঙুল তুলে অশোককে ডাকল, 'কাম অন্।'

আবার ইংরেজী বলা হচ্ছে। অশোকের রীতিমত বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে। ও গিয়ে জীপের পিছনে বসল। সঙ্গে সঙ্গে জীপ ছেড়ে দিল। জনসন রোডে পড়ে, অশোক দেখিয়ে দিল কোথায় মৃতদেহ পড়ে আছে। ফটোগ্রাফার কয়েকটা ফটো তুলল। কয়েকজন সেপাই নেমে গিয়ে, অমিতার দেহ তুলে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে, শ্যামাচরণ বারে বারেই অশোকের মুখের দিকে, সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে দেখছিল। বলল, 'হঠাৎ জনসন রোডে এসেছিলে, কোন দরকার ছিল এদিকে?'

অশোক পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলল, 'হ্যাঁ, একবার মিস কোয়াটার্সে যাব ভেবেছিলাম।'

'হঠাৎ কী প্রয়োজনে?'

'এই বেকার বসে আছি, ইটকলে একটা চাকরি যদি পেয়ে যাই, তাই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।'

'বটে!'

বিদ্রূপে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল শ্যামাচরণের মুখ। বলল, 'আর দেখতে পেলে, অমিতা রায়ের লাশ এখানে পড়ে আছে। চল থানায় চল, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি।'

'আমাকে আর দেখাদেখির কী আছে বলুন। থানায় কথাটা শুনলাম। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, তাই আপনাকে খবরটা দিয়ে দিলাম।'

'হুম্, খুব সহজ আর সরল ব্যাপার।'

শ্যামাচরণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। অশোক বলল, 'ব্যাপারটা খুব স্বচ্ছতর সন্দেহ নেই। তবে, আপনি একটু ভুল করছেন। আপনি যা ভাবছেন, ব্যাপারটা তা নয়।'

'সাট আপ্। আমার ভাবনাটা আমাকেই ভাবতে দাও।'

অশোক তেমনি নির্বিকার গলাতেই বলল, 'তা তো বটেই। তবে আপনিই সবত্ত ব্যাপারটা সহজ আর সরল করে ফেলছেন তো, কিন্তু তা নয়।'

'যথেষ্ট হয়েছে, ওঠ এখন গাড়িতে।'

ইতিমধ্যে রাস্তায় কিছু ভিড় হয়েছিল। দারোগার পরিস্থিতি না থাকলে, গোটা শহরটাই বোধ হয় ভেঙে পড়ত।

থানায় অমিতার মৃতদেহ এলে, আগেই প্রদ্যোৎ রায়কে খবর দেওয়া হল। প্রদ্যোৎ রায়, অমিতার মা ভাই বোন সবাই থানায় এল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। শহরের এই এলাকায় নতুন করে একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

অশোক এখন সামনে থেকে, মৃতদেহ ভাল করে দেখল। গলা টিপে মারা হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকে, মাথায় উরুতে কিছু কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সাদা ব্লাউজ বেতাবে ছেঁড়া, ব্রেসিয়ারটা বেতাবে টেনে নামানো হয়েছে, তাতে একটা দিকেই ইঙ্গিত করে, ধর্ষণ, ধর্ষণের পরে হত্যা, হত্যার পরে, গায়ের থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরিয়েছিল, নিশ্চয় হাতে ঘড়িও ছিল। কিছুই নেই। এর থেকে মনে হয়, আততায়ীর বা আততায়ীদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ষণ এবং অলঙ্কার অপহরণ। দাঙ্গার পরিস্থিতির সঙ্গে, এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খুনের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

তথাপি একটা সন্দেহ থেকে যায়। সে সন্দেহটা হল, অমিতাদির মত মেয়ের জন্য। শহরের এরকম পরিস্থিতিতে, নিশ্চয় সে এমন কোন জায়গায় যেতে পারে না, যেখানে দাঙ্গাবাজ গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করতে পারে। প্রথমতঃ, অমিতাদি মোটেই সেরকম বোকা মেয়ে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নিজের সম্পর্কে অমিতাদি অচেতন ছিল না। কোন মেয়েই, নিজের সম্পর্কে, প্রায় অচেতন হয় না। এই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা একটা বস্তুকে সব সময়েই আগলে নিয়ে বেড়ায় সেটা হল তাদের দেহ। দেহটা তাদের কাছে এতবড় মূলধন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে সুরু করে, জীবিকা পর্যন্ত কাজে লাগে। আর শুদ্ধতার বিষয় তো আছেই।

অতএব অমিতার মত মেয়েরাও, এ চিন্তার ঊর্ধ্বে গিয়ে, কোনরকমেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যেতে পারে না। তা হলে কি, আগের চিন্তাটাই ঠিক? অর্থাৎ, আততায়ী, চেনা লোক, বিশেষ কোন জায়গায় অমিতাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে, সেখানেই খুন করেছে। তারপরে মনসন রোডের নর্দমায় নিয়ে ফেলেছে? আততায়ী নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই হয় তো, এই দাঙ্গার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। যাতে সবাই ভাবে, ঘটনাটা নিতান্তই একটা দাঙ্গাজনিত দুর্ঘটনা।

যদিও তদন্তে যাই প্রকাশ পাক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, একটা যৌন শীড়নের ব্যাপার এর মধ্যে আছে। সেটাই হয়তো আসল উদ্দেশ্য। তারপরে, গায়ের অলঙ্কার সোপাট করাটাও নিতান্তই গৌণে ঘুলো দেওয়ার ব্যাপার হয় তো। যেন সবাই মনে করে, খুনটা করেছে, সাধারণ গুণ্ডা শ্রেণীর লুঠেরারা।

এ কথাটা অশোকের মনে হচ্ছে কেন? এই জন্যে যে, সাধারণ দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ার মত অমিতা ছিল না। তবে, কিছুই বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা বিশেষ কোন সূত্রই না পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কারুর মত শুণ্ডা যে এর মধ্যে নেই, সে বিষয়ে অশোক প্রায় নিশ্চিত।

থানার অফিসে বসেই, প্রদ্যোতের স্টেটমেন্ট নেওয়া হল। অমিতার মা ভাই বোনদের একটা স্টেটমেন্টও নেওয়া হল। তারপর সকলেই বাড়ি চলে গেল। যাবার আগে, প্রদ্যোৎ পাওড়ি পালী পালা,সবাইকে তার গাড়িতে যাবার জন্য ডাকল। প্রদ্যোৎকে তখন দেখাচ্ছিল যেন,সমস্ত মুখে একটা শূন্যতা। তার সঙ্গে একটা অসহায় বিস্ময়ের ছাপ। অনুমান করা যায় ঘটনার চমক তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে। অমিতা নেই, এই শূন্যতা বোধের সঙ্গে, ঘটনার অন্ধকারে সে যেন দৃষ্টিপাত করতে চাইছে। কে বা কারা এটা ঘটাতে পারে। এটাই বোধ হয় অসহায় বিস্ময়ের কারণ।

সে যখন সবাইকে তার গাড়িতে যাবার জন্যে ডাকল, তখন অমিতাদির ছোট বোন সুমিতা বলল, সে রিকশায় করে যাবে। সুমিতা অমিতাদির থেকে কয়েক বছরের ছোট, এখনো বিয়ে হয় নি। বি.এ. এবং বি.টি. পাশ করে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ায়। এম. এ. পরীক্ষা দেবার চেষ্টায় আছে। দেখতে শুনতে, অমিতাদির মতই। সুমিতার জন্যও শহরের অনেক যুবকের প্রাণে তরঙ্গ লেগে আছে। অনেক ভ্রমরের অনেক গুঞ্জন তাকে ঘিরে।

প্রদ্যোৎ যখন বারে বারে অনুরোধ করল সুমিতাকে তার গাড়িতে যাবার জন্যে, তখন সুমিতা যে হঠাৎ কেবল বিরক্তি দেখাল, তা নয় একটু যেন ফুঁসে উঠেই বলল,

বললাম তো, আপনার সঙ্গে গেলে আমার চলবে না, আমার অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

এ রকম একটা পরিস্থিতিতে, খালী ভদ্রিপতির ব্যবহারটা খুব সহজ মনে হল না। বিশেষ করে, সুস্মিতার দিক থেকে। সদ্য বিপত্নীক ভদ্রিপতিকে কেউ এরকম মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলে না। এবং পরিবর্তে, কোন ভদ্রিপতি ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে প্রস্তোৎবার মত এমন শান্তভাবে চলেও যায় না।

সুস্মিতার সঙ্গে প্রস্তোৎবার কিছু ছিল নাকি? দিদির মৃত্যুতে, হঠাৎ অশোকদার জামাইবাবুর ওপর বিরাগ দেখা দিয়েছে? কে জানে, কিছুই বলা যায় না।

শ্যামাচরণ তার ঘরে অশোককে ডেকে পাঠালো। সেখানে তখন আর কেউ নেই। অশোক তা জানতো। শ্যামাচরণ এখন তাকে খানিকটা নাজেহাল করবে। আসলে, অশোক কতটুকু কী জানে, সেটাই বের করবার চেষ্টা করবে। লোকটা যদি ভালভাবে চেষ্টা করতো, তবু একটা কথা ছিল। এমন চেঁচাবে, গালাগাল দেবে যে, কথাই বলা যাবে না।

শ্যামাচরণ প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলতো, কেন জনসন রোডে গেছলে? তোমার কোন খবর জানা ছিল?'

'না।'

'তবে গেলে কেন হঠাৎ?'

'হঠাৎ আবার কোথায়? বললাম তো, ম্যানেজারের কোয়ার্টারে একটা চাকরির দিকিরে যাচ্ছিলাম।'

'লোচ্চা কোথাকার, মিথ্যুক, লায়ার।'

শ্যামাচরণ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে, গর্জন করে উঠল। অশোক একটা সিগারেট ধরাতে গেল। সেটা কেড়ে নিয়ে, পায়ের তলায় ফেলে দিল শ্যামাচরণ। অশোক মনে মনে সতর্কবদ্ধ, কিছুতেই কাদুর নামটা বলবে না। বলল, দামী সিগারেট নষ্ট করে ফেললেন?'

'আমি তোমাকে শুদ্ধ নষ্ট করব। এখুনি সব আগে পুরে দেব।

'যে ভাবে তুমি অমিতার ডেডবডি আবিষ্কার করেছ তাতে সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক। ঠাকুরঘরে কেরে, আমি কলা খাইনি, তোমার ব্যাপারটাও তাই। তাই তুমি গা বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে ফোন করেছ।'

'তার মানে, আপনি বলছেন, আমি অমিতাদিকে খুন করেছি।'

'এখন পর্যন্ত ঘটনার গতিপ্রকৃতি তাই বলছে। থানা থেকে বেরিয়ে সোজা তুমি জনসন রোডে গেলে, ডেডবডি দেখলে, আমাকে ফোন করলে, এর থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'আপনি যা বলেছেন, তা-ই।'

'তবে?'

'তবে, তারপরেও এ্যালিবাই আর মোটিভের প্রশ্নটা থাকে। প্রমাণ করা তো বহুত দূরের কথা।'

শ্যামাচরণ হাতে ঝটকা দিয়ে বলল, 'ওসব পরের ব্যাপার আগে তোমাকে খুলিয়ে দিই তো, তারপরে দেখা যাবে।'

'যা আপনার খুশি। তাতে যদি অমিতাদির খুনীকে ধরতে পারেন বা খুনের একটা কিনারা করতে পারেন, তাই করুন।'

শ্যামাচরণ কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এল। একটু শান্ত মনে হল। বসে বলল, 'দেখ অশোক, আমি জানি, তুমি এমনি এমনি জনসন রোডে যাও নি, একটা কিছু খবর তোমার কাছে নিশ্চয় ছিল। সেটা কি তুমি আমাকে বলবে?'

অশোক নির্বিকার মুখে বলল, 'সত্যি কোন খবর ছিল না।'

'তুমি অবাঙালী এলাকায় গেছলে কেন? জান না, যে কোন মোমেন্টে তোমার পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারতো?'

'দিনের বেলা তো, তা ছাড়া আমর্ড গার্ড পাহারা দিচ্ছে, তাই গেছলাম।'

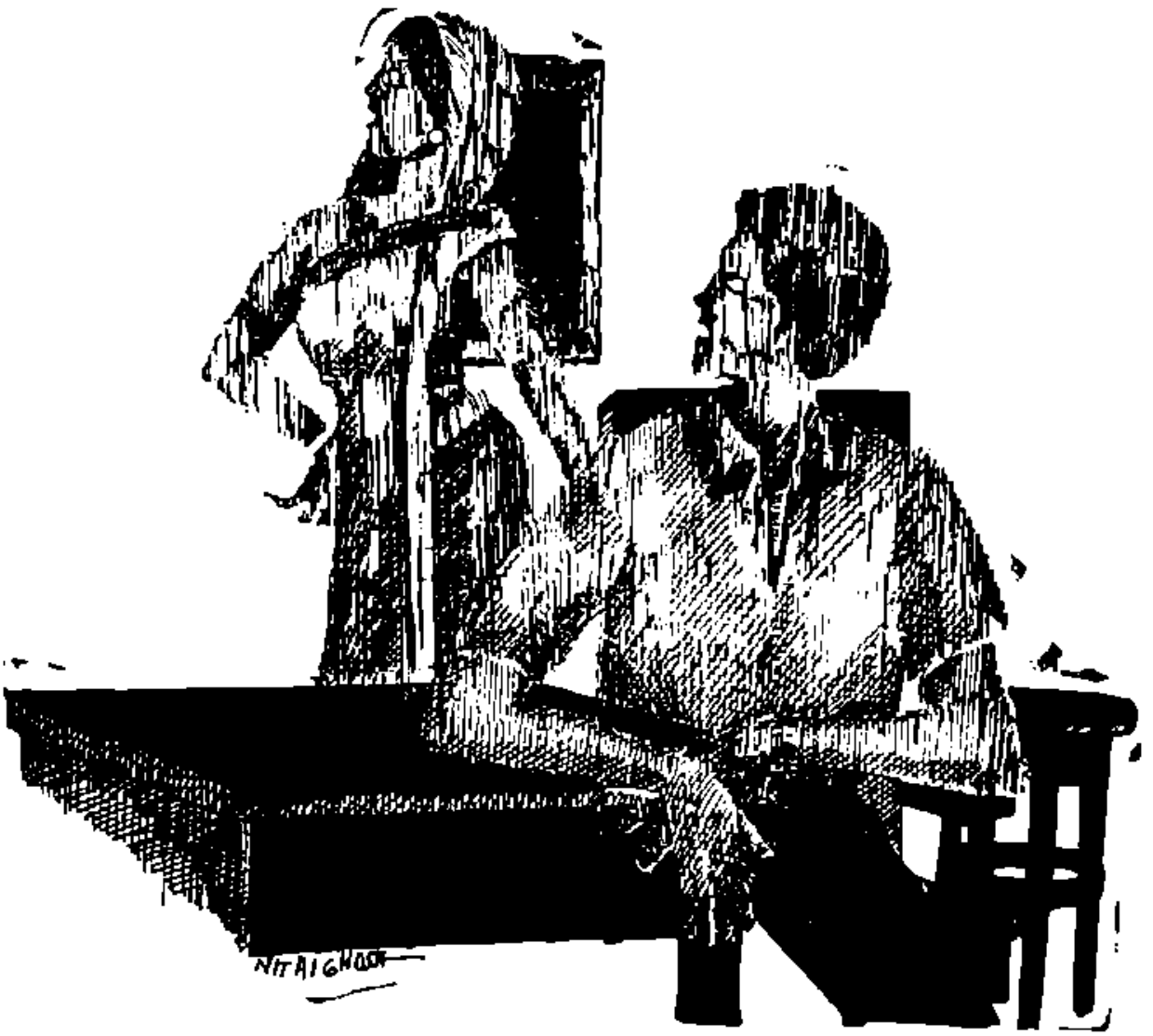

শ্যামাচরণ কয়েক মুহূর্ত অশোকের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে আমি এ্যারেষ্ট করতে পারি, কিন্তু করব না। পাশের ঘরে গিয়ে, তোমার স্টেটমেণ্ট পড়ে, সই করে চলে যাও। শহর ছেড়ে যাবে না। তাহলেই যেন পাই।'

অশোক তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল।

অশোক যখন বাড়ি এল, তখন ওদের সেকালের বাড়ির বাইরের দিকের সারি সারি ঘরের একটাতে, হারমোনিয়াম সহযোগে প্রবল ক্রন্দন রেওয়াজ হচ্ছে। আর এক ঘরে, সম্ভবে বৃহস্পতি, চন্দ্রে শুক্র এবং রাহুর দশা ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড জ্যোতিষি চলছে। দুই দাদা যথা নেশা, তাই চলছে সেখানে।

বাইরের বাড়ির আগেই, প্রকাণ্ড মন্দির। বহুকালের প্রাচীন শিব মন্দির। বাইরের বাড়িতে, কম করে দুখানা বড় বড় ঘর। তারপরে উঠোন পেরিয়ে ভিতর বাড়ি। ভিতর বাড়িতেও উঠোন, চারপাশে ঘর। দোতলা বাড়ি। আশেপাশে আরো অনেক বাড়ি। এবাড়ির

আরো তিনটি ছোট ছোট দরজা আছে, অন্যান্য গলি দিয়ে বেরুনো যায়। এমন কি, কোনো কোন বাড়ির ভিতরেও চলে যাওয়া যায়।

অশোক সোজা সোফায় উঠে ওর ঘরে চলে গেল। গিয়েই, মাঝারি আয়নের পুরনো খাটে চিত হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। অমিতাদির ব্যাপারটা ও ভাবতে চায়। একলা, গভীর মনযোগের সঙ্গে।

কিন্তু তা সম্ভব হল না। নতুন বৌ এসে হাজির হল। নতুন বৌ হল, অশোকেরই এক জ্ঞাতি ভাইয়ের স্ত্রী। নাম শিবানী। কেন তাকে নতুন বৌ বলা হয়, অশোক ঠিক জানে না। জ্ঞাতি ভাইয়ের নাম জীবন, পাশেই তাদের বাড়ি। জীবন জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ। জন্ম অস্পষ্ট, হাবা, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। শরীর বাঁকা, চলেও এঁকে বেঁকে।

নতুন বৌ কমবয়সী, পান পাতার মত মুখ। একটু রুক্ষ মুখ। একটু ছোট খাটোর ওপরে, খাটো শরীরের সুন্দর বাঁধুনি। তার চোখের রঙ একটু কটা, নাকটা টিকলো। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মত। মাথায় লালপাড় শাড়ির অল্প ঘোমটা থাকলেও, খোঁপাটা যে বেশ বড়, তা বোঝা যায়। চুল আছে বেশ মাথায়। শাড়িটা তেমন পরিষ্কার নয়। গৃহস্থালির কাজ করতে করতেই এসেছে বোঝা যায়। জামাটাও নিতান্ত মোটা কাপড়ের, একটু খাটোও বটে।

এ হেন, শিবানীর সঙ্গে, জীবনের বিবাহের কারণ, জীবনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অনেক। যারা মেয়ে দেবে জীবনের অনুপস্থিতিতে তারাই সেই সম্পত্তি পাবে। এ ছাড়া জীবনকে মেয়ে দেবার কোন কারণ নেই। শিবানীর বাবা মা, শিবানীকেই সেই বলি হিসাবে বেছে নিয়েছে। ওর বাপের বাড়ি চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রামে।

অশোক বলল, 'তুমি আবার এখন এলে কেন নতুন বৌদি?'

শিবানী ভুরু কুঁচকে একবার ঠোঁট কোলালো। তারপর বলল, 'আমার ইচ্ছে।'

'তোমার শাশুড়ি এবার সত্যি একদিন নোড়া দিয়ে তোমাকে থেঁতো করবে।'

ফরফর। 'সকাল থেকে কোথায় গেছলে?'

'আড্ডা দিতে।'

'এবার ভাই আমিও আড্ডা দিতে এলাম।'

'মেয়েদের সঙ্গে তুমি আড্ডা দিতে পার না কেন বল তো?'

'মেয়েরা আবার মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবে কী? মেয়েরা আড্ডা দেবে ছেলেদের সঙ্গে তবে তো মজা।'

বলে মেঝেতে বসে পড়ল। ভঙ্গিতে ক্লান্তি। অশোক আবার জিজ্ঞেস করল, 'জীবনদাকে খুন করবার কোন রাস্তা পেলে?'

শিবানী দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঠোঁট উল্টে বলল, 'নাঃ।'

'এই সাত বছর বিয়ে হয়েছে, সাত বছরে কিছুই করতে পারলে না! তবে আর সম্পত্তি আর স্বাধীন জীবন ভোগ করবে কেমন করে?'

'তুমি তো ওসব ফন্দি ফিকির অনেক জান, তুমিই বলে দাও, কেমন করে মারব?'

'তোমার বাবা মা বলে দেয় না কেন?'

'দেবে, তবে আমার স্বামীকে খুন করবার জন্য নয়, আমার আত্মহত্যার পথটা বলে দেবে শীগ্‌গির।'

দুজনেই দুজনের চোখের দিকে তাকাল। শিবানীর চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠল। সে মুখ নামিয়ে নিল।

অশোকও মুখটা ফিরিয়ে নিল। ওর মুখেও ব্যথার ছাপ ফোটে। তারপরে হঠাৎ বলল, 'সত্যি, মানুষের জীবনটা খুব অদ্ভুত। এক এক সময় কী মনে হয় জান নতুন বৌদি। লোকে বাস্তব বাস্তব বলে, বাস্তবটাই সব থেকে এক রকমের অবাস্তবিক অবাস্তব, অ্যাবনরমেল, অলৌকিক।'

শিবানী চকিতে মুখটা ফিরিয়ে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল। বলল, 'তোমার ওসব বক্তিমে রাখ। সকাল

থেকে দুবার ঘুরে তোমার দেখা পেলাম না।'

অশোক বলল, 'কেন কোথায় গেছলাম, পরে বলছি। কিন্তু সত্যি ভেবে দেখ তো, জীবনদার সঙ্গে তোমার বিয়ে, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার তো?'

'কিন্তু আমি কত টাকার মালিক, সেটাও একটা বাস্তব।'

দুজনেই হাসতে যায়। কিন্তু দুজনেই আবার গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারে না।

একটু পরে শিবানী বলল, 'সকালে কিছু খেয়েছিলে?'

'খেয়েছি।'

'মিথ্যে কথা। আমি তোমাদের ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছি। সে বলল, তুমি সকালবেলাই না খেয়ে বেরিয়ে গেছ।'

অশোক কোন জবাব দিল না। শিবানী আবার বলল, 'রোজ রোজ পাশের বাড়ির বৌ এসে তোমার খোঁজ নেবে খেয়েছ কি না খেয়েছ, না? শরীরটা কি আমার?'

'না, আমার। অপরের বলেই তো এত খোঁজ। নিজের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেছ।'

'দেখেছি।'

দুজনের চোখাচোখি হতে, আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। দুজনেই, দুইজনের প্রতি তাকালে চোখের তারায় কেমন একটা নিবিড়তা এসে যায়। দুজনেরই যেন কথা হারিয়ে যায়। আবার একটু পরেই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

অশোক বলল, 'সত্যি, ভেবে পাই না, মানুষের এই আশ্চর্য বাস্তব ইতরতা আর লোভ কতদূর যেতে পারে। জীবনদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। অমিতাদির মত মেয়েকে, খুন হয়ে নর্দমায় পড়ে থাকতে হয়···।'

'কী? কী বললে?'

শিবানী চমকে সোজা হয়ে বসল। অশোক সমস্ত ঘটনা শিবানীকে বলল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় নতুন বৌদি?'

শিবানী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝতে পারছি না। তবে বাপু, এটা গুণ্ডাদের ব্যাপার নয়।'

'কেন?'

'অমিতা কখনো তাদের হাতে পড়বে না। ওদিকে সে যাবেই না। এ নিশ্চয় কেউ মেরে ওখানে ফেলে এসেছে।'

চিন্তাটা অশোকের সঙ্গে মিলছে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মেয়েদের গেজেটে নতুন কোন সংবাদ আছে?'

'একটা খবর আছে। প্রবীরের সঙ্গে নাকি অমিতা ইবানিং একটু বাড়াবাড়ি করছিল।'

'প্রবীর মানে, প্রবীর গাঙ্গুলী?'

'হ্যাঁ। ছেলেবেলায় নাকি প্রবীরের সঙ্গে অমিতার ভাবটাব ছিল, যেজন্য প্রবীর বিয়ে করে নি।'

'শুনেছি। "প্র" শব্দের ওপর অমিতাদির একটু বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেখছি। প্রবীর, প্রদ্যোৎ! কিন্তু কী রকম বাড়াবাড়ি?'

'এই এক সঙ্গে বেড়ানো, প্রবীরদের বাড়ি অমিতার নিয়মিত যাতায়াত, এইসব।'

'প্রদ্যোৎদার রিঅ্যাকশন কী তাতে?'

'সে তো শুনছি, সুধাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।'

'সুধা আবার কে?'

'কে আবার, সুধা হালদার, কলকাতার সেই চলানি মেয়েটি, গার্লস্ ইস্কুলের টিচার। ওসব মেয়ে, কিসসে না পিয়ে কেন যে ইস্কুল টিচার হয়েছে, কে জানে।'

'এটা তো জানা ছিল না। সুধা হালদারের সঙ্গে প্রদ্যোৎদার রবনরম্ আছে নাকি?'

'আবার নাকি? তুমি তা হলে কী জান। সুধার সঙ্গে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের রীতিমত চলছে। এমন খবর শুনেছি, সুধার সঙ্গে প্রদ্যোৎ ঘরে বসে গল্প করছে, অমিতা তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে, প্রবীরদের বাড়িতে চলে গেছে। তারপরে সুধা নিজের হাতে প্রদ্যোৎকে খাইয়ে, নিজের বাসায় ফিরে গেছে।'

অশোক চুপ করে রইল। তার প্রথমেই মনে হল, অমিতাদি, ছোট বোন সুমিতা, সুধা হালদার, সব একই ইস্কুলের টিচার। খানায় সুমিতার ব্যবহারটা স্বাভাবিক লাগে নি। এ সবের মধ্যে কি, অমিতা হত্যার কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে?

কী করে তা সম্ভব? তা হলে ধর্ষণের ব্যাপারটা আসে না। ধর্ষণ কি নিশ্চিতই ঘটেছে? নাকি, জামা কাপড় ছিঁড়ে, আঘাত করে, চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা হয়েছে? এ বিষয়ে ডাক্তারের রিপোর্টই আসল কথা বলতে পারে। কোন পুরুষ সংসর্গ ঘটেছে কী না, বাইরের থেকে দেখে, কিছুই বলা যায় না।

শিবানী অমিতার এরকম মৃত্যুসংবাদে রীতিমত বিমর্ষ হয়ে উঠল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয় নতুন বৌদি, কে মারতে পারে অমিতাদিকে? প্রদ্যোৎদা!'

শিবানী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝতে পারছি না। মারবে কেন, দুজনেরই তো সমানে চলছিল শুনেছি।'

'প্রবীরের সঙ্গে অমিতাদির ঠিক ব্যাপারটা কী? প্রেম।'

'নাও হতে পারে। প্রদ্যোতের ঈর্ষা বাড়ানোর জন্যে অমিতা প্রবীরের সঙ্গে ইচ্ছে করে, দেখিয়ে দেখিয়ে মিশতে পারে।'

'তাতে প্রবীরের ঈর্ষা বাড়তে পারে। পুরুষ হিসেবে নিজের প্রাপ্য পাবে না, অথচ তাকে সামনে রেখে, একটি মেয়ে, তার দাম্পত্য জীবনের মোড় ফেরাবে, এটা কেউ সহ্য করতে পারে না। প্রবীর ফেলে দিতে পারে?'

'তাও পারে নিশ্চয়।'

'সুধা হালদারের জন্য, অমিতাদিকে প্রদ্যোৎদা খুন করতে পারে কী?'

'এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।'

'আমারও তাই ধারণা।'

এমন সময়ে নিচের থেকে ঠাকুর চেঁচিয়ে বলল, 'অশোকবাবু, তোমার টেলিফোন।'

'বল নতুন বৌদি, আসছি।'

বলে সে নিচে যাবার উদ্যোগ করতেই, শিবানী বলে উঠল, 'তোমার এসব বাজে ব্যাপারে আমি নেই। আমার অনেক কাজ আছে, চললাম।'

সত্যি সত্যি অশোকের সঙ্গে সে নিচে চলে এল। নিচের একটা ঘরে টেলিফোন রয়েছে। অশোক বলল, 'বৌদি, আবার এস।'

'না আসব না।'

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকাল। প্রায় একটা বালিকার মতই, অশোককে জিভ ভেংচে দিয়ে, শিবানী চলে গেল। অশোক ঘরে ঢুকে টেলিফোন ধরল, 'অশোক বলছি।'

'আমি থানার ও সি.।'

'ও, ভালাচরণবাবু।'

'তোমার সংবাদদাতাকে আমি ধরেছি। কানু এখন থানার লক্-আপ-এ আছে। আরো তিনটি ছোকরাকে ধরেছি। এরাই যে অমিতাকে মেরেছে, এবং কোন জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গেছে, সেই স্বীকারোক্তি আদায় করতে আমার বেশী সময় লাগবে না। এদের সবাইকে আমি ফাঁসিতে লটকে ছাড়ব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে জানানোর উদ্দেশ্য, তোমার খবরের সূত্রটা আমি পেয়েছি।'

'তা হলে আমার ওপর থেকে আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

'এখনো নয়। তোমার সঙ্গে এদের যোগাযোগ কতখানি আছে, সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সত্যি, আপনার মত বুদ্ধি আমার নেই। যাই হোক ডাক্তারের রিপোর্টটা—।'

ভালাচরণ লাইন ছেড়ে দিল। অশোক বলল, 'একদম বুদ্ধু।'

সন্ধ্যার সময়, বাইরের বাড়ির রকে অশোক বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিল। অধিকাংশই বেকার যুবক। হকবাজই

বলা যায়। নানান কথার মধ্যে, অশোক প্রবীরের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিল। তাতে একটা ঘটনা ও জানতে পারল, প্রবীর নাকি প্রদ্যোৎ অমিতা, দুজনের ওপরেই সমান বিরক্ত। দুজনকেই ঘৃণা করে। এমন কি, অমিতার সম্পর্কে নাকি সম্প্রতি এ কথাও বলেছে, ওরকম একটা বাজে মেয়ের পাল্লায় যে পড়িনি, ভালই হয়েছে।

এ কথা সে বলেছে তার বিশেষ এক পরিচিত পরিবারের মেয়েকে। যে মেয়ে আবার অশোকেরই বন্ধুর বোন। তাদেরই পরিবারে এ কথা শোনা গিয়েছে। এবং অশোকের এই বন্ধুর বোনের সঙ্গে, ইদানিং প্রবীরের একটা যোগাযোগের ভাব এসেছে। বিয়ে হবারও সম্ভাবনা আছে।

বন্ধুর মুখে একথা শুনে, অশোক উড়িয়ে দিতে পারল না কথাটা। কিন্তু তা হলে, অমিতাদির সঙ্গে, প্রবীরের বাড়াবাড়ি চলছে, এ খবরটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। প্রবীর বরং অমিতাকে ঘৃণাই করে এখন। অথচ, তাদের মেলামিশিও চলছে, এটা সবাই দেখছে। ব্যাপারটা আরো বেশী রহস্যাবৃত হয়ে উঠল যেন।

কোনটা সত্যি! প্রবীরের সঙ্গে অমিতার প্রেম! বন্ধুর বোনের কাছে গিয়ে, অমিতার নামে মিছিমিছি বলেছে! নতুন প্রেমিকাকে হাতে রাখার জন্য! নাকি, অমিতা এলে, না দিলেও পারছে না, মনে মনে সত্যি ঘৃণাও করে!

বন্ধুদের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে, তখন ঠাকুর এসে জানাল, নতুন বৌদি ভিতরে ডাকছে। অশোক একটু পরে, বাড়িতে ঢুকে, দোতলায় গিয়েই বলল, 'পরের বৌ হয়ে, লোকের মধ্যে ডাকাডাকি কর কেন! তোমার কি লোকলজ্জা নেই!'

'তা থাকলে তো, কবেই গলায় দড়ি দিতাম।'

'কী বলবে বল।'

'কিছু না।'

বলেই শিবানী দরজার দিকে পা বাড়ালো। অশোক তার হাতটা ধরে ফেললো। বলল, 'শোন শোন।'

শিবানী হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'না, ছেড়ে দাও। ভারী তোমার দেমাক, তোমার কাছে আমি বলে। আর আসব না।'

'তা হলে আমি যাব।'

'ওঃ! কেন পাড়ায় আর ছেলে নেই তুমি ছাড়া? এবার থেকে তাদের সঙ্গে আড্ডা দেব।'

অশোক চিবিয়ে বলল, 'তাদের প্রত্যেককে খতম করে দেব।'

'ইস্। কেন খতম করবে?'

'কেন নতুন বৌদি তাদের কাছে যাবে।'

'আমার ইচ্ছে।'

'তবে আমারও ইচ্ছে, তাদের খতম করব। নতুন বৌদি শুধু আমার, আমার বন্ধু।'

'ইস্!'

বলে দুজনেই দুজনের দিকে তাকালো। অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে, সহসা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল শিবানী। সে চোখ ফেরাল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এস।'

বলে, হাতটা ছেড়ে দিল।

শিবানী সহজ হয়ে এল আবার। খাটের কাছে সরে গিয়ে বলল, 'একটা সংবাদ তোমার কাজে লাগবে কি না জানি না, তবে তোমার শোনা দরকার।'

'কী?'

'প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়ির ঝি বুন্দা হঠাৎ আজ দুপুরে দেশে চলে গেছে।'

অশোক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে শিবানীর দিকে তাকাল। শিবানী বলল, 'তোমার একটু অস্বাভাবিক লাগছে না। হঠাৎ আজ দুপুরেই সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল কেন?'

'কে বললে তোমাকে?'

'বুন্দার মা।'

'তার দেখা পেলে কোথায়?'

'আমাদের পাড়াতেই। সে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়ি

কাজ করতে যাচ্ছিল। তার কাছেই শুনলাম, মেয়ে দেখে গেছে, তার বদলীতে সে কাজ করতে যাচ্ছে।'

'হয়তো আগেই ছুটি চেয়েছিল।'

'তাও হতে পারে। তবু এ সময়ে ছুটি নেওয়াটা ঠিক হয় নি।'

অশোক শিবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। গতকাল বৃন্দা ছিল। আজ দেখে চলে গেছে। কিন্তু পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট সে দিয়েছে। তার যা বলার ছিল, বলেছে। সে বলেছে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ বৌদি, অর্থাৎ অমিতা সেদেগুপ্তের বেরিয়েছিল। ডাক্তার তখন বাড়িতে ছিল না। বৃন্দা নিশ্চয় পালায় নি, কোন কাজেই হয় তো দেশে গিয়েছে।

অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরবে, কিছু শুনলে?'

'না, তা শুনি নি।'

'তোমার এ বিষয়ে কী মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না। বৃন্দার মায়ের ভাবটা যেন কেমন। মুখ খোলবার ইচ্ছে নেই যেন।'

'ওদের বাড়ি কোথায়, কিছু জান?'

'শুনলাম, বেড়াচাঁপায়।'

তারপরে শিবানী বলল, 'তবে কাল বিকেলে প্রদ্যোৎ ডাক্তারের বাড়িতে যে সুধা হালদার ছিল, সেটা খবর পেয়েছি।'

'তাই নাকি? কিন্তু প্রদ্যোৎদা তো ছিল না।'

'সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানি না।'

'তা হলে সুধা কার কাছে আসবে? নিশ্চয়ই অমিতাদির কাছে নয়?'

'অমিতা তো বেরিয়েই গিয়েছিল শোনা যাচ্ছে।'

'কী শুনেছ তুমি সুধার সম্পর্কে?'

'আমি শুনেছি, সুধা বিকেলে একবার প্রদ্যোৎদের বাড়ি গিয়েছিল, আবার খানিকক্ষণ পরে তাকে চলে যেতেও দেখা গেছে।'

কিন্তু এতে করে কিছুই প্রমাণ হয় না। হয়তো সুধা গিয়ে দেখেছে প্রদ্যোৎ নেই, তাই আবার ফিরে গিয়েছিল। হয় তো প্রদ্যোৎদাকে জানিয়েছিল অমিতা বিকেলে বেরোবে, সুধা যেন আসে। কিন্তু কোন কারণে, প্রদ্যোৎ ফিরতে দেরী করেছিল, তাই সুধা অভিমান করে চলে গিয়েছিল। সবটাই আন্দাজ। তবে, বৃন্দা হঠাৎ বেরিয়ে চলে গেল কেন? বিশেষ এরকম একটা মুহূর্তে? পুলিশের কাছে, প্রথম স্টেটমেন্ট সে দিয়েছে। আরো তো দরকার হতে পারে। তার কি এ সময়ে শহর ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে? থানার অনুমতি নিয়েছে কি? যদি কোন জরুরী কারণে গিয়ে থাকে, তা হলে তার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। প্রদ্যোৎদাই তো সে কথা তাকে বলে দেবে।

শিবানী বলল, 'এবার আমি চলি।'

'একটু বস না।'

'না সময় নেই। স্বামীকে খাওয়াতে হবে।'

'কী খাওয়াবে, বিষ নাকি?'

'খাওয়াতে পারছি কোথায়। সে জ্বালাতেই তো মরছি। তাই ভাবছি নিজেই খাব।'

'তখন আমাকেও একটু দিও।'

'বালাই ষাট, তুমি কোন দুঃখে আমার সঙ্গে বিষ খেয়ে মরবে।'

'বড় সাধ হয়।'

'সেটা অন্যের সঙ্গেই মেটো।'

বলে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, হাত দুলে যায় দেখিয়ে চলে গেল। অশোক খাটের ওপর এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে, থানায় ভাষাচরণকে ফোন করল।

অশোক, 'ও. সি. আছেন?'

'বলছি।'

'আমি অশোক।'

'কী চাই?'

'আচ্ছা, প্রদ্যোৎদার কি বৃন্দা হঠাৎ আজ দুপুরে দেশে গেছে, আপনি জানেন?'

'না জানবার কী আছে। সে এখান থেকে পারমিশন নিয়েই গেছে।'

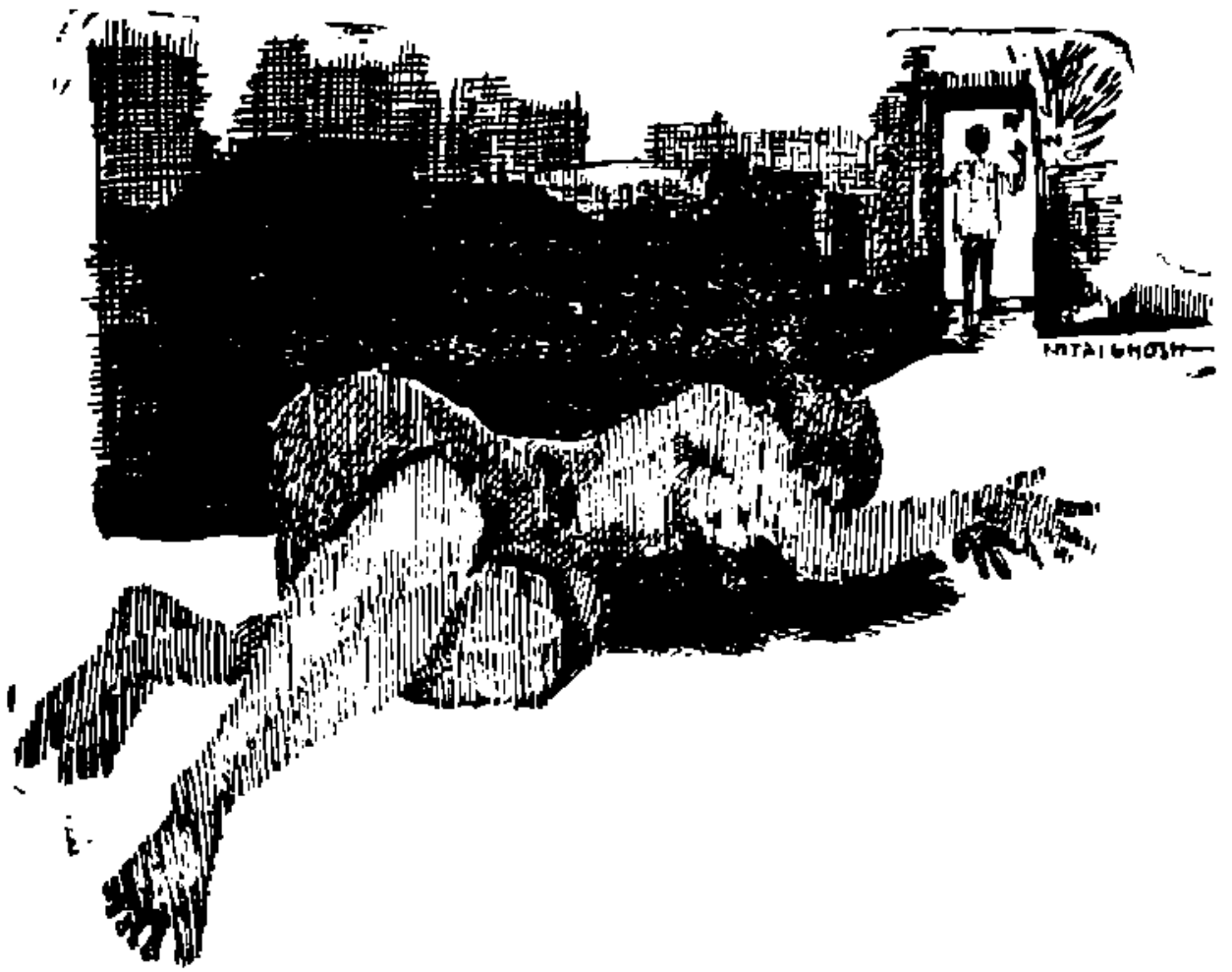

'তাই নাকি ?'

ভাবাচরণ বিদ্রূপ করে বলল, 'চৌদ্দপুরুষের জমানো টাকায় খাচ্ছ আর বকবাজী করছ, তাই কর না কেন। আবার এসব ব্যাপারে কেন। বরং নিজের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা কর।'

বলেই লাইন ছেড়ে দিল।

পরদিন ভোরবেলা অশোককে দেখা গেল বৃন্দার মায়ের বাড়িতে। ওদের পাড়ার কাছেই, বোষ্টমতলার বস্তিতে থাকে। অশোক রীতিমত একটা দায়িত্ব নিয়ে, সোজা বলল, 'এটা কি করলে বৃন্দার মা। মেয়েকে কোথায় সব সত্যি কথা বলতে বলবে তা নয়, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলে ?'

'কিসের সত্যি কথা বাবা !'

বৃন্দার মায়ের চোখে ত্রাস ও ভীতি। অশোক বলল, 'পরশু বিকালের সব সত্যি কথা।'

'সে সব তো আমি জানি না বাবা।'

'তোমার মেয়ের উচিত হয়নি এটা। পুলিশ তো সন্দেহ করছে, সে অনেক কিছু জানে। যাই হোক, সে হঠাৎ দেশে গেল কেন ?'

'এমনি একটু কাজকর্ম ছিল। দিদিমা, তাই গেল।'

'বেড়াচাঁপায় ?'

'হ্যাঁ।'

আর একটা মিথ্যা কথা বলল, 'কোন পাড়ায় যেন ? কৈবর্তপাড়া, না ?'

'তা কেন বাবু। আমাদের বাড়ি গয়লাপাড়ায়।'

'দেখ আবার পুলিশ কী বলে।'

বলে সে চলে এল। এল একেবারে রেল স্টেশনে। বারাকপুরের টিকেট কাটল। বারাকপুরে নেমে, বসির-হাটের পথে চেপে, সে যখন বেড়াচাঁপায় নামল, তখন বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। সেখান থেকে গেল, গ্রামের দক্ষিণে, গয়লাপাড়ায়। একজনকে জিজ্ঞেস করল, বৃন্দাদের বাড়ি সে চেনে কী না। সে বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

নিরালা বাগান ঘেঁষে বাড়ি। বাগানটা অপরের। সামান্য দুটি বেড়ার ঘর। একটা ঢেঁকি ঘর। একটা লাউ মাচা। আশেপাশে ফাঁকা। কিছু ঝোপ ঝাড়। একটা পুকুর। বেশ নিরালা। উঠোনটা মোটামুটি পরিষ্কার। তা হলেও, কিছু ঘাস গজিয়েছে।

ঘর দুটোর, একটার দরজা বাইরে থেকে শিকল টানা। আর একটা আধ ভেজানো। অশোক ডাকল, 'বৃন্দা।'

কোন সাড়া নেই। কয়েকবার ডাকল। কোন সাড়া না পেয়ে, ভেজানো দরজাটা ঠেলে সে ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার, বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কেউ নেই। তা হলে বৃন্দা কি দেশে ফেরে নি ? অন্য কোথাও গিয়েছে ?

এই ভেবে ফিরতে গিয়ে, মনে হল, ঘরের মধ্যে বেড়ার এক কোণে কে যেন পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে, অশোক ভিতরে ঢুকল। নিচু হয়ে দেখল, বৃন্দা। বৃন্দার চোখ খোলা। জামা কাপড় ছেঁড়া। সেও যুবতী। প্রায় উলঙ্গ। দেখলেই মনে হয়, সে ধর্ষিতা। কিন্তু মৃত। গলার কাছে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, গলা টিপে মারা হয়েছে।

অশোক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। কোনদিকে না তাকিয়ে। একেবারে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল। ভাবল কাল দুপুরে বৃন্দা চলে এসেছে। কখন তাকে মারা হল ? কাল রাত্রে ? সন্ধ্যায় ? না আজই ভোর রাত্রে ?

সেটা ডাক্তার ছাড়া বলবার উপায় নেই। তাকেও সত্যি ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না, সেটা ডাক্তার বলতে পারবে। কিন্তু একটা সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। মারবার খবরটা একরকম। অহিতাগ্নিকে যেভাবে মারা হয়েছে, একেও প্রায় সে ভাবেই, কেন ? সাক্ষী লোপাট ?

বড় রাস্তায় এসে, বাসে উঠতে গিয়েও, অশোক চমকে উঠল। তাই তো ! আর একবার দেখে আসতে হবে। সে বৃন্দাদের বাড়ির কাছাকাছি আর একবার এল। বাড়ির মধ্যে নয়। সামনের মাঠের মত জায়গাটা, আর মাটির চওড়া রাস্তাটা দেখল। দেখে, হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। গরুর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। মোটর বা সাইকেলের নয়। এসব জায়গায় গাড়ির চাকার দাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অশোক একটা ফিরতি বাসে, বারাকপুরে এসে, ছুটো টেলিফোন করল। একটা দেগঙ্গা থানায়।

দেগঙ্গা থানার মধ্যেই বেড়াচাঁপা। আর একটা তার নিজের শহরের থানায়, শ্যামাচরণকে। দেগঙ্গা থানাকে, বেড়াচাঁপা গয়লাপাড়ার ঠিকানা দিয়ে বলল, বৃন্দা নামে একজন একটি ঘরে খুন হয়ে পড়ে আছে। আর শ্যামাচরণকে বলল, বৃন্দার খুন হবার কথা।

শ্যামাচরণের গলায় সন্দেহ তীব্র হয়ে উঠল, 'তুমি জানলে কী করে ?'

'নিজের চোখেই দেখেছি ?'

'তার মানে, বেড়াচাঁপায় গেছ তুমি ?'

'এখন বারাকপুর থেকে বলছি, দেগঙ্গা থানাকেও ফোন করে বলে দিয়েছি।'

'তুমি কেন বেড়াচাঁপায় গেছলে ?'

'বৃন্দাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে।'

'তোমাকে না আমি শহর ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলাম ?'

'এখুনি আবার শহরে ফিরে যাচ্ছি।'

'খুব সাবধান, তুমিই তোমার বিপদ ডেকে আনছ।'

লোকটার সেই একই সন্দেহ। সে অন্য কথা জিজ্ঞেস করল, 'প্রবীর গাঙ্গুলীকে ডেকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করুন না।'

'কেন?'

'খুন হতে পারে। আর সুধা হালদার যে' সুমিতাকে। সুমিতাকে জিজ্ঞেস করুন, সে তার বিদ্রি হত্যাকারী বলে কাউকে সন্দেহ করে কী না। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি, পালাব না।'

ফোন ছেড়ে দিল সে।

রাত্রি আটটা অবধি অপেক্ষা করেও, শ্যামাচরণ যখন দেখল, অশোক এল না, সে তখন তার বাড়ি গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, সেই যে সকালে বেরিয়েছে, আর বাড়ি ফেরে নি। এদিকে, অশোককে সে মুখে যাই বলুক, তার কথামত, প্রবীর সুমিতা সুধা হালদার, সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। প্রবীরকে একটু সন্দেহ হয়, সে অমিতার নামে মলে যায়। সুমিতার ব্যাপার উল্টো, সে তার জামাইবাবুর নাম শুনতে পারে না। সুধা হালদার এ শহরের মানুষদের ভাল চেনেই না। তবে, ইস্কুল কমিটির মেম্বার হিসেবে, প্রদ্যোৎ ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়টা একটু বেশী হয়েছিল।

তবে, ডাক্তারের রিপোর্টে, অমিতা যে ধর্ষিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু অশোক গেল কোথায়? শ্যামাচরণকে কি সে নাচাচ্ছে। তাহলে, অশোককে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সে।

অশোকের বাড়ি থেকে আবার থানায় এল শ্যামাচরণ। এসে দেখল, অশোক তার ঘরে বসে।

শ্যামাচরণ কিছু বলবার আগেই, অশোক বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটাই প্রি-প্ল্যান্ড। যে মার্ডার করেছে, সে এমন কি, ব্যাপারটাকে ধর্ষণ প্রমাণ করবার জন্য, দৈহিক ভাবেই ধর্ষণের অভিনয় করেছে। শুধু তাই নয়, পুরুষ সংসর্গের চিহ্ন যাতে পাওয়া যায়, তাও অমিতাদির মেরে ঢেলে দিয়েছে। অলঙ্কার অপহরণটাও মিথ্যে। ওটা সাজানো। এমন কি, নিজাঙ্গে যে সব আঘাত, যা মুখের ভাষা ছেঁড়া, ব্রোসিয়ার টেনে খুলে ফেলা, সমস্তটা নিজেই, প্রমাণ করার চেষ্টা, এটা ধর্ষণের ব্যাপার এবং চুরির।'

শ্যামাচরণ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল। এবার চিৎকার করে বলল, 'আগে প্রমাণ দাও, তারপরে ফালতু বকবক করো।'

অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দিচ্ছি। অমিতাদি খুন হয়েছে বোধ হয় পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে। এর একমাত্র সাক্ষী ছিল বুলা।'

'বলা?'

'হ্যাঁ বুলা, তাই তাকে মরতে হয়েছে। এমন কি, তার খুনটাও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, ধর্ষণ এবং হত্যা। খুনী এখানেও, একই ভাবে, পুরুষ সংসর্গ প্রমাণ করার জন্য, মৃতদেহের অঙ্গে সংসর্গ করেছে, একই ভাবে।'

'কিন্তু বুলা তো বলেছে, অমিতা পাঁচটার সময় বেরিয়েছিল।'

'সেটা মিথ্যে কথা।'

'কখন বেরিয়েছিল।'

'বোধ হয় বেরোয়নি।'

'বুলা তা হলে কোথায় দেখেছে, অমিতাকে খুন হতে?'

'কোথায় দেখতে পারে?'

'সে যেখানে ছিল তখন।'

'নিশ্চয় ডাক্তারের বাড়িতেই ছিল।

'তা হলে সেখানেই খুন হয়েছে।'

'ঘোড়াট!'

শ্যামাচরণ লাফিয়ে উঠল। অশোক বলল, 'লাফালাফি করবেন না দারোগাবাবু, বসুন। অমিতাদি বাড়িতেই খুন হয়েছিলেন। সেখান থেকে, তার বডি, রাত্রে জনসন রোডে ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমান দাঙ্গার সুযোগে, যাতে ব্যাপারটা কেউ ধরতে না পারে, তাই এ সময়টা কাজে লাগিয়েছে খুনী।'

'কে খুনী।'

'তার গাড়িতে অমিতাদির রক্ত এখনো লেগে আছে। গাড়িটা প্রদ্যোৎদার।

শ্যামাচরণ তাকিয়ে রইল অশোকের দিকে। অশোক বলল, 'প্রদ্যোৎদা সত্যি গ্রেট লাভার। তবে তার ভালবাসার ঠোঁট দুটো ঠিক মানুষের মত নয়, আরো তীব্র রাজপাখীর সোনার মত ধারালো ঠোঁট। একবার ধরলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। বেচারি সুমিত্রাই ছিল দিদির প্রতিদ্বন্দ্বী সুধা হালদার। আর সুধা হালদারের চরিত্রের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথের কিছু মিল আছে। কিংবা তার চেয়ে বেশী ইয়াগোর। তার প্ররোচনাতেই প্রদ্যোৎদা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রদ্যোৎদা যে এমন নিষ্ঠুর ভাবে মেরে, আবার মৃত স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ করে, ধর্ষণ প্রমাণ করবে, এটা কল্পনাও করতে পারি নি।'

শ্যামাচরণ জিজ্ঞেস করল, কী করে জানলে এসব।'

'সারাদিন সব ব্যাপারটা প্রায় কল্পনার মধ্যেই ছিল। গাড়ির রক্তের কথাটাই ঘটনাকে বাস্তব করে তুলল। দেখবেন, গাড়ির ডান দিকে, লাল প্ল্যাস্টিকের পাপোষের ওপর রক্তের দাগ আছে। রক্তটা পরীক্ষা করালেই জানতে পারবেন, ওটা অমিতাদির রক্ত। তবে, একটুও দেরী না করে, গাড়িটা এখন করুন। বলা যায় না, হয় তো আর একবার গাড়িটা ঘুরে ফেলতে পারে। আমি চলি।'

'কিন্তু তুমি শহর ছেড়ে যাবে না, মনে রেখ।'

'তার আর দরকার হবে না বোধ হয়।'

সেই রাত্রেই গাড়িটা শ্যামাচরণ ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে, মহুয়ার শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনদিন পরে, অশোক যখন নতুন বৌদি শিবানীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, তখন ফোন এল। শ্যামাচরণ বলল, 'ফরেন্সিক পরীক্ষায় জানা গেছে, রক্তটা অমিতা রায়েরই। তা ছাড়া, সুধা হালদার একটা স্বীকারোক্তি দিয়েছে, ঘটনাটা তার সামনেই ঘটেছিল, প্রদ্যোৎ রায়ের বাড়িতেই। বৃন্দার মা বলেছে, বৃন্দা তার মাকে সব কথাই বলেছিল।'

অশোক জিজ্ঞেস করল, আপনার কোন প্রয়োজন হবে দারোগাবাবু?'

'কে তুমি আমাকে দারোগাবাবু বলছ?'

'আজ্ঞা শ্যামাচরণবাবু—'

'ঠাট্টিল। আচ্ছা শোন, কাল একবার সকালে এস।'

'যাব।'

অশোক লাইন কেটে দিয়ে ঘরে এল। ঘটনাটা সব ব্যক্ত করল শিবানীর কাছে। তারপরে বলল, 'আর তুমি কী না, জীবনদার মত একটা লোককে ধরতে পারছ না নতুন বৌদি?'

শিবানী বলল, 'তুমি যে ধরে ফেলবে?'

'সে ভয়েই পার না, না?'

'হ্যাঁ, সব সময়ে সে তোমার ভয়ে ভয়েই থাকি।'

বলে অশোকের দিকে তাকাতে গিয়ে, লজ্জায় মুখ নামাল। অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি, সংসারটা বড় অদ্ভুত নতুন বৌদি।'

নিচে তখন ধ্রুপদের প্রলয় চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই, সপ্তমে বৃহস্পতি না পঞ্চমে, তাই নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ। বাদুরবাড়ি বেশ জমে আছে।

॥ শেষ ॥

পরিণতা

মতিনন্দী

"আধা পিছু পাঁচ টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। নিতাইবাবু আপনারটা দিন।"

ইনকাম্‌ট্যাক্স কলোনির ছটিল এক অন্ধের ঘর থেকে, নিতাই মাথা তুলে টেবলের পাশে দাঁড়াল, অবনী বোসের দিকে তাকাল। "এখুনি দিতে হবে?"

"যাঃ, কাল যৌ ভাত, জিনিসটা কিনতে হবে তো?" ব্যস্ত বিরক্ত হয়ে অবনী বলল, "সবাই যদি এখুনি এখুনি বলেন তাহলে তো—কই সুনন্দা আপনারটা?"

নিতাই-এর টেবলের ঠিক উল্টো দিকে সুনন্দা পাইন ঘাড় হেঁট করে ডুবে আছে আর এক অঙ্কের মধ্যে। মাথা তুলল না শুধু ভুরু কুঁচকে উঠল।

"আপনারই তো বান্ধবী নীলিমা সব আগে তো আপনিই দেবেন। নিন্ নিন্ বার করুন।" অবনী হাত বাড়াল সুনন্দার প্রায় নাকের কাছে।

"কি হচ্ছে কি?" কাঁপিয়ে উঠল সুনন্দা।

চাওয়ার আর সময় পেলেন না, যোগটার যদি ভুল হয়ে যায় আবার আমার—" বলতে বলতে আবার ঘাড় নামিয়ে নিল।

নিতাই আর দ্বিরুক্তি না করে টাকা দিয়ে দিল। অবনী দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দার টেবলের পাশে। একমনে যোগ দিয়ে যাচ্ছে সুনন্দা, পাশে এতজন চুপ করে অপেক্ষা করছে তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। নিতাইয়েরই অস্বস্তি হতে লাগল তাই দেখে। অবনীর অপ্রস্তুত ভাব এবং হাত কচলাবার জন্য আলাপ শুরু করল, "উঠবে কত, গোটা পঞ্চাশ হবে?"

"পঁয়ষট্টি, আমরা মোট তেরোজন। অবশ্য সুনন্দা না দিলে বাট হবে।" অবনীর মুখফোঁড় হিসাবে 'ইনকাম্‌-ট্যাক্স মেন্টে নাম আছে। নিতাইয়ের ভয় হল, সুনন্দা হয়তো এবার ফোঁস করে উঠবে। ওরও নাম আছে দুর্বিনীত হিসেবে।

"এই কটা টাকায় কিইবা কিনে দেবেন", নিতাই দুহাতের তালু উপুড় করে বলল।

"আমরা শুধু নীলিমাকেই দিচ্ছি, বরকে কিছু দেব না। তপনরা গায়ে হলুদে শাড়ি দিতে, চিন্তু বলছিল, কিছু ফুল আর দুধও বরীয় শঙ্খকোম কিনে দিতে, নীলিমার বাংলা বানান যদি তাতে শোধরায়; প্রশান্তবাবু বলছিলেন

আজকাল এই হাতল ভেঙে ব্যাগে পোরা যায় একরকম স্টীলের লেডিস ছাতা বেরিয়েছে তাই দিতে।"

"না না, ছাতা নিয়ে বৌভাতে যাওয়া কি?" নিতাই খুব আপত্তি করে উঠল, "আর চড়ৈদ ছুটো অভিধান? চিন্তায় কি মাথা খারাপ হয়েছে? ফুলশয্যার দিন দুইই, রোমান্টিক কিছু দিন। প্রথম দিন জীবনে দুবার তো আসবে না।"

"দেখি, ওনারা কিসে একমত হন", অবনী ত্রস্ত হবার ভান করে সুনন্দাকে বলল, "টাকাটা দেবেন কি? না আরো দাঁড় করিয়ে রাখবেন?"

"আমি তো আপনাকে দাঁড়াতে বলিনি।" সুনন্দা যে বেশ রেগে উঠেছে, দুজনেরই তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

"কিন্তু আপনার জন্যই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা তো বুঝতে পেরেছেন। তবে কিছু একটা বলেও তো বিদায় করে দিতে পারতেন। কাজ তো আমরাও করি, কিন্তু ভদ্রতা বোধ তাই বলে বিসর্জন দিতে হবে এমন কোন কথা কি সার্ভিস কোডে লেখা আছে?" অবনীও যে খুব রেগেছে, এটা সে বুঝিয়ে দিল কথা গুলোকে দাঁতে পিষে দিয়ে। নিতাই এবার অপ্রস্তুত বোধ করতে শুরু করল। তারই টেবলে এই ভাবে কথা কাটাকাটি, দুজনই ব্যস্ত, বিশেষতঃ একজন আবার মহিলা, উপভোগ্যও এমন কিছু গুরুতর নয়—নিতাই হাঁকপাক করে বলল, "থাকগে থাকগে, বোধ হয় সুনন্দার কাছে এখন টাকা নেই, আমি বরং দিয়ে দিচ্ছি ওটা।" তারপর খুব মজার কথা বলেছে এমন চোখ-মুখ করে সে বলল, "ওটা সুনন্দার বিয়েতে আপনার চাঁদা হিসেবে জমা করে নেবেন অবনীবাবু।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু তার দরকার হবে না। বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। মূর্খেরাই বিয়ে করে।" এই বলে সুনন্দা মুখ নামিয়ে কাজে মন দিল।

"তার মানে? আমি, সন্তোষ বাগচি, জ্যোতির্ময় বোস, নব নাগ, সবাই মূর্খ?" অবনী ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। "আর আপনিই শুধু চালাক?"

সুনন্দা কথা বলল না। কাজ করে যেতে লাগল।

"জবাব দিন। এভাবে আমাদের অপমান করার মানে কি?" অবনী টেবলে ঘুঁষি মারল।

সুনন্দা ঐ কৌচকাল মাত্র। এইবার নিতাইও খানিকটা রেগে উঠল।

"সুনন্দার এ কথাটা বলা ঠিক হয়নি। অন্য ভাবেও বলতে পারতেন।"

"কেন আমার যা মনে হয় তাই বলেছি।"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত সিধে হয়ে গেল সুনন্দা। "মনের কথা বলতে পারব না, সার্ভিস কোড-এ এখন কথা কি লেখা আছে? বিয়ে মূর্খেরাই করে একথা একশো-বার আমি বলব।"

টিফিনের আগেই ডিপার্টমেন্টের সবাই জেনে গেল, সুনন্দা সাইন মূর্খ বলে বিবাহিতদের গাল দিয়েছে।

নীলিমার বিয়েতে সুনন্দা আলাদা ভাবে উপহার দিল। অফিসের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলল না। সুনন্দা বিয়ের শেষ পর্যন্ত দেখে যখন বেরোল, তখন ওর লাস্ট বাস চলে গেছে।

"আমাদের আরো আগে বেরোন উচিত ছিল।" সুনন্দাকে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিতাই বলল, "এ ব্যাপারে আপনি মোটেই চালাক নন্ দেখছি। আমি ট্যাকসিতে যাব চলুন আপনাকে নামিয়ে দেবখন।"

সুনন্দা আপত্তি করল না। ট্যাকসিতে খানিকক্ষণ আনমনা হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "জানি, সেদিন আমার ওই একটি কথায় সবাই রেগে আছে। স্বাভাবিক। কিন্তু কেন বলেছিলুম জানেন? নীলিমার সঙ্গে যার বিয়ে হল, সে আমারই বন্ধু ছিল। দীর্ঘকালের বন্ধু। আমিই একদিন নীলিমাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।"

সুনন্দা চুপ করে গেল। নিতাই বলল, "বুঝেছি, তারপর যা হবার হল, আপনিই বাদ হয়ে গেলেন।" সুনন্দা বলল, "না না, বিয়ে করা আমার পক্ষে খুবই

কঠিন, বিরাট সংসার মাথায় নিয়ে আছি আমি আর বাবা। আমি বিয়ে করে চলে গেলে হড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আমি অত নিষ্ঠুর হতে পারব না। আসলে মূর্খ আমি বলতে চেয়েছিলাম নীলিমাকে। কথাটা সেদিন ঠিকমত বলতে পারি নি। আর ওই অবনী ঘোষের হাবভাব কথায় কেমন যেন ভেস্তে গেল, তাই বললাম মূর্খরাই বিয়ে করে।"

নিতাইয়ের কাছে একটু উত্তেজিত মনে হল সুনন্দার গলা, যখন সে বলল, "বলেছিল কোনদিন কাউকে বিয়ে করবে না। এমন মিথ্যেবাদী কখনো ভাল স্বামী হতে পারে?"

নিতাই বলল, "আপনি নীলিমাকে তো বলতে পারতেন।"

"বলেছিলুম, শুনল না।" সুনন্দা অন্যমনস্কের মত বলল। "মানুষ যে কত অধৈর্য হয়ে পড়ছে। গভীর কথাগুলো যেন কেমন হালকা খেলো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা নিতাইবাবু আপনি তো বিয়ে করবেন?"

আচমকা প্রশ্নটা এসে পড়ায় নিতাই থতমত হয়ে বলল, "তার মানে, বিয়ে, হ্যাঁ ভাবছি তো, কি—"

"আপনি কাউকে ভালবাসেন?"

"না না সেসি কথা," নিতাই প্রবল প্রতিবাদ করে উঠল হাত ছুঁড়ে। "ভালবাসা কি চাট্টিখানি কথা? ওতে দুঃখ যন্ত্রণা ছাড়া আর কি লাভ হয়?"

"ঠিকই বলেছেন" সুনন্দা অন্যমনস্ক হয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। ওদের মধ্যে আর কথা হয় নি।

সুনন্দার ওই কথাটা "আচ্ছা নিতাইবাবু আপনি তো বিয়ে করবেন?" পাক দিয়ে ফিরতে শুরু করল নিতাই এর মধ্যে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে স্থির করে ফেলল যদি করতেই হয় বিয়ে, তাহলে দেরী করে লাভ নেই। কিন্তু কাকে? পাত্রী কই? কে খুঁজে দেবে? ছোট ভাই আর বাবা ছাড়া নিতাই-এর বাড়ীতে কেউ নেই। বাবা বাংলা দেশের বাইরে চাকরী করে আর ছোট ভাইকে বলা যায়না, বিয়ে করব পাত্রী খোঁজ কর।

কথায় কথায় একদিন অবনী ঘোষকেই সে সমস্যাটা নিজের নাম না করে, এক বন্ধুর জন্য—এই ভাবে বলল, "বলুন তো আমার ঘাড়ে কি সে এক ঝামেলা এসে পড়ল। এখন আমি কি করি বলুন তো?"

অবনী ঘোষ পরামর্শ দিল, "বরং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই তো আমার মাসতুতো শালার মেয়ের কি ফাসফাস বিয়ে হয়ে গেল বর্ধমানে, ছেলে সি এম পি ও-র এনজিনীয়ার, রাজপুত্তুরের মত দেখতে। বিজ্ঞাপনই দিতে বলুন বন্ধুকে, কত ভাল মেয়ে যে আনাচে কানাচে আছে, বিজ্ঞাপনে ঠিক বেরিয়ে আসবে।

নিতাই-এর পছন্দ হল এই পরামর্শ। অফিসেই সে বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করে ফেলল—গ্র্যাজুয়েট, সুদর্শন, ৫'৬—৩, কায়স্থ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যৌতুক নাই। জন্মবর্ণেও আপত্তি নাই।

'সুদর্শন' কথাটা রাখা উচিত কিনা নিতাই তাই নিয়ে কিছুক্ষণ বিব্রত হয়ে পড়ে। নিজেকে ঠিক সুদর্শনের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা তাতে খটকা থাকায় শেষ পর্যন্ত 'সচ্ছরিত্র' কথাটি বসিয়ে দিল। পরদিন দুপুরে খবরের কাগজের অফিসে, পনেরোটা টাকা খরচ করে সে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে এল, বক্স নম্বরে।

সাতদিন পরই খবরের কাগজের পিওন নিতাইকে এক তাড়া চিঠি দিয়ে গেল। গুনে দেখল বাহাত্তরটি। গভীররাতে সে খুলে খুলে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে নিতাই একপেয়ে বোধ করল। প্রতিটি মেয়েই উচ্চশিক্ষিতা। প্রকৃত সুন্দরী গৃহকর্ম নিপুণা, এবং কেউই ফুল ফাইনালের নীচে নয়।

একটি চিঠি পড়তে গিয়ে চমকে উঠল নিতাই। পাত্রী স্বয়ং চিঠি লিখেছে। তলায় সই সুনন্দা পাইন। নিতাই মাঝরাতে নির্জন ঘরে ঘেমে উঠল সেই চিঠি হাতে। এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। দমবন্ধ করে সে পড়তে শুরু করল "বিজ্ঞাপনদাতা সমীপেষু, পাত্রের বয়সের কথা উল্লেখ করেন নাই তাই ভরসা করিয়া পত্র লিখিতেছি। আপনার বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত সকল যোগ্যতাই আমার আছে অর্থাৎ আমি চাকুরিয়া, কায়স্থ বই, দরিদ্র সুতরাং

যৌতুকাদি দিতে অক্ষম এবং বাংলা অনার্সসহ বি, এ পাশ। আমি সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরে দশ বৎসর চাকুরী করিতেছি, বয়স পাঁত্রিশ, কুরূপা নই। যদি আপনি বোধ করেন পত্র দিতে পারেন।

পুনশ্চ: 'যদি দেখা করতে বলেন, তাহলে দেখা করিব।"

নিতাই লক্ষ্য করল চিঠিতে কয়েকটি লাইন কাটা। তা থেকে পাঠোদ্ধার করতে পারল—ভাই বোনেদের মানুষ করিয়া তোলার জন্য এত কাল আমি—এই কটি কথা।

সুনন্দা পাইনের চিঠিটি বার কয়েক পড়ে নিতাই খুব অপ্রতিভ বোধ করল। প্রায় সমবয়সী তারা, বরং সুনন্দা বছর দুয়েকের বড়ই হবে। চিঠিতে লেখা বয়সটা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের। টাকসিতে বসা সুনন্দার কথাগুলো মনে পড়ল নিতাইয়ের। সেই কথার সঙ্গে এই চিঠির কোন মিল না পেয়ে সে পরদিন অফিসে অবনী বোসকেই ব্যাপারটা খুলে বলল।

"তাই নাকি!" লাফিয়ে উঠল অবনী। "দেখি দেখি চিঠিটা।"

জো দিয়ে নিতাইয়ের হাতের খামটা তুলে নিয়ে অবনী লাফাতে লাফাতে ক্যাটিন থেকে বেরিয়ে গেল। নিজেদের চেয়ারে ফিরে এসে নিতাই লক্ষ্য করল, ডিপার্টমেন্টের অনেকের মুখেই চাপা উত্তেজনা। বারবার সবাই শিকারী বেড়ালের মত সুনন্দার দিকে তাকাচ্ছে। নিতাইয়ের চোখে চোখ পড়তে কেউ কেউ হাসল। তাই দেখে নিতাইয়ের বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হল, একটা কিছু সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। ভাবতে ভাবতে হালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, তার সামনের ফাইলের স্তূপ, ওপাশের সুনন্দা পাইন, তারও পিছনে অবনী বোসকে ঘিরে কিসফাস করা লোক গুলো।

নিতাই শুধু দেখল একটা ঘটনাকে টেনে নিয়ে উল্লাস চাপতে চাপতে অবনী বোস এসে দাঁড়াল সুনন্দার পাশে। কথা বলতে বলতে হাসতে থাকল আর সুনন্দার মুখের রাগ ক্রমশ রক্তশূন্য হয়ে লজ্জার অপমানে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিজয় পতাকার মত চিঠিটা মাথার উপর তুলে অবনী বোসেরা যেন গেয়ে উঠল—"খুব যে মুখ বলে ছিলেন, খুব যে মুখ বলেছিলেন। এইবার, এইবার।"

পরদিন অফিসে এসে নিতাই দেখল অন্যদিনের মতই যে যার কাজ করে চলেছে, সুনন্দাও। একসময় সুনন্দা গলা নামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বলতে পারেন চিঠিটা ওরা শেষ কি করে?"

ফাইলে চোখ নামিয়ে নিতাই বলে, "পারব না, বলতে। তবে লোকটি যে রসজ্ঞ-সুরসিক তাতে সন্দেহ নেই। এমন লোককে বিয়ে করা থেকে বেঁচে গেলেন—লাভ তো আপনারই হল।"

কথাটা বলে নিতাই খুব আরাম বোধ করল।

॥ শেষ ॥

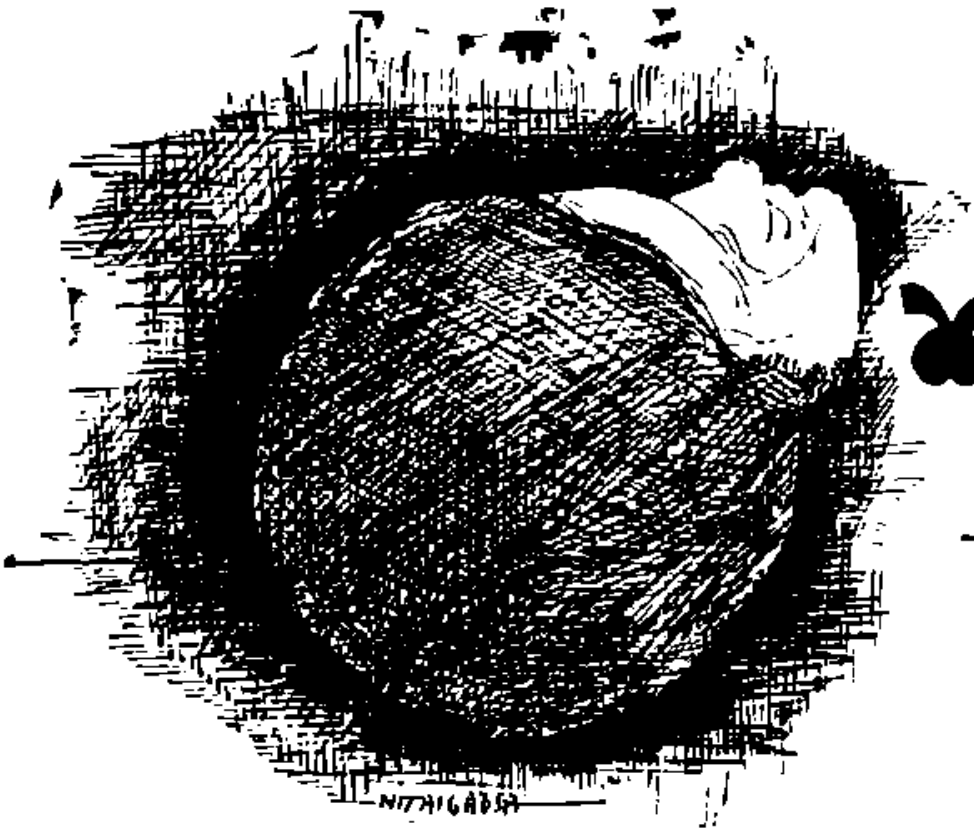

শব

শরীফ চট্টোপাধ্যায়

শহরতলীর একটা পড়ো খালি বাড়ির পেছন দিকের দোতলার এক ঘরে আমাদের কাহিনীর ধ্বনিকা উঠছে।

লম্বা একটা ডাইনিং টেবিলে চাদরে ঢাকা একটি দেহ। সময় রাত্রিকাল। ছোট একটি টিপয় টেবিলে রাখা একটি মোমবাতির কম্পিত আলোকে ঘরের আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। টিপয়-এর সামনে একটি কুশানচেয়ার।

টেবিল, তার ওপরকার মৃতদেহ আর কুশানচেয়ার সহ টিপয় সবই এ ঘরে সদ্য আমদানি করা হয়েছে। তার প্রমাণ হল এগুলি ছাড়া সারা ঘরে ধুলোয় ধুলোময়। দুটি জানালা, তাও বন্ধ। দেয়ালের কোণে কোণে মাকড়সার জালও দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

চাদর ঢাকা মৃত দেহটি বাইরে থেকেও বোঝা যায়, কোন দিকে মাথা আর কোন দিকে পা। দেহটি চিৎ অবস্থায় শোয়ানো। কোন রুগ্ন কঙ্কালসার মানুষের শব নয়, মনে হয় বেশ স্বাস্থ্যবান কারুর অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে।

বন্ধ ঘরগার ফাঁকে কোথায় যেন ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। একঘেয়ে একটানা।

নিকটবর্তী কোন ধনী বনেদী গৃহ থেকে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজলো। রাত ন'টা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল। একজন লোক ঘরে ঢুকে ধীর পদক্ষেপে টেবিলে শোয়ানো শবের দিকে এগিয়ে এল।

পেছনে দরজা কে যেন বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। তালা লাগাবার শব্দ পাওয়া গেল। তার ওপরে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ ক্রমশ নিচের দিকে মিলিয়ে গেল।

ঘরে ঢোকা লোকটি কার্যত বন্দী হয়ে গেল। দেখে অবশ্য মনে হল না যে বন্দী লোকটি নিজেকে খুব অসহায় মনে করল। বন্ধ ঘরে কম্পিত মোমবাতির আলোকে একটি মৃতদেহের সঙ্গে একজন জীবিত মানুষ বন্দী রইল।

কিন্তু জীবিত ও মৃত এরা কারা ?

লোকটি টেবিলে শোয়ানো দেহটির কাছে গিয়ে সে দিকে মুহূর্তখানেক তাকালো, অতঃপর দু'হাতের বিশেষ মুদ্রা সহ কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল একটা জানালার কাছে। খুলতে চেষ্টা করল খড়খড়ি সহ পাল্লা। খোলা গেল না। বহু ঝাঁটুনি আটকে রেখেছে কেউ। দ্বিতীয় জানালার কাছে গেল। সেটারও একই অবস্থা, খোলা গেল না। এই প্রায় নিশ্ছিদ্র ঘরে সে আর একটি মৃতদেহ।

অবশেষে সে ফিরে এসে কুশানচেয়ারে বসলো, টিপয়টা এগিয়ে কাছে এনে, পকেট থেকে ছোট্ট একটি বই বের করে মোমবাতির আলোয় পড়তে শুরু করল।

লোকটি যুবক। বেশ সম্ভ্রান্তির সুন্দর চেহারার যুবক। বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। দৃষ্টিতে যেন বেপরোয়া ভাব। হাবভাবে মনে হয় বেশ কঠোর নির্ভীক মনোবৃত্তির মানুষ।

বই-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে সে মৃতদেহের দিকেই চাইছিল। সে চাউনির মধ্যে ভীরুতার অভিব্যক্তি নেই, বা অতি সাহসীর দম্ভও নেই। এমন ভাবে চাইছিল যেন পড়ার ভেতরেই কোনকিছু চিন্তার খোরাক পাওয়ায়, হলেও করে ভাববার অবসরে, অন্যমনে দৃষ্টি দিচ্ছিল শবটির দিকে।

আধ ঘণ্টাটাক এই ভাবে পড়বার পর বুঝি সে একটি পরিচ্ছেদ শেষ করল এবং বইটিকে নিঃশব্দে টিপয়ের ওপর উপুড় করে রেখে দিল। টিপয়টাকে হাতে তুলে জানালার কাছে নিয়ে রাখলো। একটা ডিস-এর ওপর মোমবাতিটা দাঁড় করানো ছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে কুশানচেয়ারের কাছে ফিরে এল।

কি যেন ভাবল, তারপর ফিরে গেল টেবিলে শোয়ানো শবের কাছে। বাঁ হাতে আলো রেখে ডান হাতে মৃতের মুখ থেকে চাদরটা গলা অবধি সরিয়ে ফেলল। তলার পাতলা একটা কাপড় দিয়ে কপাল পর্যন্ত মুখ ঢাকা। নাক মুখ চোখ মোটামুটি বোঝা যায়। কালো কালো এক-মাথা চুল। মিনিট খানেক সে মৃতব্যক্তির মুখের পানে শ্রদ্ধা করুণা মাখা মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর চাদরটা টেনে পুনরায় ঢাকা দিয়ে চলে এল কুশান-চেয়ারের কাছে।

হাত তুলে দেখলো মোমবাতিটা ইঞ্চি দু'য়েক মাত্র অবশিষ্ট আছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর নিঃসীম অন্ধকার নেমে আসবে। অন্ধকার ঘরে সে ও একটি শব। ডিস্‌টার ওপর একটা দেশলাই ছিল। সেটাকে পকেটে পুরে নিয়ে দেয়ালে একটা তাকের ওপর মোমবাতিটা রেখে এক ফুঁ-য়ে নিভিয়ে দিল সেটা।

উপরোক্ত ঘটনার আগেকার এক দৃশ্য।

মধ্য কলকাতার ডাঃ হারাধন সরখেল-এর ফ্ল্যাটে ডাঃ সরখেল, ডাঃ হরিপদ সেন এবং জ্যোতির্ময় বোস নামে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট বসে কথাবার্তা বলছিল।

সামনে গোল টেবিলের উপর বিয়ারের একাধিক বোতল ও তিনটি গ্লাস।

তিন জনেরই অল্প বয়স। ডাঃ হারাধন সরখেল বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়স তিরিশ হবে। ডাঃ জ্যোতির্ময় বোস কিছু ছোট। সর্ব কনিষ্ঠ ডাক্তার ছাত্র-হরিপদ সেন।

নানা আলোচনার পর এক সময় ডাঃ হারাধন সরখেল বললে, দেখো, মৃতদের সম্বন্ধে জীবিতদের যে সত্তর কুসংস্কার রয়েছে এটা হেরিডিটারি, বংশক্রমিক। এবং এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। মৃত মানেই ভূত এই রকম একটা অনিবার্য ধারণার সৃষ্টি এই কারণেই হয়। অবশ্য এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, যেমন কেউ অতে কাঁচা, কারুর বা মিথ্যে কথা বলার দিকে ঝোঁক, এগুলো সবই বংশানুক্রমে পেয়ে থাকে মানুষ।

অপর দুজন হেসে উঠল। কনিষ্ঠজন বললে, মিথ্যে-বাদী হলে লজ্জিত হবে না, কি যে বলেন সরখেলদা !

—আমি সে কথা বলিনি হরিপদ। আমি বলেছি মিথ্যে কথা বলার দিকে ঝোঁক। ঝোঁক এক কথা, মিথ্যে কথা বলা আরেক কথা।

—আচ্ছা হরিধন তুমি কি মনে কর এই যে কুসংস্কার,

মানে মৃতদেহ সম্বন্ধে ভীতি, সেটা আমরা অহেতুক মনে করি. সেটা কি ইউনিভার্সাল, মানে সার্বজনীন? আমি নিজে কিন্তু ওধরনের কুসংস্কার মুক্ত, বললে ডাঃ জ্যোতির্ময় বোস।

—মানলাম, কিন্তু যথাযথ পরীক্ষা না হলে একথার সত্যতা স্বীকার করা যায় না, বললে ডাঃ হারাধন সরখেল, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যায় অন্যান্য মানুষের চেয়ে ডাক্তার এবং সৈনিকেরা এই শব-ভীতির সংস্কার থেকে মুক্ত।

—ডাক্তার আর সৈনিক! কেন এর সঙ্গে সরকারী ঘাতক বা মুদু শিকারীদেরও তো ধরা যায়।

—কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, ডাঃ সরখেল বললে, জ্যোতির্ময় সরকারী ঘাতকরা মৃতের কতটুকু দেখে। মৃত্যুর সংগে সংগে তাদের কাজ শেষ।

কণিষ্ঠ হরিপদ প্রশ্ন করলে, আচ্ছা সরখেলদা, কিভাবে প্রমাণ হবে যে কোন লোকের মৃত-ভয় ভূত সম্বন্ধে একেবারেই ভয় নেই? পুরোপুরি নির্ভীক সে?

ডাঃ হারাধন সরখেল উত্তর করলে, ধরো কোন লোককে যদি একটি সম্পূর্ণ খালি নির্জন বাড়ির একটি বন্ধ ঘরে একটি মৃতদেহের সংগে সারারাত্রি রাখা যায়, তার কোন বিছানা বা মুখ ঢাকা দেবার চাদর না থাকে এবং ঘরে থাকবে অন্ধকার, এই ভাবে শবের সংগে বাস করে সকালে যদি সে পুরোপুরি পাগল না হয়ে যায়, তবেই বুঝবো সে বাপকা বেটা, কুসংস্কারমুক্ত লৌহ-হৃদয় বীরপুরুষ। তবে এ ধরনের মানুষ, ওয়েল, মনে হয় খুবই বিরল। আমি বাজি রাখতে পারি।

—তবে শুনুন সরখেলদা, হরিপদ বললে, আমার জানা একটি লোক আছে যে ডাক্তারও নয় সৈনিকও নয়। অথচ সে আপনার সংগে যে কোন বাজি রেখে সারারাত মড়া নিয়ে ওভাবে অনায়াসে কাটিয়ে দেবে।

—কে সেই মানুষটি?

—নাম তার শত্রুঘ্ন দাস। আমাদের মুর্শিদাবাদেই বাড়ি। আমাদের বাজি ধরবার মত টাকা নেই। তবে ও নিজেই বাজি ধরনেওয়ালা।

—কি করে জানলে তুমি?

—আমি জানি ওকে। কথায় কথায় বাজি ধরে। আর ভয়? ভয় বলে যে কোন শব্দ আছে ও নাকি তা বিশ্বাস করে না।

—তাকে দেখতে কেমন?

—জ্যোতির্ময়দার মত হবে। মনে হবে যেন ওর অমর ভাই।

—বেশ আমি বাজি ধরতে রাজি, তাঃ হারাধন সরখেল যেন জোরের সংগে বলে উঠল।

জ্যোতির্ময় বললে, এর মধ্যে আবার বাদ দিলে নাকি?

—বাদ দেব কেন?

—বেশ তাহলে এ নাটকে আমি হব "মৃতদেহ"। রাজি?

—রাজি। বলে সবাই হেসে উঠল। এর পরবর্তী ঘটনা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আবার আমরা ফিরে যাই সেই অন্ধকার ঘরে। যে ঘরে রয়েছে শব ও একটি জীবিত মানুষ।

মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। অবশ্যকীয় কোন প্রয়োজনে লাগলে তখন যেন সে আলো জ্বালাতে পারে। আর কোন প্রয়োজনের কথা না ভেবে শুধু ঘড়ি দেখার জন্যেও তো আলোর দরকার হবে। অসহনীয় কোন অবস্থা আসবে কি?

আলোটা নিভিয়েই সে কুশনচেয়ারে বসে একটু চোখ বোজবার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়, ঘুম এল না। এতটা অনিদ্রাভাব তার জীবনে কখনো আসেনি। ঘুমের প্রচেষ্টা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছাড়তে হল। কিন্তু এখন সে করবে কি? অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করে ধাক্কা বা হোঁচট খেয়ে জখম হবে নাকি! কিংবা হুমড়ি খেয়ে মৃতদেহটার ওপরেও পড়তে পারে। শত্রুঘ্ন দাস তাই চেয়ারেই বসে রইল।

এ ধরনের ভাবনার সময়েই সহসা একটা শব্দ যেন কানে এল। সেটা এল টেবিলে শোয়ানো শবটার দিক থেকেই। কী ধরনের শব্দ তা সে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। সে মাথা ঘুরিয়ে ওদিকে চাইল না। কেন সে চাইবে? এই অন্ধকারে চেয়ে লি লাভ? কান খাড়া করে রইল সে। শুনতে শুনতে শরীরে কেমন যেন অস্বাস্তি একটা ভাব এল। চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরলো সে। কানে যেন কি এক অদ্ভুত আওয়াজ বেজে চলেছে। মাথা যেন ফেটে পড়তে চায়। বুকে যেন অসহ্য চাপ। অবাক হল সে। এরকম হচ্ছে কেন?

তাহলে কি একেই "ভয়" বলে?

সহসা নিঃশ্বাস নিল সে বুক ভরে। এতক্ষণ শোনবার তীব্রতায় সে বুঝি দম বন্ধ করে ছিল। দম ফেটে যাবার যোগাড়। ভয়? না না ভয় সে জানে না। গা ঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকার ঘরে কত দূরই বা আন্দাজে যাওয়া যায়। দেয়াল ধরে এগোল, কের বাঁয়ে, দেয়াল ধরে

জানালার কাছে, তারপর এগোতে গিয়ে কমাং শব্দে কি পায়ের সংগে ধাক্কা। প্রবল ভাবে চমকে উঠল শক্রর দাস।

—দুৎতোর নিকুচি করেছে, বিরক্তি ভরে শক্রর বলে উঠে, আশ্চর্য টিপটোর কথা ভুলেই যা গেলাম কি করে। আমিই তো এটাকে এখানে রেখেছি।

হাতড়ে হাতড়ে তাকের কাছে এসে দেশলাই জেলে মোমবাতিটাকে জ্বালালো এবং তৎক্ষণাৎ তাকালো টেবিলে শায়িত শবটার দিকে। না, যেমনটি ছিল তেমনি আছে। মৃতদেহ তেমনি শোওয়া। তাহলে?.....

শক্রর দাস কম্পিত শিখা, মোমবাতি আলোয় ঘরের চতুর্দিকে বারেক তাকালো।

পরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা টানাটানি করে দেখলো। না, দরজা তেমনি ভাঙা বন্ধ বাইরে থেকে।

মোমের আলোতে দেয়ালে দেয়ালে অদ্ভুত ছায়া পড়ছে। চেয়ারে গিয়ে এসে বসল। হাত ঘড়ি দেখলো, সাড়ে নটা। সাড়ে নটা? হাতটাকে তুলে কানে ধরলো। না, ঘড়ি তো চলছে। সময় কি কাটছে না, নাকি? মোমবাতির অবস্থা শোচনীয়। নিভিয়ে দিল সেটাকে ফের।

কেমন একটা। অস্বস্তি ভাব এসেছে শক্রর দাসের মধ্যে। সে বুঝি নিজের উপর এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। অসন্তুষ্ট না অস্বস্তি?

—না না আমার ভয়ের কি? কাকে ভয়? সে ভাবল, না না এটা হাস্যকর অবস্থা, লজ্জাকরও বটে। আমি এতটা মূঢ় নই। ভয় করছে যার কোন দুঃখে?

কিন্তু সাহস কি বললেই আসে? তবুই সে নিজেকে বিশ্বাস দিতে লাগলো. ভয়শূন্য হবার চেষ্টা করতে লাগলো, তবুই যেন চতুর্দিক থেকে অনিবার্য ভীতি শংকা এসে তাকে চেপে ধরতে লাগলো। শব-কে সে আর যেন নিরীহ মৃতদেহ বলে ভাবতে পারছে না।

—কী! শক্রর দাস চেঁচিয়েই উঠল প্রায়, আমি কি তাহলে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে ঐ হাস্যকর কুসংস্কার এসে গ্রাস করছে আমাকে? আমি, যে ভূতে বিশ্বাস করে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করে না, ভয় কাকে বলে জানে না, সেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি কেন? আমি কি আমার বাড়ি ফেরে যাব? ভূত প্রেত মরার ভীতি তো ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ গুহাবাসী আদিমের একচেটে কুসংস্কার। তারা বিশ্বাস করত মৃতেরা রাত্রিকালে হেঁটে বেড়ায়—

চমকে উঠল শক্রর দাস। ঠিক সেই মুহূর্তে স্পষ্ট নির্ভুল ভাবে সে তার পেছনে হালকা, পদশব্দ শুনতে পেল। সে পদশব্দ ক্রমশই যেন তার পেছনে থেকে কাছে এগিয়ে আসছে। সেই শায়িত মৃতদেহের টেবিলের দিক থেকে.....

সকাল তখনো হয় নি। রাত শেষ হয় হয়।

ডাঃ হারাধন সরখেল ও ডাক্তারী ছাত্র হরিপদ সেন ধীর গতিতে মোটরে করে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই শহর-তলীর পড়ো খালি বাড়িটার দিকে।

ডাঃ সরখেলই গাড়ি চালাচ্ছিল।

—কি মনে হয় হে তোমার? ডাঃ সরখেল প্রশ্ন করেন, তোমার বন্ধুটি তার সাহসের পরীক্ষায় উৎরে গেল? আমি কি তাহলে বাজি হেরে গেলাম?

হরিপদ মাথা নাড়লো, নিশ্চয়ই হেরে গেছেন। গিয়েও তাই দেখবেন।

—তাই হয়ত হবে, হতাশ কণ্ঠে বললে ডাঃ হারাধন সরখেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কের বললে, দেখো হরিপদ এসব আমার ভাল লাগেনা। ঝামেলা। চ্যাংড়ামিও বলতে পারো। তোমার বন্ধু শক্রর দাস যদি সেদিন অতোটা ডাঁটের মাথার কথা না বলতো এবং ঐ আপত্তিকর কথাটি না বলতেন, মানে ঐ যে "মৃতদেহটি কোন ডাক্তারের হলেই ভাল হয়"—শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল, তাই আমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি। নয়ত এ ঝামেলায় আমি যেতাম না হে। যদি কিছু ভয়াবহ সত্যই ঘটে, তাহলে আমাদের বারোটা বেজে যাবে। আমার কেমন ভয় করছে হে।

—কি আর হতে পারে খারাপ, হরিপদ অভয় দেয়, যদি ধরে নিই কিছু ভয়াবহ ঘটতে শুরু করে, তাহলে জ্যোতির্ময়দা উঠে বসে সব কিছু মানেন করবে, খুলে বলবে সব। সত্যি সত্যি মর্গের কোন বস্তু হলে হয়ত ভয়ের কারণ থাকতে পারত। ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষই তাহলে তথাকথিত 'মৃতদেহটি' সেজেছে।

গাড়ি চলতে লাগলো ধীর গতিতে। এ রাস্তা দিয়ে রাতভর ওরা কতবারি যে যাতায়াত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

—দেখো হরিপদ এখন প্রার্থনা করছি জ্যোতির্ময়কে যদি 'মড়া' থেকে বেঁচেই উঠতে হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই সেটা অতি কৌশলে করেছে। নয়ত এতটুকু ত্রুটি হলে এসব ক্ষেত্রে ফল সাংঘাতিক উলটো হয়, ভালর পরিবর্তে অত্যন্ত বিপদময় ফল হয়। নয় কি?

—ঠিকই বলেছেন সরখেলদা, মাথা নেড়ে সায় দেয়

হরিপদ, শক্তর দাস হয়ত ওকে খুন করে ফেলতে পারে।

—বাঁচালে বাবা। চারটে বেজেছে এতক্ষণে।

কিছু দূরে গাড়ি রেখে ওরা দুজন হেঁটে বাড়িটার দিকে অগ্রসর হতে, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে বললে, শুনছেন, বলতে পারেন, একজন ডাক্তার কোথায় পাব।

—কেন বলুন তো? কি ব্যাপার? সাধারণ ভাবে সহজ গলায় ডাঃ হারাধন সরখেল প্রশ্ন করে।

—নিজেরাই গিয়ে দেখুন, বলে লোকটা ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল উক্ত পোড়া বাড়িটায় অনেক লোক দ্রুত প্রবেশ করছে, আশে পাশের বাড়ির দরজা জানালা খুলে গেছে। সে সব স্থানে উৎসুক ও কৌতূহলী আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভীড়। চতুর্দিকে প্রচণ্ড উত্তেজনা। কিছু একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। প্রত্যেকেই প্রশ্ন করছে, কেউ কারুর জবাব বুঝি শুনেও শুনছে না। বিপরীত দিকের বাড়ির গেটের একটা আলো এসে পড়ে বাড়ির গেটের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত আলোকিত করেছে।

হরিপদ সেন দেখে শুনে ভয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ডান হাতে ডাঃ সরখেলের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বললে, যা-ই ঘটে থাকুক, সাংঘাতিক কিছুই ঘটেছে এবং তা আমাদের বিরুদ্ধেই। বাড়িতে ঢুকে কাজ নেই। চলুন—

—আমি একজন ডাক্তার ভুলে যেও না, ডাঃ সরখেল দৃঢ় কণ্ঠে বললে, ভেতরে হয়ত ডাক্তারের প্রয়োজন হতে পারে।

ঢুকেই সিঁড়ি গিজগিজ করছে লোক। অন্ধকার সিঁড়িতেও দোতলা পর্যন্ত কৌতূহলী মানুষ। সহসা উপরে ভয়ংকর এক গোলমাল শোনা গেল। তারপরই দেখা গেল একটা লোক দোতলার সেই ঘর থেকে বেরিয়ে দুহাতে বাধাদানকারীদের কীল চড় ঘুষি চালাতে চালাতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে নিচে নেমে এল। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল লোকটির পোশাক আশাক কেমন বিসদৃশ, দাড়ি গোঁফ কামানো, কিন্তু মাথাভরা চুল একেবারে শাদা।

সে যখন সিঁড়ি ছেড়ে গেটে এসেছে তখন হরিপদ চীৎকার করে উঠল, শক্তর, শক্তর।

কিন্তু লোকটা সেই ভোর না হওয়া আধো অন্ধকার আধো আলোর মধ্যে এক লাফে রাস্তায় নেমে চোঁচা দৌড় দিল। পেছনে অনেক পুলিশ কনষ্টেবল ছুটলো তাকে ধরতে। আশে পাশের বাড়ি থেকে উৎসুক জনতাও চিৎকার করে উঠল, পালালো, পালালো।

এই ফাঁকে ডাক্তার সরখেল, হরিপদকে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজার পুলিশ অফিসার বাধা দিতে "আমরা ডাক্তার" বলতে পথ ছেড়ে দিল সে।

ঘরের মধ্যে অনেক লোক। একটা ডাইনিং টেবিলের চতুর্দিক ঘিরে সে জনতা দাঁড়িয়ে। এরা জনতার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। ঘর অন্ধকার।

পুলিশের হাতের একটি ফ্লুটীর টর্চের আলোতে দেখা গেল কোমর অবধি চাদরে ঢাকা একটি দেহ শোয়ানো রয়েছে টেবিলে। জনতা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছে। মৃতের মুখাবয়ব বলছে পাশুর, বিকৃত, ভয়াবহ। অর্ধ-মুদিত চোখ উপর দিকে ওল্টানো, মুখটা বীভৎস ভাবে হাঁ করে রয়েছে।

একজন দীর্ঘকায় ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে কি দেখলো, হাত ধরে নাড়ি পরীক্ষা করে মাথা তুলে ঘোষণা করলে, মারা গেছে। অন্তত ঘণ্টা দুই পূর্বে মৃত্যু হয়েছে এর। কয়োনারের কেস এখন।

বলে ডাক্তার জনতা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

—ঘর খালি করুন, বলে পুলিশ অফিসার তার টর্চ সরিয়ে নিল মৃতের দেহ থেকে। মনে হল মুহূর্তে যেন মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে গেল। এতেই কাজ হল, চক্ষের নিমেষে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

সেই পলায়মান জনতার ধাক্কায় ডাঃ সরখেল এবং হরিপদ সেনও একসময় গেটের বাইরে এসে পড়লো।

দুজনে হাঁটতে শুরু করল। হরিপদ বললে, সরখেলদা বলিনি আপনাকে যে কিছু উলটো পালটা হলে শক্তরই খুন করবে ওকে।

ডাক্তার সরখেল নিরবে মাথা নাড়ল। দুজনে চলতে লাগলো হেঁটে হেঁটে। পূর্বদিক ফর্সা হয়ে উঠছে। ঝাড়ু বেহারারা কাজে লেগেছে। রাস্তার আলো একে একে নেভানো শুরু হয়েছে। কর্পোরেশনের মহলার গাড়ি বেরিয়েছে দৈনিক পাওনা হকাররা দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে।

—দেখো হরিপদ, ডাঃ হারাধন সরখেলের কণ্ঠ যেন অপার্থিব বলে মনে হল, আমাদের বোধ করি এবার স্থান পরিবর্তনের অতি প্রয়োজন।

—কোথায়?

—পশ্চিমে, যে কোন স্থানে দিল্লী, আগ্রা-লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ বোম্বাই যে কোন জনবহুল নগরে অজ্ঞাত বাস। অন্তত কিছুকাল।

—কবে যাবেন দাদা ?

—শুভস্য শিঘ্রম, আজই রাত্রে যাব'র।

—বেশ আমি রাত্রি দশটা, কাকাকে মুখে আহ্বানিত কণ্ঠে হরিপদ সেন বলে।

এ ঘটনার বছর দশ বাদে, উক্ত দুই ব্যক্তিকে দেখা গেল ইডেন গার্ডেন্স-এর এক বেঞ্চিতে বসে থাকতে।

অপর একজন লোক যে এদের দুজনকে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল, নিজে দূরে থেকে, এবার সে ধীর পায়ে এগিয়ে এল ওদের সম্মুখে।

পাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে। একটা ছেঁড়া প্যান্ট ও ময়লা হাওয়াই সার্ট গায়ে লোকটার।

—ওড আফটার নুন জেন্টল মেন। দুই চেয়ারের লোকটি কাছে এসে বললে, আজ্ঞা মশায়গণ, যদি আপনি সহসা বেঁচে উঠে কাউকে খুন করেন, তাহলে নিহত ব্যক্তির পোশাক নিয়ে পরে নিয়ে কাটিছি হাওয়া হয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কি বলেন ?

হারাধন সরখেল ও হরিপদ উভয়ে উভয়ের পানে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি হানলো। বেশ মজা লাগলো দুজনের। সরখেল তখন বলে উঠল, ঠিক ঠিক সেটাই আমার পরিকল্পনা ছিল। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত—

এ পর্যন্ত বলে সহসা সরখেল থেমে গেল। কি যেন মনে পড়ল তার। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নিমেষে অন্তর্হিত হল। ধেয়ে এল কাঁপন, ভীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল দুই বন্ধুর মুখের পানে।

—আহাহা, সেই আগন্তুক বললে, ডাক্তারবাবু দেখতে পাচ্ছি আপনিই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। যদি নিজে না চিকিৎসা করতে পারেন তো ডাক্তার হরিপদ সেন আপনাকে নিরাময় করে তুলবেন এ বিষয়ে আমি একে নিশ্চিন্ত।

—তুমি—আপনি—কে ? হরিপদ বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

আগন্তুক লোকটা কাছে এগিয়ে এসে ঘাড় নিচু করে ফিস ফিস করে বললে, কখনো কখনো আমি নিজেকে শত্রুর দাস বলে অভিহিত করে থাকি। তবে·····পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে, তোমাদের বলতে বাধা নেই যে, আমি হলাম ডাক্তার জ্যোতির্ময় বোস।

চমকে এক ঝটকায় দুজনে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে ? জ্যোতির্ময় ? তাই তো। সরখেল বলে ওঠে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যিই তাই বিশ্বাস কর আগন্তুক বলে ওঠে।

তারপর কি যেন ইতস্তত করে। বোধহয় পূর্বকথা কিছু স্মরণ করবার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে যায়। সহসা গুনগুন গান গেয়ে ওঠে। ওদের উপস্থিতি মনে হয় বুঝি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

—শোন জ্যোতির্ময়, হারাধন সরখেল বলে ওঠে, সেদিন রাতে কি ঘটেছিল শত্রুর দাসের আমাদের কাছে খুলে বলো !

গান থামিয়ে আগন্তুক বলে ওঠে, ওহ্ হ্যাঁ—হ্যাঁ শত্রুর দাস। আরে বলিনি বুঝি তোমাদের। বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। বুঝলে, শত্রুর সে রাতের স্বগতোক্তি শুনে বুঝেছিলাম ও সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে। তখন আমি পুরোপুরি কৌতুক করবার উদ্দেশ্যেই 'মৃত' থেকে বেঁচে ওঠবার প্রলোভন জয় করতে পারিনি। অর্থাৎ আচমকা আমি বেঁচে উঠেছিলাম। আমি ভাবতে পারিনি যে লোকটা আমার এ কৌতুককে অতটা সিরিয়াসলি নেবে। সত্যিই ভাবিনি বিশ্বাস করো। তারপর ? তারপর তাকে আমার স্থানে অর্থাৎ টেবিলে শুইয়ে দেখতে উঃ ভগবান, অনেক বীভৎস কাজ অনেক বীভৎস করবং আমাকে করতে হয়েছে। তারপর ওর সঙ্গে পোশাক পরিবর্তন করে·····উঃ·····তারপর, আবার তোমরা আমাকে ফেরতে দিলে না !

—আমরা ? কেন ? —কেন ? কেমন যেন কিং কর্তব্য বিহ্বল কণ্ঠে সরখেল বলে ওঠে, আমাদের সঙ্গে এ ঘটনার কি সম্পর্ক ?

—সে কি। আমি আপনাদের ডাক্তার হরিধন সরখেল আর ডাক্তার হরিপদ সেন বলে ডাকিনি ?

—আমার নাম হারাধন আর এই ভদ্রলোকের নাম হরিপদ, সরখেল চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, তবে আমরা এখন আর ডাক্তার নই। ডাক্তারের নিকুচি করেছি যে মিষ্টার। আমরা বর্তমানে, ভুয়ারী, গ্যাংলার, বুঝলে ?

এবং প্রকৃতই ওরা তাই।

—বাঃ চমৎকার পেশা, চমৎকার। আশাকরি এই হরিপদ ঐ শত্রুরের বাড়ি-ঘরা টাকা তোমায় দিয়ে দিয়েছে ! বাঃ বাঃ ভাল পেশা, ভুয়ারী, লোকটি নিজ মনেই বলে ওঠে, আমি কিন্তু পেশা ছাড়িনি। আমি হলাম চৌরঙ্গী পাড়ার গায়দের সুপ্রীম মেডিকেল অফিসার। গায়দের সুপারিনটেন্ডেন্টকে সুস্থ করে তোলাই আমার একমাত্র কর্তব্য। ওডবাই, চলি বন্ধুগণ। (বিদেশী ছায়া অবলম্বনে)

। শেষ ।

বাজুরিয়ার মঠ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের বালিয়াড়ি ভেঙে ওরা কুটীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের দিন। সূর্য সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছে। অপর্ণা কথা বলছিল না—কারণ আদিত্যকে দেখে অপর্ণার এই সমুদ্র বিষাদ লাগছে। ওরা অর্থাৎ আদিত্য দেখে কার্ণ গাছের ঝোপে লুকোচুরি খেলছিল। আর বালিয়াড়িতে অজস্র ঝিনুক। রোদের সোনালী রঙ ঝিনুকের পেটে লাল হলুদ অথবা নীলচে আভা সৃষ্টি করছিল। পাহাড়ের গায়ে কাঠের ঘর। লাল পাথর। সমুদ্র পাখীরা উড়ছে। পাহাড়ের গায়ে পাথরের উনুন—শীতকালে আদিবাসীরা এখানে আশ্রয় নেবে এবং আগুন জেলে সমুদ্র পাখীদের অত্যাচার থেকে এইসব কুটীর রক্ষা করবে অথবা মাছ ধরার মন্ত্রে অনেকে গভীর সমুদ্রে হারিয়ে

যাবে··· ···সবই গল্প
ভালবাসে।

সমীরণ বলল, একটা ঝীপ খা
যাওয়া যেত।

অপর্ণা কুটীরের দিকেই হাটছে। সে থামল না। কারণ ওর সবই জানা—এই মৌসুমে ঝড়ের ঝাঁপে যাওয়া মজার ব্যাপার। সমীরণ খোলা আকাশের নীচে শরীরের ঘ্রাণ নিতে ভালবাসে।

কুটীরের মুখে নানা রকমের ফুলগাছ। লাল কাঠের বেড়া। দেওয়ালটা রঙের মেজে এবং জানালার কাঠে রুপালী রঙ। সামনে বালিয়াড়ি বলে ঢেউয়ের রঙ নীল বলে আর গাছে গাছে ফুলের সমারোহে বলে সমীরণকে উচ্ছল মনে হচ্ছে। সমুদ্রে কিছু পাহাড়ের মত ঝীপ আর সেখানে সমুদ্র পাখীদের বাসা।

সমীরণ বলল, চল না কাল পাখীদের ডিম অন্বেষণ করে আনি।

—হঠাৎ এ কথা কেন সমীরণ। নীড় বাঁধবার সখ দেখছি।

—আর ভাল লাগছে না। এবার একটু গৃহী হওয়া ভাল।

অপর্ণা বারান্দায় উঠে বলল, কাল সমুদ্রে যাব না। বারান্দায় বসে দূরের সমুদ্র দেখব।

সমীরণ বলল, বলার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর মত কথা বলতে আরম্ভ করলে।

অপর্ণার হাই উঠছে এখন। সে ঘর থেকে একটা ইজিচেয়ার টেনে নিল এবং বসে পড়ল।

অপর্ণা বলল, চা করবে সমীরণ? তখন অপর্ণা দেখছে সেই সব ফার্নগাছ অতিক্রম করে পাহাড়ের উৎরাইয়ের পথ এবং পথের বাঁকে আদিত্য। আদিত্য আগে আগে আর রেণু পেছনে। ওরাও বালিয়াড়ি ভেঙে ঘরের দিকে উঠে আসছে। সে সমীরণকে পর্দা টেনে দিতে বলল। যেন বলার ইচ্ছা—তুমি আদিত্য কেন আগুন জ্বালতে চাও। আমি অসহায়। আর এতদূরে যেখানে প্রবাস জীবন শুধু নির্জনতায় ঘর, আমাকে অসুখী দেখতে তোমার কেন সেই এক ইচ্ছা। কেমন ইচ্ছা বেণুর। কিন্তু দেখো আমি কত সুখী।··· বিজয়িনীর মুখভঙ্গী করে যেন সব সময় অপর্ণা আকাশ দেখছে। সমীরণ পাশে বসে তখন ছোক ছোক করছিল যে অপর্ণার সম্মতি আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসলগ্ন কথা বলছে।

অপর্ণা এখন হাসছে। কারণ অপর্ণা জানেত এই শরীরের জন্য বালকের দারুণ তৃষ্ণা। সে বলল, ছেলে-মানুষি কর না। সময় অসময় বুঝতে হয়। সমীরণের ব্যবহার কেমন ভিক্ত মনে হচ্ছিল। সমীরণ মুখ ব্যাজার করে রেখেছে। এই প্রীতির ছুটী নিদারুণ বিফলে যাচ্ছে।

অপর্ণার সাহস খুব রক্ষণশীল রমণীর মত ব্যবহার —এবং উদাসি সমীরণের ভাল লাগছে না।

অপর্ণা বলল, তুমি বরঞ্চ রেণুকে চিনতে?

সমীরণ বলল, রেণু! কোন রেণু।

অপর্ণা বলল, পবিত্রের দিদি।

সমীরণ আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলল, আমাদের রেণুদি। যে পর পর দুবার ব্যাডমিন্টনে কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

অপর্ণা বলল, হুঁ। যেন বলতে চাইল—পরে যে রমণী পথের ঐশ্বর্য চুরি করে এখন ঘর করছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে—এইসব ঘটনার জন্য আদিত্যই দায়ী। অর্থাৎ যে ভালবাসার আদিত্য অপর্ণার শরীর ভক্ষণ করেছিল সেই ভালবাসার দায়ে আদিত্য রেণুকে গর্ভবতী করে বিয়ে করল।

সমীর! অপর্ণা গভীর হতে চাইল। সমীরণ বলল, বল।

—তুমি আমাকে অপর্ণাদি বলে ডাকবে, রেণু এবং আমি সমবয়সী।

অপর্ণা কপালের উপর হাতটা রাখল। পূর্বাভাস জন্য লাল ঘর বারান্দায়। কিছু আইভি লতা দুলছিল এবং লতানে গোলাপের গুচ্ছ, পাথরের উপর এবং সর্বত্র এই লাল রঙ—সমুদ্রে ঢেউ আর ঢেউ। বাতাস বইছে।

পাহাড়ের ছায়ার চায়ার ছোট্ট গ্রাম্য পথ চলে গেছে ঘাটের দিকে। এই সব বিরল স্বাস্থ্য নিবাসটির জন্য সেই সব পথে গ্রাম্য বালিকারা দুধ ডিম বহন করে আনে—ওরা ফিরে যাচ্ছে এখন। দুধ ডিম বেচে ওরা ঘরের পথ ধরছে। অপর্ণা দেখল, ওর কপাল যাচ্ছে—এক তীক্ষ্ণ চিন্তা ওর শরীর মনকে সর্বদা ক্লিষ্ট করছে। সমীরণ পাশে বসেছিল। তখনও ওর স্বভাব নতুন বিয়ে করা যুবকের মত। সে কিছুতেই উঠে ঘরের দিকে যেতে চাইছে না।

অপর্ণা কপাল থেকে হাত নামাল। বলল, যাও লক্ষ্মীটি। অসভ্যতা করতে নেই। শরীরের ভালমন্দ আছে—সব বুঝতে হয়। বলে অপর্ণা একটু থামল। কি যেন মনে মনে ভেবে নিচ্ছে।

সমীরণ এবার বিরক্তিকর পুরুষের মত অথবা সরকারী অফিসে যে মুখ নিয়ে বসে থাকে এমন এক মুখের রেখা টেনে বলল, অপর্ণা শরীর খারাপ লাগছে?

অপর্ণা স্পষ্ট জবাব দিল,—না, সমীরণ অন্য অনেক প্রশ্ন করতে চাইল কিন্তু পারল না। অপর্ণা এখন খুব দূরের মানুষ। অথবা সে শুধু দূরের সমুদ্র দেখছে, যেন অনেক ছবি।

……যাত্রিরা নৌকায় পাল তুলে দিয়েছে—ঠাণ্ডা বাতাস লেগেছে পালে—এক নিরুদ্দেশের যাত্রী তাকে অনবরত হাতছানি দিচ্ছে। পালে এক সুপুরুষ যুবক, কৃতী পুরুষের ছবি সবই অর্থহীন। ওর চোখ সহসা বড় উদাস হয়ে গেল।

—তুমি ত বহরমপুর কলেজ থেকে বি. এ অনার্স। অপর্ণার স্বরে চটুলতা। অথচ দরজার দিকে না তাকিয়ে কথাটা বলল অপর্ণা। বারান্দার কাচকাটা হীরের মত জ্যোৎস্নার রং এবং মুখে সহসা এক বেদনা—অপর্ণা চোখ না তুলেই বলল, আমি তখন বি. টি-তে এডমিশন নিচ্ছি। তোমাকে আমি তখন পঙ্কিলের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি। রেণু বলত, তুমি পঙ্কিলকে দাদা বলে ডাকতে। তোমার সম্পর্কে রেণুই অনেক কথা বলত।

—তাতে কি বোঝায়?

—আমি তখন পঙ্কিলের খুব ঘরে পাশে করতাম।

—এখনও ইচ্ছা করলে করতে পার।

—সুতরাং যে দুষ্ট বালক জীবন ভয়ানক জটিল। বলে অপর্ণা হা হা করে হাসতে হাসতে হেলে পড়ল যেন সমীরণকে।

সমীরণ এক সময় চা করল এবং চা এনে টিপয়ে রাখল। অন্ত একটা ইজিচেয়ারে পা এলিয়ে পরস্পর মুখোমুখি। সন্ধ্যা হয়েছে। সুতরাং স্বামীর কিছু গলা সেধে তারা। ওরা পরস্পর আলোয় ভেতর মুখ ডুবিয়ে বসে থাকল। ওরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে পাহাড়ের গায়ে স্বাস্থ্য নিবাসের লাল নীল আলো অথবা পাহাড়ের দামুদেশে এবং বালিয়াড়িতে সমুদ্রের রাগ রঙ্গার চেষ্টা করছে।

সমীরণ এক সময় প্রশ্ন করল আজ তোমার কি হয়েছে বলত।

—কিছুনা। অপর্ণা মনে মনে বলল কত দীর্ঘ দিন পর রেণুর সঙ্গে দেখা। ভিতরের আহত আয়নাটা থেকে ফের রক্তপাত হতে সুরু করছে। সে বলল ওদের সোনার সংসার। মনে মনে বলল- সংসারে আগুন জ্বলতে দোষ কি।

—কার সোনার সংসার অপর্ণা।

—রেণুর। রেণুরা এখানে এসেছে।

—চল একদিন ওদের কটেজে যাওয়া যাক। সমীরণ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কথাটা বলল।

—ওরা কোন কটেজে উঠেছে আমার জানা নেই। ওদের আমি বালিয়াড়িতে দেখেছি। তখন তুমি এবং আমি কটেজ নাম্বার খুঁজে মনে পাক্তারি করছিলাম।

—খুঁজলে নিশ্চয়ই ওদের বের করা যাবে।

—আশা করছি। তুমি দেখা হলে রেণুকে রেণুদি বলে ডাকবে?

—তাই বলে ডেকেছি।

অপর্ণা উঠে পড়ল ইজিচেয়ার থেকে। কিছে রাত্রির ধারাটুকুর ভার দিয়ে বলল, চল ফের অন্ধকারে নামা যাক।

সহরে এখন ঝিমিত আলো। কিছু ফার্স জাতীয় গাছ পাথরের গায়ে অথবা পাইনের মত লম্বা বৃক্ষ আর ক্রমশ উপরের দিকে কাঁটা জাতীয় গাছ, লাল পাথর, কাঁকে কোথাও ছিন্ন ভিন্ন ঘাস। অপর্ণা হাঁটতে হাঁটতে বলল, পথের অন্ধকার আমাকে বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়।

অপর্ণা উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ফের বলে চলল, আমার বাবা খুব ধর্মভীরু লোক ছিলেন। বলতে গেলে পরিবারের প্রায় সকলেই সহজ এবং সাধারণ লাজুক ছেলের মত বড় হচ্ছিলাম। অপর্ণা এইটুকু বলে থামল। দূরে সমুদ্র এবং সেখানে আলোর ঘর। সম্ভবত জাহাজ যাচ্ছে অন্য কোন বন্দরের উদ্দেশ্যে। সমীরণ পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্য অপর্ণা এসব ভুলল।

অপর্ণা বলল বাবা অন্ধকার পথে ভয়ে বড় হাঁটতেন না। তিনি বলতেন, অন্ধকারকে যত পরিত্যাগ করবে ততই শুভ।

—কেন এখন কথা বলতেন ?

—একবার খ্রীষ্টের জন্মদিনে অন্ধকারে ঈশ্বরের নাম জপ করছিলেন। পরেরটুকু ফের চেপে যাবার জন্য সে অন্য কথায় চলে গেল।

ওরা পথের মোড়ে অন্য একটি কটেজ দেখল। বৃদ্ধ মালি ঘোড়ার পিঠে জিন পরাচ্ছিল। মালিক এখন বের হবেন। তিনি এই পথ ধরে এবং পাহাড়ের সানুদেশে ঘোড়ায় ক্রমশ ধাবমান ছায়াকে অতিক্রম করে এখন শুধু সমুদ্রের প্রতি একাগ্রতা প্রকাশ করেন। সমীরণ মালিককে উদ্দেশ্য করে বলল, লোকটা পাগল।

—আমার বাবাকেও লোকে পাগল বলত। অপর্ণা পরেরটুকু ফের চেপে গেল। মনে মনে সে সেই সব স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে যেন বলল, খ্রীষ্টের জন্মদিনে এক কাপুরুষ আমাকে আলিঙ্গন করে শরীরের সব নতুন অভ্যাসের ঘায়ে সুড়সুড়ি দিল। আমি তখন প্রলোভনে মত্ত। ওর যুবক শরীর এবং বিস্তার বহর আমাকে নির্লজ্জ বেহায়া মত—অপর্ণা ভাবল সবই সমীরণকে খুলে বলা যাক। জীবন এত উচ্ছৃঙ্খল কেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে সবসময় পুরোপুরি ছুটিতে ওর এই দূরে ছুটে আসা এবং সমীরণের মত উঠতি যুবকদের মধ্যে চিমনোর জন্য···অপর্ণা ছটফট করতে থাকল। তখন কটেজের মালিক পাহাড়ের সানুদেশ ধরে ঘোড়ায় দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। লোকে বলত, সে রোজ বাজুরিয়ার মাঠে যায়। অপর্ণা এইসব দেখে মনে মনে বলল, ঈশ্বরলাভের গুহের জন্য পাশেই আমি যৌন জীবনে মত্ত ছিলাম। আদিত্য তখন কেবল বলছিল ফিসফিস করে, শোন লক্ষ্মী আমার, তুমি আমার সব, তোমাকে ছাড়া আমার প্রাণ বাঁচবে না। অন্ধকারে আলো জেলে বাবা সব দেখতে পেলেন। অপর্ণা এইটুকু সোপনে নিজের কৃতিকে শুনাল, কারণ বাবা এখন বেঁচে নেই।

এখন সানুদেশে দ্রুত ঘোড়ার অশ্বের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

অপর্ণা বলল, তুমি নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়তে পার সমীরণ।

চাঁদুরীর গাড়িতে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হয়েছিল।

অপর্ণা বলল, আরবী ঘোড়ায় চড়ে একদিন বাজুরিয়ার মাঠে চল।

ওরা দূরের দৃশ্য দেখছিল। পরিষ্কার আকাশ, সুতরাং নক্ষত্রেরা সব দূরের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরের পাশে সেতু। সেতু অতিক্রম করলে ফের পাহাড়ের সানুদেশ, এবং সমুদ্র পাশে গর্জন করছে।

সময়টা স্বাস্থ্যনিবাসের অসময়। সেজন্য প্রায় কটেজগুলো খালি। কিছু স্থানীয় পুলিসের গলা পাওয়া যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে ওরা মাছের জন্য সমুদ্রের দিকে হাঁটছে। কিছু লোক শয়নের ঘরে আগুন জেলে রান্না করছে। অপর্ণা দাঁড়াল—ওরা দূরের কটেজগুলোতে দেখল সেই লাল নীল আলো—কেমন এক রহস্যের গন্ধ সর্বত্র। এই পথ ধরে হাঁটতে অপর্ণার যেন ভয় করছে। কারণ রেণুর দিনে দিনে রূপ খুলে পড়ছে। রেণু অসহ্য, আদিত্য আরও অসহ্য। ফের ওদের সঙ্গে দেখা। এবং ওদের সংসার সুখের। সংসারে যদি কিছু খড়কুটো ফেলে দেওয়া যেত।

অপর্ণা এই ঘটনাকে সবিস্তারে ভাবতে চাইল—একদা রেণু ওর বন্ধু ছিল। যখন আদিত্য বাড়ীতে আসতে আর সাহস পেত না। রেণুই অপর্ণা এবং আদিত্যের যোগা-

বোধ রক্ষা করে করে এক সময় নিজেই আদিত্যকে গিলে ফেলল। আদি 'বুড়বক' অপর্ণা নিজেকে ভিজতে দিয়ে দেখল, পাশাপাশি হাঁটছে সমীরণ। সে বলল, তুমি বিড়বিড় করে কি বকছ অপর্ণা।

—কৈ না ত!

সমীরণ অপর্ণাকে মুখোমুখি টেনে নিল এবার। বলল, চল ঐ কোণটার পাশে আমরা বসি। বেশ একটা ছোট আলো জ্বলছে মাথার উপর। যেন বলার ইচ্ছা সমীরণের পরিচ্ছন্ন বোধ, সুতরাং কেউ দেখতে পাবে না। খোলা আকাশের নীচে বড় রোমান্টিক হবে। অথবা মাথার উপরে আকাশ এবং দূরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে—আহা অপর্ণার যৌবন যেন শ্রাবণীর মত।

সমীরণ অপর্ণার হাত ধরে কোণের দিকে টেনে নিতে চাইলে বলল, আমার ভাল লাগছে না সমীরণ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

অপর্ণা কোণের পাশে গিয়ে বসল না। বরং সে বালিয়াড়িতে পায়চারি করে বেড়াতে থাকল। কারণ অপর্ণা জানত এই সব অনুরোধে ঢেঁকিও সমীরণ প্রকৃতির নিঃসঙ্গতার ভিতর চুপচাপ বসতে পেরে না। সমীরণ কোণের ভিতর উলঙ্গ শিশুর মত মুখ করে—অথবা এই ভাল, রাতের অন্ধকার সমীরণকে পাগল করে তুলুক। সে ঘুরে ঘুরে হেঁটে যেতে থাকল। সমীরণ চীৎকার করে ডাকল অ···প···র্ণা। এই শব্দ পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। এই শব্দ নিশীথের ভাঙা অট্টালিকা থেকে যেন উঠে আসছে।

আর তখন অপর্ণা দেখল সমীরণ ক্রত ছুটে আসছে পাগলের মত।

সবে মাত্র ছবিন হল ওরা এই খাদানিবাসে উঠেছে। নানারকমের অজুহাত এখনও অপর্ণাকে রক্ষা করে আসছে। আর গতবার সমীরণের বেলেল্লাপনা, এই দীর্ঘ ছুটীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি·····অপর্ণার প্রতিরোধ স্পৃহা কতই হোক অথবা সিংহকে খাঁচায় পুরে মাংসের লোভ দেখানোর অভ্যস্ত হতে পারে অথবা অপর্ণা যেন সিংহকে অভুক্ত রেখে মাংসের লোভ বাড়াচ্ছে। কারণ সমীরণ বলিষ্ঠ যুবক। দীর্ঘ এবং ঔদ্ধত্যময় পুরুষের মত সুখ সুতরাং অপর্ণাও ছুটতে থাকল। কিছুদূর এসে অপর্ণা বলল, সমীরণ দেখ ঘুরে জাহাজ যেতে যাচ্ছে। এই বলে অপর্ণা আঙুল তুলে দূরের জাহাজ দেখাতে চাইল। সমীরণ দূরের বিন্দু বিন্দু আলোর মালা দেখল। আলোর মালা ছেলে যাচ্ছে আর প্রেম এসে সমীরণকে মাংসের ভিতর অদৃশ্য করবে। আদিত্য যা করেছিল, তারপর করে সরে পড়েছিল।

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে অপর্ণা আগামী কালের এক কর্মসূচী টেনে ফেলল। অন্য ঘরে সমীরণ হয়ত ঘুমাচ্ছে। সমীরণ এই অল্প রাতের মধ্যেই দু-তিনবার দরজার পাশে এসে প্রতীক্ষায় রাত্রি বাড়িয়ে গেছে। অপর্ণার এক বক্তব্য—শরীর ভাল যাচ্ছে না অথবা আদিত্যের ঘরে আগুন আনবার জন্য শুয়ে শুয়ে নানা রকমের ফন্দি ফিকির আঁটছে। সে জানালার কাঁচ খুলে দিয়েছিল। অপর্ণা সমুদ্রের বাতাসের জন্য অপেক্ষা করছে। অপর্ণা একটা ছবি বের করল, বালিশের নীচ থেকে, আদিত্যের ছবি দেখল—কিন্তু এই আদিত্য বারংবার সমুদ্রের পারে এসেছে এবং বেণু যাকে বারবার আলিঙ্গনে টেনে উল্লাসের জন্ম দিতে পারছে না তাদের কাছ থেকে এবার সমীরণকে ছেড়ে দেওয়া যাক। অপর্ণা ছবিটি দূরের কাছে এনে চুমু খেল। তারপর বলল, তুমি কাপুরুষ আদিত্য।

পরদিন বিকেলবেলা অপর্ণা সমীরণকে বলল চল আমরা আদিত্যের কটেজে ঘুরে আসি। আদিত্যকে হতবাক করে দেওয়া যাক এই মনে মনে ভাবল অপর্ণা। বেণুর সঙ্গে যোগ অক্ষুণ্ণ রাখা যাক কারণ আদিত্যের চেয়ে তার বেণুকে বেশী দরকার।

ওরা পাগড়ের উৎরাইয়ে নেমে গেল। এবং ছোট হ্রদের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল। রাতের সেই ঘোড়াটা এখন হ্রদের অন্য পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপর্ণাকে দেখে বৃদ্ধ মালী আদাব দিল। সামনে পুরানো কটেজ, নানা-রকমের মার্বেল পাথরের নগ্ন মূর্তি, প্রকাণ্ড জলাধার; আর দূরে সমুদ্র গর্জন, পাহাড় শ্রেণী অথবা

বাড়িগুলি এইসব মিলে ঘাটীর মালিককে লক্ষপতি করে রাখে। ওরা এখানে ইচ্ছা করলে একটা টাকা নিতে পারত। সামনের বাড়ী ঘুরে যেতে দেরী হবে……সে যেন মাইলের মত এবং ওরা হাঁটতে হাঁটতে কিছু বিদেশাগত পুরুষের কণ্ঠ শুনতে পেল। সামনে কিছু লোকের ভীড়। কিছু দোকানপাট এবং এই অঞ্চলটাই ঘন বসতিপূর্ণ আর মফস্বল সহরের মত অপরিসর জায়গা। অপর্ণা বিদেশীদের মধ্যে যিনি খুব দীর্ঘকায় তার দিকে হাত তুলে বলল, লোকটাকে দেখতে ঠিক কাকার শীব্‌সের মত। কাকার শীব্‌সকে তোমার মনে পড়ে সমীরণ?

সমীরণ বলল, না।

—কেন? তিনি বি. টি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সমীরণের লোভী পেটুক এবং অসভ্যের মত চেহারাটাকে এখন আর বুঝি চেনা যাচ্ছে না। অথবা এখন সে নাক নীচু করে বেড়ানো সেজেও নেই। তাছাড়া যে অলিখিত চুক্তি ছিল অপর্ণার সঙ্গে—যেমন বিদেশ ভ্রমণে বের হলে কিছু দৈহিক সুখ সকলেরই প্রাপ্য। কিন্তু চুনার অথবা পুরীর সমুদ্রতীর এবং কোন নিঃসঙ্গ পান্থশালায় শুধু এবার অপর্ণা যেমন যেন সর্বদা সুরক্ষিত থাকতে চাইছে। সে ঘুরে ফিরে আদিত্যকে অনুসরণ করছে। চারিদিকে ভোজ্য দ্রব্য ফেলে রেখে অনাহারী মুরুকের মুখের রেখা কতটা প্রকট এবং কত দীর্ঘ সময় ধরে লালসার বীজ বপন করা যেতে পারে অপর্ণা যেন তারই গবেষণায় এখন রত। সুতরাং সমীরণ পথে বের হয়ে কোন কথা বলছিল না যার জন্য ওর গলায় স্বর বিরক্তিকর শোনাল। সে বলল, না আমি চিনি না।

অপর্ণা বলল, ছোট মফস্বল সহরে এতবড় বি. টি কলেজের অধ্যক্ষ শীব্‌সের নাম জানতে না বড় আশ্চর্য।

—শীব্‌স নিশ্চয়ই মহাপুরুষ ছিলেন?

—এই দেখ তুমি যেন রেগে গেছ।

—রেগে যাবার কি আছে। শীব্‌সকে আমার দাদা নেই। তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তুমি বি. টি কলেজে পড়তে, শীব্‌সকে তোমার, জানা উচিত।—সমীরণ, শীব্‌স মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করেছেন। অপর্ণা ধীর এবং গম্ভীর গলায় কথাটা বলল। সে বলল যে উপেক্ষা আদিত্য আমাকে দিয়েছিল এবং রেণুকে বিয়ে করার যে অপরাধ চেপে উঠল……তুমি বিশ্বাস কর সমীরণ, আদিত্যের প্রতি আমার প্রেম বড় গভীর, দুঃখে এবং শোকে বোধ হয় আরো বেড়ায়। তখন কাকার শীব্‌স বলতেন, মরে যাওয়াটা জীবনের ধর্ম নয় অপর্ণা। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলার জন্যেই হোক অথবা উঁচু নীচু পাথর জন্যেই হোক, মনে হচ্ছিল অপর্ণা যেমন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ওকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

সমীরণ এবার তীক্ষ্ণ হতে চাইল।—তবে শীব্‌সকে মাতুলি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখ।

এই উক্তি খুবই অসম্মানকর। সুতরাং অপর্ণা আর কোন কথা বলল না। ওরা কটেজের মুখেই দেখল রেণু দাঁড়িয়ে আছে। এবং জানালার ভেতর থেকে আদিত্যের মাথা দেখা যাচ্ছে। অপর্ণার সংকোচ হচ্ছিল। কারণ সে দীর্ঘদিন পর বেড়ানো এবং নির্লজ্জের মত এই আদিত্য এবং রেণুকে সম্ভাষণ করতে এসেছে।

অপর্ণার চোখে মুখে সংকোচটুকু অনেকক্ষণ ঝুলে থাকল। আর রেণু এই আকস্মিক ঘটনার জন্য যেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে সহসা চেঁচিয়ে উঠল, আদিত্য দাখো কে এসেছে?

রেণু অপর্ণার হাত ধরে বারান্দায় উঠে এল। পেছনের দিকে ইচ্ছা করেই তাকাল না রেণু। যেন কের পিছনের দিকে তাকালে রেণু যথার্থই সমীরণকে চিনে ফেলবে।

সমীরণ ভাবল, এই সেই রেণুদি যার শরীরে সবসময় মিষ্টি গন্ধ ঝুলে থাকত। এবং যার জন্য পবিত্র ওর এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পবিত্র, রেণু এবং সমীরণ সম্পর্কে অনেক খবরই রাখত না। কারণ সমীরণ সর্বদা রেণুকে রেণুদি বলে ডাকত।

অপর্ণা জানালার উপর ঝুঁকে বলল, চিনতে পারছ। কথাটা আদিত্যকে উদ্দেশ্য করে বলা।

আদিত্য জানালার দিকে মুখ তুলে তাকাল। প্রথম মুখে কেমন ধরা পড়ে গেছে ভাব। এবং হকচকিয়ে

সেল। সে সহসা অপর্ণাকে এত কাছে দেখে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে হয়ত কিছুই বলতে পারত না তবে ব্যাপারটা আরও হাস্যকর হবে। সুতরাং সে মাথা নীচু করার আগে বলল, তুমি ভাল আছ অপর্ণা?

—এই চলে যাচ্ছে। অপর্ণা কথাটাকে হজম করে ফেলল।

অপর্ণা সমীরণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। একজন সরকারী অফিসের বড় কর্তা, অন্যজন আদিত্য হালদার অধ্যাপক মানুষ, শুধু বই পড়ার ভান করে বসে থাকবেন।

আদিত্য বলল, খোটা দিয়ে কথা বলার স্বভাব এখনও তোমার যায়নি অপর্ণা।

রেণু এতক্ষণ সব দেখছিল। কিছু বলছিল না।

শুধু আদিত্য বলল, আসুন আমরা বাইরে বসি বেশ খোলা আকাশ।

বিকেল হলে পাহাড়ের গায়ে পাখীরা সব ফিরে যাচ্ছে। রেণু, অপর্ণাকে বলল, বাচ্চা ছেলেটাকে কোত্থেকে কেন সংগ্রহ করলি?

অপর্ণা মিষ্টি করে হাসল, কোন জবাব দিল না। এবার সে বেশ জোরেই কথাটা বলল, সমীরণ তুমি ত ওকে চিনতে?

—উনি হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। সে কথাটা সংক্ষেপে বলল।

আদিত্য অন্য কথা বলল, এইসব প্রবাসের দিনগুলো বেশ লাগে। তুমি অপর্ণা এখানকার বাজুরিয়ার মাঠে গেছ?

অপর্ণা বলল, না।

—একবার যাবে? আমি রেণুকে নিয়ে কত ঘুরে এসেছি। সেখানে তুমি একটা ঢিবি দেখবে। কত রকমের গর্ত। এক ধরনের ব্যাঙ আছে ওখানে, ওরা নাকি উড়তে পারে এবং ছোট ছোট পাখী ধরে খায়।

রেণুকে অত্যন্ত উৎসাহিত দেখায়। বলল, আমি আদিত্য ঘুরে এসেছি। কেমন এক মৌমী ফুলের গন্ধ মাঠটাতে জেগে থাকে।

আদিত্য বলল, স্থানীয় লোকেরা অন্য কথা বলে। এবং একটা প্রবাদ আছে। আদিত্য প্রচলিত প্রবাদটি সংক্ষেপে বলল

প্রবাসের ভিড়ে যখন সকলে মগ্নতন তখন রেণু দীর্ঘ সময় নিয়ে সমীরণকে দেখল। সমীরণ পবিত্রের সঙ্গে শুধু বয় পর্যন্ত বসে ঢুকত একদা। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে এই যুবক ছোট ভাইয়ের মত অথবা এক আকস্মিক দুর্বলতা যাকে ঘরে সব কিছু ভুল—নষ্ট করে দিত। সুতরাং রেণু অভিনয়ের মত খুব বেশী সময় বসে থাকতে পারল না। সে বলল, আচ্ছা আপনি পবিত্রের সঙ্গে আমাদের বহরমপুরের বাড়ীতে আসতেন না?

সমীরণ বলল, পবিত্র আমার বন্ধু। আমি তখন স্কুলে এবং আপনি তখন বলে অনেক উঁচুতে।

—আমার সব মনে পড়ছে

আদিত্য যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

কথা বলল, অপর্ণাকেও কতদিন পরে দেখা।

অপর্ণা বলল, তোমার শরীর ভেঙে গেছে।

আদিত্য বলল, চলনা আমরা একদিন বাজুরিয়ার মাঠে যাই। সেখানে গেলে মানুষের বয়স কমে যায়। আদিত্য সমীরণকে উদ্দেশ্য করে বলল, বাজুরিয়ার মাঠ বড় দীর্ঘ। সাধারণ হেঁটেও পার হওয়া যায় না।

রেণু উঠে গেল একসময়। কারণ ওকে অতিথিদের জন্যে চা করতে হবে।

তারপর ওরা একসময় চা খেল। তখন সমুদ্র থেকে বেশ হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তখন পাহাড়ের গায়ে সূর্য ডুবছে। আর তখন বাজুরিয়ার মাঠে বুঝি ব্যাঙেরা উড়ে বেড়াচ্ছিল পাখী খাবার লোভে। কারণ এইসব দিনে বাজুরিয়ার মাঠ কোমল ঘাস নিয়ে শুয়ে থাকে। সিটুলী গাছের ছায়া, ঘাসের রঙ এবং বড় বড় পাথর সবুজ ঘাসের মত ছোট বেড়াচ্ছে সেই কোমল ঘাসের উপর।

রেণু বলল, সমীরণ তোমাকে চেনাই যাচ্ছেনা।

এখন সমীরণ রেণুর বয়েস এই প্রবাসের জন্য হোক অথবা যৌবনকে লালন করার জন্যই হোক খুব কম মনে

হচ্ছে। মনে হচ্ছে— ওদের ছোট চোখ জোড়া বিশেষ করে এই সমুদ্রের বাতাস এবং সামনের পাহাড় শ্রেণী অথবা কিছুদূর হেঁটে গেলে যে সানুদেশ মিলবে পাহাড়ের সেখানে বেণুর অস্থির ফুলের মত। বেণু যেন আগের চেয়ে খুব ভীরু। আর আদিত্যের শক্ত চোয়াল, মাঝখানে সাঁদি পরণে লম্বা মিহি কাপড় বহুক্ষণ একনাড়ীটার মালির মত। সে ঘোড়ার বল্গা ধরে সে পাহাড়ের সানুদেশ তাকছে। বেণুর সঙ্গে আদিত্য ছুটতে পারছেনা। সুতরাং সমীরণ বেণুকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন আমরা একদিন বাজুরিয়ার মাঠ থেকে আসি।

সমীরণের অলজলে চোখ এবং ভাষা প্রকট। সে আদিত্যকে লক্ষ্য করছিল। আদিত্য এখন ঠিক চেয়ারা নিয়ে ভালমানুষের মত বসে আছে। অপর্ণা যা চেয়েছিল এবং যা ঘটতে যাচ্ছে—তার জন্য সুখী। সুতরাং অপর্ণা মনে মনে বলল, পুরুষেরা সব কুকুর এবং আমরা কুকুরী আর যাদের ভিতর অদৃশ্য হতে পারলেই বাঁচি। অপর্ণা আদিত্যকে অন্যমনস্ক করার জন্যে কিছু ছেইলী ফুল তুলে নিল হাতে। বলল, ফুলগুলি কোন হাতের?

আদিত্য বলল, আমি ভূগবিদ্যা এবং ফুলবিদ্যা সম্পর্কে খোঁজখবর এখন কম রাখি। তুমি বরং বেণুকে বলতে পার। সে নামটা বলতে পারবে।

অপর্ণার ইচ্ছা নয় এখন তার কথায় সমীরণ এবং বেণু বাধাপ্রাপ্ত হোক। সে বরং ওদের ঘনিষ্ঠ হতে দিল। কত দিন পরে দেখা। সুতরাং এই দেখার ভিতর মনের কারিসবেরা ভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উপলক্ষে বেশ বড় করে একটা ভোজ দিলে হয়। ভোজ্য দ্রব্য বলতে শুধু মাথার চুল, চুম্বন অথবা বদন চুম্বন এবং নাকের ঈষৎ আভা থাকবে। অপর্ণা বলল, আদিত্য, তোমার সঙ্গে আমার এভাবে একদিন দেখা হবে জানতাম না।

আদিত্য বলল, আমি ছুটী পেলেই এখানে চলে আসি।

অপর্ণা বলল, চল বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখি। অপর্ণা আদিত্যকে এই টেবিল থেকে তুলে নিল। কিন্তু আদিত্য উঠতে চাইছে না। সে বেণুকে পাহারা দিচ্ছে এমত এক ইচ্ছা নিয়ে বসে আছে।

অপর্ণা কের কথাটা বলতে আদিত্য ভয় হতে চাইল। সে হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণের বারান্দার দিকে যাচ্ছে। অপর্ণা এবং কিছু ফুল আর বারান্দার মসৃণ পাথর আদিত্যকে পুলকিত করতে পারছে না। অপর্ণা মনে মনে বলল, শক্ত হাতের পাল্লায় তোমাকে তুলে দিলাম আদিত্য। এবার লড়তে পারলে বুঝব বাজুরিয়ার মাঠ হেঁটে পার-হবার শক্তি তোমার আছে। ঘাষটা বেণুকে ছিঁড়ে খাক আর তুমি বসে বসে অথর্ব পুরুষের মতো দেখো এটা যৌবন ধরে চেয়ে আসছি। অপর্ণা আদিত্যকে দেখছিল না। সে রেলিঙের উপর ভর করে পাহাড়ের উপরটা দেখছিল এবং এই সব ভাবছিল।

আদিত্য বলল, কি দেখছ?

—পাহাড়ে মাথায় কে যেন কেবল হেঁটে যাচ্ছে।

আদিত্য এবার অপর্ণার পাশে এসে দাঁড়াল। আদিত্যের মুখ চোখ শীতল এবং অনুভূতিপূর্ণ। পুরনো উত্তাপ শরীর থেকে আর বের হচ্ছে না। সুতরাং অপর্ণার কাছে আদিত্য মৃত।

অপর্ণা শুধু সেই সব দিনের কথা মনে হলে এক প্রতিশোধ স্পৃহাতে ভীক্ত হতে থাকে। অপর্ণা পাহাড় দেখছিল এবং একজন মানুষকে পাহাড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখছে যার অবয়ব বেণুর মত আর সে উঁচু পাহাড় থেকে যে কোন সময় পড়িয়ে পড়তে পারে।

আদিত্য বলল, আমারও মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে না দেখা হলেই ভাল হত। তুমি এখানে না এলে ভাল করতে।

অপর্ণা আদিত্যকে নতুন ভাবে লক্ষ্য করল। আদিত্যকে বড় বেশী প্রবীণ মনে হচ্ছে। অপর্ণা বলল, তোমার স্বভাব চরিত্রে পঞ্চাশোত্তর প্রবীণের চেহারা ধরা পড়ছে। বিয়ে করলে মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়।

আদিত্য বলল, অভিজ্ঞতা তাদের গ্রাস করতে থাকে। একটু থেমে আদিত্য বলল, তুমি কি এখনও পাহাড়ের উপর কোন মানুষকে হেঁটে বেড়াতে দেখছ?

—না

—আমার মনে হয় তিনি অন্য পাশে নেমে যাচ্ছেন। এইটুকু বলে পরস্পর সরে গেল তারপর ঘুরে এসে বেণুদের পাশে দাঁড়ালো। বেণু এখন পুরনো দিনের ঘটনা বলে সমীরণকে বেজায় হাসালো। কারণ ওরা এতক্ষণ ঠিক করে ফেলেছে—বাজুরিয়ার মাঠ বেশী দূর নয়, বেশী দূর তার জন্য হেঁটেও যেতে হবে না।

। শেষ ।

সুকটই বটে! শুনেই ত আমার আক্কারাম খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। এমন নিরীহ মানুষটির আবার কি জ্বালা?

সেই কোন ছোটবেলায় জ্যোতিষী সারদামামার দাবড়েনি খেতে গিয়ে সমবয়সীদের হাত ধেকে বাহাদুরী নিতাম। আজো তার জের চলছে। একদিন যা ছিল কৌতূহল আর বাহাদুরী, আজ তা হয়ে উঠেছে অভিশাপ।

সময় নেই, অসময় নেই। পরিচিত, অপরিচিত, পাড়াপড়শী কে না উত্যক্ত করে। জন্ম কুণ্ডলীগুলো যেন মাথা গুলিয়ে দেয়! পরাশর, মৈত্রেয়ী, বশিষ্ঠ, ভৃগু জটাজুট আর দাড়িওয়ালা সব মুনি ঋষি যেন মোটা মোটা ভূজ পাতার খাতা নিয়ে আমায় ছেড়েও ছাড়তে পারিনে।

যত সব জাগাহতের দল! মিছিল—নর-নারীর মিছিল! এই পঞ্চাশ বছরে অনেক দেখেছি; অনেক কিছু জেনেছি। এ জানার শেষ নেই। ওই সব জাগ্য-বিড়ম্বিতদের-ভাগ্যের দুয়ারের চাবিকাঠি যেন জ্যোতিষীদের হাতে।

কৌতূহল পাগল করে! আচ্ছা ওপাড়ার শ্যামবাবুর মেয়েটা বিয়ের পাঁচ মাস যেতে না যেতেই বিধবা হল কেন? আর অক্ষয়বাবুর ছেলেটা বার বার ফেল করেই বা কেন? ছেলেটা ত মন্দ নয়। কৌশিকবাবুর এমন সুন্দরী মেয়ে! গানও জানে, লেখাপড়াও ভাল। তার বিয়েই বা হচ্ছে না

কেন ?—মাথার মধ্যে কিলবিল করে ওঠে !

কৌতূহলের মাতল তোলাতে হয় বৈ কি ? তাই নিজের কাঁধেই নিজে আটকা পড়েছি। ওদের কি-ই বা দোষ ? বই-পত্র ঘাঁটি ; শখ এখন বাড়িতে বাড়িয়েছে বৈ কি ! ভূত-পরাশর ঘেঁটে ঘেঁটে কূল কিনারা পাইনে। অধ্যাপক বন্ধু সদানন্দবাবু কটাক্ষ করেন—আরেন টাকার খুলে বস পণ্ডিত ! বেশ দু'পয়সা আসবে। শিষ্য-শিষ্যাও জুটবে অনেক।

কথাটায় সত্যের আভাষ আছে নিশ্চয়ই। ওরা আসে, প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়। পায়ে ধরে কাঁদেও—"ঠাকুর আমার ছেলে ফিরে আসবে ত ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। মনে মনে ভাবি,—সেকালের যোগী ঋষিদের মত যদি তপোবল থাকত ! বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য নতুন স্বর্গ তৈরী করে ফেলেছিলেন। অলৌকিক শক্তির কতই না আবেশ আছে। মরা মানুষ কি না বাঁচিয়েছিলেন সেই কালীবাড়ির পাগলা সাধু !

নাঃ। কোন ক্ষমতাই নেই আমার। তবু তাঁপরে পড়তে হয়। সংকটও আসে। সোনাবৌদির মেয়ে প্রসবে কষ্ট পাচ্ছে—ঘরে মানুষে লড়াই আজ তিন দিন।—"একটা কিছু করে দাও ঠাকুরপো !"

বেশ আমোদেই আছেন সদানন্দবাবু। তাঁর আবার কি হ'ল ! বেশ ত গল্পগুজব করে কাটান। মাঝে মাঝে আমার এই দুঃস্থ আসরেও আসেন। ঠাট্টা-বিদ্রূপ রসিকতাও করেন। বই-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়াও করেন।

কিন্তু ইদানীং কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন সদানন্দবাবু। বিদ্বান ব্যক্তি, কলেজের অধ্যাপক। যারা আমার কাছে আসত, তারা সুখবরও দিয়ে যেতো। সদানন্দবাবু বেশ মন দিয়ে তাদের কথা শুনতেন। কিন্তু আগে এসব কথায় কানও দিতেন না।

হ্যাঁ, জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্য আছে বৈ কি ?—বুঝলে পণ্ডিত ! আমাদের বিশ্বাসবাবুর ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। কোন এক জ্যোতিষী নাকি আগেই সাবধান করে দিয়েছিল—পনেরো ষোল বছর বয়সে পাতাকী ফাড়া !

ভোল কিছু কিছু পালটেছে সদানন্দবাবুর। কিন্তু দিন দিন তাঁর সেই সদানন্দ ভাব যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে !

এই নিয়ে যে সংকট আসবে তা বুঝতেও পারিনি। কিন্তু সংকট এলই। ভাজব কাণ্ড ! সবাই চুপসে যেতে বসেছে। সুখের সংসার। সদানন্দবাবুর কি হয়েছে ?

রাতে ঘুমোতে পারেন না। ঘরে বারান্দায় পায়চারি করেন। মেজাজ হয়ে উঠেছে বেজায় রুক্ষ। প্রায় মাস খানেক ধরে না কি এই অবস্থা !

আমরের ছোট মেয়ে সুপর্ণা ! তাকেও পর্যন্ত ধমক দিয়ে কথা বলেন। বড়ো হয়েছে সুপর্ণা। ক্লাসের সেকেণ্ডারীতে প্রথম দশজনের মধ্যে একজন রয়েছে—বাবার খুব ন্যাওটা মেয়ে। প্রথম প্রথম হকচকিয়ে উঠত সুপর্ণা—বাবার এ কি হল ?

বড় ছেলে অজয় হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার আর ছোট ছেলে সুজয় এবার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফাইন্যাল দেবে। সুখের সংসার। কুসুমবৌদি প্রথম প্রথম এত গা করেন নি।

কি হল মানুষটার !

রাত্রির অন্ধকারে বারান্দায় পায়চারি করেন সদানন্দ। মাঝে মাঝে আবার মেয়ের ঘরে ঢুকে চুপি চুপি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ছেলেরা সামনে পড়লে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। ওও বাবা ! এত বিশেষ কিছু ভাবনার ছিল না। কিন্তু ইদানীং বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে—।

কি ?—এই সুজয়, অজয় আর সুপর্ণা এরা কি সব ধাঁধা ! এত আদর করে মানুষ করেছি। এরা কি সবই আমার পর—।

আর কুসুমদা, কুণ্ডী ! হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর ঐ ক্লাব, মহিলা সমিতি, সমাজ কল্যাণ-আসর-সবই ওধু ধোঁকা !—একমনে আওড়ে যাচ্ছেন সদানন্দবাবু !

নাঃ, কাউকে বিশ্বাস নেই ! বেশ হাসিখুশী ! আমি কলেজে যাবো, আর উনি বেরুবেন সমাজ-কল্যাণে !

দেহের বাঁধনটি ও বেশ রেখে দিয়েছে। চোখ আর মুখ! —ওই হাসি।

ঠিকই বলেছো, পরাশরমুনি, বিশ্বাস করতাম না। সবই ও মেলে। তা না হলে আমাদের ঐ পণ্ডিতের কাছে এত লোক আসে কেন? নিজের কানেই ও শুনেছি—যে সময় বলে দিয়েছে। সে-সময়েই কাজ হয়েছে। আমাদের পণ্ডিত বুজরুকী নয়।

হ্যাঁ, তারই বইতে রয়েছে। আর কোষ্ঠিখানা ও কোনোদিন খুলে দেখিনি। সন্দেহটা মেটাতে গিয়েই ধরা পড়ল। সেই বিশ বছর আগে-শুক্রের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় বারাঙ্গনা ভিঃ সংযোগ……।"—ঠিক সেই সময়েই ও কুন্তলার সঙ্গে—।

নিজের চুল টেনে টেনে ছিঁড়তে থাকেন সদানন্দবাবু! উঃ, কি জ্বালা! হ্যাঁ, এত সব মেলামেশা! ওই উৎপাতটা ও পিছু পিছু লেগেই আছে। আর ওই সমাজ কল্যাণের আসরে কি-ই বা হয়! বছরে ও চারবার থিয়েটার হয়—টাকা তুলতে হবে। টাকার বিলুটি করেছে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন সদানন্দবাবু!

বাবা!—সুপর্ণার ডাকে যেন সম্বিৎ ফিরে আসে।

কি বা!—"এত রাত্রে কেন পায়চারি করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এসো শুবে চল।"

মেয়ের হাত ধরতে মনটা কেমন যেন শান্ত হয়ে আসে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাসও ফেলেন সদানন্দ। বিছানায় বাবাকে শুইয়ে দিল সুপর্ণা।

হঠাৎ সদানন্দবাবু চিৎকার করে ওঠেন—যা যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।

সুপর্ণা বাবার চোখে দেখে পাগলের দৃষ্টি! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুপর্ণা।

নারে না! তোদের দোষ নেই। তোদের কোনো দোষ নেই!—তোর ঘরে তুই চলে যা না!—সবই আমার অদৃষ্টের দোষ! বিবিলিপি—! কি একটা সংস্কৃত শ্লোক যেন আওড়ালেন সদানন্দবাবু—"বারাঙ্গনাভিঃ সংযোগ—"

পরাশরেও আগে সাতনে এরূপ গ্রহ থাকলে বারাঙ্গনা সংযোগ ঘটে। কিন্তু তিনি নিজেও নিষ্পাপ। এরূপ কোনো কিছুই তিনি ধারণাও করতে পারেন না। ম্যালিসিট বলে খ্যাতি তার আগে আছে।

তাহলে সোনযোগটা কুন্তলার দিক থেকেই এসেছে। আবোল তাবোল চিন্তা করেন সদানন্দবাবু। আজ দশ-বারোদিন কলেজেও যান নি।

ডাক্তার ছেলে বলে, নিশ্চয়ই ব্রেনের কোনো গোলমাল! প্রোফেসার বন্ধুকে দেখানো দরকার মনে হয় না।

কুন্তলারও ইদানীং ঘুম নেই। এমন মানুষের একি হ'ল! কিন্তু কয়েকদিন সদানন্দের অসংলগ্ন কথাগুলি শুনে শুনে তার কেমন যেন সন্দেহ হল!—হ্যাঁ, রোজ বটে! কিন্তু এতো কোনো ডাক্তার সারাতে পারবে না। বুড়ো বয়সে কোনো কেলেঙ্কারী না করে বসেন তিনি!

কুন্তলাবৌদিও ভেবেই অস্থির! এমনো ঘটতে লাগল,—বৌদির সঙ্গে কে কথা বলছে না বলছে, সব আড়ি পেতে শোনেন সদানন্দবাবু। সমাজ কল্যাণ-আসরের কেউ এলেই কেমন যেন তাঁর চোখ দুটি জ্বলতে থাকে। অথচ মুখে কিছুই বলেন না।

ডাক পড়ল পণ্ডিত ঠাকুরপোর। সংকটই বটে। নিজের ঘরে পায়চারি করছেন সদানন্দবাবু। আর বিড়বিড় করে আওড়ে চলেছেন—এই, সুময়, অসময় আর সুপর্ণা—এরা আমার কেউ নয়! এদের উপর কোনো দাবী নেই আমার? অথচ—।

'দাদা!—আমার গলা শুনে হকচকিয়ে উঠলেন সদানন্দবাবু। চোখ-দুটো ঘোলাটে, আর উস্কখুস্ক চুল। ক'দিন যে দাড়ি কামান নি তা বোঝাই যাচ্ছে।

আমার দিকে তাকিয়ে সদানন্দবাবু বলতে লাগলেন—ওঃ, তুমি এসেছো। ভালই হল। তোমাকেই আমার দরকার।

আমাকে একটা খবর দিলেই পারতেন।—বলেই সদানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়েছেন।

যজ্ঞ ভুল হয়ে গেল পণ্ডিত! তোমার কাছে গেলেই সব পরিষ্কার হয়ে যেতো। যাক্ যা হবার তা হয়েই গেছে।

আমি আর কি দিয়ে থাকবো বলতে পারো? সদানন্দ-বাবুর চোখে জলের ধারা।

তিনি বলতে লাগলেন—ভাবতে পারো পণ্ডিত! আমার এ কি হল? বয়স ত প্রায় ষাট হতে চলল। আর কটা দিনই বা বাকী?

ছেলেরা সব কৃতী হয়েছে। মেয়ের দিক দিয়েও গর্ব করতে পারি। কিন্তু আমার সাজানো বাগানটাই যে ভুয়া,—তা এতদিন জানতেও পারিনি।

সদানন্দবাবুর কথা আমি কোন কিছুই বুঝতে পারিনে। তিনি কি যে বলতে চান, তা অনুধাবনও করা আমার সাধ্য নয়। এ কি? তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন?—মস্তিষ্ক বিকৃতি!

কতকটা উদ্ভ্রান্তের মত পাঁচোয়ি ক'রে সদানন্দবাবু কিছুটা শান্ত হলেন। এদিকে ওদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে কি যেন দেখলেন। কাউকে দেখা গেল না। তারপর ড্রয়ার টেনে একটা পুরনো কোষ্ঠী বের করে যা দেখালেন, তাতে আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারিনি।

"বারাঙ্গনাভিঃ সংযোগ—"—বুঝলে পণ্ডিত, ঠিক ওই বয়সেই আমার বিবাহ। তারপর তোমার পঞ্চাশের গোলযোগ, একদল গ্রহ-পরিবেশে "বারাঙ্গনা"র পতি হব।

হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠলাম। হাতে কুষ্ঠী আছে পত্রিকায়। পত্রিকা দেখে জ্যোতিষীমশাই ভুবেছেন,—হবে "বারাঙ্গনাভিঃ সংযোগ।"

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন সদানন্দবাবু—"কি বললে বয়াঞ্জনা? তাই তো, তাই তো!—কি বললে তাই?"

সদানন্দবাবু আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন,—"আবার বল। "বয়াঞ্জনাভিঃ সংযোগ—।" তাই হবে।

মুখে হাসি ফুটে উঠল সদানন্দবাবুর। সত্যি বলছ ত?

হ্যাঁ বাবা!—সত্যি বলছি। আপনার সাজানো বাগান সাজানোই থাকবে।

—যাঁচালে পণ্ডিত। কিন্তু একথা সত্যি, তোমাদের ওই জ্যোতিষীগুলোই যত অনর্থের মূল। আমি ত পাগল হতে বসেছিলাম।—প্রশান্ত হাসি সদানন্দবাবুর মুখে।

বুড়োবৌদি স্মিত মুখ করলেন। এটাই জ্যোতিষীর লাভ!

। শেষ ।

পরিচয় গুপ্ত

জুনেনগরের জমিদার নরপতি চাটার্জির একবালে খুবই সৌখিন ছিলেন। লাল পানি আর গান বাজনা ছাড়া জগৎ সংসারে কোন খোঁজই তিনি রাখতেন না। বিদেশের কথা উঠলে তিনি গর্বে বলতেন, তাঁর ইংরেজ ম্যানেজ!

কিন্তু সরকার নরপতিবাবুর দর্পে ঘা মারল। জমিদারী উচ্ছেদ আইন চালু করে জমি জমা সব কেড়ে নিতে নরপতিবাবুর মাথায় বজ্র ঘাত হ'ল। কয়েকপুরুষ আর কলসী গড়ানো টাকায় কয়েক বছর মধুযৌবন যাপন অব্যাহত থাকলেও ক্রমশ তা গুটিয়ে আসতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত লাল পানি কলের জলে এবং গান বাজনা ছুতোর সংকীর্তনে পরিণত হ'ল।

বয়সের ভারে নরপতিবাবু এ আঘাত রুখতে পারলেন না। রাগে দুঃখে ও শোকে তিনি মুষড়ে নিলেন এবং চিলের ছাদে বসে দিবারাত্র নাম জপতে শুরু করলেন।

নরপতিবাবুর বড় ভাই গজপতিবাবু অনেকদিন আগেই কলকাতাতে বসবাস শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর তাঁর দুই ছেলে মৃত্যুঞ্জয়, চন্দ্রশেখর, বিশ্বনাথ, ভূতনাথ, নবদ্বীপ ও উমাপতি সেখানে বসবাস করছিল। নরপতিবাবুর সঙ্গে তাদের কালেভদ্রে পত্রালাপ ছাড়া আর কোনরকম যোগাযোগ ছিল না। অবশ্য তার জন্য নরপতিবাবুই মূলতঃ দায়ী ছিলেন। কারণ ভাইপোদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কলকাতায় বসবাস করতে রাজী হন নি।

নরপতি ভেবেছিলেন জীবনের বাকী দিন কটাও এই স্মৃতিবহুল মধুরাতেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভাইপোদের আস্তানাতেই উঠতে হ'ল।

ভাইপোরা অবশ্য বাপের মৃত্যু স্থানে কাকামণিকে পেয়ে খুশীই হ'ল। তাই ভাইপোরাও অমলা, অতসী, মরলা, সরলা, উতলা, বিমলা ও করলা প্রাণপাত করে নরপতিবাবুর সেবা করতে লাগল। ফলে নরপতিবাবু দ্রুত আরোগ্যের পথে এগুতে লাগলেন।

শৈশবে নরপতিবাবু একবার শহরে এসেও শহরের বর্তমান রূপ সম্পর্কে তার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। দুচোখ খুলে তাই তিনি যা দেখতে লাগলেন তাতেই তার চিত্তে চাঞ্চল্য লাগতে লাগল। মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন, ইস্ কি মিস্ই করলাম জীবনে।

ক্রমশ শহরের পরিবেশের সঙ্গে নরপতিবাবুর পরিচিতি বাড়তে লাগল। ভাইপোদের বটুয়ে চড়ে তিনি চরকির মত শহরে পাক খেতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তার সুখ সহ্য হ'ল না। পুনরায় তিনি খুড়সিকে আচার্য ডলেন এবং ভাইপোদের ডেকে বললেন, এ যাত্রা আর কাটানো সম্ভব নয়। মৃত্যু অনিবার্য। তোমরা আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে চল। আমি শান্তিতে পরলোক যাত্রা করতে চাই।

নরপতিবাবুর অন্তিম ইচ্ছা পূরণে ভাইপোরা তৎপর হ'য়ে উঠল। ধরাধরি করে নরপতিবাবুকে নিয়ে যাওয়া হ'ল গঙ্গার ঘাটে। পরপারের দিকে পা করে তাকে ঘাটে শুইয়ে, মাথার দুপাশে দুটি ফুলের তোড়া রাখবার ব্যবস্থা, এক পরমের শান্তির প্রত্যাশায় নরপতিবাবু চোখ বুজলেন।

কীর্তনীয়াদের খোল করতাল কনকনিয়ে উঠল। ভাইপোরা নতমুখে নরপতিবাবুর পায়ের কাছে দাঁড়াল। বউরা এদিকে সেদিকে দেখে নিয়ে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

বিদায় দৃশ্য যখন মোটামুটি সকলেই অভিভূত, ঠিক সেই মুহূর্তে অচৈতন্য নরপতিবাবুর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হঠাৎ এক বিকৃতিতে রূপান্তরিত হ'ল।

পুরুতমশাই ঘাটের পাশে বসে গীতা পাঠ করছিল। ভূতনপত্নী উতলা ঠাকুরমশাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, দেখুন তো কাকামণির হঠাৎ মুখ বিকৃত হ'ল কেন?

ঠাকুরমশাই ধড়ফড়িয়ে উঠে এসে নাকের ডগায় চশমাটা টেনে, নরপতিবাবুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, হুঁ, যা ভেবেছি তাই। মনে নিশ্চয়ই কোন অন্তিম ইচ্ছার উদয় হয়েছে। এ ইচ্ছা পূরণ না করলে উনি শান্তিতে মরতে পারবেন না।

ঠাকুরমশাইয়ের কথা শুনে সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠল। মৃদঙ্গ বলল, কাকামণির সব ইচ্ছাই তো আমরা যথাসাধ্য পূরণ করবার চেষ্টা করেছি। তা' সত্ত্বেও এরকম হ'ল কেন?

ভূতন ঘাড় নেড়ে বলল, ইচ্ছার কি শেষ আছে মাকি? এরকম হ'তেই পারে। তবে মরবার সময় লোকের সাধারণত ভালমন্দ খাবারের কথা স্মরণ করেই কষ্ট পায়। আমার মনে হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অতএব এখুনি বাজারের সেরা খাবারগুলি এনে কাকামণিকে খাওয়ানো প্রয়োজন।

ভূতন আর কথা না বাড়িয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল খাবারের দোকানের উদ্দেশ্যে। বাজারের সেরা খাবারগুলো এনে অল্প অল্প করে সবই দেওয়া হ'ল নরপতিবাবুর মুখে। কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। নরপতিবাবুর মুখ পূর্বের মতই বিকৃত হয়ে রইল।

ঠাকুরমশাই আশাভোঙ্গা সব কিছুই লক্ষ্য করে বলল, এত সুখাদ্যেও যখন নরপতিবাবুর আত্মাতৃপ্তি দেখা না তাহলে নির্ঘাত তিনি অন্য কোন কঠিন বাসনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ঠাকুরমশাইয়ের মন্তব্য শুনে ভূতন আবার ভাইদের সাথে আলোচনা করতে বসল। লবণ হঠাৎ বলল, আচ্ছা কাকামণির যে পান খেতে ইচ্ছে ছিল, অন্তিম মুহূর্তে সে কথা মনে পড়ে যায় নি তো?

লবণের প্রশ্ন শুনে ভূতন বলল, আশ্চর্য নয়। এক কালে তিনি সিগে সিগেই টেনেছেন, এখন যদি দু'চার কৌটা খাওয়ার বাসনা জাগে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। এবং সেটাই স্বাভাবিক।

এক বোতল এনেই দেখা যাক না কি হয়। ভূতন আবার বেরিয়ে পড়ল অন্য দোকানের উদ্দেশ্যে।

ছয়, দুইস্কির বোতলটা প্রায় পুরোই উজাড় করে দেওয়া হোল নরপতিবাবুর মুখ গহ্বরে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

ভূতন হতাশ হ'য়ে মাটিতে বসে পড়ল।

ভূতন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

ছইস্কি খাওয়ানোর পরও যখন প্রত্যাশিত কোনো কিছু ঘটল না, তুলসকে উত্তেজ করে বললে, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ কি? ওর চেয়ে কাকামণিকে প্রশ্ন করে দেখলে কেমন হয়?

ঠাকুরমশাই তুলসের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। ঘাড় নেড়ে বললে, খুব ভাল। একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক।

ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে ভরসা পেয়ে তুলস নরপতিবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে গলা কাটিয়ে তাঁর গোপন ইচ্ছাটি জানতে চাইল।

বললে, 'চো' কোন বস্তু নয়। বস্তুর আচরণ। এ থেকেই বস্তুটি আবিষ্কার করতে হবে।

সকলে যখন 'চো'-এর অন্বেষণে ব্যস্ত, উতলা বললে, আচ্ছা এমনও তো হ'তে পারে কাকামণি চোষক কিছু খেতে চাইছেন।

উতলার কথা শুনে সকলেই সচকিত হ'য়ে উঠল। তুলস বললে, হুঁ, তাতেও হতেই পারে। লজেন্স চকোলেট আমলক ইত্যাদি তাহলে কিছু নিয়ে এসে দেখা যাক। যদি তাতে কাকামণির অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হয়।

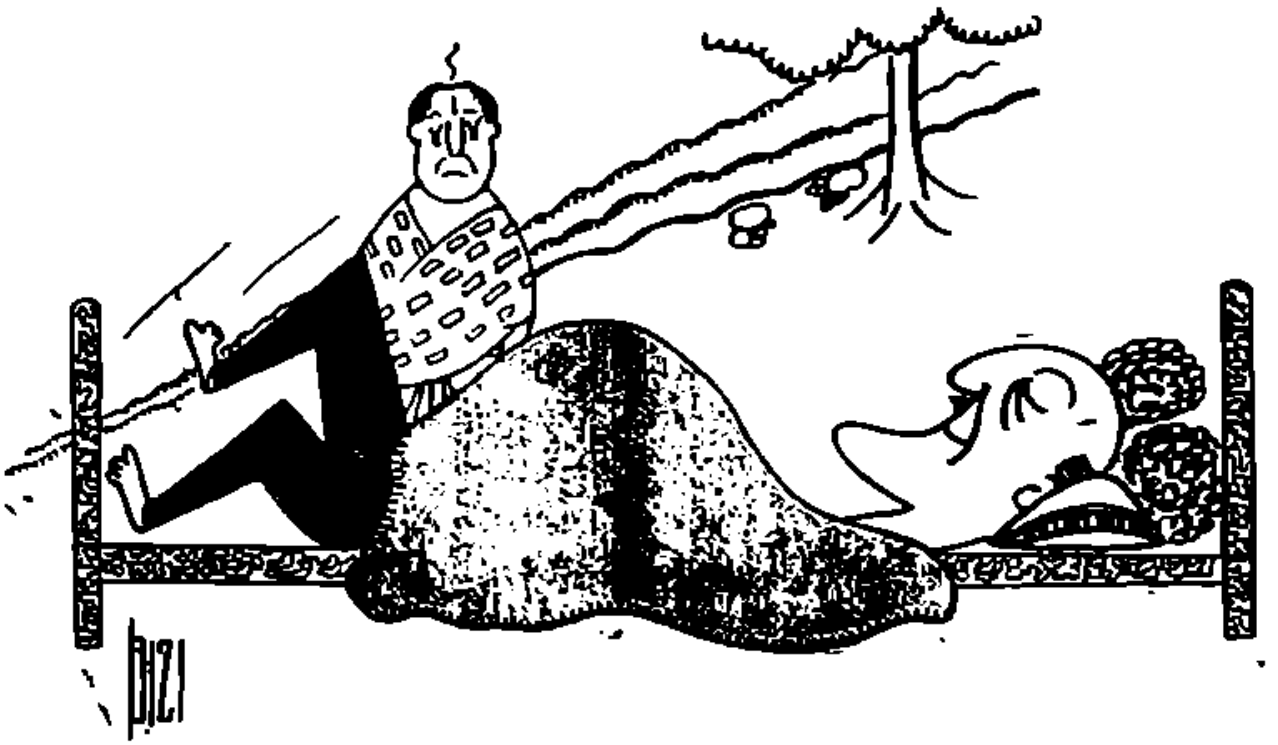

নরপতিবাবু ঘোড়ার মত পা দুটো শূন্যে কয়েকবার আস্ফালন করলেন।

তুলস প্রশ্ন করা মাত্রই নরপতিবাবুর ঠোঁট দু'টো থর থর করে কাঁপতে লাগল তারপর হঠাৎ 'চো' উচ্চারণ করেই পরমুহূর্তে তিনি স্থির হয়ে গেলেন।

নরপতিবাবুর মুখ নিঃসৃত শব্দে সকলে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেও, পরে সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউই করতে লাগল।

অবলা বললে, 'চো' আবার কি বস্তু?

অবলার প্রশ্নে সকলেই বিব্রত বোধ করল।

লজেন্স চকোলেট খেয়েও যখন নরপতিবাবুর মুখ-বিকৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটল না তখন সকলেই চিন্তিত হ'য়ে পড়ল।

তুলস হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, তাহলে উপায়?

হঠাৎ ঠাকুরমশাই বললেন, বুঝেছি।

ঠাকুর মশাইয়ের কথা শুনে সকলেই ব্য
করল, কি বুঝলেন?'

ঠাকুরমশাই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, স্বর্গলাভের সঙ্গ

নরপতিবাবু নিশ্চয় চোনায় মুখ ধুতে চান। 'চো' বলে তিনি চোনাই বোঝাতে চেয়েছেন।

ঠাকুরমশাইয়ের যুক্তি কারুর কাছেই বিশেষ অবান্তর মনে হল না। বিশেষ করে সুরজের ঠাকুরমশাইয়ের যুক্তিটা খুবই মনঃপূত হ'ল। সুরজ বললে, আমার মনে হচ্ছে ঠাকুরমশাই সঠিক চিন্তাই করেছেন। অতএব এখুনিই চোনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সুরজের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সুরজের মুখের দিকে তাকাল। সুরজ ঘাড় নেড়ে বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই।

টাটকা চোনা মুখে স্পর্শ করা সত্ত্বেও নরপতিবাবুর মৌখিক অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন হ'ল না।

এবার সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

ভাইপোরা 'ধুত্তোর' বলে এদিক সেদিক সরে পড়ল। বউয়ের সকলেরই খিদেতে পেট চুই চুই করছিল। এতক্ষণ সে কথা তারা চেপে রাখলেও আর পারল না। ঘাটের এক প্রান্তে এক হুঁচকাওলার সন্ধান পেয়ে তারা হলবেঁধে সেখানে গেল হুঁকো খেতে। কেবল ঠাকুরমশাই গীতা হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে কি সব বলতে লাগল।

ক্রমশ সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। নরপতিবাবুর ইহলোক ত্যাগের নামগন্ধ নেই।

সবাই যখন পরবর্তী করণীয় কর্তব্যের চিন্তায় রত, হঠাৎ উলঙ্গ বললে, 'চো' মানে চোঙা প্যান্ট নয়তো?

উলঙ্গের প্রশ্ন শুনে সকলের চোখ কপালে উঠলেও, সুরজ মিন মিন করে বললে, হ'তেও পারে। অসম্ভব কি?

উলঙ্গ বললে, তাহলে চোঙা প্যান্ট দিয়েই আমাদের শেষ চেষ্টা করা হোক।

উলঙ্গের প্রস্তাবে সকলে সম্মত না হ'লেও কেউ বাধা দিল না। সুরজ থলি ঝেড়ে টাকার অঙ্ক দেখে নিয়ে তখনি ছুটল বাজারে চোঙা প্যান্ট কিনতে।

চোঙা প্যান্ট এনে সুরজ ঠাকুরমশাইয়ের হাতেই তুলে দিল। ঠাকুরমশাই নাক সিটকে কমণ্ডলু থেকে খানিকটা গঙ্গাজল নিয়ে চোঙা প্যান্টের ওপর ছিটিয়ে দিল। তারপর সেটার ভাঁজ খুলে, ধীরে ধীরে পরিয়ে দিল নরপতিবাবুকে।

কোমরে বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ নরপতিবাবু ঘোড়ার মত পা দু'টো শূন্যে কয়েকবার আস্ফালন করলেন। পা দু'টো স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই নরপতিবাবুর মুখের বিকৃতি পালটে, এক স্বর্গীয় তৃপ্তিতে মুখ ভরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নরপতিবাবু ইহলোক ত্যাগ করলেন।

ভাইপোরা এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করছিল। নরপতিবাবু স্থির হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা উল্লসিত হয়ে বলে উঠল—বল হ— রি—

বউরা হুঁচকা খেতেই জবাব দিল হরি—বো—ল।

ইতি।

সঙ্গিনী

বিমল কর

মহীপতি আলমারি খুলে কিছু কাগজপত্র নিচ্ছিল, বাইরে কুকুরটা চেঁচে উঠল। প্রথমটায় সে কান করল না, দরকারী কাগজগুলো বেছে আলাদা করছিল ; পরে সামান্য মনোযোগ দিয়ে ডাকটা শুনল। নিজের পোষা কুকুরের ডাক সে চেনে ; মনে হল, বাইরে কেউ এসেছে, বাগান থেকে ফুল ছিঁড়তে বা গাছের পেয়ারা ভিখিরী টিখিরিও হতে পারে।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করতে করতে ঘরের ভেতর থেকেই মহীপতি উঁচু গলায় কুকুরটাকে ধমক দিতে চাইল।

তারপর বাইরে এল মহীপতি। কুকুরটা তখনও ডাকছে।

বারান্দায় এসে মহীপতি দেখল, তার বাড়ির ফটকের ওপারে এক মহিলা, এপারে তার পোষা কুকুর।

বাগানটুকু পেরিয়ে তাড়াতাড়ি মহীপতি ফটকের সামনে এসে গেল। কুকুরটাকে তর্জন করতে লাগল : এই বাচ্চু, চুপ ··, চুপ কর, স্যাট আপ্।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহীপতি আরও অবাক, চিনতে পেরেও চিনতে পারছিল না, বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিমূঢ়, হতচকিত অবস্থা। কয়েক মুহূর্ত যেন কী রকম আড়ষ্টতার মধ্যে কাটল। তারপর রেললাইনের কাঠি জ্বলে ওঠার মতন মহীপতির চোখের দৃষ্টিতে সবিস্ময় আনন্দ জ্বলে উঠল। "আরে—তুমি?"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। মহীপতিকে ধীরে সুস্থে, স্পষ্ট করে, গভীর চোখে সে দেখছিল, ঠোঁটে সামান্য হাসি, চোখ উজ্জ্বল।

মহীপতি তার কুকুরের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেবার জন্যে খানিকটা ঝুঁয়ে পড়েছিল : চুপ কর···ঘা ঘা পালা বেটা, জল্‌দি ভাগো।

"খুব অবাক করে দিয়েছি, না?"

"হ্যাঁ, ভীষণ অবাক," মহীপতি বলল, "এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"পারছ না? তা হলে আরও একটু সময় নাও, ছুঁয়ে টুয়ে দেখো, এখন তো দিনের আলো।" সরল পরিহাস করে ও হাসল।

মহীপতি হাসল। "ভেতরে এস।"

"ভেবেছিলাম তাই যাব। ফটকও খুলেছিলাম। কিন্তু তোমার ঘা পাহারাদার, তার পেরে আবার এসে দাঁড়িয়েছি।"

মহীপতি সহাস্য মুখে ফটক খুলল। "এস।"

"না, এখন থাক।"

"আমি রয়েছি, ভয় কি! বাচ্চুও চুপ করে গেছে···। এস।"

"না, এখন থাক। ওরা দাঁড়িয়ে আছে।"

"কারা?" মহীপতি গলা বাড়াল।

অনেকটা তফাতে ছোটখাট একটা দল, পাঁচ সাত জন হবে হয়ত, মাঠে গাছতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, কে যেন হাত পা ছড়িয়ে বসেও পড়েছে।

মহীপতি বলল, "তোমার দল? কোথায় যাচ্ছ সব? সুবর্ণরেখা?"

"শুনেছি এদিক দিয়েই সোজা। আর কতটা হাঁটতে হবে?"

"বেশি নয়, সিকি মাইলটাক।" মহীপতি ফটক খুলে বাইরে এসে আবার বন্ধ করল। "চলো, খানিকটা এগিয়ে দি, তা হলে।"

কয়েক পা হেঁটে মহীপতি বলল, "সত্যি, তুমি আজ সকালে আমায় চমকে দিয়েছ পার্বতী।"

পার্বতী আড়চোখে মহীপতিকে দেখল। "ভেবেছিলাম কাল বিকেলেই চমকে দেব।"

"কা—ল? কালকেও এসেছিলে?"

"না; কাল বিকেলে তোমায় দেখলাম, লালরঙের একটা মোটরবাইক করে আসছিলে, আমরা তখন ওই স্টেশনের পিচের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে, বেড়াতে বেরিয়েছি। ওরা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনছিল, আর তুমি কাঠগোলার সামনে তোমার মোটর বাইক দাঁড় করিয়ে কথা বলছিলে। তারপর দেখলাম, এই রাস্তাটায় নেমে পড়লে।"

মহীপতি পার্বতীকে দেখছিল। বলল, "ডাকলে না কেন?"

"ভাল করে না চিনেই ডাকব?"

"সকালে ভাল করে চিনলে।"

"খানিকটা তাই।···আজ এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে খুঁজছিলাম। বাড়ি ঘর তো দু চারটে। তোমার বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, ফটকের গায় নাম খুলছে তোমার, এম. চৌধুরী, মানুষটার সঙ্গে নাম পদবী মিলল, যদিও মানুষটা দেখলাম না। একটু সন্দেহ ছিল বই কি।"

মহীপতি অকারণে নীচু গলায় হাসল। "নাম ধরেই ডাকলে পারতে।"

পার্বতী কোন জবাব দিল না। তার দল আর খানিকটা দূরে। এদিক পানেই তাকিয়ে আছে, অবাক হয়েছে নিশ্চয়।

হাঁটতে হাঁটতে পার্বতী এবার বলল, "ওরা খুব অবাক হয়ে গেছে। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা এগোও, আমি আস্তে আস্তে যাব, এক গ্লাস জল খেয়ে নেব বাড়ি

খেকে চেয়ে। বিশ্বাস করেনি ; ভেবেছিল, আমি অচেনা বাড়ি খেকে জল চেয়ে খেতে পারব না।"

"কই, জল তো খেলে না ?"

"এই সাত সকালে কে জল খায়। এমনি বলেছিলাম, ওদের এগিয়ে দিতে। রবি বাজি ধরেছিল, পাঁচ টাকা, আমি নাকি পারব না। বললাম, তোমরা এগোও, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখ, ঠিক পারব..." পার্বতী হাসল।

মহীপতি বলল, "ভাল করেছ। পুজোর সময় একটা ভিড় আসে, তেমন কিছু নয় অবিশ্যি, পুজোর পরই আসল

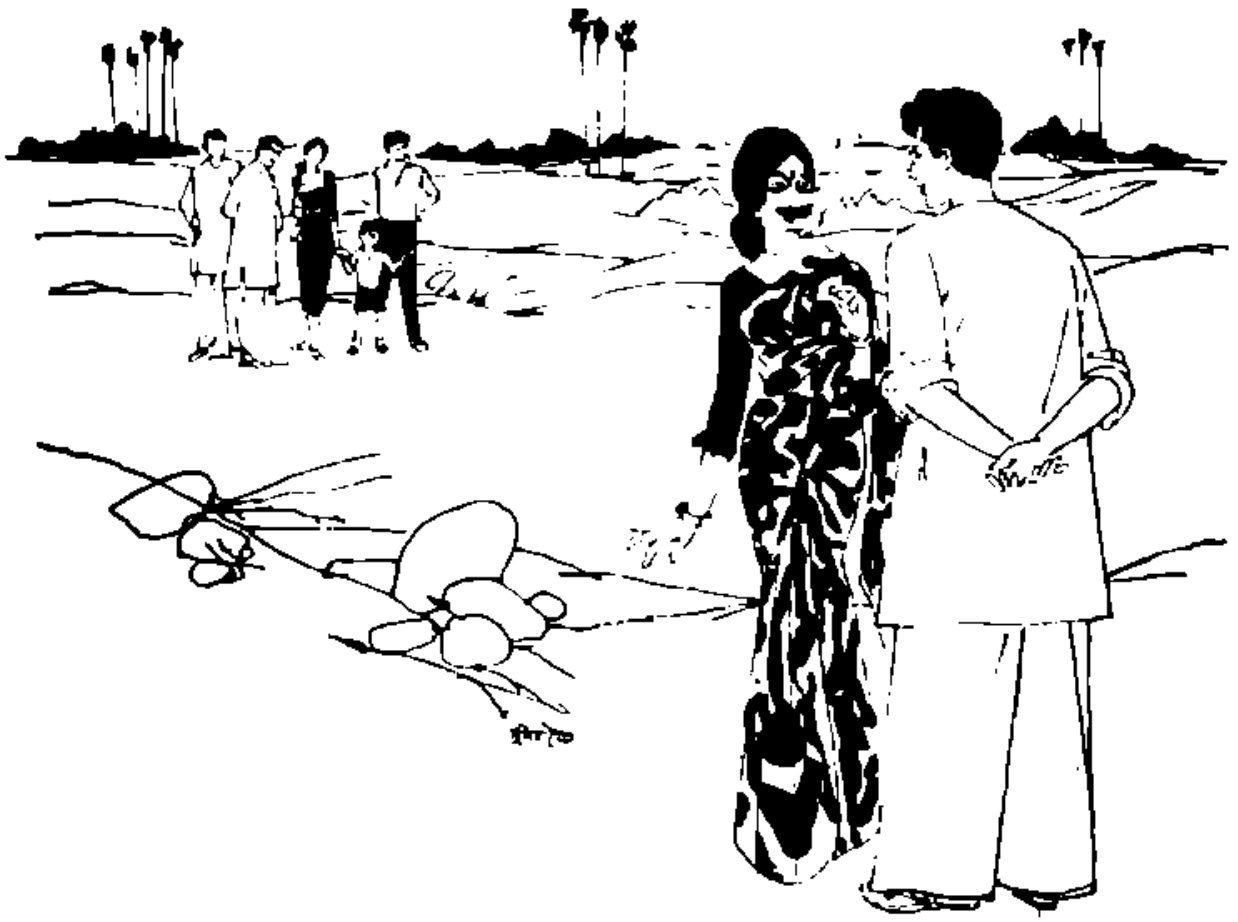

মহীপতি দলটার দিকে লক্ষ্য করল : জনা ছয়, চার জন বড়, একটা বুঝি সালোয়ার কামিজ পরা, অনজন বাচ্চা। মহীপতি দলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "পুজোর ছুটিতে দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে ?"

পার্বতী ছোট করে ঘাড় নাড়ল। "পুজো শেষ করেই এলাম, দেওয়ালী পর্যন্ত থাকার ইচ্ছে।"

মহীপতি সামান্য অন্যমনস্ক হল। কাল রাতে মেঘলার ভিড়। এরা পাঁচ সাতদিন থেকেই পালাবে। দেওয়ালী পর্যন্ত কমট থাকে। তবে এই সময়টাই ভাল।...কোথায় উঠেছ ?"

"ওই যে লাইনের ধারে, ওই দিকটায়—" পার্বতী হাত দিয়ে পশ্চিমের দিকটা দেখাল, "রেল-ক্রসিংয়ের ওপারে, ঠিক যে রাস্তাটা লাইন বরাবর চলে গেছে। তোমাদের এখানের নাম আমার মনে থাকে না।"

মহীপতি চিনে নিতে পারল। "কার বাড়ি? সত্যবাবুদের?"

"কে সত্যবাবু?...আমরা এসেছি ভাড়া নিয়ে, বোধ হয় মিত্যেবাবুদের বাড়ি।" পার্বতী এবার গলা তুলে হাসল।

মহীপতিও হেসে ফেলল।

পার্বতী বলল, "আসার সময় শুনেছিলাম বাংলো বাড়ি ভাড়া পেয়েছি, এসে দেখলাম, ওমা বাংলোর কি চেহারা, পা দিতেও ঘেন্না করছিল।"

ততক্ষণে ওরা ঘরের কাছে পৌঁছে গেছে।

মহীপতিকে ওরা দেখছিল। বোধ হয় ইতিমধ্যেই কিছু কথাবার্তা হয়েছে নিজেদের মধ্যে, বিস্ময় এবং কৌতূহল সবার চোখেই স্পষ্ট। মহীপতিও এই দলটিকে স্পষ্ট করে দেখল। পার্বতী হেসে বলল, "এই নাও, নিয়ে এলাম। কই আমার বাজির টাকা কে কিছে দাও।"

রবি গলা কেড়ে কেশে বলল, "কথা ছিল তুমি জল চেয়ে খাবে।"

পার্বতী চোখ কুঁচকে বলল, "বাঃ, মানুষটাকেই যখন ধরে আনতে পারলাম তখন জল চেয়ে খাওয়া কি অসাধ্য ছিল!"

"না, তা নয়; তবে বাজির কন্ডীশনটা তুমি মান নি।"

"মানি নি—, ইয়াকি। টাকা বের করো,..." পার্বতী কৃত্রিম ধমক দিল।

রবি দু পা সরে গেল, "বাজি ইজ্ বাজি, তুমি বাজির শর্ত না মানলে সব ক্যানসেলড্।। তোমায় তো আমরা ধরে আনতে বলিনি পারিষদ,...।"

মহীপতি এবার হেসে বলল, "উনি আমায় ধরে আনেন নি, বেঁধে এনেছেন।"

পার্বতী ভাঙা খোঁপা দুলিয়ে বলল, "নাও হল তো।... এবার তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। এই বেঁধে-আনা ভদ্রলোকটি আমার পুরোনো বন্ধু, নাম মহীপতি চৌধুরী," বলে পার্বতী দলের দিকে তাকিয়ে মাস্টারনীর মতন হাসল, পরেই আবার গম্ভীর মুখ, "তোমরা যে ভেবেছিলে এম. চৌধুরী নিশ্চয় কোনো বেহারী হবেন, মথুরাপ্রসাদ চৌধুরী কি ওই রকম কিছু, তা নয়। এঁকে আমি কাল বিকেলেই দেখেছি, আজ একবার সন্দেহটা মিলিয়ে নিলাম।"

মহীপতি পরিচয় পর্বের সূত্রপাতে নমস্কার করল হাত তুলে।

পার্বতী মহীপতির দিকে তাকিয়ে বলল, "আর এরা—ওই উনি হলেন আমার ভগ্নীপতি—শশধর পালিত; আর ও হল আমার শুধু পতি, রবি আমার সম্পর্কে দেওর, তাকে দিদি বলে; আর ও-কে তুমি দেখেছ, তখন অবশ্য প্যান্ট ফ্রক পরত, আমার বোন এলা।" বলে পার্বতী মৃদুহাস্য মুখে বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাল। "তুমি কে বাবা, বলো তো।"

"সেন্ট পৌল," বাচ্চাটা বলল।

সমস্বরে হাসি উঠল।

পার্বতীর যিনি পতি, অর্থাৎ ফরসা গোলগাল চেহারার মানুষটি বলল, "ওর নাম সন্তু। স্কুলে দিদিমণিদের কাছে রোজ বাইবেলের গল্প শুনতে শুনতে বেচারার সেন্ট হবার ইচ্ছে হয়েছিল খুব। তা ওর মা ওকে সেন্ট করে দিয়েছে। আমরা থাকি শ্যামবাজারে, পল স্ট্রীটে। সেই হিসেবে ছেলে আমার পল স্ট্রীটের সেন্ট বা সন্তু।"

আবার একদফা হাসি। সেন্ট পৌল বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হল না, বরং ওর মার কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। মহীপতি আদর করে সন্তুর মাথার চুল ঘেঁটে দিল।

এলা বলল, "সন্তু তোর বাবার নাম বল।"

"ফাদার পূর্ণেন্দু।"

এলা সরু গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল। রবিও হাসছিল।

পূর্ণেন্দু বলল, "ছেলে আমার ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্।"

মহীপতি হাসাহাসি শেষ করে এলাকে দেখছিল। এই কি এলা? সত্যি চেনা যায় না, চেনার উপায়ও নেই। মহীপতি যখন দেখেছে, তখন এলা একেবারেই বাচ্চা, ছিপছিপে চেহারা ছিল, পেনি ফ্রক না হোক হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো ফ্রক পরত, নাকটা ছিল লম্বা, থেকে থেকে টনসিলের জ্বরে ভুগত, আর আজ সেই এলা তরুণী, তার ঠিক সালোয়ার কামিজ মানায় না, চোখে বেয়াড়া লাগে। হয়ত শখ করে পরেছে। বাইরে বেড়াতে এসে কত রকম শখ কত জনেই দেখায়।

এলাকে দেখতে দেখতে মহীপতি হেসে বলল, "এলাকে চেনা যায় না।"

এলা সলজ্জ হাসল, বুকের কাছে উড়নিটা আরও গুছিয়ে নিল সতর্কভাবে।

শশধর ঘুরে ঝোপ জঙ্গল, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "সবই তো হল, কিন্তু আমাদের আজ কি আর নদী যাওয়া হবে, রোদ চড়ে উঠছে!"

রবি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আরে, যাঃ! নদী দেখতেই আসা, যাওয়া হবে না মানে! চলো, চলো, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।" বলতে বলতে পা বাড়াল রবি, মহীপতিকে লক্ষ্য করে বলল, "আর কতটা পথ বলুন তো?"

মহীপতি বলল, "প্রায় এসে পড়েছেন, দামান্য আর,... ওই যে দূরে জোড়া গাছ, তারপরই নদীর পাড়।"

পুরো দলটাই হাঁটছিল আবার।

মহীপতি সামান্য অপেক্ষা করে বলল, "আপনারা এগোন, আমি ফিরি।...ফেরার পথে নিশ্চয় জল তেষ্টা পাবে, তখন যদি এই গরীবের বাড়ি ঘুরে যান..."

"আপনি আছেন তো বাড়িতে?"

"খানিকক্ষণ থাকব," মহীপতি কুণ্ঠিত হয়েই যেন বলল, "আমার একটা জরুরী কাজ ছিল, তবু আপনাদের জন্যে খানিকটা অপেক্ষা করব।"

পার্বতী চোখ তুলে মহীপতিকে দেখল। "আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি কি অপেক্ষা করতে পারবে। বরং তুমি আজ কাজেই চলে যাও। বাড়িতে বলে যেও, তেষ্টা পেলে ডাকাডাকি করব।"

মহীপতি বলল, "তবু দেখ; আমি খানিকক্ষণ আছি।"

মহীপতি ফিরল, ওরা শালবনের দিকে, বেঠো পথ ধরে নদীর দিকে এগুতে লাগল। রোদ বেশ চড়ে উঠছে।

যেতে যেতে রবি বলল, "তুমি জোর একটা সারপ্রাইজ্ দিলে পারিদি। আমরা খ' মেরে গিয়েছিলুম।"

পার্বতী কৌতুক অনুভব করে হাসছিল। বলল, "আরও কত সারপ্রাইজ্ আছে দেখো না।"

"মানে? ভদ্রলোক কি ম্যান্ অফ্ সারপ্রাইজেস্?"

পার্বতী হেঁয়ালি করে জবাব দিল, "কি করে বলব, আমি কি ভদ্রলোকের কথা বলছি। দেখো না ঐ ঘাটশিলায় কত রকম সারপ্রাইজ্ হয়!"

শশধর সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রলোক কি করেন?"

"কি জানি!"

"বাড়িটা দিব্যি করে রেখেছেন।...ছোটোর ওপরেও ডিসেন্ট্ লুকিং।"

পূর্ণেন্দু বলল, "আমাদের ওই রকম একটা বাড়ি থুকলে হত। একেবারে নিরিবিলি,..."

পার্বতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "থাকতে পারতে না। অভ্যেসের বাইরে একটু আধটু আমাদের সয়, বেশি নয়।"

দুই

সন্ধ্যের দিকে মহীপতি এল। এসে দেখল বাড়িতে কেউ নেই। পেছনের দিকে কুঠরি মতন একটা ঘরে বাতি জ্বলছিল। মহীপতির সাড়া পেয়ে মাঝবয়সী এক রাঁধুনী বামুন বেরিয়ে এল, এসে বলল, বাড়ির বাবুটাবুরা বেড়াতে বেরিয়েছে। মহীপতি মুহূর্ত কয় অপেক্ষা করল, ফেরার সময় হয়ে এসেছে ওদের, হয়ত এসে পড়বে এখুনি।

বাড়ির সামনে এসে মহীপতি খানিকটা পায়চারি করল। পার্বতী যতটা বলেছিল, ততটা ওর মনে হচ্ছে না, বাড়িটা কিছু পুরোনো, খোলার চাল মাথায়, নয়ত তেমন একটা খারাপ কিছু নয়। অব্যবহারের জন্যে কিছুটা ঝোপ জঙ্গল, খানিকটা মালিন্য, এ আর কোথায় না থাকে! বাড়ির সামনে কাঁটালতার বেড়া, শিউলি ঝোপ একপাশে, গন্ধরাজ আর আতা ঝোপ পাশাপাশি, কলাবাগানের গায়ে পেয়ারা গাছ, কুয়াতলা। বড় বড় ঘাস রয়েছে মাঠে। সামনেই রেল লাইন।

মহীপতি পায়চারি করতে করতে বাইরে এসেছিল। কাল পূর্ণিমা ছিল, আজও যেন ছোঁয়া লেগে আছে, ঝিমঝিমে জ্যোৎস্না ফুটেছে। বুনো কোপকাড় আর টিলার ঢেউ দু পাশে, ওদিকে রাত্রের ধান ক্ষেতে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, অদূরে রেল লাইন, অনেকটা তফাতে সিগন্যালের লাল আলো একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

মহীপতি মন্থর পায়ে হাঁটছিল। আশেপাশের ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলো একেবারে ফাঁকা নয়, কোথাও টিমটিম করে বাতি জ্বলছে, কোথাও বা গলার শব্দ উঠছে। একটা জিপ গাড়ি বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সরকারী ভাড়া বাড়ির পাঁচিল বুঝি নতুন করে গাঁথা, নতুন ইট চোখে পড়ছিল। কাঁচা সুরকির গন্ধ উঠছে কোথাও।

সামান্য হেঁটে এসে মহীপতি দাঁড়াল। ওই বোধ হয় ফিরছে ওরা। খানিকটা দূর বলে দেখা বা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু একটা দল আসছে। মহীপতি দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্রমেই নানা গলার স্বর কানে আসতে লাগল। মহীপতি স্পষ্ট করে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, শুধুমাত্র একটা কলরব তার কানে আসছে। বোধ হয় এমন একটা কথা উঠছে যে দলের সকলেরই কণ্ঠ সরব।

গায়ের পাশ দিয়ে একটা জোনাকি উড়ে গেল, শূন্যে বার কয়েক পাক খেয়ে বুনো লতায় গিয়ে বসল, আবার উড়ল।

এতোক্ষণে মহীপতি ওদের দেখতে পাচ্ছে: শঙ্খধর, পূর্ণেন্দু, রবি, পার্বতী,...। এরা শাড়ি পরেছে। কিন্তু আরও একজন যেন শাড়ি পরা ও কে? সন্ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছিল, রবি অট্টহাস্য হাসছে।

কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। পার্বতী খানিকটা এগিয়ে।

"ওমা, তুমি—" পার্বতী সামনে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল, "এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছ?"

মহীপতি বলল, "তোমাদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বেড়াতে বেরিয়েছ; অপেক্ষা করছিলাম।"

রবি হাত জোড় করে সহাস্য মুখে বলল, "প্রথমেই স্যার, আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিই। সকালে নদী ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। তারপর দেখি, আর একটা দল ওদিক দিয়েই ফিরছে, আমরাও তাদের পেছন পেছন ফিরতে লাগলুম। ফিরে দেখি, যা বাসনা একেবারে অন্য আয়গায় হাজির। আপনার বাড়িতে আর জল খেতে যাওয়া হল না। ভেরী সরি।"

মহীপতি হেসে বলল, "আমিও বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকতে পারি নি।"

"যাক্, বাঁচালেন। আমরা ভাবছিলাম, আপনি ওয়েট করে করে বেজায় চটে যাবেন।"

"না।" মহীপতি মাথা নাড়ল আস্তে করে।

পার্বতী বলল, "তুমি সকালে একজনকে দেখো নি," বলে নতুন মানুষটির দিকে তাকাল; বাসনাদি, আমার মামাতো দিদি, শঙ্খধরবাবুর ধর্মপত্নী—" বলে হাসিমুখে মহীপতির দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করল পার্বতী। বাসনা সামান্য সরে দাঁড়িয়েছিল।

মহীপতি কয়েক পলক দেখল বাসনাকে। চোখে কিছুটা বিস্ময়। যথারীতি নমস্কার করল।

দিদি, এই ভদ্রলোকই সেই মহীপতি, সকালে যার কথা বলছিলাম।"

"চিনেছি," বাসনা বলল।

পূর্ণেন্দু বলল, "দাঁড়িয়ে লাভ কি, চলো।"

প্রায় গায়ে গায়ে সকলেই চলতে লাগল বাড়ির দিকে।

মহীপতি শঙ্খধরকে জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে গিয়েছিলেন বেড়াতে?"

"গিয়েছিলাম অনেকটা, ফেরার পথে স্টেশন হয়ে ফিরছি।"

"কেমন লাগছে?"

"ভাল। জলটা বেশ ভাল।"

পূর্ণেন্দু বলল, "আমার কিন্তু খানিকটা ভেজা ভেজা লাগছে, জ্যাম্প। সে রকম ড্রাই মনে হচ্ছে না।"

মহীপতি বলল, "পুজোর সময় বৃষ্টি বাদলা হয়ে গেছে, কালও মেঘ করেছিল আকাশে। এই বাদলাটা কেটে গেলেই শীত পড়বে, ড্রাই হবে।"

"আপনি কতদিন আছেন এখানে?"

"দিন কি বছর বলো", রবি পূর্ণেন্দুকে ওধরোতে গেল।

মহীপতি বলল, "তা বেশ কিছুকাল হল, বছর ৮' সাত।"

পার্বতী ঘাড় তুলে মহীপতিকে শুধলো, "বছর ৮' সাত কি? তার আগে আবার কোথায় ছিলে?"

"অন্য জায়গায়," মহীপতি মৃদু হাসল, "বিহারেই।"

"বাংলা দেশ বরাবরের মতই ছেড়ে দিয়েছ তাহলে?"

"না, ছেড়েছি কোথায়? কাজগ্রাম প্রায়ই যেতে হয়। ওটা বাংলা দেশ।"

"ও, তার ওপারে বুঝি যান না?" রবি শুধলো।

"কখনও সখনও খড়্গপুরে যেতে হয়।"

"কলকাতায় নয়?" ওপাশ থেকে বাসনা বলল।

"না।"

শশধর সামান্য দূরে গিয়ে বাসনার কাছে এল। নীচু গলায় কিছু বলছিল।

রবি বলল, "এখানে আপনি কি করেন, স্যার?"

মহীপতি সাধারণ ভাবে জবাব দিল, "একটা ব্যবসার মতন আছে।"

"কিসের?"

"কাঠের।"

এলা সন্তুকে বকছিল, সন্তু একলা কোণের দিকে চলে যাচ্ছিল বার বার, এলা বলছিল, পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে যেতে বলছি না, সাপেখোপে কামড়াবে যখন তখন বুঝবি।

সাধারণ, এলোমেলো কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ি পৌঁছে গেল।

বাগানের সামনেই দাঁড়াল পার্বতী, এলাকে বলল, "তুই গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর, আমি এখানে দাঁড়াই খানিক।"

বাসনা আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেছে, সঙ্গে শশধর। এলা সন্তুকে নিয়ে এগিয়ে গেল। পূর্ণেন্দু আর রবিও নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে এগোল, মনে হল ওরা তাদের কথা বলছে।

পার্বতী হেসে বলল, "চললো সব তাসের আড্ডায়। কী তাসটাই খেলে, সকাল সন্ধ্যে মানে না।...ও রবি, শুনছ, তাস নিয়ে বসবে বসো গলাবাজি করবে না।"

রবি যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল, "আমায় বলছ কেন, আমার গলা কোথায়! তোমরা ও বাবা কেটে ছেড়ে দিয়েছ।...ও স্যার, আপনিও কি বে-তাস? না হলে চলে আসুন। কিছু ইন্‌কাম হয়ে যাবে।"

পার্বতী হাসছিল।

মহীপতি বলল, "ভদ্রলোক বেশ ফুর্তিবাজ!"

"ভদ্রলোক বলছ কাকে, রবিকে! মারে রাম, ও ছোঁড়াও ভদ্রলোক হয়ে গেল। মস্ত পাজি ওটা।" পার্বতী সরল স্নেহের গলায় বলছিল। সামান্য থেমে আবার বলল, "আজ ওর পকেট থেকে আট দশ টাকা খসিয়ে এই মাত্র সব মিটমিটি খেয়ে আসছে, শুনলে না কেমন বলল, আমরা ওর গলা কেটে ছেড়েছি।"

মহীপতি নীরব থাকল না, মৃদু গলায় হাসল সামান্য।

তারপর চুপচাপ। পার্বতী আলস্যের সুখে নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে, সামান্য বেঁকে শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়াল, আকাশ দেখল করেক পলক।

মহীপতি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাল।

খানিকটা স্তব্ধতার পর পার্বতী আচমকা বলল, "তারপর?"

মহীপতি মনে মনে অনুভব করল, এই তার পরের একটা অর্থ আছে। ওটা নিতান্তই ভূমিকা নয়, বাহুল্য নয়।

মহীপতি বলল, "তারপর আর কি! তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।"

"আমিও নয়।...কিন্তু তুমি ভাবলে না কেন? এরকম জায়গায় আছ; কলকাতার এত কাছাকাছি; পরে পরে বাঙালী আসছে ছুটি কাটাতে, বেড়াতে, আর আমরা কি একবার এসে পড়তে পারি না।"

মহীপতি লক্ষ্য করে দেখছিল পার্বতীর গলার স্বরের কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে কি না। বয়সেই হয়ত, পার্বতীর গলার স্বর অল্প মোটা হয়েছে, এখন আরও গাঢ়, নরম মনে হয়। যতদূর মনে হচ্ছে, আগে পার্বতীর গলায় গাঢ়তার অভাব ছিল, হয় তরল না হয় রুক্ষই লাগত। কিংবা বেশি ঘনিষ্ঠ। স্বরের এই পার্থক্য তেমন যে স্পষ্ট হয়ে মহীপতির কানে ধরা পড়ল তা নয়, তবু মহীপতির এখন সেরকম মনে হল।

মহীপতি বলল, "কখনও সখনও মনে হত—"

"তবে আর কি, দেখা হয়ে গেল।"

সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া জলের মতন করে গিলে ফেলল মহীপতি। অল্প তফাতে পার্বতীদের বাড়িতে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল, এঘরে ওঘরে, কুয়াতলার দিকে বাতাসের দমকা লেগে কলাপাতার শব্দ হচ্ছে।

মহীপতি বলল, "অনেক বছর পরে দেখা, না। এক যুগ প্রায়।"

"বশ তো হবে।"

"বশ তো হলেই।" মহীপতি নড়ে চড়ে ঘুরে দাঁড়াল, পার্বতীর মুখোমুখি।

"তুমি বছর ছয় এখানে আছ, না?"

"ছয় শেষ হল।"

"আগের চার বছর কোথায় ছিলে?"

"অন্য দিকে, চাইবাসাতেও কাটিয়েছি কিছু দিন।"

"কি করতে? কাঠের ব্যবসা?"

"না, কাঠের ব্যবসাটা এখানে এসেই শুরু করলাম। তার আগে কখনও চাকরি বাকরি করেছি, কখনও অন্য কিছু।"

"আমার বিয়ে হয়েছে বছর ছয় হল", পার্বতী আচমকা বলল।

মহীপতি বোধ হয় কথাটা এভাবে প্রত্যাশা করে নি। পার্বতী কি বলতে চাইল বোঝার চেষ্টা করল মহীপতি। "বিয়ের পর মেয়েরা মোটা হয়, তুমি হও নি।" মহীপতি ইচ্ছে করেই পার্বতীর কথা থেকে সরে আসার জন্যে হালকা হবার চেষ্টা করল, মৃদু হাসল।

"মোটা হই নি কে বলল? বেশ হয়েছি।"

না, খুব সামান্য। ওটা কিছু নয়।···তুমি যেটুকু বদলেছ তা সুখে। মুখ তোমার খুব—কি বলব—কাটাকাটা, মানে শার্প ছিল। এখন দেখছি, পুরন্ত মতন।"

"মানে ভোঁতা?" পার্বতী হাসল।

"না না, ভোঁতা নয়, "মহীপতি মাথা নাড়ল, "ভোঁতা আমি বলি নি।"

পার্বতী মাটির দিকে তাকাল, বলল, "ঘাস ভিজে হয়েছে, নয়ত খানিক বসতাম। বাবা, তোমাদের এই আয়গার হাঁটা বড় কষ্টের, এই উঁচু, এই নীচু। আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। আর কম হাঁটলাম না।"

আশপাশ দেখে মহীপতি বলল, "বসতে হলে তোমায় বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত যেতে হয়।"

পার্বতী কথাটা কানে নিল না, অন্যমনস্ক হয়ে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মহীপতিও চুপচাপ, থেমে থেমে সিগারেট টানছিল।

শেষ পর্যন্ত পার্বতী কথা বলল, "কলকাতার খবরটবর কিছু রাখো?"

"তেমন কিছু নয়—।"

অমরেশদা মারা গেছে, জানো?"

"জানি।"

পার্বতী মহীপতির চোখের দিকে তাকাল। "আর কিছু জানো না?"

মহীপতি যেন কুণ্ঠিত হল, বলল, "শুনেছি অমরেশদার স্ত্রী ভালই আছে।"

"কোথায়, কার কাছে আছে জানো না।"

মহীপতি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইছিল। বলল, "আমার সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। এখানে পুরোনো কেউ এলে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় যদি দৈবাৎ তবেই যা শুনি।··· থাকগে, তোমার কথা বলো।"

পার্বতী আলস্যের পায়ে সামনে হাঁটল, থামল, আবার ফিরে এল। "আমার সম্পর্কে তোমার উৎসাহ এখনও আছে নাকি?"

মহীপতির মনে হল, পার্বতী যথাসম্ভব নিস্পৃহভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করলেও তার গলায় চাপা পরিহাস আছে। মনে মনে এই পরিহাস সরে নিল মহীপতি। সহজ করে বলল, "আমাকে খুঁজে বের করতে তুমি অনেক বেশি উৎসাহ দেখিয়েছ।"

"বাঃ।" পার্বতী কি রকম বিমূঢ় বোধ করল, মহীপতির মুখের চাপা হাসি লক্ষ্য করতে করতে বলল, "চেনাশোনা লোক দেখলে খোঁজ করব না?"

"করেছ বলেই বলছি—" মহীপতি বলল, "তোমার উৎসাহ বেশি।"

পার্বতী খানিক চুপ করে থাকল, তাকাল কিছু, বলল, "আমার উৎসাহ বরাবরই একটু বেশি ছিল।"

মহীপতি সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। অল্প সময় নিল, যেন পার্বতীর কথার পর একটা ছেদ দিল। বলল, "তোমার বাবা কোথায় আছেন?"

পার্বতী চোখ তুলে মাথার ওপর আকাশ দেখাল।

মহীপতি অন্যমনস্ক হল। "মা?"

"মা আরও আগে : ধি হয় তোমার কলকাতা ছাড়ার মাস কয়েক পরেই।"

নিশ্বাস ফেলল মহীপতি। দূরে একটা ট্রেন আসার শব্দ উঠেছে। পার্বতীদের বাড়ি থেকে আচমকা গান ভেসে এল, রেডিয়ো চালিয়ে দিয়েছে কেউ।

হালকা ভাবে মহীপতি বলল, "এখন তা হলে মন দিয়ে ঘর সংসার করছ?"

"করছি।"

"খুশী?"

"অখুশী বললে কি আমার জন্যে কাঁদতে বসবে...?" পার্বতী ঠাট্টা করে বলল। বলে অকারণে হাসল।

মহীপতিও হেসে বলল, "বললেও বিশ্বাস করতে পারব না। স্বচক্ষেই দেখছি..."

"কি দেখছ? আমাকে?"

"তোমাকে, তোমার স্বামীকে, ছেলেকে..."

পার্বতী কৌতুকের চোখে মহীপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চিবুকের তলা পর্যন্ত কোনো রহস্যজনক হাসি গড়িয়ে এসেছে।

মহীপতি জ্যোৎস্নার আলোয় আভাটা লক্ষ্য করল না। বলল, "তুমি ঘর সংসার করে সুখী লক্ষ্মী হয়েছ দেখে ভালই লাগছে।"

পার্বতী দু পলক যেন আরও গম্ভীর করে মহীপতিকে লক্ষ্য করল, তারপর আচমকা বলল, "নিজের পাপের ভার খানিকটা হালকা হচ্ছে বুঝি!"

মহীপতি হঠাৎ কি রকম চমকে গেল। পালানো চোর আচমকা পুলিশের হুইসলের মুখোমুখি পড়ে যে রকম সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে মহীপতি অনেকটা সেই রকম সন্ত্রস্ত হল। অনেক কষ্টে এই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত ভাব কাটিয়ে সে বলল, "আমার পাপের ভার! ··কি জানি, হবে হয়ত।"

"কথাটা তোমার মনে খুব ভাল লাগল? না?"

"না, লাগার কি?"

"আমার কিন্তু বরাবরই একটা কথা মনে হয়েছে। তুমি চোরের মতন পালিয়ে গেলে কেন? বলে কয়ে যেতে পারতে।"

মহীপতি নিরুত্তর। পার্বতীকে সে দেখছিল না।

পার্বতী কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলল না। পরে বলল, "আমি গোড়ায় গোড়ায় ভাবতাম, তুমি আবার একদিন ফিরে আসবে। ছেলেমানুষী আর কি! পরে আর সে আশা করি নি। আবার একটা বিয়ে করলাম, এবার আর লুকোচুরি করে নয়। বিয়ে করে আমার লাভই হল, নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাতে পারলাম।"

মহীপতি বলার মতন কথা খুঁজে না পেয়ে এবং নীরব থাকা সম্ভব হল না বলে বলল, "তাহলে তোমার ক্ষতি কিছু হয় নি, বরং লাভ হয়েছে—।"

"হ্যাঁ, লাভই হয়েছে। বিয়ের গায়ে গায়েই কলকাতা শহরের অমন জায়গায় একটা বাড়ি, বোকাসোকা ভালমানুষ গোছের একটা পুরুষমানুষ, আর ওই বাচ্চা—একদিনেই তিন তিনটে পাওনা, সোজা লাভ নাকি?" পার্বতী হাসতে লাগল আপন মনে।

মহীপতির কানে কথাটা লেগেছিল। সন্দেহভরে জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চা? একই দিনে বাচ্চাটাকেও পাও কি করে?"

পার্বতী এবার গলা আকাশের দিকে তুলে জোরে হেসে উঠল। "আমি পেটে করে নিয়ে যাই নি। তোমার বুঝি ভয় ধরে গিয়েছে শুনে!···না গো মহীপতিবাবু, তোমার ভয়ের কিছু নেই। সদ্য অন্যের পেটে ধরা ছেলে, যার পেটে এসেছিল, সে মরে গেছে, আমি তার জায়গা, তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম একদিন। ব্যাস্, সব আমার হয়ে গেল।"

মহীপতির মনে হল, পার্বতীর সর্বাঙ্গ চাপা হাসিতে কাঁপছে। রেল গাড়িটা কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

তিন

ঘুম ভেঙে উঠে রবি বাইরে এসে দেখল, চারপাশ ফরসা হয়ে গেছে। আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল, রাতের মালিনা প্রায় পরিষ্কার হয়ে সকাল ফুটেছে। পাখিরা ঘুম ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করেছিল অনেকক্ষণ, এখন একে একে উড়ে যাচ্ছে। গাছপালা শান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, সারা রাতের হিমে মাঠ ঘাট ভিজে। রবি চারপাশ তাকিয়ে দেখে নিয়ে কুয়াতলার দিকে পা বাড়াতেই পার্বতীকে দেখল। নীচু বেড়ার পাশ দিয়ে পার্বতী আসছে।

"একি, এত সকালে তুমি?" রবি বলল।

পার্বতী বলল, "ভোরে ভোরে আজ উঠে পড়েছি।"

"বেশ করেছ; কিন্তু ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

"কুয়া থেকে মুখেচোখে একটু চাটকা জল দিয়ে এলাম।"

"বলো কি, জল তুললে!"

"আহা, হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যায়···।"

রবি শব্দ করে হাই তুলে সকালের বাকি আলস্য কাটিয়ে দিল। বলল, "উঠে যখন পড়েছ তখন চলো খানিকটা মাঠ ওয়াক্ করে আসি। কী রকম ফ্রেশ লাগবে দেখো।"

এখানে এসে পর্যন্ত রবি প্রাতঃভ্রমণের অভ্যেস করেছে। এক আধদিন তার সঙ্গী জুটলেও এখন আর সাত সকালে ভোরের ঘুম ছেড়ে কেউ বিছানা ছাড়তে রাজী না। ডাকাডাকি করেও কাউকে পাওয়া যায় না। রবি একা একাই সকালের দিকটা খানিক ঘুরে বেড়ায়, গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করে, পায়ে শিশির মাখে, সূর্যোদয় দেখে, কখনও সখনও এর তার বাড়ির পাঁচিলে হাত বাড়িয়ে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসে।

পার্বতীকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গিয়ে রবি খুশী হল। বলল, "নাও তুমি এসো, আমি চোখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে আসি।"

পার্বতী ঘরের দিকে পা বাড়াল, রবি কুয়াতলার দিকে।

সামান্য পরে দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। ঘরের দরজা ভেজানো, আসার সময় ঠাকুরটাকে জাগিয়ে দিয়েছে রবি। পার্বতী রাতের বাসি শাড়ির আঁচল পিঠে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল। ভোরের দিকে পাতলা শীতের ভাব থাকে, গা সিরসির করে। ঘাস লতাপাতার ভোরের চেহারা দেখলে মনে হয়, ভোর রাতে বুঝি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়ে সব ভিজে গেছে। কুয়াশার মতন সাদা প্রলেপ তখনও শূন্যে জড়ানো।

রবির পরনে পাজামা, গায়ে চটকানো পাঞ্জাবি; গলায় কাছে একটা তোয়ালে জড়ানো। মুখ মুছে তোয়ালেটা আর রেখে আসে নি, গলায় জড়িয়ে নিয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে তার গলা খুস খুস করে ওঠে বলেই বোধ হয়।

লিউলিতলায় অজস্র লিউলি ঝরে আছে, খুব দিকে একটা গন্ধ পাওয়া যায় নাক টানলে। ঝরা ফুল পেরিয়ে ওরা বাড়ির সীমানা পেরিয়ে এল।

রবি বলল, "কোন দিকে যাবে?"

পার্বতী সকাল দেখছিল যেন, বলল, "যেদিকে খুশি চলো।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে রবি বলল, "চলো তা হলে মাঠের দিকে যাই; মাঠে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখব।" বলে রবি হাসল। সূর্যোদয় শব্দটা সে রগড় করে উচ্চারণ করেছিল।

পার্বতী হাঁটতে লাগল। এই স্নিগ্ধ সতেজ ভোর তার ভালই লাগছিল। শীতের স্পর্শ লাগছিল কদাচিৎ। প্রত্যুষের অচঞ্চল বাতাস শিশির ভেজা মাটি ও লতাপাতার গন্ধে মনোরম হয়ে আছে, নিমের জঙ্গল থেকে এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে গেল, আমপাতা খসে পড়ছিল, এত সকালেও ফড়িং পথে পথে ঘাসের ডগা ছুঁয়ে উড়ছে।

পার্বতী বলল, "দেখতে দেখতে শীত পড়ে যাচ্ছে, না?"

রবি মাথা হেলিয়ে সায় দিল। "কালীপুজো নাগাদ শীত পড়ে যাবে।"

পার্বতীরও সেই রকম ধারণা।

আরও কয়েক পা হেঁটে এসে পার্বতী বলল, "আমি ভাবছি তার আগেই কলকাতায় ফিরব।"

রবি তাকাল। "কেন? দেওয়ালী পর্যন্ত আমরা থাকছি।"

আকন্দ ঝোপ পেরিয়ে সটান রাস্তা, পায়ে চলা পথ, দু

পাশে চালু জমি। পার্বতী বলল, "কাল আমার খুব খারাপ লেগেছে।"

রবির মুখ সাধারণ আড়ষ্ট হল। কথা বলল না।

পার্বতী ধীরে ধীরে হাঁটছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, আলস্য নাকি অন্য কোন কারণে পার্বতীকে খানিকটা উদাস দেখাচ্ছে। রবির মনে হল, কালকের ঘটনা এখনও পার্বতীকে অপ্রসন্ন করে রেখেছে।

রবি ইতস্তত করে বলল, "একসঙ্গে এসেছি, এখন আর রাগ করে লাভ নেই।"

"কোন দরকার ছিল না একসঙ্গে আসার," পার্বতী বলল, "আমি রাজী হই নি। বারণ করেছিলাম বার বার—।"

রবি কিছু বলতে পারল না। কালকের ব্যাপারটা তারও পছন্দ হয় নি। শশধরদা এবং বাসনাদির আসের অনেক কিছুই তার ভাল লাগে নি, মনে মনে সে বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু কালকের ব্যাপারটা সহ্য করে যাওয়া সত্যিই মুশকিল।

"ওদের কাণ্ডজ্ঞান কোনো কালেই নেই, বরাবর নোঙরামি করে এসেছে," পার্বতী বিরক্তির গলায় বলল, "জেনে শুনেও তোমার দাদা আদর দেখিয়ে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনল।"

রবি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখল না। শশধর এবং বাসনা সম্পর্কে তার ধারণা ভাল নয়। যথেষ্ট মেলামেশাও সে এদের সঙ্গে করে নি। এমন কি, সে যতটা জানে তাতে মনে হয়, আচমকা একটা উপসর্গের মতন এরা দুজনে পার্বতীদের সংসারে এসে জুটেছে। কেন এসেছে রবি হয়ত তাও খানিকটা অনুমান করতে পারে।

খানিকটা ফাঁকা মাঠে নেমে এল ওরা। লালের চারা আর শক্ত লাল মাটি, একদিকে কিছু পাথর স্তূপ করা, মস্ত একটা বেল গাছ। নদীর দিক থেকে বাতাস বয়ে এল এক ঝলক।

রবি বলল, "কালকের ব্যাপারটা আমারও খারাপ লেগেছে, পার্বতী; কিন্তু কি করা যাবে!"

পার্বতী বলল, "সারা রাত আমার কাল ঘুম হয় নি।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "আমি ঠিক করেছি, আজ আমি স্পষ্ট করে ওদের বলে দেব, হয় ওরা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকুক, না হয় আমরা।"

রবি খানিকটা ভয় পেল। পার্বতীর চরিত্র খানিকটা সে জানে। মাথায় কোনো জেদ চেপে বসলে ওকে আর নোয়ানো যায় না। আবার কি একটা গোলমাল বাধে এই আশঙ্কায় রবি পার্বতীকে নরম করার চেষ্টা করল। বলল, "সেটা কি ভাল হবে! হাজার হোক তোমাদের গেস্ট।"

"আমি তাতে কৃতার্থ হইনি," পার্বতী বাঁকের গলায় বলল।

কালকের ব্যাপারটা তাচ্ছিল্য করার মতন যে নয় রবিরও তাতে সন্দেহ নেই। রবি খুব কাছাকাছি থেকে শশধর ও বাসনাকে আগে দেখে নি, আজ কদিন দেখছে। দেখে তার কোনো কোনো ধারণা নিশ্চয় পালটে যাচ্ছে। কিন্তু কাল যা হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। একমাত্র বাঁচোয়া এই যে, ঘটনাটা কিছুটা রাত্রে ঘটেছিল, সন্তু জেগে ছিল না—ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর মহীপতিও এ বাড়িতে ছিল না। সন্তু জেগে থাকলে কি দেখত, কি ভাবত—ভাবলেই লজ্জায় মুখ কান আগুন হয়ে যায়। মহীপতিও যদি দেখত, কলকাতার এই ছেলেটিকে কি ভেবে নিত কে জানে! এরা অবশ্য দেখেছে, শুনেছে। ঠাকুরটাও দেখল, বাবুবিবিদের কাণ্ড কারখানা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

কাল বেশিক্ষণ তাস খেলা হয় নি। শশধরের মন ছিল না, বাসনাও হাতের তাস নিয়ে খেলার চেয়ে আদিখ্যেতাই বেশি করছিল। তাসের পাট তুলে ফেলতে হল। তারপর শশধর স্ত্রীকে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। শশধর রোজই খানিকটা মদের নেশা করে, এটা তার অভ্যাস। আয়োজনের বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় না, নিছক কুয়ার জল দিয়েই সে হুইস্কি খায়, মাঝে মাঝে দু এক মুঠো ভাজাভুজি। শশধরকে দেখে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসার সময় পূর্ণেন্দু এটা জানত না তা নয়। ইদানীং পূর্ণেন্দুও মাঝে মাঝে মদ পান শুরু করেছে। এখানে এসেও শশধরের সঙ্গে বসেছে দু একদিন। কাল অবশ্য পূর্ণেন্দু ছিল না।

ঘরে বসে শশধর নেশা শুরু করার পর ওদিকে কেউ যায় নি। পার্বতী তার নিজের এবং এলার জন্যে প্রাতের একটা

ঘর দিয়ে নিয়েছিল, শঙ্কর ও
পূর্ণেন্দু আর রবি, মায়ের বেডরুমে এল
শঙ্করের।

করছে, চেঁচামেচি,
টেলিফোনিও
যাচ্ছে না

কি হয়েছিল বোঝা গেল না,
দাওয়ার ব্যবস্থা যখন শেষ, শঙ্করের জন্যে তা অপেক্ষা করছে, তখন শঙ্করদের ঘরের মধ্যে
চেঁচামেচি শোনা গেল। তার আগে ওদের স্বামী স্ত্রীর গলা যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল, দু জনের মধ্যে একটা ঝগড়া, কথা কাটাকাটি চলছে এতে অবাক হবার কারণ ছিল না শঙ্কর এবং তার স্ত্রীর মধ্যে মধুর ও বিরোধের ব্যাপারটা কোনো নিয়ম মেনে চলত না। আজ এই মুহূর্তে শঙ্কর ও তার স্ত্রীর ব্যবহার দেখলে মনে হবে, এমন আদর্শ প্রেমিক অন্যত্র দম্পতি আর দেখা যায় না, পর মুহূর্তে উভয়ের অন্য রূপ, দু জনেই স্বামী কাল পাত্র ভুলে,

তবু কান যা হল, বচসা
ক্রমে প্রখর হল, তারপর ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব বাধল রবি আর পূর্ণেন্দু বুঝতে পারছিল না কি করবে, পার্বতী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল

পার্বতী এসে পূর্ণেন্দুকে বলল, কি পেয়েছ তোমরা? এটা বাড়ি না হোটেলের বস্তি? বলে পার্বতীর মুখ লাল, চোখ উগ্র

পূর্ণেন্দু ভয়ে ভয়ে বলল, বুঝতে পারছি না

বুঝতে না পারলে হবে কেন। যাও, গিয়ে থামতে বলো।

পূর্ণেন্দু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে উঠল রবিও অত্যন্ত

কুণ্ঠার সঙ্গে এবং সঙ্কোচে, অস্বস্তিতে পূর্ণেন্দুর পেছন পেছন কয়েক পা এগোল।

মাকের বারান্দা পার হয়ে শশধরদের দরজার কাছে আসতেই আচমকা দরজা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল বাসনা। গায়ে কোথাও শাড়ি নেই, বুকের জামা প্রায় খোলা, সায়াটা অঙ্গে আছে। মাথার চুল দেখে এলোকেশী বলে মনে হচ্ছিল, চোখ মুখ ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

পূর্ণেন্দু এবং রবি বিমূঢ়, বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পার্বতী সামান্য পিছিয়ে।

বাসনা বোধ হয় কিছু ধরবার চেষ্টা করছিল, দেওয়াল বা অন্য কিছু ধরতে পারছিল না, টলতে টলতে মেঝেতে পড়ে গেল।

ঘর থেকে শশধর মাতাল গলায় চেঁচাচ্ছিল, বীচ্...ইউ আর এ সোয়েলন্ বীচ্। তুই কেথায় মিস্তিরের বাড়িতে কার্পেটে শুয়ে গড়াগড়ি যাস, আমি জানি না। আমায় তুই জুতো মারবি, তোর ঠ্যাঙ্ চিরে দেব, হারামজাদী কোথাকার।...বজ্জাত মেয়েছেলে, ঘুষলী মাগীর পেছনের...

বাসনা মেঝেতে উবু হয়ে বসে দু হাতে মাটি ধরে ওয়াক তুলছিল। বৃহৎ একটা ব্যাঙের মতন সে বসে। ওয়াক তোলার শব্দ ও শব্দের মধ্যের বিরামে সে বলে, ভাঙা গলায় বলছিল, তোরা দেখ এসে, আমায় খুন করে ফেলেছে রে! ওরে বাবা রে...। জানোয়ার, জন্তু, চামার...। বলছিল আর ওয়াক তুলছিল বিশ্রী শব্দ করে। পূর্ণেন্দু ভয় পেয়ে বাতিটা জেলে দিল বারান্দার।

আলোয় বাসনাকে উন্মাদিনীর মতন দেখাচ্ছিল; বীভৎস। তার খাঁচো পাতলা জামাটা পিঠের দিকে ছিঁড়ে গেছে, হাতের পাশে রক্ত। মুখ চোখ আঁচড়ানো, সায়ার দাঁটুর কাছটায় ফালা হয়ে ছিঁড়েছে। মনে হচ্ছিল, শরীরের মধ্যে থেকে কিছু উগরে বের করে দিতে পারলে ও বাঁচে। বাসনার যে ভীষণ একটা কষ্ট হচ্ছিল, বোঝাই যায়।

আলোটা না জ্বাললেই ভাল ছিল। দৃশ্যটা ভীষণ দৃষ্টি-কটু। পূর্ণেন্দু এবং পার্বতীর সামনে এই দৃশ্য দেখে রবি যেন শউরে উঠছিল, লজ্জায় অধোবদন।

পূর্ণেন্দু হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলল, ব্ল্যাকেন্...

ঘরের মধ্যে থেকে শশধর ততক্ষণে বেরিয়ে দরজার কাছে এসেছে। শশধরের চেহারা দেখে তাকে বেপরোয়া এবং বিকৃত দেখাচ্ছিল। দরজার পাল্লা ধরে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়েছে শশধর।

বাসনা শব্দ করে বমি করতে শুরু করল। বমির সঙ্গে লালা পড়ছে, মুখ হাঁ করে টেনে টেনে দম নিচ্ছে।

পার্বতী নাক মুখে আঁচল চাপা দিল। কী দুর্গন্ধ!

এলা কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাছে আসতে বা ফিরে যেতেও পারছিল না।

বাসনা হাত বাড়িয়ে জল চাইছিল।

ঠাকুরটাও কোন সময়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কারও খেয়াল হয় নি। পার্বতীর চোখ পড়ল হঠাৎ। ইশারায় চলে যেতে বলল।

এলাও শেষ পর্যন্ত পালাল।

দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে শশধর জড়ানো গলায় তখনও চেঁচাচ্ছে: মুখের কোনো লাগাম নেই, অশ্লীল ইতর নোংরা কথা বলছে।

বাসনা শেষ পর্যন্ত রবির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

পার্বতী আর দাঁড়াল না, চলে যেতে যেতে বলল, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তোমাদের আজ থিয়েটার দেখতে হবে না, ঘরে যাও, আমি দেখছি

রবিরা ঘরে ফিরে গেল।

পরের সমস্ত ঝামেলা পার্বতীকেই সামলাতে হয়েছে। মুখ চোখ মুছিয়ে বাসনাকে তার ঘরে রেখে এসেছে, শশধরকে ধমকে চমকে থামিয়েছে, বারান্দায় বমি ধুয়েছে নিজের হাতে।

সব যখন শেষ হল তখন শশধরদের ঘরে আর কোনো সাড়া শব্দ নেই, অচেতন দুটি মানুষ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

রাত্রের দৃশ্যটা রবি এই সকালে আবার স্পষ্ট করে মনে করতে গিয়ে দেখল, দুঃস্বপ্নের মতন সেটা তাকে বিরক্ত করছে।

আরও খানিকটা হেঁটে এসেছিল ওরা। আকাশে আলো ফুটে উঠেছে। সূর্য উঠে আসছে।

পার্বতী বলল, "কলকাতা ছাড়ার আগেই আমি জানতাম, এখানে এসে এই সব বেল্যাল্লাপনা হবে।"

রবি পুব আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল। সূর্য উঠে আসছে।

কি ভেবে রবি বলল, "কালকের বাড়াবাড়ির পর আর কি কিছু করবে ওরা?"

"না করলে বাঁচবে না।"

রবি পার্বতীর মুখের দিকে চোখ ফেরাল। "এই কি বাঁচা?"

পার্বতী রবির মুখ দেখল। বলল, "তুমি এখনও ছেলে মানুষ; কে যে কি ভাবে বাঁচে তুমি জানো না।"

আরও অনেকটা বেলায়, বিসদৃশ ঘটনাটা ঘটে গেল।

রোদের তাত বাঁচিয়ে গাছতলার ছায়ায় পার্বতী দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ গম্ভীর, চোখের মণিতে তখনও আঁচ রয়েছে, চিবুক শক্ত।

হন হন করে পূর্ণেন্দু এগিয়ে এসে বলল, "এটা তুমি কি করলে?"

পার্বতী স্বামীর দিকে তাকাল না, কথাটা যেন তার কানেই যায়নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পূর্ণেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার বলল, "তুমি এ-রকম একটা কাজ করবে আমি ভাবতেই পারি নি।"

পার্বতী স্বামীর মুখের দিকে লহমার জন্যে আড়চোখে তাকাল। "তোমার অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল।"

পূর্ণেন্দু যেন হাত বাড়াতে যাব যাব করছিল, ধাক্কা খেয়ে হাত গুটিয়ে নিল, অথচ খুঁত খুঁত করতে লাগল। খানিক চুপ করে থেকে, বার কয়েক চোখের দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে শেষে স্ত্রীর কঠিন মুখের দিকে চোরা চোখে তাকাল পূর্ণেন্দু। বলল, "যা করলে তারপর কি ওরা থাকবে?"

"আমি তো ওদের থাকতে বলি নি, পার্বতী স্পষ্ট রূঢ় জবাব দিল।

পূর্ণেন্দু স্ত্রীর এই রূঢ়তা এবং কঠোরতায় ক্ষুব্ধ হল। "আমি ওদের ডেকে এনেছিলাম।"

"আমি বারণ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও তুমি এনেছ।"

"ভুল করেছি। কিন্তু আমিই বা কি করে জানব ওরা এখানে এসে এই রকম করবে। কে ভাবতে পেরেছিল…"

পার্বতী স্বামীকে কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, "বেশ তো, তুমি ওদের নিয়ে থাকো, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।"

পূর্ণেন্দু এবার বিরক্ত হল। "তোমার কথার কোন মানে হয় না।… ওরা আমার কে? তোমারই আত্মীয়। কলকাতা থেকে ডেকে এনে এখন তাড়িয়ে দেওয়াটায় তোমার গৌরব বাড়বে না।"

পার্বতীও তীব্র, তিক্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। "তুমি বার বার ও কথাটা বলো কেন? আমি ওদের নেমতন্ন করে এখানে আনি নি। তুমি এনেছ। গৌরবই হোক আর নিন্দেই হোক সে তোমার প্রাপ্য আমার নয়।"

পূর্ণেন্দু যে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। অল্প তফাতে বাড়ি দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় কেউ নেই, সব শেয়ারা গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। মনে মনে পূর্ণেন্দু আরও একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল: শশধরের ঘরে শশধর দাড়ি কামাবার আয়োজন করে সাবান মাখা দাড়া গাল নিয়ে বসে আছে, বাসন্তী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে স্নানের জন্যে চুল খুলে আঁচড়ে নিচ্ছে। দু জনেই চুপচাপ, পার্বতীর রূঢ় স্পষ্ট কথাগুলো ওদের কানে বাজছে তখনও।

অসহায়ের মতন পূর্ণেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। তার বলার কিছু নেই; তবু শেষবারের মতন চেষ্টা করল, "মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি একটু ভেবে দেখ। এ ভাবে কাউকে তাড়াতে নেই।"

পার্বতীর ধৈর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলল, "আমাকে আর জ্বালিও না, তোমার যা খুশি করো, ওদের আদর করে রাখতে চাও রাখো, আমাদের আর এই নোংরামির মধ্যে রেখ না।"

পূর্ণেন্দু বুঝতে পারল, পার্বতীকে আর কোন মতেই নরম করা যাবে না। কালকের ঘটনার জন্যে সে মনে মনে

লজ্জিত, বিব্রত, কিন্তু বাস্তবিকই তার জানা ছিল না শশধর এতটা বাড়াবাড়ি করবে। শশধরের ওপর সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পার্বতীর কাছে সে আরও কিছুটা সদয় ব্যবহার আশা করেছিল।

পূর্ণেন্দু বলল, "বেশ, আমি আর কিছু বলব না ; তবে বলতে গিয়েও পূর্ণেন্দু থেমে গেল, শেষে খানিকটা হতাশ গলায় বলল, 'থাকগে, যা হবার হবে; আমার কপালটাই খারাপ।"

পার্বতী কোন রকম সাড়া শব্দ দিল না।

পূর্ণেন্দু গাছতলা ছেড়ে চলেই যাচ্ছিল, কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "যাই বলো, তুমি ওদের ওপর এতটা চটা আগে আমি জানতে পারি নি, জানলে সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। ওরা যেমন বেশ বাড়াবাড়ি করেছে, তুমিও সেই রকম বাড়াবাড়ি করলে।"

পূর্ণেন্দু চলে গেল, পার্বতী একা দাঁড়িয়ে থাকল।

খানিকক্ষণ বিশেষ করে কিছু ভাবতে পারল না পার্বতী, বার বার তার শশধরদের কথা মনে পড়ছিল, যে ভাবে ওদের ঘরে ঢুকে অচেনা দুজনকে কথা শুনিয়ে এসেছে, তাতে দু জনেই বোবা হয়ে গিয়েছিল। একটা কথাও বলে নি, বলার সাহস হয় নি। কথা বললে আরও ভিন্ন অবস্থা হত।

এলা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছে, হাতে কাচা কাপড়, রোদে এসে ঘাস এবং গাছের নীচু ডালে কাপড় জামা মেলে দিচ্ছিল। দিদিকে সে দেখল, তারপর কাপড় চোপড় মেলা হয়ে গেলে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পার্বতীর হঠাৎ মনে হল, মহীপতি আসছে, কাছাকাছি কোথাও মোটর বাইকের শব্দের মতন শোনা যাচ্ছিল। তাকাল পার্বতী, গাছ, ঝোপ, উঁচু পাঁচিলের জন্যে দূরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা রেলক্রসিং পেরিয়ে এসেছে বলেই মনে হল, ওদিকে লাইনের ওপারের রাস্তায় রাশিকৃত ধুলো উড়ছে। পার্বতীর মনে হল তার ভুল হয়েছে, ধুলো উড়িয়ে কোন গাড়ি যাচ্ছিল, সে ভুল শুনেছে। মহীপতি আসছে না। তার এখন আসার কোন কারণ নেই।

আর আচমকা পার্বতীর মনে হল, মহীপতির সঙ্গে দেখা হবার পর কি সে বেশি রুক্ষ হয়ে পড়েছে ?

পার্বতী ঠিক বুঝল না, এবং স্বীকার করল না।

চার

সকাল থেকেই একটা গুমোট ভাব জমেছিল বাড়িতে। বেলায় আরও বাড়ল। দুপুর থেকে কী রকম এক আড়ষ্টতা। অতগুলো লোক বাড়িতে তবু যেন গলার শব্দ নেই। সন্তর যা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, নয়ত সব চুপচাপ, অভ্যাস বশে সংসার চলছে এই যা, মানুষগুলোর সঙ্গে তার বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। কাল একরকম মনে হয়েছিল ; মনে হয়েছিল—এই যে একটা দল কলকাতা থেকে ছুটি কাটাতে ছুটে এসেছে, এরা খুব জীবন্ত, স্ফূর্তিবাজ, হল্লুগে, এদের পারিবারিক সম্পর্ক তৃপ্তিদায়ক। আজ একেবারে আলাদা রকম মনে হচ্ছে এদের ; মনে হচ্ছে, এরা সকলেই পৃথক, বিচ্ছিন্ন, একত্রে থাকলেও একের সঙ্গে অন্যের যোগ কিছু নেই যা আছে তা নিতান্তই চাক্ষুস।

বিশ্রী রকম আড়ষ্টতা আর নিষ্প্রাণ এক আবহাওয়ার মধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেল। রবি সারা দুপুর এলোমেলো ঘুরে পড়ে কাটাল, বা চোখ বুজে শুয়ে থাকল ; পূর্ণেন্দু বাসি খবরের কাগজ পড়ে আর ঘুমিয়ে দুপুর পার করল। পার্বতীর ঘরে পার্বতী চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল, এলা সিনেমার কাগজ দেখল খানিক, খানিক বা ঘুমোলো, জানলা দিয়ে দুপুরের আকাশও দেখল শেষ দুপুরে। সন্ত আপন মনে খেলা করে করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

শশধরদের ঘরের দরজা সকাল থেকেই ভেজান প্রায়। কালকের মত্ততার পর আজ শশধর বা বাসনা কেউই তেমন সুস্থ নয়। বাসনা ক্লান্তি ও অবসাদে নিস্তেজ হয়ে আছে। কাল বোঝা যায় নি, আজ ওর দিকে তাকালে বেশ বোঝা

যায়, তার শারীরিক আঘাতগুলো কম নয় বা চোখের তলায় কালশিটে পড়ে কালচে হয়ে গেছে, গলার কাছে নখের দাগ, ডান হাতের কনুই ফোলা। হাতের কাটা জায়গাটায় ক্ষত হয়ে আছে। পিঠ টান করে বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল বাসনার। শশধরও ভাল নেই। তার গায়ে আঁচড়ানো খামচানোর দাগগুলো ঢাকা, কানের পাশে অনেকটা জায়গা লাল হয়ে আছে। বাইরে থেকে কাল যতটা বোঝা গিয়েছিল ঘরের মধ্যে তার চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র কাণ্ড ঘটেছে। নিজেদের শরীর মনের জ্বালার ওপর পার্বতীর আজকের ব্যবহারে ওরা দুজনেই কেমন আহত অপমানিত। এমনও হতে পারে; সকালের আলোর স্বাভাবিকতায় তারা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বিকেল পর্যন্ত শশধর আর ঘরের দরজা খুলল না।

বিকেল পড়ে আসার সময় থেকেই অন্য দিন বেড়াতে বেরোনোর উদ্যোগ শুরু হয়। আজ কোন উদ্যোগ নেই। চা খেয়ে যে যার মতন সময় কাটাতে লাগল। সন্তু ছটফট করতে শুরু করেছিল, জামা প্যান্ট পরে সে তৈরি, চুল আঁচড়েছে নিজে নিজে, তারপর একবার রবি অন্তবার এলার কাছে ঘুর ঘুর করতে লাগল।

রবিরও ভাল লাগছিল না, তার পক্ষে এভাবে হাত পা গুটিয়ে বোবা হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত পার্বতী গিয়ে বলল, "কি, আজ ঘরে বসেই কাটাবে নাকি?"

পার্বতী বলল, "তোমরা যাও, ঘুরে এস।"

"আমরা আবার কে! কারও কোন রকম গা দেখছি না।"

"তুমিই তাহলে সন্তু আর এলাকে নিয়ে ঘুরে এস।"

"তুমি?"

"আমার ভাল লাগছে না।"

"ঘরে বসে থাকলে আরও খারাপ লাগবে। চলো, বেড়িয়ে আসি খানিকটা, ভাল লাগবে।"

পার্বতী মাথা নাড়ল। "না, তোমরা যাও। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।"

রবি আরও খানিকটা অনুনয় বিনয় করল। শেষে মনে করিয়ে দিল, "আজ আমাদের মধীপতিবাবুর বাড়ি যাবার কথা। ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন।"

পার্বতী বলল, "তোমরা ঘুরে এস। আমি পরে যাব।"

অগত্যা রবি এলাকে তৈরি হয়ে নিতে বলে রবি পোশাক পাল্টাতে গেল।

রবিরা যখন বেরুলো বিকেল তখন ফুরিয়ে গেছে, আকাশের তলায় তলায় ধরা আলো ক্রমশই ফিকে হয়ে হয়ে ছায়ার রং ধরছে। পূর্ণেন্দু আরও একটু পরে পার্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল।

"একটা কথা ভাবছি, পূর্ণেন্দু বলল, "শশধরবাবুকে আমি না হয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি, কাছাকাছি একটা বাড়িতে গিয়ে থাকুক ওরা, দু চার দিন পরে বরং কলকাতায় ফিরে যাবে।"

পার্বতী কোন কথা বলল না।

পূর্ণেন্দু আবার বলল, "এভাবে তাড়িয়ে দেবার চেয়ে সেটা ভাল।"

পার্বতী বলল, "আমি কিছু জানি না। যা তোমার ভাল মনে হয় করো।"

পূর্ণেন্দু অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছিল, শশধরদের অন্য কোন বাড়িতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ-বাড়িতে আর ওদের রাখা যাবে না। আর আজ বা কালই ওদের কলকাতার গাড়িতে তুলে দেওয়া ভীষণ দুষ্কর।

স্ত্রীকে বোঝাবার মতন করে পূর্ণেন্দু এবার বলল, "আমাদের মদনবাবুকে ধরলে একটা ছোট মতন বাড়ি কাছাকাছি পাওয়া যাবে নিশ্চয়। চেষ্টা করে দেখি, কি বলো?"

"দেখো," নিস্পৃহভাবে পার্বতী জবাব দিল।

"তার আগে শশধরবাবুদের বলে দেখি। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারলে ভাল। তোমার কি মনে হয় ওরা অরাজী হবে?"

"কি করে বলব?"

আমার মনে হয় রাজী হয়ে যেতে পারে। কালকের ব্যাপারের পর দুজনেই দমে গেছে।...এমনিতে যে শশধরবাবু লোক খারাপ তা নয়, তবে ওই—মোদ্দা মাতাল হয়ে পড়লে কোন হুঁশ থাকে না।"

পার্বতীর ইচ্ছে হচ্ছিল, বাসনার সম্পর্কে কোন কোন কথা সে বলে। বলল নয়। পূর্ণেন্দুকে সে আগে যা বলেছে তাতে যখন কোন লাভ হয় নি, এখন বললে আর বড় লাভ হবে না। পূর্ণেন্দু একেবারে নিঃস্বার্থে ওদের আনে নি বা আদর

আপ্যায়ন করছে না। শশধরবাবু রাগ করে, অপমানিত হয়ে চলে গেলে ক্ষতি পূর্ণেন্দুর কম নয়।

পার্বতীকে আর ঘাঁটাল না পূর্ণেন্দু। সকালের চেয়ে স্ত্রীর মন মেজাজ খানিকটা যেন ফিতোনো মনে হল, আগুনের ঝলসানো আঁচ কমে এলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। পূর্ণেন্দুর ভয় ছিল, পার্বতী হয়ত এ প্রস্তাবেও রাজী হবে না, আপত্তি করবে, বলবে—যার দায় সে খুঁজুক তোমার মাথা ব্যথা কেন ?

পার্বতী কোন আপত্তি তুলল না, পূর্ণেন্দু এতেই যেন স্বস্তি পেল। এরপর শশধর আর বাসনা। তাদের রাজী করাতে হবে। বলা যায় না, শশধর সম্মত হবে কিনা, তবু চেষ্টা করবে পূর্ণেন্দু।

পূর্ণেন্দু চলে গেল।

পার্বতী ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, অন্ধকার হয়ে এসেছিল, হাতে করার মতন কোন কাজ নেই, বড় জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ ও গাছপালা দেখে গড়িয়ে পড়া সন্ধ্যার মধ্যে কখন যেন সে হারিয়ে গেল।

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে পার্বতী বেরিয়ে পড়েছিল। গায়ে সাধারণ হালকা রঙের শাড়ি, পায়ে নরম একটা চটি, বিকেলে চুল বেঁধে নিয়েছিল, এলো খোঁপা, গায়ের আঁচল টেনে হাঁটতে হাঁটতে পিচের রাস্তায় চলে এসেছিল। বাঁ দিকে ফুলডুঙরি, ডান দিকে রেল-ক্রসিং, তারপর বাজার, বাজার দিয়ে চলে গেলে স্টেশন।

রেল-ক্রসিংয়ের চালু জমিটার কাছে এসে পার্বতীর খেয়াল হল, সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে খানিকটা। উদ্যোগের কিছু নেই। বাড়িতে ঠাকুর আছে, পুরোনো কলকাতার বাড়ির ঠাকুর। আসার সময় ঠাকুর তাকে দেখেছে। পূর্ণেন্দু বাড়িতে নেই। শশধরকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি খুঁজতেই গেছে হয়ত। বাসনাকে পার্বতী দেখে নি। সে তার ঘরে রয়েছে না বেরিয়েছে পার্বতী জানে না।

রেল-ক্রসিংয়ের কাছে পার্বতী সামান্য দাঁড়াল। বাজারে আলো জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে রিকশা গেল, দু চারজন পথচারী, স্বামী স্ত্রী এবং প্রবীণা একজন রাস্তা ধরে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে, বেড়িয়ে ফিরছে হয়ত। এখন পথে বেরোলে অনেক লোক দেখা যায়, চেনাদের দল, বুড়ো বুড়ি থেকে বাচ্চা কাচ্চা সবই দেখা যায়। পথ ঘাট গুলজার করে কলকাতার সেই ছোঁড়াগুলোও ফেরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে, গান গায়। এখানে সবাই একটা মুক্ত মনের আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই আনন্দটুকুর জন্যেই আসা, নয়ত আসবে কেন, শুধু জল বাতাসের জন্যে!

পার্বতীদের মধ্যেও এটা ছিল। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত বেশ ছিল। শশধরদের পছন্দ করুক না করুক কাল পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যাতে পার্বতীরা নিজেদের এই আনন্দের অংশীদার মনে করে নি। তারপরই সব কি রকম হয়ে গেল আচমকা।

প্রায় গায়ের পাশ দিয়ে একটা সাইকেল চলে গেল। পার্বতী সরে দাঁড়াল। এখানকার সাইকেলগুলো এমন ভাবে যায় যেন ঘাড়ে এসে পড়বে। ততক্ষণে সেই স্বামী স্ত্রী ও প্রবীণা মহিলা কাছে এসে গেছে। ওদের কথাবার্তা কানে আসছিল পার্বতীর। চুরি চামারির কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। কোথায় যেন চুরি হয়ে গেছে—, পার্বতী এই রকম শুনল। প্রবীণা কি একটা কথা বললেন। পার্বতীকে একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনজনেই তাকাল, দাঁড়াবার মতন হাঁটার গতি মন্থর করল, চুপ করে গেল; তারপর আবার কথা বলতে বলতে চলে গেল।

চুরি চামারির কথায় পার্বতী অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ির কথা ভাবল। আসবার সময় সে ঘরের দরজা ভেজিয়ে এসেছে, তালা দেয় নি। পূর্ণেন্দুদের ঘরেও নিশ্চয়ই তালা দেওয়া নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পার্বতী কাছাকাছি, বাড়ির সামনে খানিক পায়চারি করবে ভেবেই বেরিয়েছিল; দরজায় তালা দেবার কথা মনে হয় নি, অথচ সে খানিকটা পথ চলে এসেছে। বাড়িতে ঠাকুর রয়েছে, বিশ্বাসী পুরোনো ঠাকুর। কিন্তু মুহূর্ত কয় আগে, পার্বতী ঠাকুরের ওপর যতটা আস্থা রাখতে পেরেছিল, এখন আর অতটা পারল না। তার মন খুঁত খুঁত করল। ঠাকুর রান্নাঘরে থাকবে, কাজে ব্যস্ত থাকবে, তার পক্ষে সামনের দিকের ঘরের ওপর নজর রাখা সম্ভব না।

খোঁড়া কিছু নেই। তবু ত্র চাওটে খুচরো ভীষণ অসুখ করে
দানা আছে, টাকা পয়সা সবই টাকে, কাপড় ছিঁড়ে যায়।
চোপড়ও রয়েছে। কেউ যদি সামনে দিয়ে ঠাকুরের অজান্তে এক সময় পার্বতী চুরিও করেছে
ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে যায় বলার কিছু নেই। সেই সময় লাভিয়ুটীন ওও হয়েছে।

পার্বতী আর দাঁড়াল না, ফিরতে লাগল চুরি চামারিতে তার অতটা ভয় নেই, কিন্তু এখন তার অন্য রকম ঘিন্ন এল। বাড়ি থেকে একটা সামান্য কিছুও যদি খোয়া যায় তবে ওরা বলবে, সে কি দরজা খুলে তুমি বাইরে বেরিয়ে গেলে? সাধারণ একটা বুদ্ধিও তো তোমার রকম বোকামি কেউ করে?

এ ভাবে চলে আসাটা বোকামি। পার্বতী এখন শচরাচর বোকামি করতে চায় না, বোকার মতন কাজকর্ম সে

পার্বতী সামান্য ভুল পায়ে হাঁটছিল। নিজের বোকামির জন্যে তার একটা স্থায়ী ক্ষোভ থেকে গেছে সেই ক্ষোভ অবশ্য প্রত্যহ তাকে পীড়া দেয় না, সেটা স্বাভাবিকও নয় কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কারণে পীড়া দেয় বই কি নিত্যদিনের সংসারে ঘোরাঘুরছে, স্বামী এবং ছেলেকে খেতে শুনতে, ছোট বোনের পাশে বসতে, এবং আরও নানা রকম চাহিদা মেটাতে মেটাতে নিজের এত সময়, মনের এতখানি চলে যায় যে নিজের কোনো ক্ষোভ নিয়ে ভাববার সময়

জোটে না। তাছাড়া, সব ক্ষতই শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, যদিও দাগ থাকে অনেক ক্ষেত্রে, এবং আজীবনেও সেটা মিলিয়ে যায় না। পার্বতী এমন বয়সে এই বোকামি করেছিল, সাধারণত যা বোকামির বয়েস নয়। তখন সে পরিপূর্ণ যুবতী নয়, অথচ তাকে নাবালিকা বা কিশোরীও বলা যায় না। এখন এলার যা বয়েস, বছর উনিশ কুড়ি, তার চেয়েও বয়েস তার বেশি ছিল। বাইশ চলছিল তখন। মুশকিল এই যে, তখন যদি পার্বতী এমন কোনো আঘাত পেত যা ভীষণ বা মারাত্মক একটা ক্ষত সৃষ্টি করার মতন, যা আরোগ্য হয় না, দিনে দিনে শোষের মতন ছড়িয়ে যায়—তবে অন্য কথা ছিল। সে রকম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেনি, আজ অন্তত পার্বতী তা বেশ বুঝতে পারে। প্রথমটায় তার লেগেছিল, কিছুদিন সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, ছটফট করেছে নিজে নিজে; তারপর যা হয়, ক্রমেই সেই জ্বালা যন্ত্রণা, ক্ষত সেরে এসেছে। পশুরা তাদের শরীরের ক্ষত জিভ দিয়ে চেটে চেটে আরোগ্য করে; মানুষ তার মনের ক্ষতও সান্ত্বনা দিয়ে আরোগ্য করে। উপায় কি! জীবন বলতে যা বোঝায় তা দু চার মাস বা দু এক বছরে নয়, তার পথ এত আঁকবাঁকা ঘিরে, এত জলের পাশ দিয়ে, বছরের পর বছর ধরে চলে যে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ বাঁচার জন্যে অনেক কিছু সামলে নেয়। পার্বতীর বেলায়ও দেখা গেল, পার্বতী সামলে ফেলেছে। বাঁচতে হবে তাকে, ছেলেমানুষি আর বোকামি করে যা ঘটিয়ে ফেলেছে তার এখন কিছু মূল্য বাস্তবিক নেই, ভবিষ্যত নষ্ট করার মতন মূর্খতা আর সে করবে না।

বাড়ির কাছাকাছি, একেবারে নিজের এলাকার মধ্যে পৌঁছে পার্বতী হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে দেখল বাসনা। একেবারে সামনে।

কেমন আলু থালু বেশভূষা বাসনার, মাথার কাঁপানো চুল ঘাড়ের কাছে দুলছে, শাড়ির আঁচল যেন মাটিতে লুটোচ্ছে। ওকে দেখলে মনে হচ্ছে, এই মাত্র বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। সারা মুখে ঘোলা ভাব। শান্ত, অলস ভাবে বাসনা সামনে পায়চারি করছিল।

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই ভাল ছিল। পার্বতী পাশ কাটাতে গিয়েও পারল না। দাঁড়াল। বলল, "তুমি?"

ভারী মোটা গলায় বাসনা বলল, "বেড়াচ্ছিলাম।"

"ও।"

"সারাদিন শুয়ে থেকে থেকে আর ভাল লাগছিল না—, তাই···"

বাসনাদি যে বাড়িতে আছে পার্বতী খেয়াল করে নি; ভেবেছিল, শশধরদের সঙ্গে বেরিয়েছে। আগ্রহ থাকলে হয়ত পার্বতী শশধরদের ঘর লক্ষ্য করত, সে আগ্রহ তার ছিল না; তা ছাড়া ধরজা ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে কেউ রয়ে থাকলে পার্বতীই বা জানবে কি করে!

পার্বতী এবার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল, বাসনা কথা বলল। "কোথায় গিয়েছিলি তুই? বেড়াতে?"

"না।"

"ওরা কোথায়?"

"রবিরা বেড়াতে গিয়েছে," পার্বতী অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে জবাব দিল। 'ওরা' বলতে বাসনা কাদের বোঝাতে চাইছিল পার্বতী ধরতে পারল না, রবিদের না শশধরদের। শশধররা যে বাড়ির খোঁজে গেছে বাসনাদি কি জানে? জানে নিশ্চয়।

বাসনা অলস ভাবে মাথা দুলিয়ে, ছোট হাই তুলে জড়ানো গলায় শব্দ করল। তারপর বলল, "এরা গেছে বাড়ির চেষ্টায়—।"

পার্বতী নিরুত্তর থাকল।

"আমি বলেছিলাম—" বাসনা বলল, "চলে যেতে। এখানে মানুষ বেড়াতে আসে? শুধু নামেই ঘাটশিলা—! যাচ্ছে তাই...!"

বাসনার কথাবার্তা পার্বতী বড় বিশ্বাস করে না। তবু সে ভাবল, চলে যেতে চেয়েছিলে যখন চলে গেলেই পারতে। যাচ্ছ না কেন?

মুহূর্ত কয় চুপচাপ থাকার পর বাসনা বলল, "এমন জানলে, আমিই কি এখানে আসি?"

পার্বতীর ভাল লাগছিল না। দাঁড়িয়ে থাকলেই কথা বলতে হবে। ভাবভঙ্গিতে সে চলে যাবার উপক্রম করছিল। বাসনাই বা কি করে এত কাণ্ডের পর কথা বলছে নির্লজ্জের মতন সে বুঝতে পারছিল না।

বাসনা এবার বলল, "অত ছটফট করছিস কেন? কিসের কাজ তোর? দাঁড়া, ক'টা কথা বলব।"

পার্বতীকে বাধ্য হয়েই যেন স্থির হতে হল। "ঘরে আমার কাজ রয়েছে।"

"তোর কোনো কাজ নেই। তুই আমার সামনে থাকতে চাস না।"

"আমার কাজ আছে....." রুক্ষ ভাবে পার্বতী বলল।

"তুই যে যথেষ্ট কাজের মেয়ে আমি জানি।...বাসনা গা করল না, বরং হঠাৎ বলল, "আমাকে তোর ঘেন্না কিসের? মদ খেয়েছিলাম বলে? কি হয়েছে মদ খেয়েছি তো! খেতে ভাল লাগে খাই, মাঝে মাঝেই খাই। কাল বেশি খেয়েছিলাম। বেশি খেলে সব জিনিসেই শরীর খারাপ হয়।" বাসনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তার কথায় কি রকম এক অসহায় ভাব রয়েছে। "তুই আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরদোর দুইয়ে ফেলবি নাকি?"

এই শেষের দিকের কথায় বিদ্রূপটা পার্বতীর ভাল লাগল না, বলল, "আগে যাও তারপর দেখব কি করি।"

বাসনা বোধ হয় এই মুহূর্তে এ-রকম কঠিন জবাব প্রত্যাশা করে নি। পার্বতীকে দেখতে দেখতে বলল, "তুই আমায় ভাবিস কি? আমরা এসেছি, না তোরা ডেকে এনেছিস? কেন এনেছিস? তোদের বুঝি গরজ নেই?... আমায় তুই খুব নোংরা মেয়েছেলে ভাবিস। তাতে আমার বয়েই গেছে। আমি বরাবরই নোংরা। তবে তুই কি এমন শুদ্ধু মেয়ে রে?"

পার্বতী পলকে চোখ তুলে বাসনার দিকে তাকাল। তার মাথা গরম হয়ে এসেছে আগে, এবার যেন কাঁজ লাগল। "তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলার সময় আমার নেই। তুমি নোংরা না পরিষ্কার আমি তা জানতে চাই নি, আমার বাড়িতে আমার সামনে এসব চলবে না।"

পার্বতী চলে যাচ্ছিল, বাসনা তীক্ষ্ণ করে বলল, "তোর বাড়িতে আমাদের যাতায়াতি ইত্তরামি না চলুক, তোর নিজের চলবে না?"

পার্বতী এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। পেছন ফিরে তাকাল। "কি বললে তুমি?"

"বলছি আমরা চলে গেলেই তুই বাঁচবি নাকি?"

"সে ভাবনা আমার।"

"শুধু তোর ভাবনা কেন, আরও কত..."

"বাসনাদি।"

"তুই আমায় ধমকাতে আসিস না। যখন নেশায় ঘরে ছিলাম তখন ধমকাতিস কিছু বলি নি। এখন আর ধমকাতে আস না।...ওই মহীপতি লোকটার জন্যে তোর এখন বড় ভয়। তুই আমাদের কেন তাড়াচ্ছিস আমি বুঝি না। তাড়াচ্ছিস নিজের গরজে। কি ভাবিস তুই?...আমাকে তুই ওই লোকটাকে চিনিয়ে দিবি? যথেষ্ট চিনি ওকে। তোর বেশি চিনি।"

পার্বতী যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

পাঁচ

"তুমি ওকে চেনো?" পার্বতী সরাসরি প্রশ্ন করল।

মহীপতি স্থির দৃষ্টিতে পার্বতীর চোখের বিহ্বলতা দেখতে দেখতে বলল, "চিনি।"

পার্বতী কিছুক্ষণ আর পলক ফেলতে পারল না। বিভ্রান্ত চোখে মহীপতির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কুকুরটা বাইরে বাগানের দিকে বাঁধা আছে, চেঁচামেচি করছে না আর। বারান্দার গা ঘেঁষে ছোট মতন একটা ঘরে মহীপতিরা রয়েছিল। জানলা খোলা, দরজাও খোলা। রোদের আলো আসছিল ঘরে, আর খানিকটা পরে রোদ এসে পড়বে জানলা দিয়ে। সন্তু আর এলা রবির সঙ্গে নদীর দিকে গেছে মাছ কিনতে। নদীর মাছ।

সকালের শুভ্রতার সঙ্গে হেমন্তের রোদ, শিশির, স্নিগ্ধ বাতাস এবং এই নির্জনতার ভাব মিশে গিয়ে মহীপতির বাড়ির চারপাশ খুব মনোরম হয়ে উঠেছিল। বনের দিকে উড়ে যাওয়া পাখিও মাঝে মাঝে ডাকছে। লতাপাতার এক গন্ধও যেন বাতাসে। ঘরের মধ্যে তোমরা ঢুকে পড়ে উড়েছিল পাক খেয়ে, আবার জানলা দিয়ে বাইরে চলে গেছে কখন।

পার্বতী কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে সামলে নিতে। বলল, "ওকে তুমি চেনো, আমায় বলো নি তো?"

মহীপতি বলল, "বলি নি, কারণ, উনি আমায় চিনতেন না। দেখেও না চেনার ভান করলেন। উনি যখন চেনাতে চান না, আমি তখন গায়ে পড়ে কেন চিনি।"

পার্বতী ভাবল সামান্য। কাল সে অনেক ভেবেছে। ভেবে ভেবে তার মনে একটা খটকা লেগেছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফেরার পর যখন বাড়ির সামনে মহীপতিকে দেখতে পেয়ে সে বাসনাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তখন বাসনাদি কি রকম এড়িয়ে যাওয়ার ভাব করেছিল। একটি দুটির বেশি কথা বলে নি। পরেও আর কথাবার্তা বলতে আসে নি। এই ব্যাপারটা যদিও পার্বতীর কাছে সামান্য দৃষ্টিকটু লেগেছিল, তবু সে বুঝে উঠতে পারে নি বাসনাদি মহীপতিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এখন অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, বাসনাদি ইচ্ছে করেই মেলামেশা বা আলাপে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু মহীপতি? মহীপতি তাকে বলে নি কেন কিছু?

পার্বতী বলল, "উনি চেনাতে চাইলেন না, আর তুমিও চিনলে না। বাঃ, বেশ তো!"

মহীপতি তখনও পার্বতীর মুখ দেখছে। অল্প হেসে বলল, "আমি চিনব না কেন, চিনেছিলাম। তোমায় বলি নি।"

"কেন?"

"বলেই বা কি হত!"

"ও তাহলে ঠিকই বলেছে, তোমায় চেনে?"

"চেনে বই কি।"

"কি করে চিনল?" পার্বতী জেরা করার মতন শুধলো এবার।

মহীপতি কোনো জবাব দিল না। মনে মনে সে ভাবছিল, মুখে হালকা হাসি, যেন কথাটার গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

পার্বতী জবাবের আশায় মহীপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলছে না মহীপতি। এমন ভাবে হাসি মুখ করে আছে যেন কথাটা কিছুই নয়। ধৈর্য থাকছিল না পার্বতীর। বিরক্ত হয়ে বলল, "কি হল, কথা বলছ না যে?"

মহীপতি মুচকি হাসল। "চেনা শোনা হতে বাধাটা কোথায়?"

"বাধা থাক না থাক, তোমার সঙ্গে চেনা হল কি করে?"

"তোমার কি খুব জানার ইচ্ছে?"

"আমি কি সাত সকালে তোমার সঙ্গে তামাশা করতে এসেছি ভাবছ?"

"না না, তামাশা করতে আসবে কেন—" মহীপতি হেসে বলল, "তোমার আসার কথা ছিল, বলেছিলে আসবে। বেড়াতেও আসতে পার।...যাকগে, তোমার দিদির সঙ্গে আমার কি করে চেনা শোনা হল এটা তুমি জানতে চাও। ব্যাপারটা কি খুবই জরুরী?"

"হ্যাঁ," পার্বতী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

"ওঁকে আমি নানা ভাবে চিনি। সেদিন তোমাদের মধ্যে ওঁকে দেখে আমি অবাকই হয়েছিলাম। তখন কিছু বলি নি। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখাও হয় নি। দেখা সাক্ষাত হলে হয়ত বলতাম।"

"নানা ভাবে চিনি মানে?" পার্বতীর কোথাও খটকা লেগেছিল।

মহীপতি বলল, "একভাবে চিনি প্রতিবেশী হিসেবে। এক সময় উনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন।"

"কখন?"

"আমি তখন ল্যান্সডাউনে থাকতাম।"

"ও!...আর কি ভাবে চেনো?"

"চিনি। কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমি তো ওঁকে বিলক্ষণ চেনো, তোমার আত্মীয়।"

পার্বতী এবার যেন নিজের কোথাও খানিকটা দ্বিধা অনুভব করল। মহীপতির কাছে তার এভাবে ছুটে আসার

একটা অর্থ নিশ্চয় ধরা পড়ে যাচ্ছে। মহীপতি যত ভাবেই চিনুক সেই চেনার কিছু কি পার্বতী বুঝতে পারছে না! তবু কৌতূহল হয়। কৌতূহলেরও যা বেশি, যার জন্যে পার্বতী এই সকালে মহীপতির বাড়িতে হাজির হয়েছে তা অন্য কিছু। ভয় কি? পার্বতী ভয় পাচ্ছে?

নিজের মনের উতলা ভাব পার্বতী চাপা দিয়ে রাখল। বলল, "আমার সম্পর্কে দিদি হয়, কিন্তু আগে আসা যাওয়া ছিল না, ওই কখনো সখনো কোনো পারিবারিক কাজে যদি হঠাৎ দেখা হয়েছে। আমি ভাল করে চিনতামই না। বাবা মা যতদিন ছিলেন এক আধবার দেখেছি। তারপর কোনো সম্পর্কই ছিল না। এই হালে আবার আমার কর্তার সঙ্গে ওদের ভাবসাব।"

মহীপতি খানিকটা বুঝল, ঠাট্টা করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছে।"

পার্বতী মাথা নাড়ল। "না। আমার সঙ্গে নয়।"

মহীপতি অনেকক্ষণ থেকেই নানা রকম সন্দেহ ও অনুমান করছিল, এবার বলল, "ওকে নিয়ে তোমার রাতারাতি দুর্ভাবনা শুরু হয়ে গেল কেন?"

পার্বতী সরাসরি এই প্রশ্নটা পছন্দ করল না। অথচ সে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এড়িয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। তার ব্যবহার থেকে মহীপতি কিছু কি আঁচ করতে না পারছে? সাদামাটা জবাব দিয়ে মহীপতির কৌতূহল ঠেকানো যেতে পারে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তাছাড়া, পার্বতী বাসনার ওপর এখন শুধু বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ নয়, কোথায় যেন তীব্র এক ঘৃণা অনুভব করছে।

পার্বতী বলল, "ওদের কাণ্ডকারখানা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।" বলে সামান্য চুপ করে থেকে পার্বতী সেদিনের রাত্রের ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করল, তারপর গতকালের কথা।

মহীপতি সব শুনল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে কতটা অবাক হয়েছে। হয়ত অনেক কিছু তাকে অবাক করলেও সবটাই অবাক হবার মতন নয়। চুপচাপ সমস্ত শুনে মহীপতি খানিকটা সময় নীরব থাকল, তারপর বলল, "ব্যাপারটা খুবই খারাপ, তোমায় বড় মুশকিলে ফেলেছে দেখছি।"

"আমি ওদের অন্য জায়গা খুঁজে নিতে বলেছি," পার্বতী রাগের সঙ্গে বলল।

"ভালই বলেছ। তবে—"

"তবে টবে নয়, ও রকম নোংরামি আমার বাড়িতে হতে দেব না। বোঝো তো, এরা কি ভাবল? সব জেনে থাকলে আরও যে কি চক্ষু আমি ভেবে পাই না।"

মহীপতি মাথা নাড়ল আস্তে, "ঠিকই।"

পার্বতী অল্পক্ষণ আর কথা বলল না, শেষে শুধলো, "তুমি বললে ওকে তুমি নানাভাবে চেনো। এক পাড়ায় থাকতে শুনলাম, আর কি ভাবে চেনো?"

এবার মহীপতি কথাটা এড়িয়ে যাবার মতন করে মৃদু হাসল। "সে-সব শুনে তোমার লাভ নেই। কি হবে! আজ যা দেখছ ওকে, এরই নানারকম লক্ষণ দেখেছি।"

পার্বতী এ-রকম জবাবে খুশী নয়, অপ্রসন্ন ভাবে বলল, "বলতে তোমার আপত্তি কি?"

"না আপত্তির কিছু নেই, তবে অকারণে বলা। তোমারই বা শুনে কি হবে।"

পার্বতী ভাবল সামান্য, বলল, "তোমার সঙ্গে খুব মেলামেশি করেছিল নাকি?"

মহীপতি হেসে জবাব দিল, "খুব নয়, কিছুটা।"

"ও!" পার্বতী অন্যমনস্ক হল। দেখতে দেখতে জানলা দিয়ে রোদ ঘরে ঢুকলো। পেছনের দিকে কুয়াতলায় জল তুলছিল কেউ, শব্দ আসছে চাকার।

কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে পার্বতী হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে সোজা হয়ে বলল। "এবার উঠি। ওরা যে কোথায় মাছ কিনতে গেল, কে জানে।"

মহীপতি বলল, "এখুনি উঠবে কি, বসো চা-টা খাও। ওরা আসুক।" বলে মহীপতি যেন চায়ের তাগাদা দিতেই উঠছিল। তার আগেই পার্বতী উঠে দাঁড়াল।

"চলো তোমার ঘর দোর দেখি—" পার্বতী বলল।

"এসো।"

পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল মহীপতি। ছোট খাট বাড়ি, খোলামেলা ঘর, ভেতরের টানা বারান্দার নীচে বাঁধানো উঠোন, ওপাশে কুয়াতলা, কুয়াতলার গায়ে সবজি বাগান, মাঝ বয়সী এক মালী কাজ করছিল, সামনে তাকালে পাঁচিল, পাঁচিলের ওপারে ঝোপঝাড় আর ঢালু জমি ঢেউ খেলিয়ে ছুটে গেছে, অনেকটা দূরে মাঠের আলের মতন এক উঁচু বাঁধিয়াড়ি পুব পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে, সবুজ দেখায়, ওপারে নদী, নদী দেখা যায় না, নদীর ওপারে বনজঙ্গলের কাপসা ছবি আর রোদভরা আকাশ।

দেখতে দেখতে পার্বতী বলল, "বাঃ, বেশ জায়গাটি তোমার।"

"শীতে আরও সুন্দর লাগে।"

"এখনও বেশ, চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায়।"

পার্বতী সামনের দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে গেল।

আরও একটা ঘর। ঘরের আধ ভেজানো দরজা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল।

পার্বতী অবাক হয়ে বলল, "এই ঘরটা— ?"

মহীপতি বলল, "ওটা যার, সে বোধ হয় দরজা ফাঁক করে তোমায় দেখছিল, সাড়া পেয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে।"

"কে ও ?"

"দেখবে ?" মহীপতি দরজার কাছে এসে ডাকল, "রমা, বাইরে এস।"

ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। দরজা বন্ধ। পার্বতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

আরও দু একবার ডাকল মহীপতি। শেষে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। মহীপতি ভেতরে ঢুকে গেল।

মুহূর্ত কয় পরে হাত ধরে টেনে যাকে নিয়ে এল মহীপতি পার্বতী তার দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক হল। মাথায় লম্বা একটি মেয়ে, না শীর্ণ না ক্ষীণ, ছিপছিপ করছে চেহারা, গায়ের রঙ পাকা ধানের মতন, মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা চুলের গোছা, কাজল লতার মত টানা টানা চোখ, দীর্ঘ নাক, আঁটো থুতনি, চিবুক লম্বা। সস্তা একটা ডুরে শাড়ি পরনে, পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড়। গায়ের জামাটা ছিটের। দু হাতে দুটি কলির মতন বালা।

রমা তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। মহীপতি ছাড়ছিল না।

পার্বতী কোনো রকমে যেন ঢোঁক গিলল।

মহীপতি পার্বতীকে বলল, "তোমায় দেখে লজ্জা পেয়েছে। ওর খুব লজ্জা। ভাল কথা বলতে পারে না। কিসের একটা গোলমাল আছে।"

আচমকাই রমা কি ভাবে যেন হাত ছাড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে পালাল। পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

মহীপতি যেন কৌতুক অনুভব করে হাসতে লাগল।

ঘরে এল পার্বতী। মহীপতির শোবার ঘর। বিছানাটা দেখল। বলল, "ও তোমার বউ ?"

"না।"

"তবে ?"

"আমার কাছেই থাকে—"

"দেখছি তা। কিন্তু ও কে ?"

"যে যে বলা মুশকিল ; যা ভাব –। সঙ্গিনী।"

পার্বতী মহীপতির হালকা মুখভাব লক্ষ্য করছিল, যেন ওই মেয়েটি থাকায় মহীপতির কোনো চিন্তা নেই। পার্বতী কি ভেবে বলল, "ওর বয়েস তো বেশি নয় ?"

"না, বেশি কোথায় ? বছর কুড়ি টুড়ি হবে।"

"এই ভাবে তোমার কাছে রেখেছ ? কেউ নেই ওর ?"

"না কেউ নেই। ওর বাবা আমার জিম্মায় রেখে স্বর্গে চলে গেছে। সে আজ বছর সাত আট হবে। তখন ও ভীষণ দুরন্ত ছিল। এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে।"

পার্বতী শোবার ঘর থেকে বাইরে সারান্দায় এল। সামনে বাগান, কটক বন্ধ, কুকুরটা বোধ হয় আলসে গাছতলায় বাঁধা অবস্থায় ঘুমোচ্ছে।

"বসো," মহীপতি একটা বসার জায়গা এগিয়ে দিল।

পার্বতী বসল। বলল, "তুমি সেদিন আমায় কিছু বললে না তো ?"

মহীপতি এবার হেসে ফেলল, বলল, "আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশি বলার কি আছে। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, বিয়ে থা সংসার করছি কি না। বলেছিলাম, সংসার করছি, বিয়ে করেছি কি না বাড়ি এসে দেখে যেও।"

পার্বতী যেন কি রকম এক বিভ্রান্ত বোধ করছিল। বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে উদাস গলায় বলল, "বাড়ি এসেও কিছু বুঝলাম না।"

"কেন, সংসার করছি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বিয়েটাও আধাআধি।"

পার্বতী হঠাৎ মুখ তুলে বলল, "তুমি চিরটাকালই আধাআধি বিয়ে করার মানুষ।"

মহীপতি এবার আর জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ কি রকম চুপচাপ। বাগানে কাঠ বেড়ালি ছুটছে, একটা দমকা হাওয়া এসেছে, জবা ফুলের গাছ টকটকে লাল তার মাথায় উজ্জ্বল রোদ।

কটকের ওদিকে খানিকটা তফাতে রবিদের দেখা গেল। রবিরা আসছে।

মহীপতি দেখতে পেল ওদের। "ওই যে, ওরা আসছে। মাছ পেয়েছে যেন।"

পার্বতী তাকিয়ে থাকল।

"এবার চা আনতে বলি" মহীপতি চলে যাচ্ছিল।

পার্বতী সহসা বলল, "একটা কথা বলছিলাম।"

দাঁড়াল মহীপতি।

পার্বতী অস্বস্তির মধ্যে বলল, "আমরা যে একবার লুকিয়ে বিয়ে করেছিলাম, এটা কি ও জানে ?"

কে, তোমার দিদি ?"

পার্বতী মাথা দোলাল, হ্যাঁ, বাসনা জানে কি না।

মহীপতি বলল, "আমার তরফে যে সাক্ষী ছিল সে তোমার দিদির খুব চেনা জানা। তার বেশি আমি জানি না।"

ছয়

একেকটা দিন কাটল। শশধরেরা গিয়েছে টাটানগর। সামাজ খোঁজখুঁজি করে শশধরদের জন্যে একটা বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল, এ বাড়ির কাছাকাছিই কল, খাবার পানীয় পাঠানো ও অন্যান্য প্রয়োজনে আসা যাওয়া করতে অসুবিধে হত না, তবু শেষ পর্যন্ত ওরা টাটানগরেই চলে গেল। বেড়িয়ে আসার নাম করেই ঘড়িও গিয়েছে, তবু দিন কয়েক থাকবে, পরপর এখানে ফিরে এসে সে যা কলকাতা। টাটানগরে যাবার ঝোঁকটা বাসনার। সেখানে তার জানা শোনা লোক আছে। তা ছাড়া হোটেল টোটেলও রয়েছে।

ব্যবস্থাটা মোটামুটি সকলেরই মনোমত হয়েছে বলা যায়। একসঙ্গে এসে তাড়াতাড়ি হয়ে ছ

বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ার চেয়ে এ ভাল, অন্তত মনে হয়, দু তরফের বিরোধ ও মনান্তরটা বাস্তবিক কিছু নয়। কিন্তু তার যাওয়া হয় নি, পার্বতীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটত কি ঘটত না সেটা অন্য প্রশ্ন,

শশধরই রাজী হয় নি। খুবই আশ্চর্য, টাটানগর যাবার সময় শশধর পার্বতীর সঙ্গে এমন সাধাসিধে মনখোলা ব্যবহার করল যে মনে হল, পার্বতীর ওপর তার কোনো বিদ্বেষ বা রাগ নেই, সে ক্ষুব্ধ নয়, বরং যা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না এ বাড়িতে। শশধর খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছিল।

শশধররা বেড়াতে যাবার মতন করেই গেল, জিনিস পত্র ফেলে গেল কিছু, যেন টাটানগরে দু চারদিন কাটিয়ে চলে আসছে, তারপর সোজা কলকাতা ফিরবে। ওরা চলে যাওয়ায় বাড়িটা সামান্য ফাঁকা হল। বাসনার গলা ছিল জোরালো, উঠতে বসতে ডাকাডাকি করত; শশধরের ছিল মজলিসী স্বভাব, কদিনের মধ্যে এই বাড়িতে যে সরগরম ভাব হয়েছিল, ওদের অবর্তমানে তা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এখন নিরিবিলি ভাবটা আরও অনুভব করা যায়; রাত্রের দিকে তাস বসে না, ফলে খুব শান্ত হয়ে যায় বাড়িটা। পূর্ণেন্দুরা আগের মতনই সকাল বিকেল বাজার হাট ক'রে, বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে বটে তবে সময় ফুরোতে পারছে না। গল্পের বই পড়ে, কাগজ দেখে, পেসেন্স খেলে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলে কত আর সময় খরচ করা যায়। ক্রমশই একটা বিমুনি আসছিল বাড়িতে।

পার্বতী আর পূর্ণেন্দুর মধ্যে খুব চাপা একটা ক্ষোভ-বিক্ষোভ যে জমে উঠেছে এটা এখন মাঝে মাঝে বোঝা যায়। পার্বতী যে ভেঙে পড়ে, পূর্ণেন্দু তা বাড়াবাড়ি মনে করে, পূর্ণেন্দু যে কারণে বিক্ষুব্ধ পার্বতী তা অন্যায় মনে করে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই মানসিক ক্ষোভ-বিক্ষোভের অবশ্য গুরুতর কোনো কারণ ছিল না, সময়ে মিটে যেতে পারত। কিন্তু পার্বতীর তরফে অন্য রকম এক পরিবর্তন এসেছিল। সেটা বোঝা যেত, এবং কারণটা যা অনুমান করা যেত—শশধর-বাসনার প্রতি বিরক্তি, স্বামীর প্রতি ক্ষোভ—তা নয়। পার্বতী অন্য চিন্তার ব্যাধিতে জড়িয়ে পড়ছিল।

পার্বতীর চরিত্র কিছুটা অদ্ভুত। তার একটা চেহারা ছিল যা বাইরের, তাকালেই চোখে পড়ে। ওর সহাস্য, সুন্দর ব্যবহার, পরিহাস-প্রিয়তা, মমতা, স্বাস্থ্যরিকতা—এ-সব চোখে না পড়ে যেত না। অন্তত এ-যাবৎ যারা তার কাছাকাছি এসেছে বা আশেপাশে থেকেছে তারা পার্বতীর বাইরের চেহারাটাকেই সাধারণত দেখেছে এবং আকর্ষণ বোধ করেছে। এর ভেতরের স্বভাব কেমন, তা জানার সুযোগ বড় কারও হয় নি। অনেক সময়ে পার্বতী যে রূঢ়তা, কাঠিন্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করত, সেটা তার চরিত্রের অংশ বলে ঘনিষ্ঠরা জানলেও এসব তার সাংসারিক স্বভাব, হাসভারী ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিয়েছিল। পার্বতীর আরও ভেতরের একটা স্বভাব ছিল, বাইরে একে বারে তলার আড়াল করে রাখা নিজস্ব কিছু জিনিসের মতন। এখানে পার্বতীর হিংসেবীপনা ছিল, উগ্র দ্বেষ ছিল, এক ধরনের বেপোরোয়াপনা ছিল। ক্ষোভ তিক্ততা নিষ্ঠুরতাও থেকে গিয়েছিল। সে যে কী পরিমাণ সর্বগ্রাসী অধিকার-বোধে আচ্ছন্ন ছিল পার্বতী নিজেও জানত না, তার হিংস্রতার কথাও অনুভব করত না।

ঘাটশিলায় এসে মহীপতির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর পার্বতী বিচলিত হয় নি। বরং এতকাল পরে মহীপতিকে কাছাকাছি পেয়ে সে তার পুরোনো কিছু ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আচরণ থেকে এটা বোঝা যেত না, কারণ ঘটনাটা অনেক পুরোনো। ঘায়ের ওপর চামড়া পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতন ক্ষত লুকোনো, প্রায়-বিস্মৃত এই ক্ষত নিয়ে ছটফট করে বেড়াবে এমন স্বভাব তার নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। কাজে কাজেই পার্বতী রুক্ষ, উগ্র হিংস্রে হয় নি। সে কখনো সখনো মহীপতিকে বিদ্রূপ করেছে, পরিহাস করেছে আঘাত করেছে সূক্ষ্ম ভাবে। অর্থাৎ এ যেন অনেকটা শুকনো ক্ষতের ওপর চামড়া টেনে তুলে আরাম পাওয়ার মতন। পার্বতী সেটুকু আরাম হয়ত পাচ্ছিল।

অথচ শশধর-বাসনার ঘটনার পর পার্বতী কি রকম

সচেতন হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার স্বভাবের খানিকটা পালটে গেল, অন্তত চোখে পড়তে লাগল। তার বরাবরের হাসি খুশি, সদালাপী, পরিহাস-প্রিয়তা মরুর কেমন চাপা পড়ে গম্ভীর, বিরক্ত, অখুশী, রুক্ষ ভাবটা যখন তখন ফুটতে লাগল। পূর্ণেন্দু বা ঋষি এটা শ্বশুর-বাসনার ঘটনার জের হিসাবে ধরে নিয়েছিল। পূর্ণেন্দু আরও ভেবেছিল, তার সঙ্গে পার্বতীর চাপা মনোমালিন্য ও ক্ষোভ-বিক্ষোভের জন্যে স্ত্রী অত গম্ভীর, উদাসীন, বিরক্ত। অথচ তা ঠিক নয়।

পার্বতীর মনে অন্য ভাবনা তত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। সে খানিকটা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তার এখন সন্দেহ ও ভয় জাগছিল। অসহায় বোধ করতে শুরু করেছিল। এবং আরও কোনো কোনো ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিল।

সেদিন বিকেলে সামান্য ঘটনা নিয়ে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে গেল পার্বতীর।

পূর্ণেন্দু বলল, "আমি বরাবর দেখেছি, তোমার মন ভুগিয়ে চলাটাই তুমি বড় মনে করো।"

জবাবে পার্বতী বলল, "আর আমি বুঝি তোমাদের মন ভাঙিয়ে চলি।"

"আশ্চর্য স্বভাব তোমার—!" পূর্ণেন্দু রাগ করে বলল," এটা কি রকম রীতি, সংসারে সবাই তোমার হুকুমের চাকর হবে।"

পার্বতীও মাথা গরম করে বলল, "আমাকেই বা তোমার চাকরানী হতে হবে নাকি।"

"তোমায় আমি চাকরানী করে রাখি নি।"

"না রাজরানী করে রেখেছ।"

"তোমার হয়ত সে-রকম সখ ছিল; বিয়ের সময় রাজাটাজা খুঁজে নিলেই পারতে। আমার যে রাজত্ব নেই এটা ভাল করেই জানতে তুমি।"

"তোমার কিছুই নেই, রাজত্ব চুলোয় যাক, বাপের দৌলতে পাওয়া বাড়িটাও কি আছে তোমার আর! মর্টগেজ রেখে বসে আছ।"

পূর্ণেন্দু আত্মসংযম হারাল। "বেশ করেছি, আমার বাড়ি আমি যা খুশি করব।"

"করছই তো, আমার করব কি! তুমি কি ভাব, তোমার বাড়ির জন্যে আমি মরে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যা হলেও আমার দিন কেটে যাবে।"

'তা যাবে, কিন্তু যতদিন না যাচ্ছে ততদিন মেজাজ করো না।" পূর্ণেন্দু ঘর ছেড়ে চলে গেল। পার্বতী অপমানের জ্বালা বুকে দাঁড়িয়ে থাকল।

অথচ ব্যাপারটা কত তুচ্ছ, সামান্যমাত্র। পূর্ণেন্দু এসে বলেছিল, দারা দুপুর ছেলেটাকে মাঠে চড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে শুয়ে শুয়ে আরাম করছ। যাও দেখো না—হাঁটু ছড়ে পা কেটে বসে আছে। তোমার বোনও তো 'ন্যাওটা' মুখে বলে। ওয়ার্থলেস সব।

অন্য সময় হলে পার্বতী সন্তুকে মাঠে চরার স্বাধীনতা দিত না বা সন্তু কোনো ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে হাঁটু ছড়িয়ে পা কেটে এলে পূর্ণেন্দুকে অত কথা বলার সুযোগই দিত না, এলাও নবেল মুখে বসে থাকার অবাধ অবকাশ পেত না; কিন্তু এখন পার্বতী কেমন যেন হয়ে গেছে, সব রাগ ছেড়ে দিয়েছে, উদাসীন হয়ে পড়েছে, গরজ নেই গা নেই; যে যা করছে করুক, যার যা খুশি করে নিক। এই নিস্পৃহতা তাকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করে ফেলছিল।

পার্বতী অনায়াসে উঠে সন্তুকে দেখতে যেতে পারত। সেটাই তার রীতি। ছেলেকে বকত হাঁটু-পায়ের যত্ন করতে বলত, পূর্ণেন্দুকে দু'কথা শুনিয়ে দিত, এলাকে তিরস্কার করত। এখন পার্বতী কিছু করল না, কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না, বরং স্বামীকে বলল, ছেলে তোমার, তুমি তার খবরদারি করগে যাও আমি শুয়ে ঘুমিয়েই থাকব।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কলহটা বেধেছিল; তারপর কথায় কথায় অনেকখানি গড়িয়ে গিয়ে 'রাজরানী' ঠেকেছিল। আজকাল মাঝে মধ্যেই এ-রকম ঝগড়া বাধছে স্বামীস্ত্রীতে।

ঘটনাটা ঘটেছিল বিকেলের গোড়ায়, তারপর বাড়ির মধ্যে কেমন একটা ছাড়া ছাড়া থমথমে ভাব এল, পূর্ণেন্দু রাগ করে একা একাই কোথায় বেরিয়ে গেছে,

রবি গিয়েছে তার সদ্যপরিচিত একজনের বাড়ি বেড়াতে, সন্ধ্যে শেষ পর্যন্ত মার কাছে চড় চাটি খেয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে বসে আছে, পায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এলাকে তার কাছে বসে লুডো খেলতে হচ্ছে।

পার্বতী কি মনে করে শশধরদের ঘরে গিয়ে বসেছিল। শশধরদের ঘর প্রায় ফাঁকা। ফেলে যাওয়া একটা ট্রাংক, বেতের ঝুড়ি, খুচরো ক'টা জিনিস ছাড়া কিছু নেই। চওড়া একটা তক্তপোশের ওপর সতরঞ্চি বিছানো ছিল। এটা অবশ্য শশধরদের নয়, পার্বতীদের, রবি পেতে রেখেছিল, খেলেন খেলত সময় বিশেষ। নিরিবিলি একা থাকার জন্যেই হয়ত পার্বতী এই ঘরে এসে বসেছিল।

তার খেয়াল ছিল না, মহীপতি এসেছে কখন, বাইরে এসে ডাকছিল।

এলা এসে বলল, "দিদি, মহীপতিদা এসেছে।"

পার্বতীর খেয়াল হল, বোনের দিকে তাকাল।

এলা বলল, "এখানে নিয়ে আসব?"

পার্বতী কিছু না ভেবেই বলল, "আয় নিয়ে।"

মহীপতি এল। এলার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এসেছিল, ওরা কোন পাহাড়ে বেড়াতে যাবে, কারা দেখবে—যাওয়াগিরি না কোথায়—তার জন্যে গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা করতে বলেছিল মহীপতিকে, মহীপতি সেই ব্যবস্থা করে এসেছে। পরশুদিন যাওয়া হবে।

এলা চলে গেলে মহীপতি পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার, তুমি একলা এখানে বসে তোমার বাড়ির লোকজন কই?"

শশধররা চলে গেছে মহীপতি জানত, পার্বতী বলল, "গেছে কোথাও ঘুরতে।" "তুমি একলা?"

"এলা সঙ্গে রয়েছে।...বসো।"

মহীপতি তক্তপোশের একপাশে বসল। পার্বতীর চোখমুখ গম্ভীর, অন্যমনস্ক, বিমর্ষ ও মলিন দেখাচ্ছিল। মহীপতি সরল ভাবে বলল, "তোমার এ-রকম চেহারা কেন?"

পার্বতী জবাব দিল না। চাপা নিশ্বাস ফেলল।

ঘরে আলো জ্বলছিল, বাতিটা তেমন উজ্জ্বল নয়।

মহীপতি বসে থেকে একটা সিগারেট ধরাল। "পরশু তোমাদের যাওয়াগিরি যাবার ব্যবস্থা করলাম। যাও বেড়িয়ে এস। চমৎকার জায়গা। তবে শুনছি এখন নাকি একটু ভয় আছে। সঙ্গে ভাল লোক দিয়ে দেব, তেমন বুঝলে বেড়াতে যেতে দেবে না।"

পার্বতী উদাস ভাবে বলল, "ওরা যাক, আমি যাব না।"

"যাবে না। কেন?"

"ভাল লাগে না।"

মহীপতি লক্ষ্য করে পার্বতীর চোখের নিস্পৃহ উদাসীন ভাবটা দেখল। ক'দিন ধরেই মহীপতি এটা লক্ষ্য করছে। প্রথম দিনের সেই সজীব, সপ্রতিভ, সানন্দ ভাবটা যেন পার্বতীর হঠাৎ কেমন মরে গেছে।

মহীপতি চুপচাপ সিগারেট খেতে লাগল। শেষে বলল, "তোমার কি যেন একটা হয়েছে। কি?"

পার্বতী মহীপতির দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। সামান্য পরে বলল, "কিছু না। সংসারের চক্কর দেখছি...।"

"কি চক্কর দেখছ?" মহীপতি ঠাট্টা করে বলল, হেসে। পার্বতী কথার কোনো জবাব দিল না। আপন মনে কিছু ভাবছিল। খানিক পরে বলল, "সবাই নিজের স্বার্থটি বোঝে।"

"তুমি বোঝ না?"

"বুঝতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কপাল মন্দ সইল না।"

মহীপতি পার্বতীর হতাশ, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ভাবটা অনুভব করতে পারছিল। পার্বতীর এই মনোভাব লাঘব করার জন্যে ঠাট্টা করে বলল, "তোমার কপাল দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।" বলার সময় সে পরিহাস ভরে চোখ কুঁচকে পার্বতীর কপাল দেখছিল।

পার্বতী বলল, "কি মনে হচ্ছে তবে?

"বেশ ভাল। স্বামী পুত্র সংসার নিয়ে দিব্যি সুখী।"

পার্বতী চোখ চেয়ে চেয়ে মহীপতির এই হালকা ভাবটা

দেখল। কেন যেন তার রাগ হচ্ছিল। লোকটা নিতান্ত বেহায়া, নির্লজ্জ। পার্বতী বলল, "তোমার মতন লোকা সুখ সকলে রাখতে পারে না।"

মহীপতি কথাটা ঠিক বুঝল না, প্রশ্নও করল না। মুখ ভর্তি করে ধোঁয়া নিয়ে ঢোঁক গিলল, গলা পরিষ্কার হলে বলল, "তুমি কি সত্যিই অসুখী?"

"না, সুখের মধ্যে ডুবে বসে আছি," পার্বতী এবার বিদ্রূপ করে বলল, "দেখতে পাচ্ছ না?"

"সুখের মধ্যে গলা ডুবিয়ে কে আর বসে থাকে, ভগবানও নয়।"

পার্বতী অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। মহীপতির ওপর তার রাগ হচ্ছিল, কিসের এক আক্রোশ হচ্ছে আজ ক'দিন ধরেই। এই মানুষটাই তার শনি। জীবনের প্রথমেই কুগ্রহের মতন হাজির হয়েছিল, সেই গ্রহ যাও বা কাটল, আজ এতকাল পরে আবার এসেছে। মন তিক্ত হয়ে উঠছিল পার্বতীর। বলল, "তোমার কখনও কোন অনুশোচনা হয় নি, না?"

মহীপতি সামান্য নীরব, তারপর হালকা করেই বলল, "হয়েছে হয়ত।"

"হয়ত!"

"আমার কথা থাক। তোমার কথাই বলো।... আমাকে নিয়ে তোমার যেটুকু ছিল তার অনেক বেশি এদের নিয়ে। এরা তোমার অশান্তির কারণ হয়ে উঠল কেন হঠাৎ?"

পার্বতী দেখল, মহীপতি তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। শান্ত ভাবে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তেমন শুনে বুঝেও যে কেউ এভাবে অন্যের জ্ঞান করে তাকাতে পারে পার্বতী ভাবতে পারল না। বিরক্ত হচ্ছিল পার্বতী। বলল, "তুমি জান না?"

"তুমিই বলো।"

পার্বতীর ইচ্ছে হল, বলে সব অশান্তির মূলে তুমি, তুমি আমার জীবনের শনি। এখনই গ্রহ তুমি, তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। কথাটা পার্বতী বলতে পারল না, বলতে বিশ্রী লাগছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝিয়েটার করায় তার রুচি নেই।

মহীপতি অপেক্ষা করছিল। পার্বতীর ক্রোধ ও ঘৃণা সে লক্ষ্য করছিল, ঠিক কতটা তার বিচলিত ভাব তার এবং নৈরাশ্য অনুভব করতে পারছিল।

পার্বতী বলল, "আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি। কেন যে তোমায় খুঁজে খুঁজে বের করতে গেলুম! ছি ছি!"

মহীপতি পার্বতীর আক্ষেপ দেখতে দেখতে বলল, "তুমি বোধ হয় তোমার ভিত দেখাতে গিয়েছিলে।"

"ভিত!"

"ওই রকম কিছু।...আমার যা মনে হয়েছে বললাম; অন্য কিছুও হতে পারে।...কিন্তু দেখো, যে জন্যে বলছিলাম, তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ, তুমি যা ভাবছ তেমন নাও হতে পারে।"

"নাও হতে পারে! পার্বতী অবিশ্বাসের মতন করে বলল। তারপর হঠাৎ শুধলো, "আমি কি ভাবছি তুমি তো জান? যদি তাই হয়, আমি যা ভাবছি তাহলে কি হবে?"

মহীপতি ভাবল সামান্য, বলল, "এখন থাক, পরে একদিন বলব তোমায়।"

"পরে?"

"আজ আমার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, ফিরব।"

পার্বতী প্রথমে কিছু বলল না, পরে খেয়াল হলে বলল, "চা খেয়ে যাও।"

"না, আজ থাক তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া?"

"রমার," মহীপতি হেসে বলল, বলে উঠে দাঁড়াল।

পার্বতী স্থির চোখে মহীপতিকে দেখতে দেখতে বলল, "ওই মেয়েটার তুমি খুব বাধ্য বুঝি?"

"বাধ্যটা—" মহীপতি হাই তুলল, "ও নিজে বড় অবাধ্য, আমায় মাঝেমাঝে বাধ্য হতে হয়।"

পার্বতীও উঠল, উঠে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মহীপতিকে।

মহীপতি চলে যাবার পর পার্বতী কিছুক্ষণ বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনের মাঠ ঘাসে হিম পড়তে শুরু করেছে। এখন খানিকটা ঠাণ্ডা অনুভব করা যায়। হেমন্তের আকাশ তারায় ভরা, অন্ধকার বেশ ঘন। সামনে গাছপালা কালো ছায়ার মতন জমে আছে। এলা গান গাইছিল আপন মনে, সন্ত বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা গান শুনছে। পূর্ণেন্দু কোথায় গেছে কে জানে! রবি আরও পরে ফিরবে, বেচারী অনেক আশা নিয়ে এসেছিল, হইহুল্লোড় করে ছুটি কাটাবে, ঘুরবে বেড়াবে, এলার সঙ্গে খুনসুটি করবে, আড়ালে চুনো ফুল গুঁজে দেবে চুলে, নিভৃতে বসে গল্প-টল্প করবে অন্য রকম—, তা প্রথম প্রথম তার এসব সাধ কিছু কিছু পূরলেও এখন বাড়ির যা অবস্থা তাতে তাকে অনেক আশাই ছাড়তে হয়েছে। বেচারী! বেশ ঝিমিয়ে পড়েছে রবি। এলাও যেন চারপাশের আব-হাওয়ায় কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তার ঘাটশিলা আর ভাল লাগছে না। রবিকে বলছিল সেদিন, এর চেয়ে বাবা আমার হোটেলই ভাল। কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি।

পার্বতী বারান্দায় আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকল, শিউলীফুলের গন্ধ আসছে বাতাসে, কোথায় যেন কুকুর কাঁদছে।

পার্বতী বারান্দা ছেড়ে শশধরদের ঘরে বাতি নিবোতে গেল। বাতি নেবাবার পর হঠাৎ তার চোখের ওপর অন্ধকার যেন থাবা মেরে তাকে অন্ধ করে দিল। স্তব্ধ, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পার্বতী। অনেকক্ষণ পর তার বিমূঢ় ভাবটা কাটল। চোখ ততক্ষণ অন্ধকার খানিকটা সয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তক্তা-পোষের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে শক্ত ভাবটা অনুভব করল, তারপর বসলো।

জানলা খোলা। জানলার ওপাশে আতা গাছের ঝোপ একটা জন্তুর মতন দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতী চেষ্টা করল ওপর দিকে তাকাতে, আতা ঝোপের ওপর দিয়ে বাইরে তাকাতে। আতা ঝোপের পর পাঁচিল, তারওপারে-মহলার কালো হয়ে আছে, অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

এখানে বসতে ভাল লাগছিল না পার্বতীর, উঠতেও ইচ্ছে করছিল না। কয়েকবারই তার বড় বড় নিশ্বাস পড়ল, তারপর বুক নিঃশেষ করে দীর্ঘশ্বাস। বসেই থাকল পার্বতী অন্ধকারে।

মহীপতিকে তার আবার মনে পড়ল। এই মানুষটা তাকে সত্যিই শনির মতন ধরেছে। কেন? এখানে এসে পার্বতী তাকে আবার দেখতে পেল? প্রায় এক-যুগ পরে এভাবে দেখা হবার কি দরকার ছিল। যদিবা দেখা হল, কি দরকার ছিল তার সঙ্গে বাসনাদির চেনাশোনা থাকার?

পার্বতী নিজের ভাগ্যের দোষ ছাড়া আর কোথাও দোষ দেখতে পেল না। তার কপাল বড় মন্দ। আজন্ম না হোক, অল্প বয়স থেকেই পার্বতী দেখছে, তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। বাবা ছিল স্কুলের হেড মাষ্টার, মোটামুটি সংসারটা চলে যাচ্ছিল, খাওয়া পরার কষ্ট জীবনে একটা অভাব কখনও ছিল না। সেই বাবা কী গ্রহের ফের একদিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে গেল। তারপর একটি পা নষ্ট হল। পার্বতী তখন নিতান্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার শরীর স্বাস্থ্য কর্ম-ক্ষমতা সেই থেকে নষ্ট হল। তবু বাবা খোঁড়া পায়ে কিছুদিন হাল ধরে থাকল। মা ছিল এক পেশে, বাবার উপর মার টান বেশী। সংসারে বাবাই ছিল মার নির্ভর। অক্ষম দুর্বল বাবার ওপর সংসারের বোঝা চাপানো থাক মা এটা সহ্য করতে পারত না। মার মুখ ছিল ধারালো, শাসন ছিল ভীষণ, বদরাগী মানুষও ছিল মা।

কলেজে পড়তে ঢুকেই টিউশানি নিতে হল, এ-বেলা ও-বেলা দুটো ছাত্র পড়াতে হত। সেই টাকায় নিজের কলেজের খরচা, গাড়ি ভাড়া, খাতাপত্তর। বাবা তখনও স্কুলের সঙ্গে কোনো রকমে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বাড়িতে বি নেই, চাকর বাকর বলতে পার্বতী-ই, বাজার যাও, লণ্ড্রিতে যাও, ডাক্তার ওষুধ করতে হলেও তুমি যাও, বৃষ্টিতে বাসন মাজার দরকার হলে ভিজে গায়ে

কলতলায় বসতে হবে ; ঘর মুছতেও সে। এই ভাবেই চলছিল। শেষে বাবা একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ল। পায়ের জন্যে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক শরীরের ক্ষমতা বাবাকে একেবারে বিছানায় শুইয়ে ফেলল। স্কুল আর যাওয়া হল না। ততদিনে পার্বতী কলেজের অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবার অন্য টিউশনি, সেই সঙ্গে কিছু উড়ো কাজ। তারপর চাকরি। যখন চাকরিতে ঢুকছে স্কুলের, বি এ পাশ করে ফেলেছে তখন, মহীপতি তার মধ্যেই চেনাশোনা হয়ে গেছে। পরিচয় হয়েছিল কেতকী মারফত। কেতকী তার বন্ধু ছিল। মহাপতি তখন পঙ্গুরা নয়, কিসের একটা চাকরি করছে ভাল। দেখতে শুনতে সুন্দর, কথাবার্তা ঝরঝরে, আলাপ করলে মন খুশী হয়ে ওঠে। মহাপতির সঙ্গে বছর দুই ঘোরাফেরা মাখামাখি করে পার্বতী ধারণা করে নিল, মহাপতিই তার পার্বতীরত্ন বিভূষণ। পার্বতীর তরফ থেকে কোনো দোষ ছিল না। কৈশোরের শেষ থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সে সংসারের যে চাপ সহ্য করছিল তাতে তার মন বয়সের কোনো খোলা জানালায় গিয়ে দু দণ্ড দাঁড়াতে পারে নি। তার সমবয়সী ও বন্ধুরা কত কি করছে, করার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের মন কত রকম সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে পার্বতীর বেলায় কেন এসব থাকবে না। মহীপতিকে দেখে পার্বতী প্রথমটায় অত আশা করে নি, ভেবেছিল—এ তার জন্যে নয়। পরে দেখল, মানুষটি সে রকম নয়, পার্বতীকে উপেক্ষা করছে না। পার্বতী ভরসা পেল। ভালবেসে ফেলল কখন। শেষে তার দাবি বাড়ল, বলল, আমরা বিয়ে করব। মহীপতি রাজী ছিল না। পার্বতী তখন অস্থির, ব্যাকুল। বাড়িতে তার ততদিনে একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, চাকরি করে, তার উপার্জনে সংসার চলে। বাবা সেকেলে গোঁড়া মানুষ, মা বয়স্কা স্বার্থসচেতন মেয়ে। বিয়েটা আপাতত সামাজিক ভাবে হওয়ার বাধা দিল, বাবা মা রাজী হত না। অথচ অপেক্ষা করার ধৈর্য পার্বতীর নেই। সে ভেবেছিল, আজ মা বাবার যা আপত্তি, কাল সে আপত্তি থাকবে না, ওরা হজম করে নেবে। আজকাল কে আর বামুন কায়েত নিয়ে মাথা ঘামায়। আসল ভয় মার অন্য জায়গায়, রোজগেরে মেয়ে বিয়ে করলে হাতের বাইরে চলে যাবে। মেয়ের ওপর এখন যে দাবি, অধিকার মা-বাপ হিসেবে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে অধিকার থাকবে না, মুখের ওপর তুড়ি দিয়ে মেয়ে চলে যাবে। এই আপত্তিটা বা ভয়টা মা ওই জাত-বংশের আড়ালে রেখে আপত্তি তুলত, ঝগড়াঝাটি করত, অশান্তি হত সংসারে। পার্বতী তা চায় নি। ভেবেছিল, বিয়েটা গোপনে সেরে রাখুক, তারপর ক্রমশই সে উলটো চাপ দিয়ে, মা-বাবাকে হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে কাজ গুছিয়ে ফেলবে। ...বিয়ের ঝোঁকটা পার্বতীকে এমন পেয়ে বসেছিল যে, মনে হত—পার্বতী তার ভবিষ্যতের ভিতটা পাকা করে রাখতে চায়। তার এই ঝোঁক অনেকটা ছেলে মানুষী ; তবু এর মধ্যে তার হিসেবীপনা ছিল। সে নিশ্চিন্ত, নিশ্চিত হতে চাইছিল। কাঠালের ধনই বলো, আর লোভীই বলো পার্বতী তার নাগালের বাইরে কিছু যেতে দেবে না বলেই পাগল হয়ে গিয়েছিল যেন। তাছাড়া পার্বতী এসব ব্যাপারে খানিকটা মেয়েলী, খানিকটা কল্পনাপ্রবণ, বয়সও ছিল। মনে মনে সে রোমাঞ্চ অনুভবের খেলা খেলত। বিয়ের সময় সে বোধ হয় ভেবে মজা পাচ্ছিল যে সকলের চোখের আড়ালে তারা—সে আর মহীপতি—যুগ্ম ও দাম্পত্য জীবনের শরিক হয়ে থাকবে, আর বাইরে —সমাজের কাছে যুবক-যুবতী, প্রেমিক-প্রেমিকা, এই বাঁধা কিছুদিন ঠেকা চলবে, তারপর একদিন সব বাঁধা পরিষ্কার। ও মা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, হাতে শাখা, ওদিকে জোড়া বিছানা, বালিশ, এক ঘর, এক খাট ; তবেও বুঝি বিয়ে হয়ে গেল। তাহলে হেসে লুটোপুটি খেত পার্বতী ; এর সঙ্গে আরও একটু ছিল, সচেতন ভাবে হয়ত পার্বতী বোঝে নি। সংসারে সে যত বোঝা, ভার, দায় দায়িত্ব পেয়েছে, কাটুক দেখেছে তার কণামাত্র ভালবাসা, মমতা, স্নেহ পায় নি : বা অনুভব করে নি। পার্বতী

এসব পাবে কিনা তারও স্থিরতা ছিল না। কাজেই সে যা পাচ্ছে তা তাড়াতাড়ি পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

বিয়েটা হল। লুকিয়ে। রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে। মহীপতি দু জন সঙ্গী এনেছিল, পার্বতী বলেছিল আসতে। আর পার্বতীর ছিল একজন। বিয়ের পর রেস্তুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া হল। সঙ্গীরা বিদায় নিল। রাস্তায় নেমে দেখা গেল, দুপুরের আবহাওয়া থমথমে, কালবৈশাখী উঠবে যেন। বৈশাখের আকাশ কেমন ঘোলাটে।

পার্বতী বলল, "আমার ক'রাত ঘুম নেই; চলো তোমার বাড়ি গিয়ে ঘুমোবো।" মহীপতি একা থাকত। বলল, "চলো।"

মহীপতির বাড়িতে এসে ঘর দোর ভেজিয়ে পার্বতী বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল, "আর কি, এসো; শোও।...খুব বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক। সন্ধেবেলায় চলে ভিজতে ভিজতে আমার বাড়ি পৌঁছে দিও তা হলেই হবে। ...এখন তো তোমারই দায়।" বলে পার্বতী হাসল।

মহীপতিও এসে বিছানায় শুলো।

যখন ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার। পার্বতী বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মহীপতি তখনও ঘুমিয়ে।

শাড়ি জামা গুছিয়ে পার্বতী মহীপতিকে নাড়া দিয়ে ডাকল, "এই, শুনছ। ওঠো। সন্ধে হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে। ওঠো, আমায় বাড়ি পৌঁছে দাও।"

মহীপতি সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তার পরেও অনেকদিন। শেষে একদিন আর এল না।

মহীপতি হঠাৎ রাতারাতি কোথায় পালিয়ে গেল।

পার্বতী অপেক্ষায় থাকল, প্রত্যাশায় থাকল, চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়ে থাকল। মহীপতি আর এল না।

সাত

যতক্ষণ না থার্মোমিটারটা তুলে নিল মহীপতি ততক্ষণ রমা ভয়ে কাঠ হয়ে, চোখ বন্ধ করে থাকল। তার মুখ দেখে মনে হবে, গায়ের ওপর যেন বিছে বা তেঁতোপোকা ফেলে দিয়েছে কেউ। থার্মোমিটার তুলে নেবার পর সে আস্তে করে চোখ খুলল, তারপর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

মহীপতি থার্মোমিটার দেখল। জ্বর ছেড়ে গেছে। গায়ে ঘাম দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছিল মহীপতির, শরীরের তাপও বিশেষ অনুভব করা যাচ্ছিল না।

থার্মোমিটার রেখে মহীপতি বলল, "ওষুধ খেয়েছিস?" রমাকে সে কখনও 'তুই' বলে কখনও 'তুমি', সচরাচর 'তুই'।

রমা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা। মহীপতির বিন্দুমাত্র বুঝতে কষ্ট হল না, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রমা যখনই ঘাড় নাড়ছে তখন ওষুধ সে খায় নি।

রমার শাড়ির আঁচলটা টেনে মহীপতি ওর হাতে গুঁজে দিল। "গায়ের ঘাম মুছে নে। খেয়েছিস কত! তাড়াতাড়ি নে।"

রমা বিছানায় বসে ঘাড় গলা বুকের ঘাম মুছতে লাগল, মুছতে মুছতে মহীপতির দিকে তাকিয়ে বলল, "পিঠ..." আঁচলের অংশটা সে মহীপতির দিকে বাড়িয়ে দিল। বিয়ে গায়ের জামা তুলে পিঠ ফেরাল। রমার গলার স্বর ভাঙা, সামান্য মোটা, ভিজের জড়তা আছে, দু একটা কথায় বোঝা যায় না, একটা না কথা বললেও তার অস্পষ্ট উচ্চারণ ও জড়তা কানে লাগে।

মহীপতি পিঠ মুছিয়ে দিল। হাত দিয়ে আরও একবার পিঠ ঘাড় স্পর্শ করে দেখল, গা বেশ ঠাণ্ডা।

পুরোনো ম্যালেরিয়ার ধাক্কাটা বোধ হয় থেকে গেছে রমার। ভাল আছে তো আছেই, তারপর হট করে একদিন জ্বর এল, মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে শীতের দাপটে যা পাবে হাতের সামনে সব গায়ে চাপিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে, দাঁতে দাঁতে শব্দ করবে, হু হু করে জ্বর চড়বে, তারপর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য প্রায়। আসেও যেমন জ্বরটা, যায়ও তেমনি হট্ করে, কিছু ঠিক নেই—কখনও এ-বেলা ও-বেলায় যেয়াদ, কখনও দু চার

দিন ভোগায়। বাঁধা ওষুধ আছে কাউন্টারের বাদল ডাক্তারের, বাড়াবাড়ি মনে হলে, এখানের ডাক্তার-বাবুকে ডাকতে হয়।

এবারের অসুখটা ম্যালেরিয়াও হতে পারে, আবার ঠাণ্ডা লেগেও হতে পারে। পরশুদিন মাঝরাতের খোলা জিম খেয়েছে মেয়েটা, গায়ে জল লাগিয়েছে। ঘুমের মধ্যে বাবার স্বপ্ন দেখছিল, ঘুম ভাঙলে সোজা কুয়া-তলায় গিয়ে কাপড় জামা কেচে, গা ভিজিয়ে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুলো। বাবা যখন মৃত, তার স্বপ্নের সান্নিধ্যও নাকি মৃতদেহ স্পর্শের মতন। এসব যে কে শিখিয়েছে রমাকে কে জানে। হয়ত বাল্যের শিক্ষা, বা শুনেছে কোথাও। মেয়েটা এই রকমই। ওর অনেক কিছু এমন সরল ও অসঙ্কোচ যে ওকে খানিকটা আদিম স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়, আবার ওর এমন কিছু বামঝেরাপীপনা আছে যে ওকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। মেয়েটা বাল্যাদিক থেকেই তার স্বভাবে বয়সের বাড় পায় নি, আবার এমন কিছুদিনও পেয়েছে যা তার বয়সে কিছুটা বেমানান।

অদ্ভুত স্বভাব। মাথায় কাজের ঝোঁক চাপলে সারাদিন কাজ নিয়ে থাকবে, গা লাগল না তো কিছুই করল না, হাসে যখন অকারণে খিলখিল করে হাসে, পাখি দেখেও হাসে আবার মহীপতির দাড়ি কামানো দেখেও হাসে, লজ্জা পায় যখন তখন। সারা বাড়িতে তার অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না, কোথায় গিয়ে যে লুকিয়ে থাকে কে জানে। এদিকে রাগলে সে ভীষণ হিংস্র, কাপড় জামা ছেঁড়ে, আগুনে পোড়ায়, ফুলগাছ ছিঁড়ে উপড়ে দেয়, মহীপতিকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে। তবও তেমনি মহীপতিকে। মহীপতির গম্ভীর গলা পেলে একবারে শান্তশিষ্ট।

মহীপতি উঠে দাঁড়িয়ে এবার বলল, "ওষুধ খা।"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "খেয়েছি।"

"মিথ্যে কথা—।" মহীপতি কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল। ওষুধটা যে তেতো সে জানে।

রমা সারা মুখে ব্যথির ভাব তুলল। মুখ নাক কুঁচকে ভীষণ ভাবে মাথা নাড়ল, না—খাবে না আর ওষুধ।

মহীপতি নিজেই ওষুধ খুঁজতে পা বাড়াল। ঘরের মধ্যেই কাঠের ছোট দেরাজ-মতন, তার মাথায় নানা জিনিসের মধ্যে একপাশে ওষুধ। মহীপতি ওষুধ খুঁজতে গিয়ে দেখল পাখির পালক, বাগানের সদ্য ফোটা মরশুমি ক'টা ফুল ছিঁড়ে এনেছে, আদার কুচি, কাগজে মোড়া নুন।'

মহীপতি ওষুধ এনে বলল, "খা—।"

রমা চোখ বন্ধ করে চোঁক গিলল। তার লম্বা সুন্দর মুখ অন্য রকমের দেখাচ্ছিল।

হাসি পাচ্ছিল মহীপতির। "জল দিয়ে টপ্ করে গিলে ফেল।"

মাথা নাড়ল রমা। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওষুধের নামেই তার বমি এসে গেছে। বমির ঝোঁক বোঝাবার জন্যেই বোধ হয় জিব বের করল।

মহীপতি এবার ওষুধের বড়িটা রমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "খা না, রাত্রে গিয়ে চান করবে খা, মরবি যখন তখন বুঝবি···।"

রমা মহীপতির হাত ঠেলে সরিয়ে দিল। দিয়ে কাতর ভাবে বলল, "কাল খাব।"

"কাল ভাত খাবি, আজ এটা খা—"

মহীপতি জোর করেই ওষুধটা খাইয়ে দিল। রমা খানিকক্ষণ শব্দ করে করে ওয়াক তুলল, বিকৃত মুখ করে থাকল, আদার কুচি যেন নুন দিয়ে। তারপর মুখ কুঁচকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাগ করেই যেন।

মহীপতি বিছানায় বসে সকৌতুকে রমার রাগ দেখল সামান্য। তারপর আদর করে ওর কপালের চুল গালের কাছে জমা উড়ো চুল সরিয়ে নাক টিপে দিল। বলল, "তোর নাকটা বেশ, নাকছাবি পরবি?"

সঙ্গে সঙ্গে রমা চোখ খুলল। খুলেই, নিজেই নাকে হাত দিল।

মহীপতির নজরে পড়ল, রমার গায়ের জামা আধ-খোলা হয়ে আছে; জামাটা উলটো করে পরেছে রমা। এটাও তার স্বভাব, প্রায়ই উলটো জামা পরে। মহীপতি

বলল, "না:, তুই আর সোজা উলটো চিনলি না। তোকে আর সভ্য সমাজে বের করা যাবে না রে।"

রমার জামা সম্পর্কে কোনো উৎসাহ নেই; নাকচাবির কথা ভাবছে, বলল, "নাকচাবি কবে দেবে?"

"দেব; জামা সোজা করে পরতে শেখ, তবে—"

রমা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসে জামা সোজা করে পরতে বসল। আঁচলটা টেনে গায়ে কোনরকমে আঁচলের একটা আগা দাঁতে ধরল, ধরে জামা খুলতে গেল। মহীপতি দেখে হাসছিল। জামার হাতা খুলতে গিয়ে রমা হঠাৎ মহীপতির চোখে চোখে তাকিয়ে কি ভেবে ফেলে গেল। তারপর আচমকা কি রকম লজ্জা পেয়ে গেল। "তুমি যাও," রমা আস্তে করে বলল।

মহীপতি হাসতে হাসতে উঠে বলল, "রান্তিরে মুখ ধুয়ে শুবি, গায়ে চাকা রাখবি, আর মশারি টাঙাবি।"

চলে যাচ্ছিল মহীপতি, রমা বলল, "জামা দেখবে না?"

"পরে দেখব। তুই পর।"

ঘরে এসে মহীপতি আলো জ্বালাবার আগেই গায়ের পাশে রমার স্পর্শ পেল। এরই মধ্যে রমা জামা সোজা করে, পরে দৌড়ে এসেছে। তার পায়ের আশ্চর্য গুণ, এমন ভাবে পা ফেলে আসে যে শব্দ পাওয়া যায় না। মহীপতি রমার ঘর থেকে বেরিয়ে দীনুকে রান্না ঘরের দিকে দু একটা কথা বলতে গিয়েছিল, তারপর সোজা ঘরে এসেছে।

আলো জ্বালাবার আগেই রমা মহীপতির পিঠে মুখ ঘষতে লাগল, ক্রমেই মনে হল সে কাতর জন্তুর মতন মুখ মাথা ঘষছে, গলায় অস্পষ্ট জড়ানো এক শব্দ উঠছিল, মহীপতির কাঁধে রমার হাত ও দোষের চাপ শক্ত করে বসছিল।

মহীপতি আলো জ্বালল না। রমা তার পিঠে দাঁত বসিয়ে ধীরে ধীরে কামড়াচ্ছিল। হঠাৎ খুব জোরে কামড়ে দিল।

অস্ফুট শব্দ করে মহীপতি বলল, "লাগছে রে। এবার যা; পরে আসিস, আবার কাজ আছে।"

রমা হাতের দোষ দিয়ে মহীপতির গলায় আঁচড়ে দিল, কি একটা বলল বোঝা গেল না।

মহীপতি আলো জেলে দিল।

আচমকা আলোয় মধ্যে রমা কি রকম বিমূঢ় হয়ে চোখ বুজে ফেলল। সে জামা সোজা করে পরেছে, গায়ের আঁচল আলগা, নাকে গলায় ঘাম জমেছে, গালের মাংস যেন থরথর করে কাঁপছিল। সাদা ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছিল ঠোঁটের ফাঁকে।

মহীপতি কিছু বলার আগেই রমা ঘুরে দাঁড়িয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পালাল।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে মহীপতি পার্বতীকে স্বপ্ন দেখেছিল। দেখেছিল, পার্বতী নদীতে, মহীপতিও নদীর মধ্যে বালিতে বসে আছে। বালির পর জল, জলের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাথর। পার্বতী বালি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাথরে বসতে যাচ্ছিল। মহীপতি বলল, যেও না, স্যাওলা ধরে আছে পাথরে, পা, পিছলে পড়ে যাবে, ভীষণ লাগবে, কেটেকুটে রক্তপাত হবে। পার্বতী শুনল না, সে জলে নামল, তার পায়ের গোছ ভিজল, শাড়ি জলে ডুবল; তারপর হাঁটু জল, ভিজে শাড়ি জলের তোড়ে ফেঁপে ভেসে উঠল, আরও জলে নেমে পার্বতী পাথর বেয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ল, আঘাত খেল তবু জেদ করে উঠল। উঠে ভিজে শাড়ি জামা নিয়ে পাথরে বসল, বলল, দেখেছ? মহীপতি দেখল, দূর থেকে আঘাত দেখা না গেলেও পার্বতীর বিমর্ষিনী মূর্তি দেখা যাচ্ছিল। মহীপতি দেখছিল। এমন সময় জল বাড়তে লাগল। কিংবা স্রোত এল। মহীপতি দেখল পাথরে জল আছড়ে পড়ছে। তারপর আশ্চর্য কাণ্ড! পাথর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। পার্বতী প্রথমটায় বুঝি বোঝে নি, বোঝা মাত্র ভয় পেয়ে পাথর থেকে নামতে গিয়ে আর পা রাখার জায়গা পেল না, জল আর স্যাওলা তাকে পা রাখতে দিচ্ছিল না। পাথরের চাঁইগুলো ভাসতে ভাসতে চললো। পার্বতী ভয় পেয়ে ডাকল, হাত বাড়াল, কিন্তু ততক্ষণে ভেসে

যাওয়া পাতার মতন ভাসতে ভাসতে পাথরগুলো অনেক দূরে চলে গেছে।

মহীপতি বালির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটল না, ছুটে লাভ নেই। পার্বতীর জন্য তার ভীষণ দুঃখ ও বেদনা বোধ হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নদী থেকে ফিরল মহীপতি। ফিরে আসার সময় মহীপতি দেখল, রমা নদীর পাড়ের কাছে শুয়ে চড়ুই পাখির মতন চিঁ চিঁ করছে এবং কয়েকটা পাখি তার নগ্ন বুক পেটা মাথায় বসে আছে। হুস করে করে মহীপতি শব্দ করল, হাত উঠালো তাড়াবার ভঙ্গি করে, অবাক হয়ে দেখল রমা নদীর কাদা বালি, পাড়ের ঘাস ও আগাছা এবং যত রাজ্যের পাখি সমেত উঠে বসেছে। তাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর মহীপতি কয়েক মুহূর্ত নিজের ঘর ও বিছানা অনুভব করল। পার্বতী নদীর জলে পাথরে বসে নেই, ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে না, রমা পাশের ঘরে শুয়ে।

পার্বতীর কথাই মহীপতি ভাবল। স্বপ্ন নিয়ে সে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না। এইমাত্র বুঝল, পার্বতীর চিন্তা তার মাথায় ভর করেছে। ঠিক যেমন তার মাথার পাশে জানালা, সেই রকম পার্বতীর চিন্তা তার মাথার ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

আজ পার্বতী কি বলতে চেয়েছে মহীপতি বুঝতে পেরেছে। খুব স্বাভাবিক যে, পার্বতী মহীপতির ওপর আক্রোশ অনুভব করবে। কিন্তু মহীপতির কি খুব একটা দোষ ছিল? পার্বতী যা করেছিল সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছায়। মহীপতি অনিচ্ছুক ছিল। কেননা সে পার্বতীর স্বভাব তখনও ভাল করে বুঝতে, নিজের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। বরং তার মনে হত, পার্বতী এবং তার স্বভাবে মিল তেমন নেই, অমিল বেশি। মহীপতি পার্বতীর অনেক কিছু যেমন পছন্দ করত, সেই রকম বহু জিনিস পছন্দ করত না। পার্বতীকে সে প্রথম দেখেছিল যখন তখন পার্বতীর বয়সই কম নয় তার বয়েসও কম। পার্বতীকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। চেহারার মধ্যে তখন এমন একটা ভাব ছিল যা চোখে করকর করে লাগত না, বোলাটের আলোর মতন স্নিগ্ধ মনে হত। এর মুখশ্রী বরাবরই ভাল, এখন অনেক পুরন্ত হলেও তখন তা ছিল না। বয়েস আজ অনেকটা ভাঙা, পুরু হয়ে এসেছে চোখ মুখ গাল; তখন ছিপ ছাপ ছিল সব। চৌকা ধরনের মুখ, কপালের দিকটা চওড়া, কাটা কাটা নাক, ঠোঁট, চিবুক গভীর চোখ, ধুংনি সামান্য সরু। শরীরের গড়ন ছিল আটসাঁট। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে পার্বতীর ব্যক্তিত্ব ফোটেনি, কিন্তু বৈশিষ্ট্য ফুটেছিল। তাকে হালকা, চটুল নির্বোধ মনে হত না, তার কথাবার্তা বলার ভঙ্গি এবং আচরণ থেকে তাকে শিষ্ট ও সংযত বলে মনে হত। তার নরম স্বভাব, মিষ্টতা পছন্দ করার মতন ছিল। পার্বতীর এইসব—এবং আরও কিছু কিছু মহীপতির তখন খুবই ভাল লেগেছিল। পরে কিছুদিন মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার পর অনেক কিছু তার আর ভাল লাগে নি। মানুষের ওপর ওপর একটা মোড়ক থাকে, সচরাচর সেটাই আমরা দেখি। কখনও কখনও বাইরের মোড়কের পরও ভেতরের একটা আবরণ থাকে, তার তলায় আসল মানুষ। এতটা না হলেও পার্বতীর ভেতরের চেহারা মহীপতির তেমন পছন্দ হয়নি। পার্বতীকে তার কি রকম হিসেবী মনে হত। যা, করছে করবে সব যেন আগেভাগেই ভেবে চিন্তে স্থির করে নিয়েছে। উদ্দেশ্য সামনে রেখে পার্বতী চলছে বলেই তার মনে হত। পার্বতী স্বার্থ বুঝত, স্বার্থ নিয়ে কাজ করত। সোজা জিনিস বেঁকা করে ভাবত। তার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল, মহীপতিকে সে তার হাতের মুঠোয় জিনিস ভাবত। তার মধ্যে আধিপত্যের ভাব এবং অধিকার-বোধ প্রবল ছিল। এ ছাড়া মেয়ে ভীষণ জেদী, একরোখা, বেপরোয়া ছিল। তার মধ্যে রুক্ষতা ও ঘায়াল ভাবও ছিল। মহীপতি ক্রমশ এ-সব বুঝছিল, বুঝছিল পার্বতী তাকে সবদিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায়। তবু মহীপতি পার্বতীকে ভালবাসত। পার্বতীর মধ্যে কাম তৃষ্ণা ছিল

চাপা। সে সুকৌশলে এই প্রবৃত্তির দিকে মহীপতিকে আকর্ষণ করত। মহীপতির পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব হত না। অথচ কখনও কখনও মহীপতির এই চৌর্যবৃত্তি ভাল লাগত না। মনে হত পার্বতী লোভী, হিংস্র।

বিয়েটা পার্বতী ঝোঁকের পড়ে করেছিল। মহীপতি রাজী ছিল না। মহীপতির আপত্তি, অনিচ্ছা পার্বতীকে এমন হিংস্র নোংরা ও অস্থির করে তুলেছিল যে শেষ পর্যন্ত মহীপতী রাজী হতে বাধ্য হল। পার্বতীর নিজের তাগিদ, জেদ এবং ঝোকই ছিল সব। মহীপতি অবশ্য ভেবে দেখেছিল পার্বতী তার ভিত পাকা করার বাসনায় এটা করেছে। রাজী হওয়া মহীপতির উচিত হয় নি। এখানে সে ভুল করেছে। কিন্তু দুর্বলতা জয় করার মতন শক্ত সে হতে পারে নি।

লুকোন বিয়েটা পরে প্রকাশ্যে বিয়ের চেয়েও দুঃসহ হল। পার্বতী সেই মুহূর্ত থেকে মহীপতির সমস্ত কিছু অধিকারও আচ্ছন্ন করতে চাইল। তার আচরণে স্ত্রীর আধিপত্য, স্বার্থ সতর্কতা প্রকট হয়ে উঠল। পার্বতী অসহিষ্ণু হত, ঝগড়া করত, কথার উপরে কথা চাপিয়ে দিত, বিরক্ত দেখাত।

মহীপতির বিতৃষ্ণা আসতে লাগল। যাতে তার অনিচ্ছা ছিল অথচ পার্বতীর জোর জবরদস্তি ও তাগিদে পড়ে (নিজের দুর্বলতা বশেও অবশ্য) অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা করে ফেলেছে তা তাকে আরও বিরক্ত করতে লাগল। পার্বতীর ওপর সে ক্রমেই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। সে আগেও জানত, এই ভালবাসা টেকসই হবে না; গোপন বিয়ের পর আরও জানল এই দাম্পত্য জীবনও টিকবে না। পার্বতীর অবস্থা সবদিক থেকে বিবেচনা করে একসময় মহীপতির সহানুভূতি হয়েছিল, এখন আর সহানুভূতি থাকল না—বিদ্বেষ হল। তার মনে হত, পার্বতী তাকে চতুরের মতন জালে জড়িয়েছে। ঘৃণা হত, রাগ হত।

অবশেষে মহীপতি একদিন পালিয়ে গেল। নিজের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে এই চাতুর্যটুকু সে করেছে। অবশ্য সে জানত, পার্বতীর এতে ক্ষতি হবে না। ও আবার সব গুছিয়ে নিতে পারবে।

পার্বতী যে আবার সব করে গুছিয়ে নিয়েছে মহীপতি এত বছর পরে তা দেখতেও গেল। অস্বীকার করা যাবে না, মহীপতি পার্বতীকে এখানে বিজয়িনী বেশেই প্রথমে দেখেছিল। পার্বতী দেখিয়েছিল, সে হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়, শেষ পর্যন্ত সে শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ মহীপতি তা দেখেছে।

কিন্তু এখন পার্বতী দেখছে তার দাঁড়াবার জায়গা শক্ত নয়, স্থির নয়। সে ভেসে যেতে বসেছে।

মহীপতি মনে মনে অবশ্য এই বিপর্যয় আশঙ্কা করে নি। সে চায় না, পার্বতী যে পাথরের ওপর বসে আছে তা ভেসে যাবে, অন্তত পার্বতী এখন—জীবনের এই গাঢ় বেলায় মনোরম করে নিতে পেরেছে। তার মূল্য থাকা উচিত। ওর চরিত্রের অতি-গোপনে কি আছে বা ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানো অবান্তর, পার্বতীর এই সাংসারিক রূপ কোথাও বিসদৃশ হয়ে নেই। তার সেবা যত্ন, স্নেহ, আন্তরিকতা ও মায়া মমতা অবহেলা করার মতন মূর্খতা পূর্ণেন্দুর না হওয়াই উচিত।

পার্বতীর জন্যে মহীপতির সহানুভূতি ও বেদনা হওয়া সত্ত্বেও সে ভেবে দেখছিল, বেচারী বাস্তবিকই এমন জায়গায় গিয়ে বসেছে যা শক্ত পাথর নয়। ভেসে যাওয়া অসম্ভব কি!

আট

দিন তিন চার আরও কেটে গেল। শশধরবাবু টাটানগর থেকে ফিরে এল ট্যাক্সি করে। তার হাতটা ভেঙেছে শশধর, কন্যির কাছে, তবে মারাত্মক হয়ত নয়, হয়ত প্লাষ্টার করা, গলার সঙ্গে বাঁধা কাপড়ে হাত

বুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। শশধর বলছে, হোটেলের বাথরুমে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে; বাসনা বলছে, মোটেই নয়, বুড়ো বয়সে কোথায় সিঁড়ি চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে; পার্বতীর সন্দেহ, দুটোই মিথ্যে কথা, নিশ্চয় কর্তাগিন্নী মদ্যপ অবস্থায় লাঠালাঠি করার সময় এই অঘটন ঘটিয়েছে।

শশধর হাত ভেঙে এসেছে অবশ্য, কিন্তু থাকবে না এখানে, কালই কলকাতায় ফিরবে। বাসনা এসেই জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বসল। যাবার সময় যে আবহাওয়ায় তারা গিয়েছিল এবং যে মনোভাব নিয়ে ফিরে এসেছে তার স্পষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছিল না। বরং শশধর এবং বাসনা এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন, পুরোনো ব্যাপারটা তারা ভুলে গেছে। কয়েক দিনের ব্যবধানে নিশ্চয় এটা ভুলে যাবার ব্যাপার নয়। তবে সপ্তাহখানেকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কিছু জল গড়িয়ে গেছে, সেই সদ্য-সদ্য ভাবটা নেই, মানসিক উত্তেজনা বা পীড়নেরও অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। এই সব কারণে ওরা ফিরে এলেও এ বাড়ির থমথমে ভাবটা আর ফিরল না।

এ বাড়িতে এখন যা, তা নির্জীব নিঃসাড় ভাব। ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা। আর এই ঝিমুনির মধ্যে জলের কোরা খুলে যাবার মতন মানুষগুলি সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। রবি আর এলা শুধু মাঝে মাঝে আড়ালে একটা জীবন্ত ভাব আনে, কিন্তু বাড়িটা নিশ্চয় আর জীবন্ত নয়।

শশধররা ফিরে এলে পার্বতী আর কোনো রকম অশান্তি করল না। করার কারণও নেই। কথা ছিল তারা আসবে এবং এসে একটা রাত কাটিয়ে কলকাতায় ফিরবে। কথার খেলাপ তারা করছে না। কালই কলকাতা ফিরবে। বরং পার্বতী শশধরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল, বাসনার সঙ্গেও বাক্যালাপ করল।

পূর্ণেন্দু বলছিল, ঘাটশিলা আর তার ভাল লাগছে না, তারাও কাল ফিরে গেলে পারে একসঙ্গে।

পার্বতীর আপত্তি, চলো বলেই যাওয়া যায় না, গোছগাছ করে যেতে হলে দু একটা দিন সময় চাই।

রবি বলছিল, আর দুটো দিন কাটানো মানেই দেওয়ালী। দেওয়ালীতেই তাদের ফেরার কথা।

অতএব সময় মতই ফেরা হবে।

দুপুরের খাওয়ার সময় শশধর প্রস্তাব করল, চলো আজ বিকেলে কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি সবাই, আবার একসঙ্গে কোথায় যাব না যাব। লেট্ আস্ হেভ্ এ হ্যাপি ইভ্নিং টুগেদার।

রবি বলল, আমি এক্সি করছি। যাবেন কোথায়?

এলা বলল, ফুল ছুঙরি।

বাসনা বলল, ছুঙরি না টুঙরি আমি আজও বুঝলাম না। এক একজন এক একরকম বলে।

ফুল ছুঙরি কাছেই। এ বাড়ি থেকে বেরুলে ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও বোধ হয় পুরো আধঘণ্টা লাগে না

চলো চলো করে বেরুতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বিকেল আর এখন থাকে কোথায়, দেখতে দেখতে ঘুরোয়, রাশনা হয়ে আসে। রোদ যখন গাছের মাথায় উঠে যাই যাই করছে তখন ওরা বেরোলো। মহীপতিও এসে হাজির। এসেছিল অন্য কাজে, কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে, এদের মধ্যে আটকে পড়ল।

শশধর বলল,"চলুন মশাই, আপনার কাজ চিরকাল থাকবে, আমরা থাকব না।"

মহীপতি কি ভেবে বলল,"চলুন।...হাতে কি হল?"

"পতন।" শশধর হেসে জবাব দিল।

"টাটানগর থেকে ফিরলেন কবে?"

"আজ।"

মহীপতি লক্ষ্য করে দেখল, এ দলটি অনেক দিন পরে জোড়া লেগেছে। যদিও সেই আগের মতন নয়, শুধু জোড়া। আগে দেখে মনে হয়েছিল মৌচাক, এখন জোড়াতালি। তবু ভাল।

বাঁ হাতি পুল, একটা দল এসেছে কলকাতা থেকে কাচ্চা বাচ্চার, পতাকা উড়ছে, মাঠের মধ্যে গান গেয়ে গেয়ে গোল হয়ে নাচছিল বাচ্চা মেয়েরা, ছেলেগুলো ফৌজী কায়দায় প্যারেড্ করছে, বাঁশি বাজছে কোথাও। কলকাতার দুই দিদিমণি গলা জড়াজড়ি করে প্রাণের গল্প করছে মাঠে বসে।

নিচের রাস্তা, পরিষ্কার। সামনে ক্রমেই চড়াই উঠেছে। রবি মাঝে মাঝেই এলাকে গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, এটা কি গাছ? ওটা কি গাছ বলো তো? বলতে পারছে না, বা বললেও ভুল বলছে। কাঁঠাল আর ডুমুর গাছের তফাৎ তার তেমন চোখে পড়ছে না ওই নিয়ে হাসাহাসি, ঠাট্টা মস্করা চলছিল।

এলা আজ পরিপাটি করে সেজেছে, ঘন নবুজ পাড়ের শাড়ি পড়েছে সিল্কের, হাত-ছোটো ব্লাউজ, গলায় মস্ত মালা, পাথরের, চুল বেঁধেছে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। বাসনাও মন্দ সাজে নি, তার আজকের সাজে বরাবরের উগ্রতা অবশ্য কম, ওরই মধ্যে যতটা তাতে ওকে আলাদা করে বোঝা যায় ওর গালের চামড়া রঙে পুরু হতে হতে কর্কশ হয়ে গেছে, এখন আর রঙ ধরার তাল ছবি নেই। বাসনার হাত নির্লোম, চুলের গুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত। তবু, এখনও ঠিক, বাসনার চেহারায় প্রলোভনের সামগ্রী আজও কিছু অবশিষ্ট আছে, তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। বাসনা যেতে যেতে আচমকা কি দেখে গুণ গুণ করে গাইল; তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা···'। গেয়েই থামল, বলল, "দূর···র আর গাব না।"

শশধর আজ একটা ঘড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, বাহারী ঘড়ি, রাস্তায় ঘড়ি ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল, পরনে ব্লাউজাস গায়ে হালকা রঙের বুকা শার্ট। শশধরের যে বয়সে হয়েছে বোঝা যায়, আরও বোঝা যায়—এ বয়সে সে সুপুরুষ ছিল। পূর্বেন্দু পাশাপাশি যাচ্ছে শশধরের; একেবারে সাদাসোটা তার তার। সঙ্গ কখনও এখানে কখনও সেখানে; বকবক করছে একাই, মাঝে-মাঝে রাস্তার ধার থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। পার্বতী প্রায় বাসনার পাশে, সামান্য পিছিয়ে।

দু পাশে কিছু বাড়ি, দু একটা বেশ বাহারী, কোনো কোনোটা ফাঁকা, কোনো বাগানে ফুল ফুটছে মরসুমের। রাস্তার দু পাশ ধরে গাছ।

বড় রোডের কাছে পৌঁছে দেখা গেল, আকাশে লাল মেঘ, গোধূলিবেলা চলছে। দেখতে দেখতে আপনাটে ভাব গভীর হয়ে সন্ধ্যা নামবে।

মহীপতি বলল, "অন্ধকার হয়ে যাবে ওপরে চড়তে। তাড়াতাড়ি হাঁটুন।"

শশধর বলল, "বাঘ তা হলেই বা কি?"

"চোখে পথ দেখতে পাবেন না।"

শশধর কি ভেবে হেসে বলল, মশাই, চোখ থেকেই বা কোন আলো দেখছি।"

কথাটার অর্থ মহীপতি বুঝতে পারল না।

শেষে ফুল ফুটবিষ পাহাড়ের তলায় এসে মহীপতি বলল, "আজ কেউ নেই।"

"নেই কেন?"

"এসেছিল বহুত, নেমে গেছে।···ওপরেও থাকতে পারে দু একজন, নামছে।"

চারপাশ একেবারে ফাঁকা, ডাক বাংলোটাও নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

ওরা টিলা বেয়ে উঠতে লাগল। গাছপালা, নুড়ি পাথরের ছড়াছড়ি, লম্বা লম্বা ঘাস, কাঁটা ঝোপ, শালের চারা উঠেছে এপাশ ওপাশে। পাক খেয়ে খেয়ে পথ, রাস্তাটা চড়াই যদিও, তবু হাঁটতে কষ্ট হয় না।

প্রথম পাক শেষ হবার পরই দেখা গেল রবি আর এলা জোরে জোরে হেঁটে আড়ালে চলে গেছে। সঙ্গ দু হাত ভরে শুধু পাথর কুড়োচ্ছে।

শশধর আর পূর্বেন্দু পাশাপাশি।

বাসনা পার্বতীকে কি বলছিল। হঠাৎ বাঁকের মুখে গাছ গাছালির আড়ালে অন্ধকার যেন নামল।

মহীপতি একা একা যাচ্ছে, দু চারটে পাথর কুড়িয়ে নিচ্ছে সঙ্গকে।

রবি আড়াল থেকে সাড়া দিয়ে ডাকল, পাবিদি আমরা এগিয়ে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে গলা কাটিয়ে সাড়া দিল। এখানের বাতাসে শুধু চারপাশে ভেসে ভেসে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

ঘুরের পাক শেষ হয়ে যখন তিনের পাক চলছে, বাসনা বলল, "আমি বাবা বসি, এই মোটা শরীরে আর পারি না।"

শশধর বলল, "চারতলা বাড়ি উঠছ, তাতেই পারি না।...নাও, নাও ওঠো। আর দু এক পাক।

বাসনা বসতে পারল না, একা জোপ জঙ্গলে বসে থাকাও মুশকিল।

গোল করে পাক খেয়ে খেয়ে টিলাটায় উঠতে হয়; আস্তে আস্তে পশ্চিমের দিকে এসে পড়লে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, লাল মেঘগুলি কালচে হয়ে আসছে, সূর্য ডুবে গেছে। শুধু এই ওপরে বাসনা একটু আলোর ভাব আছে, নীচে অন্ধকার।

এলা আর রবির গলা পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বোধ হয় এতক্ষণে মাথায় পৌঁছে গেছে।

পূর্ণেন্দু বলল, নামবার সময় কষ্ট হবে দেখছি; একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

শশধর বলল, গড়গড়িয়ে নেমে যাবে, কষ্ট কিসের হে। এখান থেকে গড়িয়ে পড়লেও মরবে না, হাত পা জখম হতে পারে।"

বাসনা রাগ করে বলল, "এতই শখ যখন, একটু বেলা বেলি এলেই পারতে।"

কথা বলতে বলতে আরও একটা পাক শেষ হল। রবি আর এলার গলা পাওয়া যাচ্ছে। তারা টিলার মাথায় উঠেও সে আছে। শশধরদের গলা পেয়ে ডাকল, "এদিক দিয়ে উঠে আসুন, ডান দিক দিয়ে।"

একে একে সবাই উঠে এল। তখনও আর আলো নেই বিন্দুমাত্র, লাল মেঘ কালো হয়ে গেছে, আকাশতলা অন্ধকার, নীচের মাঠঘাটে অন্ধকার ক্রমশই থিতিয়ে গিয়েছে।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়ায় শীত এসে পড়ছিল যেন। দূরে অনেকটা দূরে, হালার মতন কতকগুলো আলো জ্বলছে, মেঘের ওপার ঝোলানো চাঁদে লণ্ঠনের মতন দেখাচ্ছিল। গাছপালার গন্ধ ঘন হয়ে আছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কোথাও জনপ্রাণী নেই। আকাশে তারা ফুটল।

বাসনা বসে বসে ঝিমিয়ে নিচ্ছিল, রবি দাঁড়িয়ে আছে, এলা বসে। শশধর বসল না, এদিক ওদিক পায়চারি করল।

পূর্ণেন্দু বলল, "না আর নয়, নেমে পড়াই ভাল। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে।"

মহীপতিও বলল, "চলুন নামি।
আরও অন্ধকার লাগবে।"

শশধর বলল, "চলুন তবে।"

নামার পথে অল্প এগোই সকলেই অন্ধকারে দিশেহারার মতন হল। গাছপালার আড়াল, টিলার পাথুরে গা সব যেন ঢেকে চুকে গভীর স্তব্ধ এক অন্ধকার সৃষ্টি করছে। চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সমস্তটাই অনুমান করে নিতে হয়।

এমন সময় শশধর সকলকে অবাক করে দিয়ে ম্যাজিক দেখানোর মতন করে টর্চ জ্বালল। জোরালো টর্চ। হেসে বলল, "নাও, চলো এবার।"

রবি বলল, "শশধরদা টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন?"

"বাইরে বেরিয়ে টর্চ নেব না কি হে! বিকেলের পর পথে বেরুলেই আমি টর্চটা পকেটে পুরে নি। কেন আগে দেখো নি?"

কথাটা ঠিকই। টর্চ নেবার অভ্যেস শশধরের বরাবরের। রবিরাও টর্চ নিয়ে বেরোয়, তবে সব সময় নয়। আজ যেন ভুলেই গিয়েছিল।

শশধর টর্চ ফেলে আগে আগে চলল, বাসনা তার পাশে। স্বামীর ভারী হাত যেন আগলে আগলে যাচ্ছে।

শশধরের পেছনে পূর্ণেন্দু আর সন্তু। ছেলের হাত ধরে আছে পূর্ণেন্দু শক্ত করে।

পূর্ণেন্দুর পেছনে রবি আর এলা। আলোর ওপর চোখ রেখেছে এলা, একটা হাত দিয়ে রবির হাত চেপে ধরেছে।

সবার পেছনে পার্বতী আর মহীপতি পাশাপাশি।

পাথুরে রুক্ষ পথ দিয়ে লতাপাতা ঝোপ মাড়িয়ে গাছের আড়াল বাঁচিয়ে ওরা নামছিল। মাটি থেকে চোখ তোলার অবসর কারও নেই, আলোর বাইরে তাকাবার সাহসও নেই। কথাবার্তা বড় কেউ বলছিল না। চুপচাপ ওরা নামছে। মাঝে মাঝে দু একটি কথা এলোমেলো ভাবে শোনা যাচ্ছে।

অনেকটা নেমে এল ওরা আস্তে আস্তে; সময় লাগল। কুয়াশা জমে উঠেছে। অন্ধকার নিবিড়। বুনো ফুলের গন্ধ উঠল কোথাও, কোথাও বা পায়ের ঠোক্করে পাথরের নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। বহু রোড ধরে আলোর ফলা ফেলে একটা গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে গেল।

এলা বলল, "বাব্বা, এতক্ষণে বাঁচলাম।"

রবি হেসে বলল, "একটা পাগলা শিয়াল ডাকছে নীচে।"

"য়্যা।…

"ডাকছে…। শুনতে পাচ্ছি।"

"কই! আমি তো পাচ্ছি না!"

"ভাল করে শোনো।"

পূর্ণেন্দু সন্তুকে আদর করে বকছিল। "আঃ, তুই ঠিক করে হাঁট তো। মণ দেড়েক পাথর নিয়ে চলেছে পকেটে করে। বাঁদর!"

সন্তু বলল, "বাড়ি নিয়ে যাব।"

"কি করবি এত পাথর?"

"রেখে দেব। শান্তাকে একটা দেব।"

"এত পাথর তোকে নিয়ে যেতে দিচ্ছে… গাড়িতে ধরবে…"

"লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যাব…" সন্তু বলল।

"কোথায় লুকোবি?" পূর্ণেন্দু মজা করে জিজ্ঞেস করে "প্যান্টের পকেটে?"

সন্তু একটু চুপ করে ভাবল, বলল, "মার বিছানার মধ্যে…।"

আরও খানিকটা নেমে ডাক বাংলোর বাতি চোখে পড়ল।

শশধর ঠাট্টা করে বলল, 'কি গো, তোমরা সব নিরাপদে পৌঁছলে তো?"

সবাই পর পর, শুধু পার্বতী আর মহীপতি কয়েক পা পিছিয়ে গেছে।

পূর্ণেন্দু এতক্ষণ পরে পিছু ফিরে তাকাল। পার্বতীকে দেখতে পেল না, পায়ের শব্দ পেল, অন্ধকারে ওরা আসছে।

নীচে নেমে এসেছিল ওরা। বাসনার জল তেষ্টা পেয়ে গেছে, এলারও।

শশধর সকলকে সঙ্গে করে ডাক বাংলোর জল খেতে গেল। যদি চায়ের ব্যবস্থা করা হয় চাও যাবে।

পার্বতী আর মহীপতি কাছাকাছি একটা পাথরে বসল।

মহীপতি বলল, 'সেদিন রাত্রে তোমার স্বপ্ন দে বলাম।'

পার্বতী সাড়া দিল না। নামবার সময় সারাটা পথ সে মহীপতির হাত ধরে নেমেছে। অন্ধকারে সে কিছু দেখতে, বুঝতে, চিনতে পারছিল না। মহীপতি তাকে শেষ সময় আরও কাছে টেনে হাত দিয়ে প্রায় জাপটে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন আর তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে নেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মহীপতি আবার বলল, "তোমার কথা ভাবলে দুঃখ হয়, কিন্তু কি আর করার আছে।"

পার্বতী পাথরের ওপর নড়ে চড়ে বসল সামান্য। বলল, "তোমার সবের দুঃখ দিয়ে আমার কি লাভ।"

"না, লাভের আর কি—"মহীপতি একটু পরে বলল, "কিছুই না।"

পার্বতী নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে: পরে হঠাৎ বলল, "তোমার জন্যেই সব।…তুমি আমার পর পর দুবার মারলে।"

মহীপতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল পার্বতীর দিকে। শেষে বলল, "আমি তোমার যেটুকু ক্ষতি করেছি তুমি নিজে তার বেশি করেছ।"

"আমি!"

"আর কে?"

"তুমি, তুমি।...তুমি আমার পা রাখার আর জায়গা রাখলে না।"

মহীপতি রাগ করল না, আহত হল না। শান্ত ভাবে বলল, "তোমায় একটা কথা বলি।...তুমি বার বার পা রাখার চেষ্টা করেও রাখতে পারো নি।"

"কে বলল পারি নি! পেরেছিলাম। কিন্তু তোমার জন্যে...।"

মহীপতি বাধা দিল, বলল, "বেশ, আমার জন্যেই। তাতে কি হল।...নিজের পা রাখতে গিয়ে তুমি দুবারই তো কিছু লুকিয়েছ।...আমারটা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু সেবেরটা তুমি কেন লুকোলে?"

কেন লুকিয়েছিলে পার্বতী সেটা কি মহীপতি জানে না! আশ্রয়ের জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে, নির্ভরতার জন্যে। আমায় বাঁচতে হবে না? কোথায়, কি নিয়ে আমি বাঁচব?

মহীপতি বলল, "তখন ভেবেছিলে না লুকোলে তোমার পা রাখার জায়গা জুটবে না। এখন কি মনে হচ্ছে?"

"কি?"

"লুকিয়ে রেখেছিলে বলেই পায়ের তলায় জায়গা থাকছে না।"

পার্বতী কিছু বলতে পারল না। বলার কি বা আছে এক সময় পার্বতী সত্যিই ভেবেছিল, জীবনের প্রথম ভুলটা সে গোপন না করলে আশ্রয় পাবে না, এখন দেখছে যে আশ্রয়ের লোভে এই গোপনতা সেই আশ্রয়ই এখন ভেঙে দিতে বসেছে। ভেঙে দিতে বসেছে সেই গোপনতার জন্যেই। আশ্চর্য, একেই বুঝি বলে ভাগ্য। কে জানত, আজ যা লুকিয়ে ভাবছি আমার লাভ হল, কাল দেখেছি লাভ কোথায়, সেই লুকোনো জিনিসটাই আমার লোকসানের কারণ। পূর্ণেন্দু সরল প্রকৃতির মানুষ, বোকা সোকা, ভদ্র, ভাল মানুষ। সে যখন জানবে পার্বতী তাকে ঠকিয়ে তার সংসারে এসেছে তখন কি হবে? কি হবে সন্তু যদি জানতে পারে কিছু? পূর্ণেন্দুর সঙ্গে গোলমাল বাধলে সে কি কিছুই শুনতে পারবে না? এলাই বা কি মনে করবে বিদিকে? এলাও জানে না তার দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন মহীপতিকে বিয়ে করেছিল। দিদি। যদিও নিশ্চয় জানতে পারবে। দেখে অবাক হবে, এই তার পাদিদি—যে বাড়িতে কোনো রকম বেচাল দেখলে চটে যায়, যার চোখে নোংরামি সহ্য হয় না, সে নিজেই কত বড় নোংরামি করেছে, করে লুকিয়ে রেখেছিল।

মহীপতি বলল, "আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়।"

পার্বতী তাকাল।

"বাসনা যদি শুনেও থাকে তবু সে কথা বলবে না।"

"বলবে না?"

"মনে হয় বলবে না। বাসনা বোধ হয় তোমায় কিছু বলেছে তখন।"

"কখন?"

"কথা বলছিল দেখছিলাম।"

পার্বতী ভাবল একটু, বলল, "না, অন্য কথা বলছিল।" তারপর কি মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, "একবার অবশ্য বলছিল—কলকাতায় ফিরে একদিন আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।"

শশধরবাবু ফিরছে। কথা বলতে বলতে কাঁকর মাড়িয়ে আসছে সব। সন্তুর হাতে বোধহয় টর্চ, যেখানে সেখানে আলো ফেলছে।

পার্বতী বিরক্তি এবং হতাশ গলাও বলল, "এখন দেখছি ওদের সঙ্গে আমায় বনিবনা করে চলতে হবে। ...বরাবর আমি ওদের ঘেন্না করেছি, এখনও করি, বাসনা-দিকেই আমার বেশি ঘেন্না। তবু আর আমার মুখ নেই। বাঁচবার জন্যে তোয়াজ করতে হবে ওকে। মন যুগিয়ে চলতে হবে। ছি ছি।" বলতে বলতে পার্বতী ভাবলঃ আর এখন থেকে শুধু মনে মনে ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে, কবে পায়ের জমি সরে যায়। কী আমার কপাল!

"শশধরবাবুর সঙ্গে তোমার স্বামীর সম্পর্ক কি?" মহীপতি শুধলো।

"কি আবার! এ মানুষটা তো বোকা, বোকার বেহদ্দ। কোন বন্ধুর সঙ্গে পড়ে ব্যবসা করতে নেমে হাজার চল্লিশ টাকা লোকসান দিয়ে বসে আছে। বাড়ি মর্টগেজ। জামাইবাবুর হাতে লোক আছে, কেস কোম্পানীর পার্টনার ফুটিয়ে দেবে, টাকা পেলে আবার কারবার চালু হবে—এইসব ব্যবসাপত্রের ব্যাপার। যত চুরি জোচ্চুরি…।"

গীতপতি উঠে দাঁড়াল, বলল, "ওঠো। আসছে।"

পার্বতী তবু বসে থাকল। চুপ করে। চারপাশে থমথমে অন্ধকার। অজস্র ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। আকাশ যেন বিশাল এক ছাতা খুলেছে, অসংখ্য তারা দিয়ে সাজানো, এই বন, মাঠ, পাহাড় ও মানুষকে ছাতার তলায় ঢেকে রেখেছে।

সন্তু এসে হাতের টর্চ দোলাতে দোলাতে সোজা পার্বতীর মুখে ফেলল।

অশরীর বলল, "সন্তু, কারও মুখে টর্চ ফেলতে নেই। যাও আমার দাও।"

॥ শেষ ॥

মেনকা মরুপথে

সুনীল কুমার ঘোষ

প্রায় বছর দুই আগেকার একটি ঝড়ো রাত্রির কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। আমি তখন কোন একটি সরকারি কাজে ভদ্রাবতী থেকে ব্যাঙ্গালোরে ফিরছিলাম। রাস্তায় পুনা এক্সপ্রেস অস্বাভাবিক দেরী করেছিল বলেই "ব্যাঙ্গালোর সিটি"তে যখন পৌঁছলাম তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে সেই আমি প্রথম গিয়েছিলাম। তার ওপরে বড় আর বৃষ্টি। জায়গাটায় যে স্থানচিত্র আমার পকেটে ছিল তার ওপরে নির্ভর করে ঐ দুর্যোগে স্টেশন থেকে একা বেরোতে সাহস হল না। সুতরাং বাইরে বেরানোর আশা পরিত্যাগ করে কিছু খাওয়ার আশায় পোর্টারের জিম্মায় জিনিসপত্রগুলি রেখে সটান রেলওয়ে ক্যান্টিনে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু সেখানেও বিধাতার রসিকতা। খুব মেজাজে একটা টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে আমাকে বসতে দেখে কিছুটা অপ্রসন্ন মুখে "বয়" আমার সামনে এসে দাঁড়াল, এবং জানাল যে ব্রেড-বাটার আর কফি ছাড়া ক্যান্টিনে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার নিরুত্তাপ মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে পেটে হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম: তাই নিয়ে এস।

মিলিটারি কায়দায় লম্বা-লম্বা পা ফেলে বয়টি কিচেনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সারাটা দিন অনাহারের সমুদ্রে নাকানি-চোবানি খেয়ে ব্রেড ও বাটারের কাষ্ঠখণ্ড ধরে ভেসে থাকার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চেয়ারের ওপরে বসে পড়লাম। দেখলাম, বিরাট 'ডাইনিং হলে' সাকুল্যে তিন চারজন বসে রয়েছেন, তাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তাঁরাই হয়ত সে-রাত্রির শেষ অতিথি। তাঁদের মধ্যে একজন আমার কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে একটি চেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন। দু একবার আড়চোখে তিনি আমার দিকে চেয়েও দেখলেন, এবং চোখাচোখী হওয়া মাত্র চোখ সরিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, রেল-কোম্পানীর দেওয়া অমকালো পোশাক পরে বয়টি বিরাট একটা ট্রের ওপরে পুঁচকে দু' টুকরো রুটি আর এক পেয়ালা কফি নিয়ে আমার টেবিলে নামিয়ে দিয়েই দ্রুত পশ্চাৎ অপসরণ করল। বুঝলাম ঐ বস্তু দুটি পরিবেশন করার পর আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত সৎসাহস তার ছিল না। নিরুপায় হয়ে, আমি হাতে-গরম কফিতেই চুমুক দিলাম। চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করলাম। ছ্যা! একেবারে ব্ল্যাক। তাতে দুধ আর চিনি, দুটিরই সাধ্যাতীত অভাব; মানে, নেই। রেল-কোম্পানীর এই রকম রসিকতা দেখে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু নিতান্ত অনাবশ্যক ভেবে নিজেকে কোন রকমে আয়ত্তের মধ্যে টেনে এনে এক টুকরো শুকনো রুটি দাঁতের মধ্যে চেপে ধরলাম।

আবার চোখাচোখী হল সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে। মনে হল, আমাকে ঐ ভাবে বে-ইজ্জৎ হোতে দেখে তিনি যেন কিঞ্চিৎ উল্লসিত হয়েছেন। তাঁর সেই গোল-গাল দুটি চোখের ভেতরে নাতি উজ্জ্বল ব্যঙ্গের আভাসটুকু নিষ্ঠুর কৌতুকে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি শচীনবাবু নয়?

এবারে তাঁর মুখের দিকে ক্যাল-ক্যাল করে তাকিয়ে থাকার পালা আমার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু বলা হল না। তিনি বললেন: কলকাতায় একটি সাহিত্য সভাতে আপনাকে একবার দেখেছিলাম। আপনি কি সাহিত্যিক?

বিব্রত হয়ে বললাম: মানে, ঐ একটু আধটু মক্স করি আর কী।

আপনি যাবেন কোথায়?

বললাম: যাওয়ার তো একটা জায়গা রয়েছে; তবে, যেতে ভরসা পাচ্ছিনে। রাতের মত একটা আস্তানা পেলে সে কথা কাল সকালে ভাবা যাবে।

ভদ্রলোক মনে-মনে কী যেন ভাবলেন, দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন; তারপর সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: আমার বাড়িতেই চলুন।

তাঁর এই রকম হঠাৎ প্রস্তাবে আমি একটু বিব্রতই হলাম। একটি অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে অপরিচিত কোন জায়গায় রাত্রি কাটানোর আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্যই কেবল নয়, সে-সংশয় তো ছিলই, তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে এমন একটি মুক্ত আর উদার অভ্যর্থনার সুর লুকিয়ে ছিল যা আমাকে একেবারে অবাক না করলেও কিছুটা বিস্মিত করেছিল। কিন্তু তিনি বোধ হয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বললেন: চিন্তা করার কিছু নেই। আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী।

ভদ্রলোকের নাম সুবল ভট্টাচার্য। নেহাৎ অভদ্রতা হবে বলেই পেশার কথাটা জিজ্ঞাসা করি নি, কিন্তু কিছুটা পথ অতিক্রম করার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম স্টেশনের কর্মচারী থেকে শুরু করে কুলিগুলি পর্যন্ত তাঁর যথেষ্ট পরিচিত। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কেউ মাথা নেড়ে, কেউ একটু হেসে, কেউ বা দুটো মামুলি কথা বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ব্যাপারটা দেখে ভরসা পেয়েছিলাম; নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

তারপর প্রায় ঘণ্টা দুই কেটেছে। এরই ভেতরে সুবলবাবুর বাড়িতে আমরা পৌঁছিয়েছি; গরম জলে বেশ ভাল করে স্নান করেছি; তারপর, যথারীতি খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসেছি। এর মধ্যে তৃতীয় কোন মানুষকে আমি দেখতে পাই নি; কিন্তু তার জন্যে অভ্যর্থনার কোন রকম ত্রুটি আমার হয় নি। বরং, সেদিন খাওয়ার টেবিলে বসে আয়োজনের বহর দেখে রীতিমত আশ্চর্যই হয়েছিলাম।

ভুরিভোজন সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অনেকদিন পরে বাঙালীখানা পেয়ে খাবার টেবিলে শালীনতা বজায় রাখতে পারি নি। তার ওপরে, সারাদিনের ক্লান্তি তো ছিলই। চোখ দুটো এমনিতেই

যুমে আসছিল। একবার বিছানার সঙ্গে গা ঠেকানোর অপেক্ষা কিন্তু ভগবানের মার দুনিয়ার বার। আমেজ করে শুতে যাব এমন সময় সুধন্যবাবু হাজির হলেন। রাত্রিতে আমার যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে সে-বিষয়ে যথাসম্ভব তাগিদ করে বললেন: শুয়ে পড়ুন শচীনবাবু; ফিল কোয়াইট অ্যাট হোম।

বিছানার ওপরে উঠে বসে বললাম: ধন্যবাদ।

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক শুভরাত্রি জানিয়েই চলে যাবেন; কিন্তু তিনি গেলেন না। তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কোন লক্ষণও তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পেল না। একটা চেয়ারের হাতল ধরে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কী যেন করা উচিৎ ছিল, অথচ, করা হয় নি, এই রকম একটা ভাব তাঁর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয় আপনি অনেক মানুষ দেখেছেন?

তা, তা, কম দেখি নি।

মাঝে মাঝে তাদের চরিত্র আপনাকে অবাক করেছে?

তা করেছে।

একটু বিরতি দিয়ে হঠাৎ সুধন্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলতে পারেন, মানুষকে বিচার করার মানদণ্ডটা কী?

প্রশ্নগুলির ক্ষিপ্রতা আর পারম্পর্য লক্ষ্য করে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অজগরের নিরপরাধ দৃষ্টির বাইরে যেমন তার জন্য একটি আত্মচিন্তা গভীর প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করে, বুঝলাম, সুধন্যবাবুর প্রশ্নগুলির অন্তরালে, হয়ত অন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন; আমাকে আপনার কী মনে হয় বলুন তো?

রীতিমত বিস্মিত হয়েই তাঁর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

সুধন্যবাবু একটু হেসে বললেন: পাগল?

না, না। পাগল হবেন কেন?

সুধন্যবাবু ধীরে-ধীরে বললেন: মাঝে-মাঝে নিজেরই কেমন যেন সন্দেহ হয়, শচীনবাবু। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। শুনবেন আমার কাহিনী? আপনারা সাহিত্যিক মানুষ। আপনাদের অন্তর্দৃষ্টি গভীর। আপনি হয়ত আমাকে কিছুটা বুঝতে পারবেন। আমি কি কিছু অন্যায় করেছি?

তাঁর গল্পের সারাংশটুকু আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। কাহিনীটি তাঁর, ভাষাটি আমার।

লণ্ডনে থেকে যাত্রী বোঝাই করে নর্থ এশিয়াটিক রথারীতি সিঙ্গাপুরের দিকে আসছিল সেবারে। হঠাৎ মাঝপথে একটা অভ্যুৎপাৎ নেমে এল। প্রচুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কী জানি কেমন করে জাহাজের খোলের মধ্যে একটি বসন্তের রোগী ঢুকে পড়েছিল। অনেকের বারণ, পোর্ট সৈয়দেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। ধরা যখন পড়ল তখন রোগটি সবেমাত্র ছড়াতে সুরু করেছে। ধরা পড়া, আর জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে একটা আতঙ্কের স্তব্ধ বয়ে গেল।

এমনি একটি সময়ে ন'-নম্বর কেবিনে ডাক পড়ল তার ওটি। ছিল ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরের মিঃ এবং মিসেস সেনের কেবিন; লোকেশ সেন, আর তার স্ত্রী চম্পা সেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁইত্রিশ-আটত্রিশ; ভদ্রমহিলার পঁচিশ ছাব্বিশ। বৈদেশিক দপ্তরে সমস্ত দায় আর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ভদ্রলোক ভারাক্রান্ত। এই বয়সেই প্রায় বুড়িয়ে গিয়েছেন তিনি; কিন্তু মদ আর তাসের গন্ধ পেলে তাঁর নব যৌবন ফিরে আসতো। চম্পা যেন ঠিক তাঁর বিপরীত। কোন ভারটাই তাঁর কাছে বোঝা নয়; কোন কিছুতেই তার অরুচি নেই। বিলিয়ার্ড রুম থেকে টেনিসকোর্ট পর্যন্ত তার অবাধ গতি। অনেকটা ব্যালান্স অফ পাওয়ারের মত। জাহাজে পা দেওয়ার পর থেকেই সে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সবাই প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল, হ্যাঁ, মিসেস সেন সত্যিকারের একটি প্রাণবতী মহীলা। রূপ তো ছিলই, অবয়বটিও প্রায় নিঁখুত। অনর্গল হাসেন, অবিরাম কথা বলেন, অবিশ্রাম ঘুরে বেড়ান। ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তর

ও-রকম মহিলা ছাড়া বেমানান।

অমন যে বেপরোয়া চম্পা সেন, সেও কেমন যেন ঘাবড়িয়ে গেল। ভয়ে, দুর্ভাবনায় দুদিন প্রায় কেবিন ছেড়ে বাইরে বেরোয় নি। তৃতীয় দিনে তাঁর অসুস্থতার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেল। প্রথমে মাথা ব্যথা, তারপর গা-হাত-পা কামড়ানি, তারপরে অরোঅরো ভাব। সেইদিনই চম্পা সেনের সঙ্গে সুধন্যবাবুর প্রায় প্রথম আলাপ হল।

পরীক্ষা শেষ করে সুধন্য বলল : কিছু নয়।

বিরক্ত হল মিসেস সেন ; ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল : কিছু নয় মানে ?

'কিছু নয়' মানে, নাথিং অ্যাট অল। যু আর ও-কে।

ভ্রূকুটি করল মিসেস সেন : তা হলে মাথা ঘুরছে কেন, গা ঘিন-ঘিন করছে কেন, শরীর ঝিমঝিম করছে কেন ?

সুধন্য চম্পা সেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। গোটা মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে। মিসেস সেনের আসল রোগটা কোথায় বুঝতে পারল সে। কদিন ধরেই গরম পড়েছে। সমুদ্রের জল ফুটছে। হলকা বইছে আগুনের বাতাসে। যে-কোন মানুষের পক্ষেই ও-রকম উৎকট গরম সহ্য করা কঠিন। তার ওপরে বসন্তের ভয় তো রয়েছেই। সুতরাং কিছুটা সাবধান তাকে হতেই হবে। তাই সে উঠে পড়ে বলল : আপনি বিশ্রাম করুন। ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

উঠে পড়ল সুধন্য।

মিসেস সেন হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল : আমার বড় ভয় করছে ডক্টর। পক্স হবে না তো ?

অভয় দিল সুধন্য : না, না। কোন ভয় নেই।

সুধন্যর কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল। আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই বসন্ত কমে গেল।

হঠাৎ একদিন চম্পা সেনের সঙ্গে সুধন্যর দেখা হয়ে গেল। সকাল নটায় 'ব্রেক ফাস্ট' সেরে কিছু বিদেশী ভিজিটরদের নিয়ে লোকেশবাবু বারে আড্ডা জমিয়েছেন। চম্পা সেন ফিরে এসেছে ডেকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে ; কিছুক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকেছে ; তারপর উল আর কাঁটার সংযোগে কিছু একটা বোনার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সুধন্যকে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিসেস সেন একটু হেসে বলল : কী ব্যাপার ডক্টর সাহেব ? পক্স ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক অসুখ রয়েছে। না, তাও নেই ?

সুধন্য চম্পার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তারপর একটু হেসে বলল : আপনি মানুষটা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়, মিসেস সেন। পৃথিবীতে এত ভাল জিনিস থাকতে, বসে-বসে কেবল অসুখের কথা চিন্তা করেছেন।

তার চোখ দুটোর দিকে পরিপূর্ণ ভাবে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে চম্পা সেন জিজ্ঞাসা করল : আপনি তাহলে বলতে চান আমি অসুস্থ নই ?

বালাই, ষাট। অসুস্থ হতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?

জবাব দিল চম্পা ; সব সময়েই আপনার ঠাট্টা। নাড়িটা দেখুন দেখি। এখনও কেমন যেন বেতালা চলছে।

হাতটা বাড়িয়ে দিল চম্পা। সুধন্য তার নাড়ি টিপলো। কোথাও কোন গোলমাল নেই। ডাক্তারী শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে নিয়ে সে স্বাভাবিক ভাবেই ঘোরাফেরা করছে। পরীক্ষা শেষ করে হাতটা ছেড়ে দিতেই যাচ্ছিল সুধন্য ; কিন্তু ছাড়া হল না। তার বদলে চোখাচোখী হল দুজনের। চম্পার হাতটা সুধন্যর হাতের মধ্যেই ধরা রইলো। দুটো চোখ স্থির হয়ে রইল দুটো চোখের দিকে। দুজনের হৃৎপিণ্ডই আরও হয়ে উঠলো। কেউ কোন কথা বলল না। দীর্ঘ কয়েকটি সেকেণ্ড পরে দুজনেই চোখ নামিয়ে নিল। প্রায় একই সঙ্গে দুজনের হাত পৃথক হয়ে গেল। দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল দুজনে। তারপর কয়েকটি অলস মুহূর্ত, নীরব, বিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

উঠে দাঁড়াল সুবর্ণ; বলল: আপনি একা থাকবেন না মিসেস সেন। ভাইনিং রুমে যান, নয়ত বিলিয়ার্ডে। এখন আর কোন ভয় নেই।

ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল সুবর্ণ। রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল চম্পা।

তারপরে সেই অবশ্যম্ভাবী দিনটি এগিয়ে এল।

সেদিন শেষ সায়াহ্নের আলো সমুদ্রের জল রাঙা করে দিয়েছিল। মেঘমুক্ত আকাশের নীচে দিয়ে কয়েকটা শীগাল দূরের কোন আস্তানা লক্ষ্য করে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। বসন্তের প্রকোপ থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি পেয়ে যাত্রীরা তাদের কর্মচাঞ্চল্যে মেতে উঠেছিল। বিলিয়ার্ডরুমে লোকেশবাবুকে কেন্দ্র করে জোর কয়েক খেলা শুরু হয়েছিল। টেনিস কোর্টে উৎসাহীদের ভিড় জমেছিল। সুবর্ণ তার চেয়ারে বসে অলস ভাবে একখানা ম্যাজিকেল জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছিল। হঠাৎ তার টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভারটা তুলে নিতেই ওপাশ থেকে চম্পার আর্তস্বর শোনা গেল: আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। একবার দয়া করে আসবেন?

এখন-ই আসছি।

রিসিভার রেখে দিয়েই উঠে পড়ল সুবর্ণ; মিসেস সেনের দরওয়াজায় টোকা দিল।

ইয়েস কাম ইন প্লিজ।

ভেতরে ঢুকে গেল সুবর্ণ। যা ভেবেছিল তাই। চম্পার 'মর্নিয়া' দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ঘটনা। অক্সফোর্ডে কাছাকাছি এসেছে জাহাজ। এ-কটা দিন সবাইকে নাচিয়ে-কুদিয়ে-টলিয়ে-টালিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে সমুদ্র। বিছানার ওপরে অস্থির ভাবে এপাশ ওপাশ করছে চম্পা; মাঝে-মাঝে ব্যর্থ উদ্গারের চেষ্টা করছে; মুখের ওপরে, কপালের খাঁজে-খাঁজে, নাকের দুপাশে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে; আরক্ত হয়ে উঠেছে কপালের শিরাগুলি, চোখ দুটি আরক্তিম।

যথারীতি ওষুধপত্র খাওয়ার পরে ধীরে ধীরে সুস্থ হল চম্পা। সুবর্ণর দিকে তার ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে ধরলো; তারপর, একটু হেসে নিশ্চিন্তে চোখ বোজাল।

বিছানার কাছে চুপটি করেই দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ। হঠাৎ কেমন যেন মায়া হল তার। চম্পার মাথার চুল গুলির ভেতর দিয়ে সে আঙুল বোলাতে লাগলো। আর ঠিক সেইমুহূর্তে তার সেই হাতটা টেনে নিয়ে নিজের চোখের ওপরে চেপে ধরলো চম্পা। ফুঁপিয়ে উঠলো, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দুলে-দুলে উঠলো তার বুক।

কিছুতেই শুনলো না চম্পা। তার হাত ধরে টান দিল। বিছানার পাশে বসল সুবর্ণ। চম্পা তার হাতটা চেপে ধরে বলল: এ কদিন তুমি আসনি কেন?

সুবর্ণ ধীরে ধীরে বলল: আমি তো।

কথা বল না কেন?

তুমি তো বল না।

আগের মত সকলের সামনে আমার পাশে এসে বস না কেন?

এবারে চুপ করে রইল সুবর্ণ।

চম্পা ছাড়লো না; হাতটাকে আরও জোরে চেপে ধরে বলল: চুপ করে রয়েছ কেন? বল। আমি যে মরে যাচ্ছি তা কি তুমি দেখতে পাও না?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুবর্ণ; তারপরে, চম্পার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে নিয়ে গিয়ে খুব আস্তে করে বলল: পাই। তবু কেন তোমার কাছে অকারণে আসতে পারিনে, সময় পেলে সে কথা আর একদিন বলব, আজ উঠি কেমন?

ধীরে-ধীরে উঠে গেল সুবর্ণ।

নিরালা ডেকের রেলিঙ ধরে অন্ধকারে ঢাকা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সুবর্ণ ভাবলো।

জীবনটাও কি এই জাহাজের মত?

করাচী ছেড়ে এল জাহাজ। তারপর বম্বে। চম্পারা নেমে যাবে বম্বেতে, সোজা সিঙ্গাপুরে চলে যাবে সুবর্ণ। বিরাট পৃথিবীর জনারণ্যে, তারপর দুজনে কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে?

চম্পা জিজ্ঞাসা করল এবার!

তার কথারই পুনরাবৃত্তি করল সুবর্ণ: এবার!!

সমস্যাটা দুজনেরই। কিন্তু সমাধানটা কী? কেউ তা খুঁজে পেল না।

ডক্টর, ডক্টর!

অনেক রাত্রিতে নিরালা ডেকের ওপরে পায়চারি করছিল সুবর্ণ। হঠাৎ পরিচিত কার ডাকে সে পিছন

ফিরে তাকালো। দেখলো, জাহাজের মুপারকারগো তার দিকে এগিয়ে আসছে।

পরের দিন চম্পা সেনের এজাহার নেওয়া হল। সে স্পষ্টই জানাল ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা। লোকেশ-বাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল বছর পাঁচেক; এবং একটা দিনের জন্যেও তাদের মধ্যে কোন রকম মনো-মালিন্য ঘটে নি। পরস্পরের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাদের জীবন কেটেছে; আর শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পূর্ণ সদ্ভাব ছিল। সে আরও জানাল যে ঐ বিশিষ্ট দুর্ঘটনার সঙ্গে সে নিজেই দায়ী। গুলিভর্তি রিভলভারটা নিয়ে সে নিজেই নাড়াচড়া করছিল। হঠাৎ সেটা হাত থেকে ফ্লিপয়ের ওপরে পড়ে; তারপর নিচে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে যায়। তারপরেই সে আর্তনাদ করে ওঠে। আর কিছু মনে নেই তার। লোকেশ-বাবুর জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত পরবর্তী অনুসন্ধান ঐখানেই স্থগিত রইল।

বম্বেতে পৌঁছানোর আগের দিন রাত্রিতে ডেকের ওপরে পায়চারি করতে করতে সমস্ত ঘটনাটা নিয়ে নিজের মনেই আলোচনা করছিল সুবর। চম্পার এজাহার সে মেনে নিতে পারে নি। দুর্ঘটনাটা যদি আকস্মিকই হোত, আর তার জন্যে দায়ী যদি লোকেশ-বাবু না হতেন তাহলে তিনি দ্বিতীয়বার গুলিও ছুড়তেন না, বা, অমনভাবে পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করতেন না। কাজটা নিঃসংশয়ে কাপুরুষের। সমস্ত ক্রিমিন্যালরাই নাকি ঐ রকম কাপুরুষ।

পরের দিন ভোর বেলাতেই লোকেশবাবু মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর কোন জ্ঞান ফেরে নি। মৃত্যুর কারণ হচ্ছে সেরিব্রেল হেমারেজ।

বম্বেতে লোকেশবাবুর মৃতদেহে পুলিশের জিম্মায় তুলে দেওয়া হল; চম্পাকে ষ্ট্রেচারে করে পাঠানো হল হাসপাতালে। কাজকর্ম মিটিয়ে দুদিন পরে জাহাজ ভাসলো সিঙ্গাপুরের দিকে; সুবর রয়ে গেল বম্বেতে।

প্রায় তিনটি মাস পরে উঠে দাঁড়াল চম্পা। তিন তিনবার অপারেশনের পর, বাঁ পাটাকে কোন রকমে বাঁকানো সম্ভব হল। তবু, খুঁৎ রয়ে গেল কিছুটা। আগের মত সহজ ভাবে হাঁটতে পারল না, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলো। তা হাঁটুক। চম্পা যে সুস্থ হয়েছে এতেই সুবর কৃতার্থ। এতদিনের এত চেষ্টা তার সার্থক হয়েছে। যে কটা দিন চম্পা হাসপাতালে ছিল সে কটা দিন সুবরই প্রায় তাকে দেখা শোনা করেছে। লোকেশবাবুর আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন, তাঁরা ও-দের খুব ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে চান নি, চম্পার আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র। থাকেন তাঁরা কলকাতায়। অত দূরে গিয়ে রোগীর সেবা করার মত সামর্থ তাঁদের ছিল না। সুবরই সব করেছে। সুবরকে ডাক্তার জেনে হাসপাতালও বিশেষ বাধা দেয় নি।

হাসপাতাল থেকে যেদিন চম্পাকে নিয়ে সুবর বাইরে বেরিয়ে এল, সেদিন সে নিজেকে পৃথিবীর সব চেয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করল। পথ তার পরিষ্কার; সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, সংশয় অপসৃত। কুয়াসা কেটে গিয়েছে; প্রভাতের রঙিন আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে চারপাশে।

ফ্ল্যাট তো আগেই ঠিক করে রেখেছিল; চম্পার জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল ঘর; টবে ছিল যুঁই আর রজনীগন্ধার ঝাড়; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ছোট একখানি নীড়; তার বেঁচে থাকার সমস্ত সম্ভাবনা দিয়ে গড়া, আনন্দের নির্যাসে মাতোয়ারা।

কিন্তু চম্পা এল না; বলল: তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

চম্পার এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে সুবর কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বলল: ব্যাস্।

চম্পা ছলছল চোখে বলল: আমাকে ক্ষমা কর তুমি। অন্তত, একটা সপ্তাহ সময় দাও। একটু হাসলো সুবর; বলল: বেশ, তাই নাও। দরকার মনে করলে আর ও বেশী সময় নিতে পার। সুবরর মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইলো চম্পা; নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর উদ্গত অশ্রু চেপে অপেক্ষমান ট্যাক্সীর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

অপসৃয়মান ট্যাক্সীর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুবর; রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরলো, জাহাজ ঘাটায় এসে চুপচাপ বসে রইলো, বারে গিয়ে কিছুটা মদ টানলো। তারপর অনেক রাত্রি করে বাসায় ফিরলো।

পর পর সাত দিন কেটে গেল। এর ভেতরে একদিনও সে চম্পার সঙ্গে দেখা করতে যায় নি। সুবর ইচ্ছে করেই চম্পার সঙ্গে দেখা করে নি। সময় চেয়েছিল চম্পা, সময় তাকে না দিয়ে পারে নি সুবর। সাত দিন কেন? সাত হাজার, সাত লক্ষ দিন চাইলেও সে নিশ্চয়ই তা দিত। তার মত কঠিনই হোক, সে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারত না: চম্পা

(১০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুনীল গুহ

—'আমাকে কিনবেন ?'

—'কত দাম ?'

—'গোটা ছিনেক টাকা দিলেই হবে।'

—'আচ্ছা তাই দেব।'

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে রফা হয়ে গেল। এখানে পণ্য হচ্ছে মানুষ। ক্রেতাও মানুষ। আজকের দিনে কোন মানুষ উপরিউক্ত সংলাপ শুনতে পাবে না। এখন পণ্য নিয়ে এরকম ঘরোয়ারি ভাবে আইনতই নিষিদ্ধ নয়, অন্তত্যার যুগের অসভ্যতা বলে বিলক্ষণ বিবেচিত হবে।

কিন্তু একদিন ছিল যখন এদেশে, এই বাংলাদেশেই মানুষ পণ্য হিসেবে বিক্রি হয়েছে। অভাবের তাড়নায় না খেতে পেয়ে কেউ কেউ তখন নিজেকে বিক্রি করে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল।

একদা আমেরিকায় মানুষ বিক্রির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দাস প্রথার ফলে সেখানে মানুষ ক্রয় বিক্রয় হত। সেই কেনা মানুষেরা ক্রেতার কাছে যাবজ্জীবন এমন এক জীবন যাপন করত যা, ভয়াবহ। কেননা, ক্রেতা তখন মনিবের অতএব মনিব যা' খুশী তাই করতে পারত। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়ার অধিকার ছিল মালিকের।

সেই বহু প্রচারিত ইংরেজী গল্পটির কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এক ভদ্রলোক একটি মানুষ কিনেছিলেন। তাকে দিনরাত খাটাতে সেই ভদ্রলোক কোনরকম কসুর করতেন না। এ-ছাড়া যে কোন রকম অছুহাত পেলেই তাকে ধরে মারধর করতে কোনরকম দ্বিধা করতেন না তিনি। একদিন সেই কেনা লোকটি তাঁর হেপাজত থেকে পালিয়ে একেবারে জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলে গিয়ে এক গুহায় ঢুকে আত্ম রক্ষার পরিকল্পনা করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সেই গুহায় এক ভালুক সিংহের সামনে পড়ে জীবনের আশা পরিত্যাগ করে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কিন্তু সিংহটি লোকটিকে কোনরকম আক্রমণ না করে, লোকটির সামনে তার থাবাটি পেতে দিল। লোকটি দেখল যে সেই থাবায় একটি কাঁটা ফুটে রয়েছে, সম্ভবত সেই ব্যথা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায়ই পশুটি এসে লোকটির কাছে থাবাটি পেতে দিয়েছে মনে করে লোকটি সেই কাঁটা উৎপাটন করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পশুটি অবশ্য তার কোন ক্ষতি করেনি।

একদিন ঐ মনিবের লোকজন জঙ্গল থেকে একটি

সিংহকে আটকাতে সক্ষম হল। এবং তারা একটি লোককেও জঙ্গল থেকে নিয়ে এলো। সেই লোকটি যে সেই পলাতক দাস, সেটা বুঝতে পেরে মনিব তার উপযুক্ত শাস্তির জন্য সেই ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে লোকটিকে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন।

সেই সময় খাঁচার বাইরে অপেক্ষমান জনতা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকনের অপেক্ষা করছিল, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সবাই লক্ষ্য করল যে, সিংহই লোকটাকে কোনরকমে আক্রমণ না করে তার গা চেটে তাকে উপকারী বন্ধুর মর্যাদা দিতে লাগল।

এক্ষেত্রে আমি পশুর মনস্তত্ত্বের কোন উদাহরণ উপস্থাপিত করছি না। 'অথবা সত্য ইহা অবলম্বনে রচিত' সে রকম শিরোনামাও এ কাহিনীর দিতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে, এ কাহিনী সেই দাস যুগকে অবলম্বন করেই যে রচিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষ বেচা কেনা চালাও মানুষ লুঠ করাও হত এক-সময়। আর সেটা বেশী দিনের কথা নয়। দু তিন শতাব্দী আগে এই ভারতবর্ষেও পর্তুগীজেরা যখন এদেশের নগরে বন্দরে আক্রমণ চালাতে লাগল, তখনও তারা এদেশের গহন গ্রাম থেকে মানুষ লুঠ করে নিয়ে বিদেশে চালান দিত।

এ ছাড়া ইয়োরোপীয়রা আফ্রিকায়ও এ ব্যবসা বহুদিন ধরে চালিয়ে গেছে। আমেরিকার এই দাসত্ব প্রথার জন্যই আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ এবং এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল থেকে দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। শ্বেতকায় আর্যগণ যে কৃষ্ণকায় অনার্য-দের যুদ্ধে পরাজিত করে অনেক সময় দাসে পরিণত করত তাতে কোন সন্দেহই নেই। তার অনেক প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এক আভিধানিক অর্থে শূদ্রকেও দাস বলা যায়। বেদের থেকে দুশো বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশেই যে ক্রীতদাসদের ব্যবহারের জন্য মানুষ ক্রয় বিক্রয় করে দলিল তৈরী করা হত তার এক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণগণ কেমন সামাজিক দুরবস্থায় যে অধঃপতিত হয়েছিলেন তা আজকের দিনে ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে মোগল আমল পর্যন্ত জাতি অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পাশ্চাত্যদেশে দাসত্বের সঙ্গা ছিল যে, দাসের কোন রকম স্বত্ব বা অধিকার নেই। জড়পদার্থও স্থাবরের ন্যায় দাস স্বামীর সম্পত্তি। স্বামীর ইচ্ছানুসারে দাস দান বিক্রয় ইত্যাদির দ্বারা হস্তান্তরিত হতে পারে এবং স্বামী তার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে। তারাও আগে এমন এক সময় ছিল যখন দাসকে হত্যা করলেও স্বামী প্রতিকারে যোগ্য হত না।

অবশেষে দণ্ডবিধির ৩৭০ ধারায় বলা হয় যে, যে ব্যক্তি অপর কোনকে দাসরূপে আমদানী, রপ্তানী, স্থানান্তর, ক্রয় বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দাসরূপে গ্রহণ করে বা আবদ্ধ করে, তার সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম অথবা বিনাশ্রম কারাবাসে এবং অর্থ দণ্ড হতে পারবে।'

এ দেশে এই আইনই দাসপ্রথার মূলোৎপাটনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশ্বপ্রেমিক টমাস ক্লার্কসন এবং উইলিয়ম উইলবার ফোর্সের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে দাস ব্যবসা নিবারণের জন্য এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এই সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টে দাস ব্যবসার রহিতের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডের বিশ বৎসরের আন্দোলনে এই জঘন্য দাস ব্যবসা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রহিত হয়েছিল।

আবার ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদানের আন্দোলনও হয়েছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মুক্তি আইনের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দাসগণ—স্বাধীনতা লাভ করে। এ জন্য দাসদের মালিকদিগকে দুই কোটী পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল।

ইউরোপ এবং এশিয়ার কোন কোন দেশে প্রকাশ্যে বাজারে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে মানুষও ক্রয় বিক্রয় হত। যৌবন ও রূপলাবণ্য সম্পন্না কোন কোন দাসী সৌভাগ্যবশত কখনো কখনো ক্রেতার পত্নীত্বে অথবা উপপত্নীত্বে পরিগৃহীতা

হত। এই সব ক্রীতদাসীর ভাগ্য কখনো কখনো রাজ সম্মানও লাভ করেছে। ক্রীতদাসীরা রাজপ্রাসাদে সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছে। ইতিহাসে এমন ঘটনার অনেক প্রমাণ রয়েছে। এক সময় বাংলাদেশেও যে মানুষ ক্রয় বিক্রয় হত, তারও প্রমাণ আছে।

বাংলা ১১৯৫ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ এক মহিলা নিজের সাত বছরের কন্যাসহ জনৈক ব্যক্তির কাছে মাত্র তিন টাকায় বিক্রীত হয়েছিল। এ কারণে সেই মহিলা যে দলিল সম্পাদন করে, তাতে সেদিনকার বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা, তাদের অবস্থা সবই অবহিত হওয়া যায়।

এই দলিলটি এইভাবে লেখা হয়েছিল,—

…টয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলফে গদাধর সিদ্ধান্ত, সাকিম চান্দনী পরগণে বাজরোড়া সুচরিত্রেষু:—শ্রীমতী কুসুমালা ওমর ২৭ সাতাইশ বরিষ হুকুমাম ওলফে রাম রুদ্রতে সাকিম শিবলাকাঠি পরগণে আজীমপুর অত্র লিখনং আগে আমি মহাকষ্টে পালিত খোরাক পোষাক অভিজ হইয়া যারা যাই এবং আমার অন্য শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ হুকুমাম এহাতও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পর বিষ করে এমত না হাছে অতএব আপন রাজিখুসে সজ্ঞেষ আক্লেবহাল তবিয়তে সে ইচ্ছপূর্বক আমি ও আমার কন্যা ঘহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রুপাইয়া পুরোওজন বহমানী চলন সহী দস্তযতে পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম। আপনে লওয়া-জিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্তরী বরিষ যাবী অর্থ কর্ম যান বিক্রিয়াধিকারী হইয়া করাইতে রহ অদি এই মুদত মৈর্দ্ধে আচায হইতে চাহি তবে ১।০ মণ হলদি দিয়া বিয়া আচায হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম। ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানব্বৈ শাল তারিখে ১৪ চৌদহী মাহে অগ্রহায়ণ।

এই দলিলের সঙ্গে আরো একটি দলিলে দেখা যায় যে, কুসুমালার ভাসুর রামরামতৈ তখন জীবিত ছিল এবং এই আত্মবিক্রয়ে তার সম্মতি ছিল।

সেই দলিলখানা এই—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ, সাকিন চান্দনী সুচরিত্রেষু, শ্রীরামদাস দাস সাকিন ধাটাজোড় পরগণে বাজরোড়া অত্র লিখনং আগে শ্রীমতী কুসুমালা ওরফে রামরত্নতে সাকিন শিবলাকাঠি পরগণে আজিমপুর এবং তহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া এই দুইজন স্বেচ্ছাপূর্বক আপনার স্থানে আত বিক্রী হইল, এহার ঘর দুইজনকে আমি আনিয়া দিলাম এহার ভাসুর শ্রীরাম রামতৈ ইসারি করেন দুই ওওকা আমি নিলাম এহার নাম কওলায় লিখাইয়া দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই জৈন্ত কিছু খেসারত আপনার ঘরে তাহার দিলা আমি করিব। ইতি সন ১১৯৫ তারিখ ১৪ অগ্রহায়ণ।

এই দলিলে যে তিন টাকার উল্লেখ আছে অর্থাৎ আত্ম-বিক্রীত হয়ে কুসুমালা যে তিন টাকা গ্রহণ করেছে তা থেকেই কি এই দালাল দুটাকা গ্রহণ করেছিল? তবে আর এ দলিলের প্রয়োজন ছিল কী? অথচ কুসুমালার এই তিনটি টাকার যে কী প্রয়োজন ছিল, বা এই তিন টাকা যে সে কীভাবে ব্যয় করল তা বোঝা গেল না।

কিন্তু এর দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে-দিনকার সমাজে এই ধরনের আত্মবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া এই দলিলের ভাষণ, লিখন প্রণালী লেখের আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধেও একটা জ্ঞান অর্জন করা যায়।

এই দলিলে উল্লেখিত কুসুমালা সধবা কি বিধবা তা বোঝা গেল না। কেননা কওলে বা স্বামী মৃত বলে লেখা নেই। তবু কুসুমালাকে বিধবা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। সংসারে তাকে অন্ন বস্ত্র দিয়ে রক্ষা করে এমন লোক নেই। আর ভবিষ্যতে কুসুমালা এবং তার কন্যা কখনো স্বাধীনতা লাভ করেছিল কিনা তা বোঝবার কোন উপায় নেই।

তবে দালালী বা আড়কাঠির কৃপায় কোন রমণী কারও গৃহে দাসবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হলে, পরে যদি তার আত্মীয় কেউ অভিভাবকস্বরূপ সেই দাসবৃত্তিধারীর উদ্ধারের জন্য রাজ-দ্বারে বা সমাজে প্রার্থী হত, তবে তাকে মুক্তি দিতে হত। না হলে কেন্তা ন্যায়ভূষণমশায় কুসুমালার ভাসুর রাম রামতৈর সম্মতির জন্য এত ব্যগ্র ছিলেন কেন? এবং দালাল রাম দাসই বা কেন খেসারত দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে?

॥ শেষ ॥

ডাকাতের গল্প

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

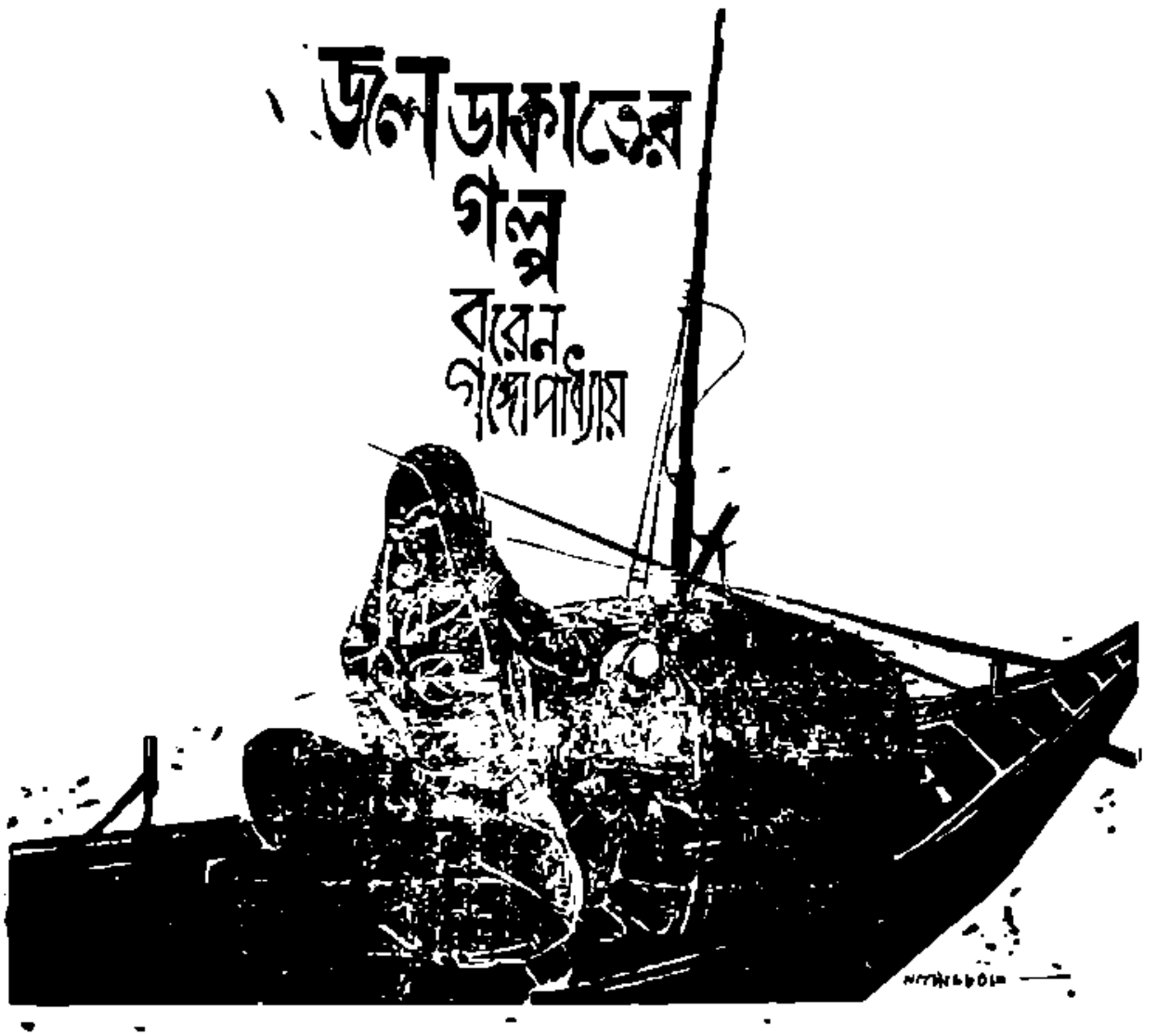

এ কাহিনীর তিনটিই মাত্র চরিত্র। রুস্তম, পদ্মিনী আর আর একটি মৃতদেহ। বলাই বাহুল্য রুস্তম একজন মেয়ে, পদ্মিনী তার সহধর্মিণী। যদিও রুস্তমের তিনকাল প্রায় গত, বিপরীত পক্ষে পদ্মিনী পূর্ণ কলস যুবতী। পদ্মিনীর আছে আশা, বাসনা, রঙে-রসে জীবনকে ভোগ করার আকুতি; রুস্তমের দেহ নদী পদ্মি তীরে ক্লান্ত। অথচ এই রুস্তমই ছিল এ রাজ্যে সম্রাট, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। খোদাই জানে, ইন্দ্রিশ মিয়ার চোখের মণিদুটো উপরে নেওয়ার মত দুঃসাহস ডাকাত রুস্তম আজ বয়সের প্রান্তে এসে কেমন করে আশ্রয়ের আশায় ব্যাকুল। হ্যাঁ, মানুষ ধরা রুস্তমের জাত ব্যবসা কোন কালেই ছিল না। রুস্তম ছিল জল ডাকাত। নৌকা ডুবি, জল খুন, বা লুণ্ঠন, না এতটুকু বিচলিত করত না রুস্তমকে। জোর যার মুলুক তার! হাতে থাকত বাঘনখ, বুকের পাঁজরের নীচে থাকত ছোরাই যোলশা। অন্যান্য মানুষের গা থেকে মণি মাণিক্য ছিনিয়ে নেওয়ায় ছিল এক নেশা। তিন

বুড়ি বয়স ডিঙিয়ে সে নেশা সব উঠে গেছে কস্তমের। এখন কেবল নিজের বুকের ভেতে চমকে চমকে ওঠা। এখন ধর্ম অধর্মের ভয় আছে বুকে। হাঁ, এত দিন পরে যেন ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়েছে বাতাসে। কস্তম তুমি কোন দলে? কোন দলে তুমি, ধর্মে না অধর্মে?

এ কাহিনীর সূত্রপাত হয় গভীর এক নিশীথে। ছোট্ট জেলে ডিঙি নিয়ে কস্তম আর পদ্মিনী বেরিয়ে পড়ল মাছের সন্ধানে। সঙ্গে ছিল আরো দশ বারো খানা ডিঙি। বন্দর গাঙীর নাম নিতে নিতে আচমকা কুয়াশার মধ্যে ডিঙি গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। ধরিয়ার ঘা টান ঢেউয়ের আগেই দাগরের মুখে নতুন সাদা চরে গিয়ে পৌঁছুল ধারে। তারপর অনেক বেলা জাল টানা, বুড়ি ভরে মাছ তুলে দলের ঘাটে ঘাটে ডিঙি বয়ে আনা। কিন্তু এখন এই অন্ধকার রাত, নক্ষত্রের রাত, জলের তাঁজে তাঁজে ফসফরাসের চমক। এই অন্ধকারে দু ধু জলের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়েছে কস্তমের ডিঙি। আলাদা ঘরে পড়লেও ক্ষতি নেই, ডিঙির গলুই আছে সাগরের দিকে মুখ করা। নতুন চরে পৌঁছতে পারলে আবার দেখা হবে সকলের সঙ্গে। এই রকমই পরিকল্পনা ছিল সবের।

কিন্তু এমন সময় একটি মৃত দেহ নৌকোর গলুইয়ে এসে আঘাত করে। অন্ধকারের আলোয় খুঁজে পেতে দেহটাকে আবিষ্কার করল কস্তম। পূর্ণ যৌবনা এক নারীর দেহ। সাদা দেহে ঝলমল করছে গয়না। পরনের সুদৃশ্য শাড়ি খানাও কম মূল্যবান নয়। দেহটাকে নৌকোর পাটাতনে তুলে নেয় কস্তম। ওর দেহ থেকে গয়না গুলো। একে একে খুলে নেয় পদ্মিনী। পরে দেহটাকে আবার ভাসিয়ে দেওয়ার সময় নেহাৎই বুঝি অধর্মের কথা মনে পড়ে। কস্তম তার বিড়ির আগুন দিয়ে দেহটার গায়ে যেন গয়না গুলো পরিয়ে দেয়। দেহটাকে উদ্দেশ্য করে বলে, দেখ মেয়ে তোমার গা থেকে যে সব গয়না খুলে নিয়েছি তা আমরা আবার তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি, কোন দোষ নিও না মেয়ে। এই দেখ তোমার গলায় আগুনের মালা এঁকে হারের মত পরিয়ে দিলাম। এই তোমার দুল, এই আংটি, এই পায়ের তাগড়া। কোন দোষ নিও না মনে, দুঃখ করো না।

গয়না পরানো হয়ে যাওয়ার পর খানিকটা ব্যাথাতুর আলিয়ে মুখে আগুন গুঁজে দেয় পদ্মিনী, তোমার মুখে কেউ আগুন দেয়নি মেয়ে, তোমার আত্মার সদগতি কামনা করে আমরা তোমার মুখে আগুনও দিলাম।

তারপর দেহটাকে আবার ধাক্কা দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিল কস্তম। শুরু হল নতুন করে ডিঙি বাওয়া। চারপাশে দু ধু সমুদ্রের মত নদী, জল আর জলের তাঁজে তাঁজে ফসফরাসের আগুন। আকাশে চাঁদ নেই, চরম কৃষ্ণ পক্ষেই ডিঙি এখন। কস্তম গলুইয়ে বসে বৈঠা বাগিয়ে জলে, বৈঠার টানে ভর ভর করে এগিয়ে চলল ডিঙি।

সমস্ত ঘটনাই ঘটল নিঃশব্দে। কস্তমের জীবনে এ জাতীয় ঘটনায় এমন কিছু একটা নতুনত্ব না থাকলেও পদ্মিনীর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম। পদ্মিনী কীভাবে গয়না গুলোর উপর আঙুল বুলিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন ঘোরে উন্মনা হয়ে পড়ছিল। এই অন্ধকার রাতে হয়ত কোন মাছারিনীর গা থেকেই গয়না গুলো খুলে নিয়েছে। হয়ত কত বাসনাই ছিল মেয়েটার। কত সোহাগ ভরে একে একে গয়না গুলো পরেছিল মেয়েটা। হয়ত স্বামীর সঙ্গে একই নৌকোয় করে যাচ্ছিল এমন সময় দুর্ভাগ্য, নৌকাডুবির কবলে পড়েছিল মেয়েটা, তারপর এই অবিচার। কত কিছুই কল্পনা করছিল পদ্মিনী কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছিল না, কে এই মেয়ে, কেমন করে ভাসতে ভাসতে এল ও? ওরে কি খুন করার চক্রান্তে পড়েছিল মেয়েটা। মাঝ নদীতে এনে কেউ কি ওকে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গেল। কেন, কেন, কি অপরাধ করেছে ও।

কস্তম আবার একটা বিড়ি ধরাল, 'কি হল পদ্মিনী, একেবারে যে পাথরের মত জমে গেলি তুই, কি হল?'

'কিছু না।' পদ্মিনী গয়না গুলো থেকে চিন্তা ধারার কিছুটা সরে তুলল, 'কিছু না।'

'কিছু না কি? আসলে কি জানিস, বোধাই আমাদের পাইয়ে দিল গুগুলো।' কস্তম এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে খুব ধীর

গলায় হাঁটল। 'নইলে এত গুলো ডিঙি থাকতে আমাদের নৌকোর ধারেই বেহুটা এসে ভণায় ঠুকল কেন বল ?'

পদ্মিনী চারপাশে একবার তাকাল, একটাও সঙ্গী নৌকোকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ছোট ছোট ঢেউয়ের মধ্যে ফসফরাস ভাঙা আগুন। সড়িয়ে সড়িয়ে লাগিয়ে উঠছে ঢেউ। আকাশে ঝিম ঝিম করছে নক্ষত্র। জন মানব হীন এই বিশ্ব চরাচরে যেন পদ্মিনী আর রুস্তম ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন প্রাণী নেই।

'বরং আমি বলি গয়না গুলো একবার গায়ে পরে নিয়ে দাঁড়া না পদ্মিনী, দেখি। রাজরাণীর মত মানাবে তোকে।'

পদ্মিনী ফিস ফিস করে বলল, 'কিন্তু কেমন যেন বুকের ভিতরটা আমার কাঁপছে এখনো। কি জানি, হয়ত কোন জিন পরী ছদ্মবেশ ধরে আমাদের পরীক্ষা করতে এসেছিল।'

'যেই এসে থাক, গয়না গুলোতো আর মিথ্যে নয়। তুই একবার গায়ে পরে নে পদ্মিনী, তোর গায়েই মানাবে গুলো।'

নৌকোটা ঢেউয়ের আঘাতে একটু একটু দুলছিল। ছইয়ের ভিতর হ্যারিকেনটা এখনো জ্বলছে। পদ্মিনী একবার ছইয়ের দিকে তাকাল। তারপর রুস্তমের দিকে, 'তোমার কোন ভয় ডর নেই, আশ্চর্য মানুষ তুমি। তুমি একটা ডাকাত।'

রুস্তম মন খুলে গলায় আবার হেসে উঠল, 'যেই। ভয় ডর থাকলে আর এতকাল বাঁচতাম না পদ্মিনী। তা ছাড়া আমরা তো কোন অধর্ম করি নি আজ। মড়াটা অমন ভাবে এল বলেই না গয়না গুলো খুলে নিয়েছি, নইলে,— যাক গে, গয়না গুলো একবার পর না লক্ষ্মীটি। দিনের আলোয় তো আর ও গুলো পরে ঘুরে বেড়াতে পারবি না। হয়ত অনেক থানা পুলিস-হুজ্জে ওটাকে নিয়ে।'

পদ্মিনী কি বুঝল কে জানে, হাসা দিয়ে দিয়ে ছইয়ের ভিতর এসে ঢুকে পড়ল। ছোট্ট নিচু একখানা ছই। স্তূপীকৃত শুকনো জালপড়ে আছে একপাশে। আবার এক পাশে বেড়ার গায়ে লণ্ঠনখানা ঝুলছে। লণ্ঠনের আলোয় রক্তের মত মনে হচ্ছে ভিতরটা। বেড়ার গায়েই ঝুলছে একখানা ছোট্ট আরশি, চিরুনী। একখানা কালীর ফটো, ওটা রাখতে হয়, আছে। আর একপাশে পদ্মফুল আঁকা ছোট্ট একখানা টিনের বাক্স, পদ্মিনীর বাক্স। বাক্সটার ঠিক উপরেই একখানা খেজো হুঁকো। কখনো সখনো ব্যবহার করে রুস্তম। অতিথি বান্ধব এলে পদ্মিনীকেই হুঁকো সাজিয়ে এগিয়ে দিতে হয়।

পদ্মিনী ছইয়ের ভিতর ঢুকে গয়না গুলো আলোর সামনে বিছিয়ে বসল। আহা, খাসা বস্তুগুলি, আলো ঝলমল করছে যেন। কানের দুল দুটো তুলে বসল। বরফের মত শীতল, হ্যারিকেনের কাছে এগিয়ে এনে তাতে কিছুটা গরম করে তুলবার চেষ্টা করল। তারপর কানের ফুটোয় পরিয়ে দিল দুল দুটো। আহা কান দুটো যেন ভরাট হয়ে গেল। আরশিটাকে তুলে ধরল পদ্মিনী। কান থেকে যেন আলো ছড়াচ্ছে চারপাশে। আহা এমন জিনিস না হলে কি মানায়!

গলায় হার পরল পদ্মিনী। গলায় যেন বরফের একটা শীতল ফাঁস জড়িয়ে গেল। আহা ফাঁস হতে যাবে কোন দুঃখে, পরবার জিনিস পরেছি। কিন্তু বুকের ভিতরটা এমন কাঁপছে কেন আমার। ও কিছু না, পদ্মিনী হাতের পোছা ছুঁচলো করে চুড়ি ক'গাছা পরে ফেলল। বাকি রইল মল দুখানা। মল দুখানা রূপোর। ছোট ছোট ঘুঙুর মানায় মত টুন্‌টুনি ঝুলছে। একটু নেড়ে দিয়ে মিষ্টি করে শব্দ তুলল পদ্মিনী। তারপর পায়ের গোছ থেকে কাপড় সরিয়ে মল দুখানাও পরে ফেলল। আহা কানে দুল দুলছে, গলায় ঝুলছে হার, হাতে চুড়ি, পায়ে মল। এমন কি আমার রাজরাণীর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কি নবাব বাদশার বেগমের মত! আরশি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে অনেক ভাবে দেখবার চেষ্টা করল পদ্মিনী, তারপর এক সময় যেন ক্লান্তিতে আলোটার দিকে চোখ পেতে তাকিয়ে রইল।

নিজেকে সাজিয়ে রাখতে কার না বাসনা হয়! লাল রঙের চুড়ি ছাড়া কিছুই ছিল না আগে, কিন্তু এখন, এখন আমার হাতে দোলাদেই সোনার চুড়ির শব্দ। দুজনে যা

হয়ে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে, ওমা পদ্মিনী তুই? —হাঁ আমি, কেন পরতে পারিনা আমি!

কিন্তু মড়া মেয়েটা কেন কোথায়? পদ্মিনীর বুকের ভিতর কাঁপুনি শুরু হল আবার। মেয়েটাকে তাল করে ভাসিয়ে দিয়েছে তো কুত্তম, না কি এখনো ওটা সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে ভিড়িয়ে! পদ্মিনী ঝলমলে মুখ নিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ইয়া গো, শুনছ?'

কুত্তম গলুইয়ে বসে কাত হয়ে এদিকে ছিল, উত্তর করল, 'কি? কি হল আবার?'

'একটু চারপাশে খুঁজে দেখ না গো, আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে, মেয়েটা ডিঙির সঙ্গে সঙ্গেই আসছে।'

'এই জ্বালো, এখনো তুই ভুলতে পারলি না ব্যাপারটা।' কুত্তম অবজ্ঞা মেখিয়ে উত্তর করল। 'গলা গলো পরেছিস?'

'পরেছি। কিন্তু আমার যেন কেন মনে হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা আসছে। একটু দেখ না চারপাশে, সত্যি সত্যি আছে কি না।'

কুত্তম বলল, 'আলোটা আন, নিজের চোখে দেখে যা।'

পদ্মিনী আলো হাতে ছইয়ের ভিতর থেকে বেরুল। আলো পড়ল চোখে মুখে। আলো পড়ল পাটাতনের উপর, পড়ল বিষিত ভাবে জলের উপর।

কুত্তম লণ্ঠনটাকে তুলে ধরল। জলের কাছাকাছি নামিয়ে আনল। জল ছাড়া কিছুই নেই। কিছুই দেখা গেল না।

'একবার নিজের চোখে তাকিয়ে দেখ, আত্মাটার মড়া ভাসতে ভাসতে কোথায় এখন চলে গেছে কে জানে। এরপর ওটা পচতে শুরু করলে মাছে খুঁটে খুঁটে খাবে, চিল শকুন ওর গায়ের উপর বসে ঘোল খাবে।'

'যা গো!' অস্ফুট উচ্চারণ করল পদ্মিনী। ঘোলাটে চোখে কুত্তমের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'যা, ভিতরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে শরীরটাকে জুড়িয়ে নে পদ্মিনী। আজে বাজে কথা ভুলে যাবার চেষ্টা কর।'

কূল কিনারা দেখা যাচ্ছিল না, পদ্মিনী বহুদূরে তাকাল, জল আর জল। হাত সামনেই সাগর। আশে পাশে একটাও ডিঙি দেখা যাচ্ছিল না। পথ ভুল হয় নি আমাদের। সাগরের ভিতর দিয়ে ভেসে চলেছি না তো আমরা, কে জানে!

কুত্তম হাতে আবার ও ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। বেড়ার গায়ে লণ্ঠনটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে জালের উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল পদ্মিনী।

কিন্তু আবার সেই মেয়েটার কথা মনে আসছে। উদ্ধত যৌবন, পাটাতনের উপর মেয়েটাকে যখন টেনে তুলেছিল কুত্তম অদ্ভুত ভাবে কোমরের কাছটা বাঁকা মনে হয়েছিল। পায়ের নখে রঙ মাখা ছিল মেয়েটার। খোলা বুক পাথরের মত ভারী, নিটোল। চোখ দুটো বিস্ফারিত, গোল যেন ডিম দুটো কেটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। মুখ হাঁ করা ছিল মেয়েটার। মুখের গহ্বরে অন্ধকার। মুখের ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় জলে ডুবেই মরেছে মেয়েটা। কেউ আগে থেকে মেরে ভাসিয়ে দেয় নি। কেন, কেন অমন ভাবে জলে ডুবে মরল মেয়েটা! কি পাপ করেছিল ও!

হয়ত এই গয়না গুলোর উপর জীবন মায়া ছিল মেয়েটার। হয়ত তাই জলের ভিতর মেয়েটাকে লুকিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গেই আসছে আমাদের। এত গুলো সোনার লোভ কি কেউ ছাড়তে পারে!

কথাটা ভাবতেই আবার সারা গায়ে শিরশির বোধ করল পদ্মিনী। অস্ফুট গলায় আবার ও চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়া গো, আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মেয়েটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আসছে আমাদের।'

'তোর মাথা খারাপ হয়েছে।' কুত্তম চেঁচিয়ে উঠল। 'এতই যদি ভয় তা হলে গয়না গুলো ফেলে চোখ জলছিল কেন। তুলে যা ওসব পদ্মিনী, তুলে যা। একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা কর এবার।'

'ঘুম আসছে না যে!'

কুত্তম কেমন স্তব্ধভাবে শুনল। পদ্মিনীর গলাটা যেন ভারী ঘন মনে হল ওর। এই একটি মেয়েছেলে নিয়ে বেরুতে নেই। অল্পতেই এত কাতর হয়ে পড়ে মেয়েরা। উত্তেজনায় আবার একবার বিড়ি ধরাল কুত্তম।

পদ্মিনী আলোর দিকে তাকিয়েছিল। একটা মাছির মত পোকা আলোর চারধারে পাক খেয়ে ঘুরছিল।

আলোটাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল পদ্মিনী। এক সময় ওর আবার মনে হল সত্যি সত্যি মড়াটা ভিতির সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। কেন কি চায় ও? কি চায়?

—চাই ঐ গয়না গুলো। ওগুলো আমার গয়না আমাকে ফিরিয়ে দাও।

—তোমার গয়না তো তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়েছি মেয়ে। কখন তোমাকে আগুনের জ্বালা এঁকে গয়না পরিয়ে দিয়েছে, আর কেন।

—তুমি জান না পদ্মিনী, ওগুলো কত সাধের জিনিস ছিল আমার। আমার স্বামী আমাকে কত কষ্ট করে ওগুলো বানিয়ে দিয়েছিল। ওগুলো অন্য কারো গায়ে উঠবে আমি সইতে পারি না।

পদ্মিনীর কেমন অস্বস্তি লাগছিল। চেঁচিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলাটা কেটে গেল এ সময়। কখন ছইয়ের বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছে, 'এই পদ্মিনী কার সঙ্গে কথা বলছিস, পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

পদ্মিনী শূন্য চোখে তাকাল। তাই তো, কার সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ! কে, কে এসেছিল আমার সামনে! সেই মেয়েটাই কি! আশ্চর্য, একি ঝঞ্ঝাটেই পড়া গেল!

কখন ছইয়ের দিকে এগিয়ে এসেছিল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলি পদ্মিনী?

পদ্মিনী ম্লান হাসল, 'আমার মনে হচ্ছে মড়াটা যেন সঙ্গেই রয়েছে আমাদের। জানো, এই গয়না গুলো গায়ে পরেছি বলে একদম সহ্য করতে পারছে না মেয়েটা।'

'চোখ দুটো কেমন টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তোর। পায়ে পড়ি পদ্মিনী, একবার একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা কর, নইলে কিছুতেই ব্যাপারটা ঝুলতে পারবি না তুই।'

পদ্মিনী জানের উপর মাথা রেখে চোখ বুজল।

'হ্যাঁ ঘুমা! ঐ গয়না নিয়ে যদি বিড় বিড় করিস কেউ টের পেলে কামেলাতেই পড়ে যাব। ব্যাপারটা এখন কয়েকদিন গোপন করে যেতে হবে আমাদের।'

কখন আবার গলুইয়ের দিকে সরে এল। আবার হুঁকো কেলল জলে।

চোখ বুজে থাকলেও পদ্মিনী যেন সামনের আলোটাকে অনুভব করতে পারছিল। অপরিচ্ছন্ন আলো, ছইয়ের ভিতরে যাদুকরী রহস্য ছড়িয়ে রেখেছে। ডিঙিটা জলের আঘাতে মৃদু ভাবে দুলছিল। যেন আকাশের নক্ষত্র গুলিও দুলছে। দুলছে পদ্মিনীর দেহটা। আশ্চর্য, যেন জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে। জলের উপর দিয়ে কেন, তবে কি মড়াটার হাত থেকে রেহাই নেই!

পদ্মিনীর মনে হল, দুই দেহটা যেন ওরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে।

—আশ্চর্য, কি চাও তুমি?

—ঐ গয়না গুলো ফিরে চাই। জানো, কত সাধের গয়না গুলো।

—কি করবে তুমি গয়না নিয়ে? দেহটাই যদি তোমার নষ্ট হয়ে গেল, ও গুলো তোমার কি হবে?

—গয়নার শোক আমি ভুলতে পারি না পদ্মিনী। জানো ও গুলির জন্যই আমার বেঁচে থাকার বাসনা ছিল পৃথিবীতে, কিন্তু হল না।

—যা হল না তার জন্য আর দুঃখ করা কেন, এবার ও গুলোর কথা ভুলে যাও।

—অসম্ভব, ভুলতে পারি না পদ্মিনী, অমন সুন্দরকে নতুন গয়না, ভুলতে পারি না আমাকে ও গুলো ফিরিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

—আবার সেই পুরনো কথা। তোমাকে তো আগুন দিয়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছি আমরা, আবার কেন? নেই নি?

—কেবল সাজনাই দিয়েছ তোমরা। আসল গয়না গুলোর কথা ভুলতে পারি না। আমাকে ও গুলো ফিরিয়ে দাও।

পদ্মিনী অস্ফুট চিৎকার করে উঠল, 'না, না।'

'কি হল রে পদ্মিনী? কি না-না করছিস? কার সঙ্গে কথা বলছিস্?'

কখন ছইয়ের কাছাকাছি এসে এসেছিল। 'কার সঙ্গে কথা বলছিস কি হয়েছে তোর?'

পদ্মিনী যেন পরিত্রাণ ফিরে পেয়েছে আবার। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে এখন। কখনকে দেখতে পেয়ে

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল পদ্মিনী, 'জানো মড়াটা যে এখানেই উঠে এসেছিল। গয়না গুলো না পেলে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে!'

'কি প্রলাপ বকছিস পদ্মিনী? কার কথা বলছিস?'

'বাহ্, দেখলে না, এতক্ষণ কেমন ঝগড়া করে গেল।'

কুন্তম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, 'কে ঝগড়া করে গেল?'

পদ্মিনীর চোখ জবা ফুলের মত লাল, কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ। তবে কি অসুস্থ হয়ে পড়ল পদ্মিনী! কুন্তম আরো খানিকটা এগিয়ে এল, আবেগ মিশিয়ে ডাকল, 'পদ্মিনী!'

'উঁ।'

'নৌকোর মুখ কি ফিরিয়ে নেব পদ্মিনী? তোর ভাব গতিক কিন্তু ভাল লাগছে না আমার!'

পদ্মিনী বলল, 'মাছ, মাছ মারবে না?'

'তুই যদি অমন প্রলাপ বকিস, ব্যাপারটা যে জানাজানি হয়ে যাবে পদ্মিনী।'

পদ্মিনী চোখ বুজল। অহেতুক একটা ক্লান্তি যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ওকে। কুন্তম অনেকক্ষণ পাশেই বসে রইল। লণ্ঠনটা জ্বলছে। লণ্ঠনের আলোয় কেমন যেন মৃত ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে পদ্মিনীকে। ভয়ে কাঠ হয়ে আসছিল কুন্তম। সরে এল।

নৌকোর মুখটা বোধ হয় জলের তোড়ে ঘুরে যাচ্ছিল এ সময়। কুন্তম আবার উঠে এসে গলুইয়ে বসল। শক্ত করে বৈঠার চাড় দিয়ে নৌকার মুখ সোজা করে নিল।

বোধ হয় আর খানিকক্ষণের মধ্যেই চরের কাছাকাছি এসে যাবে ওরা। তখন আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে। গাঙ-কোমর বেঁধে জলে জাল বিছিয়ে মাছ ধরবে সবাই। না গয়না গুলোর কথা ফাঁস করা উচিত হবে না ওর। কিন্তু পদ্মিনী। পদ্মিনী যদি আবার ওরকম প্রলাপ বকতে শুরু করে! গা থেকে গয়না গুলো খুলে লুকিয়ে রাখতে হবে।

কুন্তম চারপাশে ভয় ভয় করে তাকাল। না, কূল কিনারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু এই রাত্রি আর এই জলের টান দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না চরের কাছাকাছিই এসে পড়েছে ওরা। যা থাকে কপালে এগিয়েই যাওয়া যাক।

ঘন ঘন বৈঠা বাইতে লাগল কুন্তম।

কিন্তু সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল পদ্মিনী। দেহের প্রতিটি কোষে কোষে কেমন এক অস্থিরতা। কি যেন একটা অঘটন অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। যাত্রা শুরুর প্রথম থেকেই কি যেন এক অশুভ ইঙ্গিত ওকে ঘিরে রেখেছে। নিজেকে গুটিয়ে ছোট করে রাখবার চেষ্টা করছিল পদ্মিনী, কিন্তু যাতব অলঙ্কারের শব্দ, যেন মাংসের ভিতর ঝিম ঝিম করে ওকে সম্মোহন করছে।

—কেন তুমি অমন করে সবে সঙ্গে আসছ কেন? কেন?

পদ্মিনী যেন দেখতে পাচ্ছিল কেউ একজন কালো কাপড় গায়ে লণ্ঠনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কে? কে তুমি?

—আমাকে ওগুলো ফিরিয়ে দাও, শুনছ, ফিরিয়ে দাও।

পদ্মিনীর দেহের ভিতর ফুলে উঠল আবার এক অস্থিরতা। আবার এসেছ তুমি? বললাম তো তোমার জিনিস তোমাকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি।

—না, আমার গয়না গুলো কেন তুমি গায়ে পরে আছো অমন করে, ফিরিয়ে দাও।

—এ গুলো আমার। আমাদের। আমার বাপের আমরা পেয়েছি।

—না, তোমরা ছিনিয়ে নিয়েছ আমার গা থেকে।

—তুমি তো আর বেঁচে নেই মেয়ে, এ গুলো তোমার কোনই কাজে আসত না, তাই নিয়েছি আমরা।

—তোমরা অন্যায় ভাবে নিয়েছ।

এতে কোন অন্যায় দেখি না আমি। বরং তোমার মুখে আগুন ছুঁইয়ে ন্যায় কাজই করেছি আমরা।

—ন্যায় অন্যায় বোঝার ক্ষমতা তুমি হারিয়েছ।

কুন্তম বসে ছিল গলুইয়ে। আবার অস্ফুট গলার স্বর ও শুনতে পেল পদ্মিনীর। কান পেতে শব্দ গুলো বুঝবার

চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য, কারো সঙ্গে যেন তর্ক জুড়েছে ও। মেয়েলি তর্ক। যেন সত্যি সত্যি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ছইয়ের ভিতর বসিয়ে রেখে নিয়ে চলেছে কুন্তম! আশ্চর্য!

ধীরে ধীরে ছইয়ের কাছকাছি এগিয়ে এল কুন্তম। লালচে বিন্দু একটা আলো ঝুলিয়ে আছে ভিতরে। কুন্তম ছইয়ের ভিতর তাকাল। পদ্মিনী বিড় বিড় করে বকছে, তার অন্যায় তোমার কাছে লিখব বলতে চাও?

কুন্তম পদ্মিনীর আরো কাছাকাছি এগিয়ে এল।

—বেশ তো চল, যার কাছে বিচার হবে তার কাছেই চল।

মাথায় হাত রাখল কুন্তম। পদ্মিনীর চুলের ভাঁজে আঙুল ডুবিয়ে দিল।

—সেখানে যদি প্রমাণ হয় অন্যায় করেছি আমি, ফিরিয়ে দেব। ফিরিয়ে দেব তোমার গয়না।

কুন্তম বুঝল পদ্মিনীর গা জ্বরে পুড়ে ভীষণ তপ্ত হয়ে উঠেছে। আগুনের শিল বেরুচ্ছে গা দিয়ে। হঠাৎ জ্বরের ঘোরেই প্রলাপ বকতে শুরু করেছে পদ্মিনী। নাহ্, এভাবে কখনো চলা যায় না। কুন্তম একে একে ওর গা থেকে গয়না গুলো খুলে ফেলতে শুরু করল। প্রথমে হার, পরে দুল, হাত থেকে চুড়ি গুলো; তারপর নথ দুটোও খুলে ফেলল কুন্তম। এবার এগুলোকে লুকিয়ে রাখতে হবে। কাক পক্ষীও টের পাবে না, এমন ভাবে লুকিয়ে রাখতে হবে এগুলো।

পদ্মিনী বিড় বিড় করে বকেই চলেছে। ছুটো চারটে ভাঙা কথা ছুড়ে ছুড়ে অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল কুন্তম। কেমন যেন দুর্বোধ্য, দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

গয়না গুলো কাপড়ে জড়িয়ে লুকিয়ে ফেলল কুন্তম তারপর হামা দিয়ে দিয়ে আবার ছইয়ের বাইরে চলে এল। আবার এসে গলুইয়ের উপর চুপ করে বসল। রাত্রিটা কেমন যেন ঝিকে ধরে এসেছে বলে মনে হল ওর। তবে কি ভোর হওয়ার সময় হয়ে এল।

বৈঠা দিয়ে আবার জল টানতে শুরু করল কুন্তম।

কে জানে পদ্মিনীটা এখন জ্বরের ঘোরে পাপ পুণ্যের বিচার করেই চলে গেল কিনা। যেখানেই থাক গয়না গুলো এখানেই, এই ডিঙিতেই পড়ে থাকবে। কুন্তমের কেমন যেন অদ্ভুত ঘোলাটে মনে হল পরিস্থিতিটা। কেমন যেন অদ্ভুত অর্থহীন।

॥ শেষ ॥

ঠিকানা

বুদ্ধদেব গুহ

কতক্ষণ যে বিমল চুপ করে বসে বসে ভাবছিল, ওর হুঁশ ছিল না। এমন সময় ফোনটা বাজল। চৌধুরীর ফোন।

বিমল বলল—হ্যালো।

হোয়াটস্ আপ? চাম? ওপার থেকে চৌধুরী বলল। তারপর আবার বলল—কাল ওয়ার্কস ম্যানেজারের বাড়ি যাচ্ছ ত? তোমাকে যাবার কথা আর কিন্তু বার বার বলে গেছেন।

বিমল বলল, দেখ আমার এসব ভালো লাগে না। তারপর ওয়ার্কস ম্যানেজারের স্ত্রীর সঙ্গে গান নিয়ে আলোচনা করার মত জ্ঞান আমার নেই।

আরে বিহারীলাল টিহারীলাল সম্বন্ধে উনি আলোচনা করে সব পাকা করতে চান। 'খো' ত সামনের ২২ তারিখ। আর পনেরো দিনও বাকি নেই। এসব না গেলে চলবে কেন? তাকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। কটায় যেতে হবে?

নটা নাগাদ যেও। ব্রেক ফাস্টেও পার।

ঠিক আছে। যাব। বলে, বিরক্তির সঙ্গে নামিয়ে রাখল বিমল।

এই ওয়ার্কস ম্যানেজার নতুন এসেছেন। বয়স খানেক হল। প্রথমে একলা ছিলেন। গত সপ্তাহে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন ভদ্রলোকের ত্রিসংসারে একা-

ভেহিক ক্যারিয়ার—এবং বিমলের সবচেয়ে যা ভাল লাগে—তা হচ্ছে ভদ্রলোকের সাদাসিধে ভাব। কোনোরকম ফাদ-ফাতুর নেই তাঁর মধ্যে, যে এরকম লোক এই ধরনের উচ্চ-দায়িত্বপূর্ণ কোম্পানীর ওয়ার্কস ম্যানেজার হতে পারেন।

চাকরীতে নতুন ঢুকেছে বিমল। তাই এ্যাকাউন্ট্যান্সী পাশ করে বেশ কিছুদিন বসেছিল। চাকরী পায় নি যে তা নয়, মনোমত চাকরী পায় নি। মেয়েদের বিয়ের মত, ছেলেদের চাকরীও জীবনের সীরিয়াস ব্যাপার। একবার করে দিয়ে ফেলে গেলে, তার কত ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, কত বড় এলিজিবল ব্যাচেলর তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল সে সব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। ছেলেদেরও তাই। চাকরীর জোয়ালে একবার জুড়ে গেলে হল—। তখন কোন্ কোন্ ডাকসাইটে কোম্পানী ইন্টারভ্যুয়ে ডেকেছিল সে সব কথা বলতে লোকে ভুলবে।

সেই জন্যেই চাকরী নেবার আগে দেখে শুনে ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে চাকরী নিয়েছিল বিমল। ওর বড়মামার শ্যালকপুত্র ভাইয়ের ছোটবেলার বন্ধু মিঃ কর—নরিক বিভাগ থেকে ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্সী করে এক বিখ্যাতের এই জগদ্বিখ্যাত মিথিমিলি পাহাড় তলির এঞ্জিনীয়ারীং কারখানার আকাউন্ট হয়ে বসেছিলেন। আকাউন্ট অর্থাৎ F. A. C. A. O.। অন্য কথায় Financial Adviser And Chief Accounts Officer.

এই আকাউন্ট-এর সুপারিশে বিমল এখানে Cost Accountant-এর একটি ভাল চাকরী পেয়ে গেল। ভাগ্যিস্ অনেকদিন ছিল।

শনিবার রাতে, ডিনারের পর—বেডরুমের ডিভানে পা ছড়িয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে বিমল ভাবছিল আগামী কাল রবিবার। প্রতি রবিবারে সেই একই ক্লান্তিকর রুটিন। রবিবারেও বৈচিত্র্য নেই।

যেহেতু রবিবার, রবিবারে ও দেরী করে উঠবে। তারপর বাথরুমে ঢুকবে। সে একটা ঘটনা বিশেষ। ক্রমে দাঁত মাজবে, তারপর দাঁড়ি কামাবে, তারপর নীল বাথটাবে একটা অহিষ্কার উটের মত হুর্-হুর্ করবে—তারপর জল ফেড়ে উঠে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল করে দেখবে—নিজের চোখের দিকে তাকাবে। আজকাল নিজেকে বিমলের কেমন নতুন নতুন লাগে। এক একটা রবিবার যায় আর ওর চোখের দৃষ্টি পাল্টে যায়। একটু একটু করে। ওর চোখে ইদানীং কেমন অদ্ভুত এক দায়হীনতা দেখতে পায়।

চান করে ক্লাবে যাবে। এবার কতিপয়ত্ব ক্লাব। ক্লাবে গিয়ে বীয়ার খাবে—বিলিয়ার্ড খেলবে। ভাল লাগে না—ক্লাবটাকেও অফিস অফিস বলে মনে হয়। ছোমরা-চোমরারা আসেন। সেটকাটি ব্লাউজ আর বাকে কুচ করা খোঁপা নিয়ে তাদের স্ত্রীরা আসেন। আর তাঁরা সব সময় সুন্দর সুন্দর মুখ করে সুন্দর দাঁতে, মুচকি হাসেন।

বিমলের আজকাল খুব জানতে ইচ্ছে করে এরা কখনো কাঁদেন কি না, এরা কখনো হাসেন কি না। বাগলে এদের নাকের পাটা ফোলে কি না, কাঁদলে এদের কুৎসিত দেখায় কি না। কিন্তু তার উপায় নেই। এই এখানকার এয়ার-কনডিশান্ড সমাজে—অন্তর যাইরে যেই থেকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্ত স্বাভাবিকতাকে কনডিশান্ড করে ফেলেন। বিমলও করে ফেলেছে। আজকাল তাই ও আয়নায় চাইলে ওর চোখের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে। ও বোধহয় এখানে এসে বদলে গেছে।

প্রায় রবিবারই ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরে—তাকে যায় একা একা—কচিৎ কদাচিৎ কোনো সহকর্মীকে ডাকে—ডাকলেই আবার সেই অফিসের আলোচনা—ভাল লাগে না—তাই একাই যায়। বাইরে রোদ পড়ায়। খাওয়া দাওয়ার পর একা ঘরে পর্দা ফেলে ঘুমোয়।

তারপর বিকেল হয়।

তারপর আবার ক্লাবে সিনেমা দেখতে যায়। বড় সাহেবদের ছইস্কি অফার করে—ওর সাবর্ডিনেটরা ওকে ছইস্কি অফার করে। তারপর রেসা করে—ওর মাথার ঘন চেউনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে অচেতনে ওর হ্যাণ্ডার্ড হেডাল্ড চাপিয়ে কোয়ার্টারে আসে।

এমনি ধরা বাঁধা মাপা জীবনে মন বন্ধ হয়ে ওঠে বিমলের।

কোনোদিন সে স্বাভাবিক ছিল এ কথা মনেও পড়েনা আর।

বিমল শুয়ে শুয়ে তখনো ভাবছিল। বি, এ, সি পরীক্ষার পর নীতু আর রবির সঙ্গে বেড়াতে গেছিল ও। নীতুদের ছোট্ট ছবির মত বাড়ি ছিল নন্দন পাহাড়ের নীচে। এক টিলতে বাগান ছিল। চাঁপা আর হাসনুহানার ঘ্রাণ।

ওরা পনেরো দিন গেছিল। সারাদিন হুহু করে লাল ধুলো ওড়ানো হাওয়া বইত। সন্ধ্যায় বসাতো মুখুজ্জি দাদা টোপা টোপা জল ঘরে পড়ত—অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল সবগুলো একসঙ্গে ফুটে উঠে নীল আকাশের নীচে লাল চাবোয়ার মত দুলত। ওরা এমন একটা বয়সে সেখানে গিয়েছিল, যে বয়সে আশো সামান্য ঘটনাকে অসীম থাকে।

ওরা তিন বন্ধু ফাঁকা বাড়িতে হুরদাপ্ করে বেড়াত। রাতদুপুরে গল্পসাহিত্যি তুলে চান করত—বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে সাহিত্যের কথা আলোচনা করত—মানে আলোচনা করত না এমন বিষয় নেই।

নীতুদের বাগানের পাশে ঐ বাড়িরই কম্পাউণ্ডের ভিতরে আর একটি পুরোনো একতলা বাড়ি ছিল। নীতুরা যারা সেটা ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন সে বাড়িতে বিজলী আলো ছিলো না। রাত হলে লণ্ঠনের আলো জলত ঘরে, গলার আওয়াজ শোনা যেতো। কেরোসি গলবে।

বাড়িটা নীতুদের বাড়ির বাগান ঘুরে পিছনে না গেলে দেখা যেত না। তাই ওদিকটাতে কখনো গিয়ে অবধি যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় নীতু বলল, চল দিদিমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

দিদিমা কে?

ঐ পাশের বাড়ির দিদিমা। আমার ছোটবেলা থেকে ওঁরা ভাড়া আছেন—তাই উনি আমাকে নাতি বলেন।

ওরা তিনজনে গিয়ে পৌঁছল। চওড়া বারান্দা অন্ধকার ছিল। আকাশে চাঁদ-ধোয়া জলের মত জ্যোৎস্না। নীতু ডাকল, দিদিমা, ও দিদিমা! আমি নীতু।

ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা বিধবা বেরিয়ে এলেন, এসে বললেন, কি দাদু এতদিন—শুনতে পেয়েছি বাড়ির কাছে এসেছো—কিন্তু কই দেখা করতে তো এলে না এতদিন। বোসো, দাদু বোসো।

বৃদ্ধার গলায় কোনো অনুরাগের সুর ছিলো না। অভিমানের সুর ছিল।

তারপর বললেন, এরা কে দাদু?

নীতু বলল, এরা আমার বন্ধু দিদিমা। কলেজের বন্ধু। আমরা সকলে বি, এস্, সি, পরীক্ষা দিলাম। এই যে বিমল দেখছেন না দিদিমা ও খুব ভাল ছেলে—ওদের সব পরীক্ষায় স্টার্ও করেছে। আর এই যে রবি, ওনা আমার চেয়েও ভাল—পাশ করবে কি সন্দেহ।

নীতুর কথা শুনে ওরা সবাই, দিদিমা শুদ্ধ, হো হো করে হেসে উঠলেন।

দিদিমা বললেন, বোসো বোসো, চা খাও, তারপর গান শোনাও—তোমাদের গান শুনছি ত তোমাদের আসার পর থেকে। সারাদিন গান গাইছ। আমার নাতনীরা ও গান শোনাতে পারল। তাকি ওদের।

বৃদ্ধা ভিতরে চলে গেলেন। ওরা তিনজনে অন্ধকারে বসে রইল। চাঁদ-ধোয়া জ্যোৎস্নার ঝুরঝুরে হাওয়ায় চাঁপা আর হাসনুহানার গন্ধ ভেসে আসতে লাগল।

নীতু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বিমলকে চিমটি কাটল। বিমল মুখ ব্যাদিয়ে ওর মুখের কাছে কান নিয়ে বলল, কি? নীতু বলল, সাবধান। বুড়ি কিন্তু মহা ঘোড়েল—নাতনী পছন্দ করার ভালো আছে।

রবি বলল, উঃ চেয়ারে কি ছারপোকা রে।

নীতুর কথাটা বিমলের ভাল লাগল না। এঁরা গরীব যে তা ভাঙা বাড়ি ও আসবাবপত্রের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া দারিদ্রের একটা বিষণ্ণ আভা থাকে—মেঘলা দুপুরের আকাশের আভার মত—মনের হাসি দিয়ে সে বিষণ্ণতা কাটানোর মত মনের জোর বা শিক্ষার জোর না থাকে—গ্রামের বাড়িতে সেই বিষণ্ণতা অদৃশ্য অথচ শান্ত সানাইয়ের সুরের মত বাজতে থাকে। তা প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে ছোঁওয়া যায়।

তবু কেন জানি, বিমলের নীতুর কথাটা তীব্র গর্বময় না। ওদের অবস্থা ভাল বলে, ওরা ডিস্টিংশনে বেরেছে বি, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছে সুতরাং এদের থেকেই নিজেদের প্রত্যেককে এক একজন এলিজিবল ব্যাচেলর বলে ভাবতে শুরু করেছে বলেই—এই দরিদ্র বুদ্ধার প্রীতিকে অবহেলা করে তাকে এমন ভাবে অপমান করাটা ঠিক নয়।

বিমল মুখে কিছু বলল না। কিন্তু ওর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। নীতুকে বেশ খারাপ বলে মনে হলো।

এমন সময় ডিমি'র পেছন পেছন দুটি মেয়ে—শাড়ি জড়োসড়ো হয়ে বারান্দায় এলো। ডিমি লণ্ঠন হাতে এলেন। বললেন, এই আমার সেই নাতনীরা, মুই আর চামেলি। মুই এখানে বলেছে ভাই ইংরেজি পড়ে—আর্টস। চামেলি এবার স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে। মেয়ে আমার আগেই কাঁকি দিয়ে পালিয়েছে—জামাই থাকে কোলকাতায়। আমি এই নাতনীদের নিয়ে আছি। সঙ্গে অবশ্য আমার এক লেডার থাকে। সে একটু বেড়িয়েছে।

মেয়ে দুটি যেমন জড়োসড়ো হয়ে এসেছিলো, আসলে তেমন জড়োসড়ো নয়—বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বেশ টান টান হয়ে যোগোনডোনিয়ার কন্যার মত দাঁড়ালো। লণ্ঠনের আলোয় ওদের চোখ চিক্‌চিক্ করতে লাগলো।

বিমল ভালো করে তাকালো। লম্বা সাধারণ উঁচুতের ছুরে শাড়ি পরে আছে—সমস্ত চেহারা, দাঁড়ানোর ভঙ্গী—চোখের চাউনি সব কিছুর মধ্যে একটি অমায়িক সরলতা—বিশেষ করে বড় মেয়েটির।

বিমলের হঠাৎ কেমন ভাল লেগে গেল।

বড় মেয়েটি স্পষ্ট, নয় মিষ্টি গলায় বলল, আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে কে ভাল গান গাইতে পারেন?

নীতু বলল, বিমল।

একটা গান শোনান না?

বিমল খুব লজ্জা পেল, রীতিমত ঘেমে উঠল, বলল, যাঃ, আমি পারি না। তারপর চাউটাউ নেড়ে বলল, দিদি গায়, দিদির কাছ থেকে শুনে শুনে একটু একটু বাথরুমে চর্চা করে গাই। সে কি বাইরে গাওয়ার মত।

নীতু বলল, একটা আবার বাইরে শোনাবে কোথায়? এত ভিডারই। তারপর নীতু মেয়ে দুটির সঙ্গে এমন এক অন্তরঙ্গ এমন এক সুরে কথা বলতে আরম্ভ করল যে বিমলের খারাপ লাগতে লাগল। নীতুদের বাড়িতে ভাড়া আছে বলে, যেন ওদের খুশুরের মেয়ে বলে কথার অধিকার আছে নীতুর। বিমলের ভীষণ রাগ হতে লাগল নীতুর উপর। কলেজে চার বছর পাশাপাশি বসে ও একসঙ্গে আড্ডা মেরেও কাউকে এটুকু যে চেনা যায় না তা বুঝতে পারল।

বিমল মুখ নীচু করে বসে থাকল। একটু পরে চামেলি, এক কাপ চা করে ও দুটি করে থিন্‌এ্যারারুট বিস্কিট এনে দিল। তারপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নীতুর এরকম অন্তরঙ্গ ব্যবহার না বোঝার মত বোকা বলে ওদের দুজনের কাউকেই মনে হলো না। তাছাড়া কোথায় অন্তরঙ্গতার শেষ এবং কোথায় অন্তরঙ্গতার সুরু এ কথা মেয়েদের বলে বোঝাতে হয় না। ওদের চোখে তখনই এক-রে লাগিয়ে দিয়েছেন। ওরা নিজেরা কেন কি বলতে বা করতে চাইছে। তবে ওরা সত্যিই খুব বুদ্ধিমতী ও ভদ্র বলে অনেক অভদ্র লোকই পার পেয়ে যায়—এবং পার পেয়ে গিয়ে নিজের বিদ্যে বাহাদুরী নিজে প্রচার করে বেড়ায়।

মুই প্রায় স্মিত মুখ তুলে বলল, শোনান না। এত করে বলছি। আমরা ত কেউ বড় গাইয়ে নই। আপনাদের মতও ত গাইতে পারি না আমরা।

রবি বলল, নে নে, আর ঢং বাড়াস না। গেয়ে ফেল দেখি। নীতু বলল, সেই গানটা গা, তোর সেই পেটেন্ট গান—"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে," গা' না।

বিমল একটু ইতস্ততঃ করে নেয়েই ফেলল।

মাঝে মাঝে গান গাইতে ইচ্ছে করে, সব সময় করে না। যখন ইচ্ছে করে তখন সকলেই তার নিজের সাধ্যমত সবাই ভাল গায়। সেদিন বিমলেরও তেমনি ভীষণ ভীষণ ভীষণ গান গাইতে ইচ্ছা করল।

গান শেষ হলে, চামেলি বলল, খুব সপ্রতিভ গলায়, এমা; আপনি বেশ ডাকা-আছেন ত। এত ভাল গান,

আর অমন মেয়েলিপনায় কচ্ছিলেন কেন। যুঁই কোনো কথা বলল না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হ্যারিকেনের আলোয় ওর উজ্জ্বল চোখ দুটি সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকের ফসফরাসের মত জ্বলছিল।

পরদিন আরো এক কাণ্ড হয়েছিল। রোহিনীর রাস্তায় বেড়াতে গেছিল বিমল। একা। বিকেল বেলা। পথে একটা শালবন পড়ে। পাতা প্রায় সবই ঝরে গেছে। সেই লাল করা পাতার পথে মচমচানি তুলে হাঁটতে ভারি ভাল লাগছিল বিমলের। মনে হচ্ছিল ওর বুকের মধ্যে পাপর ভাজার মত সকুমো কোন কিছু মচমচিয়ে গুড়ো হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় যুঁই-এর সঙ্গে দেখা। একটা কালো কটকী শাড়ি পড়েছিল যুঁই। গায়ে একটি লাল ব্লাউজ। ব্লাউজ বুঝতে পারেনি বিমল, যুঁইকে অতখানি ভাল দেখতে এই শেষ বিকেলে শালবনের পটভূমিতে ওকে হঠাৎ দেখে বিমলের বুকটা ভালোলাগায় ধুক্ ধুক্ করতে লাগল।

যুঁই ওকে আসতে দেখে দাঁড়াল—তারপর বিমল কাছাকাছি আসতেই এক চিলতে হাসল. বলল. মিঃ মাস্কেটিয়ার্সের অস্ত্রটা কোথায়?

বিমল উত্তর না দিয়ে হাসল।

যুঁই-কোনোরকম ভূমিকা না করে বলল, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না ত?

কি?

আপনার বন্ধুদের সঙ্গে কিন্তু আপনার কোন মিল নেই।

কেন? আমি খুব বোকা না?

যুঁই বলল, তা জানি না। তবে মিল নেই। আপনিও জানেন নেই। তবে আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

বিমল বলল, ও কথা থাক। কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি। বন্ধুর বাড়ি গেছিলাম। আপনি?

আমিও বাড়ি।

তবে চলুন একসঙ্গে যাই।

ওরা দুজন অনেকখানি পথ একসঙ্গে হাঁটল।

যুঁই বলল, বলুন আপনার গান শুনে এত ভাল লেগেছিল যুঁই ঘুমে কাঁদতে পারিনি কিছু। আপনি কিছু ভাবেন নি ত?

বিমল বলল, মুখে সব কথা না বলাই ভাল। তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, ভাল গান ইচ্ছে করলেই গাওয়া যায় না—আপনি চমৎকার গান গাইতে নিতে জানেন।

যুঁই হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিমলের দিকে।

তারপর আবার চুপ করে হাঁটতে লাগল। ওরা যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন ডিমারিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে রেলগাড়ি গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ করে চলে গেল। হাঁটতে হাঁটতে যুঁই বলল, ডিমারিয়ায় গেছেন এসে অবধি?

না। বিমল বলল।

যাবেন?

যেতে পারি। আপনি নিয়ে যাবেন?

নিয়ে যাবো। যদি আপনি একা যান।

একা? কি যেন ভেবেছিল বিমল, তারপর বলেছিল, বেশ।

ডিমারিয়া পাহাড়ে সেদিনই একদিন ওরা দুজনে গেছিল। দুপুরবেলা সাইকেলে চড়ে। বন্ধুদের না জানিয়ে বাজার থেকে সাইকেল ভাড়া করে গেছিল। যুঁইকে কেরিয়ারে বসিয়ে নিয়ে গেছিল। তারপর ওরা অনেক অনেক গল্প করেছিল। দিনের শেষে ডিমারিয়া পাহাড়কে সাক্ষী রেখে বিমল হঠাৎ বলেছিল, আমি প্রতীক্ষা করছি যে আপনাকে কখনো ভুলব না। সারাজীবনের সম্পর্ক গড়ব আপনার সঙ্গে।

যুঁই হেসে বলেছিল, আমরা কি এ্যাবেরিজিন্স্? অত তাড়াতাড়ি এসব বড় বড় কথা বলতে হয় না। তাছাড়া আপনি এখনও ত ছেলেমানুষ—জীবনের কত পথ বাকি আছে—কত বন্ধু আসবে আপনার জীবনে—কত বান্ধবী—তাই এসব প্রতীক্ষা টতীক্ষা করবেন না। তার চেয়ে প্রতীক্ষা করুন, ডিমারিয়া পাহাড়ের নীচে এই যে একটা দিন, এমন একটা সুন্দর দিন কাটালাম আমরা—গল্প করে, গান গেয়ে, আমার কখনো না একেবারে চুপ করে থেকে—এই দিনটিকে কেন আমরা মনে করে রাখি। দুপুর বেলা, আমাদের সামনে ঘূর্ণিহাওয়ার যে সুন্দর নাচ দেখালো—সেই নাচের কথা ভুলে রাখি। আজ আপনি আমার সঙ্গে যেমন মিষ্টি, ভদ্র ও সভ্য ব্যবহার করলেন—এ কথা আমি যেন মনে রাখি। প্রতীক্ষা করার কত কি আছে। এমন সব প্রতীক্ষা করবেন না, যে সব প্রতীক্ষা ধারা যায় না।

বিমল খুব বেশ দেখিল। মনমাতিও হয়েছি বলেছিল, তার চেয়ে বেশ না কেন আমি যে সাধারণের সম্পর্কে পড়তে চাই আপনার সঙ্গে এ আপনার পঞ্চম আসলে আমাকে আপনার একটুও ভাল লাগেনি।

যুঁই অনেকক্ষণ বিমলের মুখের দিকে চেয়েছিল। তারপর অদ্ভুত হেঁয়ালি ভরা চোখে চেয়ে একটুখানি হেসে বলেছিল, তাহলে, ভাল লাগেনি।

তারপর হেওয়রের সেই কটি দিন কবে কেমন করে, ধীরে ধীরে যে মুছে গেছে জীবন থেকে বিমল টেরও পায় নি। বাইরে থেকে ফিরে এসে কোলকাতার জীবনে একবার মিশিয়ে গেলে, সে জীবন পিছন ফিরে তাকাতে দেয় কাউকে—তাই তাকাতে পারেও নি।

রুমা, মল্লিকা, মিনি সকলে ওর চারপাশে ভীড় করেছিল।—খড়াভরা ছিল, আড্ডা ছিল, কত কি ছিল। একদিন পরীক্ষারও শেষ হয়ে গেল। মল্লিকা ওকে খানিক ভালবাসত—বিমলও যে ওকে ভালোবাসত না তা নয় ওদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কিন্তু রবির বাবা হঠাৎ একটা পঞ্চাশ লাখ টাকার লোভেক্টের কনট্রাক্ট পেয়ে যাওয়ায় মল্লিকার শেষকালে রবিকেই বিয়ে করতে হল। আফটার অল্—পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যাপার।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল বিমল। নীতুটাই ঠিক বলত। ভালোবাসা টালোবাসা বলে কিছু নেই টোমেটিরের লেফুয়াতে। এখানে শুধু টাকার মোহ আছে, শরীর আছে, কিছুদিন ভক্তের মত ভালোবাসার ভান করে কাছাকাছি থাকা আছে। আসলে সবাই একা। বিমলের মত একা—ভীষণ ভীষণ একা।

ভোর থেকেই বিমল বেশ নার্ভাস বোধ করছিল।

মিসেস মুখার্জীকে আগে কখনো দেখেনি। চেম্বুরী বলছিল খুব নাকি সুন্দরী মহিলা। বয়সে স্ত্রী—সুন্দরী অসুন্দরী দিয়ে বিমলের কি যাবে আসবে—ভদ্রমহিলা ব্যবহারটা ভাল করলেই যথেষ্ট।

ভাল করে আস্তে আস্তে নিখুঁতভাবে দাড়ি কামাল বিমল। আলমারী থেকে একটা ভাল হাওয়াইন শার্ট বের করল। বইয়ের র‍্যাকের ধুলো ঝেড়ে সীতবিতানটাকে টেনে বের করল, পাতের নটা নাগাদ ওর বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়ল।

গ্যারেজ পেরিয়ে কারপোর্ট এ্যাভিন্যুতে গিয়ে পড়তে বড় জোর পাঁচ মিনিট লাগল গাড়িতে।

বেয়ারা বিমলকে এনে বসবার ঘরে বসাল।

একটু পর ভিতর থেকে হুড়দার সঙ্গে মুখার্জী সাহেবের আসার শব্দ শুনল বিমল। মুখার্জী সাহেব ছোট শর্টস্ পরে আছেন গায়ে কলারওয়ালা স্পোর্টস গেঞ্জি।

বললেন, গুড মর্ণিং সেন। আমি একটু খাচ্ছি টম জারিয়ার কাছে মাছ ধরতে। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি আমার স্ত্রীর—আপনারা ঠিক-ঠাক করুন—আমার ও গান টান একেবারেই আসেনা।

তারপর পর্দার ওপাশে গিয়ে আবার মুখার্জী সাহেব বললেন, কই? যুঁই এসো।

নামটা শুনেও বিমলের কিছু মনে হয় নি—। এক নামেও কত লোকই থাকে—তাছাড়া হেওয়রের যুঁইয়ের যে মুখার্জী সাহেবের মত লোকের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে এ কথা ভাবার মত কোনো সঙ্গত কারণও ছিলোনা। কিন্তু, যেই পর্দা ঠেলে মিসেস মুখার্জী এসে দাঁড়ালেন শুধু কাপেট পাতা ঘরে—বিমল লাফিয়ে উঠল। জোর হাতে নমস্কার করল।

যুঁই বলল, বসুন বসুন। তারপর মুখার্জী সাহেবের দিকে ফিরে বলল, ঠিক লোককেই ধরে এনেছ—এঁর গান আমি শুনেছি—একবার আমাদের আলাপও হয়েছিল।

মুখার্জী সাহেব বললেন, বাইন, তবে ত আমার আলাপ করাবারও দরকার নেই। তোমরা হারমনিয়াম নিয়ে চ্যান্টো সুরু করে দাও আমি দেখি গোটা দুই ভাল সাইডের কই ধরতে পারি কিনা। এই বলে মুখার্জী সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

বিমল কি বলবে, ভেবে পেলো না। একদিন নীতু যার ঘিরিমাকে ঘোড়েল বলেছিল, তার পেয়েছিল যে মহিলা ঘিরিমী তাঁর নাতনীদের ভাষের খাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবে,

(শেষাংশ ৩৬১ পৃষ্ঠায়)

হরিণী

এমন মনে হচ্ছিল। কিছুর প্রাণ ছিল না।

কিন্তু জলটা চকচক করছিল, আয়নার মতন ঝক ঝক করছিল।

যেন নিচের গুগলি শামুক বালি টাদ চোখে পড়ছিল। জায়গায় জায়গায় কালচে সবুজ শ্যাওলার মতন থোকা থোকা নানাজাতের ঘাস দেখা যাচ্ছিল।

তা হলেও জলের দিকে আমার মোটেই মনোযোগ ছিল না। ফাঁক হয়ে থাকা পাকুড়ের ডালটা দেখছিলাম। একটা ধোঁয়ার রঙের সাপ বুক থেকে মাথা পর্যন্ত অর্ধেকটা শরীর শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে জলের দিকে চেয়ে আছে। আশ্চর্য চোখ দুটো, কত উজ্জ্বল, কী ভয়ংকর স্থির। মাথাটা কিন্তু একবারও নড়ছিল না, ফণা দুলছিল না। বুক পিঠ ও গলাটা এমন ভাবে বেঁকিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল, হঠাৎ আমার মনে হল একটা লম্বাটডার মতন কিছু পাকুড়ের ডাল থেকে বেরিয়ে জলের ওপর ঝুলছে। কিন্তু তারপর আমার গা শিরশির করে ওঠে, কালো লিকলিকে সরু চেরা জিভটা যখন চোখে পড়ল। কেননা গাছ লতাপাতা জল মাছ আকাশ—পৃথিবীর সব কিছু যখন স্থির, পাথরের মতন বোবা নিরেট হয়ে আছে, হঠাৎ একটা কিছু থরথর নড়ছে কাঁপছে চিকচিক করছে, আপনা থেকেই চোখটা সেদিকে যাবে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে গেল।

'জগু!' ভয়ে ভয়ে পাশের মানুষটাকে ডাকলাম।

'কি হয়েছে!' জগু রুখে উঠল। কপাল থেকে ঝাকড়া চুলের গোছা সরিয়ে আমার দিকে চোখ তুলল। আঙুল দিয়ে আমি পাকুড়ের ডালটা দেখালাম।

জগু সেদিকে চোখ ফেরাল, এবং তখনই গলার স্বর নরম করে ফেলল। আমার চোখে চোখ রেখে একটু হাসল। 'থাক না, তোর তো কিছু ক্ষতি করছে না, ওর জায়গায় ও আছে।'

কাজেই আমি চুপ করে রইলাম;

চশমটা খুলে রেখে জগু ডান পায়ের গোড়ালিটা ঘাসের ওপর ঘষছিল। গায়ের জামা আগেই খুলে ফেলেছিল। বেশ তার গোড়ালি চুলকোচ্ছিল। এই জন্য ডান পা-টা টান করে দিয়ে নরম ঘাসের ওপর জোরে জোরে ঘষছিল। আমার অনুমান এটা। আমার এ-ও হতে পারে, ভাবলাম, নরম কচি ঘাস পেয়ে জগু খুব করে পা ঘষে নিচ্ছে, ঘষতে ভাল লাগছে। আমার চটি জোড়া পায়েই ছিল, তা বলেও ঘাসের ওপর বসে চমৎকার আরাম পাচ্ছিলাম, হাতের তেলোর নিচে দুর্বা ঘাস মখমলের মতন খোলায়েম নরম ঠেকছিল।

হুঁ, জগু ঘাসের ওপর গোড়ালি ঘষছিল। আর আমি জলের ওপর ঝুঁয়ে পড়া পাকুড়ের ডালটা দেখছিলাম। দেখলাম এর মধ্যেই দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একটা ডাল বেয়ে সাপটা আস্তে আস্তে, যেন খুব সাবধানে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ধোঁয়ার রং হলেও সবটা পিঠে চিকচিক কাটা রুপালি আঁচড় চোখে পড়ল। খুব হালকা আঁচড়। দেখা যায় কি যায় না। আর পেটটা যেন সবুজ হলুদের মাঝামাঝি একটা রং। গাছের পাতা যখন শুকোতে আরম্ভ করে এই রং ধরে। অর্থাৎ পাতার সঙ্গে গাছের ডালের সঙ্গে মিলে থাকার সবরকম সুবিধে ঈশ্বর ওকে দিয়েছে, চিন্তা করে মনে মনে হাসলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। কেননা তখনি একটা পাখির বাসা আমার চোখে পড়ল। খুব উঁচুর দিকে, দুটো সরু ডালের মাঝখানে, খড়কুটো দিয়ে তৈরী ছোট সুন্দর বাসা। কেমন হায় হায় করে উঠতে ইচ্ছা করল আমার। এই জন্যই শয়তান ওই ডালটা বেয়ে চুপি চুপি ওপরে উঠে যাচ্ছে।

জগুকে আর ডাকলাম না। ধনক লাগাত আমাকে চোখ লাল করত দাঁত খিঁচোত। যা স্বভাব তার। একটুতেই মেজাজ খারাপ করছে কদিন ধরে। অগত্যা চুপ থেকে ঘাস বন্ধ করে গাছের ওপর বসবাসটার কীর্তি দেখছিলাম। একটা ঢিল টিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারব কিনা চিন্তা করলাম। কিন্তু ওদিক থেকে চোখ নামিয়ে যে ঢিল খুঁজব আমার সেই সময় ছিল না। এক সেকেণ্ডের জন্য আর কোনোদিকে তাকিয়ে

সময় নষ্টই করতে ইচ্ছা করছিল না। দেখছিলাম, ডাঙ্গাটার আর মাত্র দু'হাত আড়াই হাত বাকি, ওইটুকুন ওপরে উঠে গেলেই পাখির বাসাটা নাগাল পেত, কিন্তু হঠাৎ যেন তার সুমতি হল, সুমতি কি অত কু-বুদ্ধির মাথায় ছিল জানি না, আর ওপরের দিকে গেল না, আড় হয়ে একটা ডাল ওপাশের একটা কাকড়া মাথা স্যাওড়া গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে, ওই ডাল বেয়ে স্যাওড়া গাছে নেমে গেল। তারপর আর দেখা গেল না। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারলাম। এবং তখনি চোখে পড়ল রোগা অতন দুটো পাখি কোথা থেকে টি-টি শব্দ করতে করতে পাকুড় গাছের মাথায় সেই ছোট্ট বাসাটায় এসে ঢুকল। তাতে আরও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম। বাসায় ডিম বা ছানা নেই। থাকলে কর্তা গিন্নী একদণ্ডে বাসা ছেড়ে চলে যেত না। অন্তত এক জন পাহারা দিতে থেকে যেত।

যাই হোক; সাপটা চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার হাওয়া ছাড়তে আরম্ভ করল। গাছ লতাপাতা এবং আমাদের পায়ের কাছে দীঘির জল এক সঙ্গে নড়ে উঠল, মনে হল সব কিছু আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে, আকাশের এক কোণায় বরফের চাকা হয়ে সাদা মেঘটা এতক্ষণ ঝুলছিল, সেটাও দিব্যি চলতে আরম্ভ করল। জলের নিচে সেই স্যাওলার মতন অন্ধকার ঘাসের ফাঁকে কটা পুঁটি মাছকে হঠাৎ অতি-মাত্রায় চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল, মনে হচ্ছিল কতগুলি রুপোর চাকতি ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

হয়তো এসব দেখেই মনটা বেশ সরল তাজা হয়ে উঠল। এতক্ষণ এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাটছিল।

দেখলাম, জগু ইতিমধ্যে সার্ট গেঞ্জি খুলে ফেলে পুঁটলি করে সব ঘাসের ওপর রেখে দিয়েছে।

এই প্রথম জগুর খোলা পিঠ আমার চোখে পড়ল। আর কোনোদিন দেখিনি। চমৎকার পিটানো সাঁওতা। রংটা বেশ কালো। তার ওপর এইটা হেঁটে এসে ঘামছিল বলে পিঠটা অদ্ভুত চকচক করছিল। দেখাদেখি আমিও সার্টটা খুলে ঘাসের ওপর রাখলাম। কিন্তু গেঞ্জিটা খেকে গেল। রোগা শরীর নিয়ে একেবারে উদম গা হতে লজ্জা করছিল।

'জগুদা!' আস্তে ডাকলাম। তখন আর ঘাসের ওপর গোড়ালি ঘষছিল না, পা গুটিয়ে নিয়ে মাথা কাকড়া চুলের ভিতর একটা হাত ডুবিয়ে দিয়ে গভীর কিছু যেন চিন্তা করছিল। আমি কথা বলতে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ বড় করে তাকাল।

'কি বলছিস?'

একটু ঘাবড়ে গেলাম। যখন মন খারাপ বা গোঁজা টানে তখন না হয় আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এছাড়াও সময় সময় তার চোখ এত লাল হয়ে ওঠে, তাই দেখছিলাম এখন। এত কাছের মানুষ আমি, বলতে গেলে ছায়ার মতন সব সময় সঙ্গে সঙ্গে আছি, কিন্তু ওই চোখ দেখে মাঝে মাঝে আমারও গলা শুকিয়ে যায়।

তবু আমাকে হাসতে হয়। হাসতে পারি আমি। তা না হলে তার কটমটে লাল চোখ দেখে আর পাঁচটা মানুষের মতন ভয়ে মুখ কালো করে থাকলে আমাকে সে এক নম্বর সাকরেদ বলে কোনোদিন স্বীকার করে নিতে পারত কি। আমার তো মনে হয় না।

হেসে বললাম, 'আর কতটা হাঁটতে হবে আমাদের?'

'কেন, তোর পায়ে ব্যথা নেমেছে নাকি!'

শেয়ালের মতন চোখ দুটো নিয়ে জগু মুখ বেঁকিয়ে খানিকটা হাসল। 'যেন খুব দেমিয়ে পড়েছিস?

'না তা নয়।' বিড়বিড় করে বললাম, তারপর চুপ করে রইলাম।

জগু দীঘির জলে মাছের খেলা দেখতে লাগল। একটু সময় সেদিকে চেয়ে থেকে পরে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না, আর হাঁটতে হবে না, এসে গেছি।'

শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমিও তাই অনুমান করছিলাম। কেননা কবে যেন একবার সে বলেছিল,

প্রকাণ্ড একটা দীঘি আছে। চারদিকে অনেক গাছপালা।

তা ছাড়া হাঁটাও আমাদের কম হয়নি। সেই ভোর বেলা, কি যেন ষ্টেশনটার নাম, ট্রেন থামতে শুভর কথা মতন নেমে পড়তে হয়েছিল। তারপর এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টার ওপর দু'জনে হেঁটেছি। ওপাশে একটা কদম গাছের মাথার কাছে সূর্যটা জ্বলছিল। বেলা দশটা বাজে, অনুমান করতে কষ্ট হল না।

'কেমন লাগছে জায়গাটা তোর?' শুভ আবার আমার দিকে চোখ ফেরাল। তার চোখের লালটা কিকে হয়ে এসেছিল। সম্ভবত দীঘির ঠাণ্ডা জল ও কপালি পুঁটির ঝাঁকের খেলা দেখে মেজাজটা নরম হয়ে এল।

বললাম, 'চমৎকার! ভারি সুন্দর জায়গা।'

শুভ আর কিছু বলল না। চোখ তুলে মাথার ওপর সবুজ পাতার ফাঁকের ও সোনালি রোদের ঝিলিমিলি দেখতে লাগল। বাতাসটা জোরে বইছিল। দীঘির জল ছলছল শব্দ করছিল। গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছিল। আমাদের পিছনে একটা ঝলসা গাছে মউমাছি বাসা বেঁধেছিল, এখানে এসেই গাছের ডালে মাটির ঢিবির মতন কালো প্রকাণ্ড জিনিসটা আমার চোখে পড়ে। যেন হঠাৎ বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ার দরুণ মউমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করে গুনগুন শব্দ ছুড়ে দিল। আর ঠিক তখনি কোথা থেকে একটা কাঠবিড়াল ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়াল, তারপর ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঘাসের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল।

'বেটা ঘাবড়ে গেছে!' শুভ আমার চোখে চোখ রেখে হো-হো করে হাসল।

'তা হবে!' আমিও হাসলাম। 'নতুন মুখ দেখেছে।' হাসিটা আরও কিছুক্ষণ মুখে ধরে রেখে শুভ নূতন করে ঘুরার ওপর গোড়ালিটা ঘষল। তারপর এক সময় গম্ভীর হয়ে গেল। তার ঝাকড়া মাথার কাছে দুটো মউমাছি উড়ে এসে জোরে ঘুরার চক্কর মেরে অন্যদিকে উড়ে গেল। আমি প্রথম থেকেই ভাবছিলাম, এখানে এই অবস্থায় আমাদের দু'টি মানুষকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কেবল কাঠবিড়াল কেন, চারিদিকের গাছের সবাপাতা মাটি জল, এমন কি পোকামাকড়গুলিও আমাদের দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়েছে, ভয় পাবার কথা। এখন দু'টি মুখের সঙ্গে তাদের মোটে পরিচয় নেই। কেবল কি মুখ, আমাদের নিশ্বাস আমাদের গায়ের গন্ধ আমাদের তাকানোটাও তাদের কাছে বিদঘুটে বেখাপ্পা লাগছে।

টাটকা বাতাস চামড়ার লাগাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললাম। শুভর মতন উদম গা হয়ে চটি জোড়া খুলে রেখে ঘাসের ওপর চেপে বসলাম। শুভ চোখ পাকিয়ে আমার হাড় জিরজিরে বাইশ ইঞ্চি বুক ও বার্লিকাগজের মতন ফ্যাসফেসে পাতলা চামড়া দেখে কিছু যেন ভাবল।

যাই ভাবুক, মনের দিক থেকে আমাদের দুজনের যে অমিল ছিল না, সরু মোটার কোনো ব্যাপারই সেখানে মাথা গলাতে পারত না, শুভর চেয়ে এ জিনিস আর কে বেশি বুঝত। তা না হলে আমি তার পদ্মা নম্বরের সাকরেদ হলাম কি করে। আমাকে এত খাতির করত কেন সে।

ঁ, শহরের এত ধোঁয়া কালি ময়লা দুজনের শরীরের পরতে পরতে জমা হয়ে আছে। রক্তের মধ্যে গাঁজা কোকেন আফিং চোলাইয়ের বিষ ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

ছুয়া খেলি আমরা, সত্যর মেরেধাড়ুম খুঁজি; খুঁজে পাওয়ার পরেও আবার দর কষাকষি করি, তারপর চোখ রাঙাই, তাতেও সুবিধা হচ্ছে না দেখলে ছোরা দেখাই।

ছোরাটাই আমাদের জীবিকা— বল ভরসা বন্ধু বা আত্মীয় বলতেও ওটাই। একটা না থাকলে, শুধু শিস দুজনের কোমরে কাপড়ের নিচে দু'তুটো শুদ্ধা ছোরা চল্লিশ ঘণ্টা বেল্টের আংটায় ঝুলছে। কাজেই যা বলছিলাম, এত সব শুদ্ধ নিয়ে— তুরিবুরি সুকীর্তি নিয়ে আমরা এখানে, এই নিরালা ঠাণ্ডা দীঘির পাড়, গাছ-গাছালি রৌদ্র ছায়া মউমাছির জগতে চুপচাপ বসে

থাকলেও ভয়ের বেমানান ঠেকছিল আমাদের, যেন আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্ছিল তোরবেলার একটা শিশির ধোয়া টাটকা ফুলের ওপর দু'জন দুটো ময়লা মাছি হয়ে চেপে বসেছি।

কিন্তু একটা কথা সত্য। আমাদের মনে তখনকার মতন কোনো ময়লা ছিল না। কোনোরকম নোংরোমী।

আর ময়লা নোংরোমী আমরা শহরে রেখে এসেছিলাম। হ্যাঁ, মদ বেশ্যা ফুর্তি বাটপাড়ি চুরি চালাচালি চোখ রাঙারাঙি ফুসুরবাজি কিছুই সঙ্গে আনিনি।

মনটাকে প্রায় বিশুদ্ধ করে দু'জনে এই জনশূন্য পাকুড় ফলসার জঙ্গলে ছুটে এসেছি। তারপর জলের ধারে বিশ্রাম করছি।

'হাবু!' জগু ডাকল। আমি চোখ তুললাম। একদলা থু থু ফেলে জগু আমার দিকে মুখ ফেরাল। 'খাবার টাবার কিছু এনেছিলি?'

'এনেছি বৈকি।' ঝোলা ঝেড়ে কাপড়ের তলা থেকে একটা পুঁটলি বার করলাম। আমার জানা ছিল, এসব যোগাড় রাখার ব্যাপারে জগুর খেয়াল কত কম, নেই-ই একরকম। তারপর বিনা হুট করে একসময় বলে বসবে, 'খিদে পেয়েছে, কিছু সঙ্গে থাকে তো দে খাই।' তখন আমাকেই ঠেলা সামলাতে হয়, না হলে চোখ লাল, মেজাজ খারাপ।

অবশ্য আমি তার চেলা—এক নম্বরের সাকরেদ। তার সুখ সুবিধা আমাকেই দেখতে হয়। ছোট খাট ব্যাপার মনে রাখা সব দিক খেয়াল করে চলার তীব্র সময় থাকে না, মেজাজও থাকে না অনেক বড় বড় জিনিস নিয়ে সে মাথা ঘামায়। এই জন্যই, যদি কোথাও দূরের রাস্তায় পাড়ি দিতে হয় তো, খাবারটা জলের বোতলটা সিগারেট দেশলাই এবং টুকিটাকি জিনিসগুলি আমাকেই মনে করে সঙ্গে নিতে হয়।

পুঁটলি খুলতে জগু খুশি। আগেই একটা সিদ্ধ ডিম ভেঙে মুখে পুরল, তারপর একটা পাউরুটি তুলে নিয়ে রাক্ষসের মতন কামড়াতে আরম্ভ করল। বেজায় খিদে পেয়েছে একটা ডিম ও পাউরুটি তুলে নিলাম, চারটে ডিম এনেছিলাম, দুটো এক পাউও রুটি। সব পেয়ালদার জিনিস। ট্রেনে চাপবার আগে স্ল্যাটফরমের বাইরের রাস্তার পাশের মর্কটমুখের দোকান থেকে কিনে এনেছিলাম। ঘাম দেওয়া হয়নি বলিও। ঘামে কেনা। জগু সঙ্গে থাকলে হট করে নগদ দাম চাইবে এমন সাহস কোনো চাষের আছে বলে আমার জানা ছিল না, অন্তত বৌবাজার বেন্টালস থেকে আরম্ভ করে ওদিকে একটানা এদিকে বালিকতলা—এই চহারটের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে সঙ্গে সঙ্গে কড়ি ফেলতে হবে, না হলে জগুকে ঘাস দেবে না। একটা প্রতাপ প্রতিপত্তি সে এসব জায়গায় করে রেখেছিল। হাওড়া শিবপুর কি বেহালা বজবজের কথা আমার জানা ছিল না ঠিকই। জলের বোতল বার করে দিলাম। জগু মাথা নাড়ল।

'গরম হয়ে আছে ওটা। তার চেয়ে নীচের জল অনেক বেশি মিঠা, ঠাণ্ডা।'

'তা তো হবেই।' পেয়ালদার কলের জল উপুড় করে ঘাসের ওপর ঢেলে দিয়ে হাসলাম। খালি ছুটছাট শব্দ করে বোতলটা নিয়ে ঢালু পাড় বেয়ে নিচে নামলাম। ছুটছাট শব্দ করে বোতলে জল ঢুকছিল। আমি ঝাড় তুলে পাকুড় পাতার সবুজ জলের দেখলাম। নিচের ছোট ডালগুলিতে মেলা শালিক চড়ুই নাচানাচি করছিল।

জল খেয়ে জগু চেহারা তুলল।

আমি সিগারেট বার করে দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে জগু বুক ভরে ধোঁয়া টানল এবং বাকিটা আকাশে ছড়িয়ে দিল। এলোমেলো হাওয়ায় ধোঁয়াটা কুয়াশার মতন উড়তে উড়তে ফলসা গাছে বৌচাকের গায়ে গিয়ে ঠেকল।

চোখ তুলে দৃশ্যটা উপভোগ করলাম। জগু হঠাৎ গজগজ করে উঠল।

'তুই একটা বুদ্ধু।'

'কেন!' চোখ দিয়ে তার চোখের দিকে তাকাতে সে ভেংচি কাটল। অবশ্য মুখে হাসি নিয়েই তার এই ভেংচি।

'সবই তো এনেছিস দেখছি, ওটা আনলি না কেন?'

চুপ করে পায়ের নিচের ঘাস দেখলাম। অর্থাৎ কথাটা বুঝতে দেরি হচ্ছে ইচ্ছে করে এমন একটা ভান করলাম। সিগারেটটা ফেঁরে ফোঁরে টেনে শেষ করল সে। তারপর পোড়া বিড়িটা দীঘির জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বড় করে হাই তুলল। হাইটা মিলিয়ে যাবার পর আমার কাঁধে কাকুনি দিল।

'কি বলছি শুনছিস?'

'হুঁ।' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করলাম। মুখ শুকনো করে বললাম, 'আর আর এ জিনিস হবে না, অন্তত এখানে হবে না, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে গুরু।'

'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কি?' যেন একটু ওড়কে গিয়ে জগু আমার মুখ দেখল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তা না হলে আমার তো কিছু কাজ ছিল না।' শুকনো মুখে হাসি টেনে বললাম, 'জলের বোতল ভরে এনেছি, না হয় আর একটা বোতল সঙ্গে আনতাম।'

ঘাড় গুঁজে জগু নখ দিয়ে দুটো ঘাস ছিঁড়ল।

'এই জন্য কষ্টেটাও আনিনি।' বিড়বিড় করে বললাম, 'কোনোরকম নেশা ভাঙ এখানে করবে না জেনেশুনে সব রেখে এসেছি।'

'এমন করে বলছিস তুই!' জগু আমার দিকে তাকাল না। জলের দিকে চোখ রেখে হাসল। 'যেন কোন তীর্থে এসে গেছি আমরা, যেন দেব দেবীর পিঠ এটা।' একটু থেমে থেকে সে অনেকটা নিজের মনে বলল, 'না হয় একটু গুলিটুলি চড়ান যেত, তাতে আর তেমন কি দোষ ছিল।'

'না, গুরু, আর না, এখন না।' অনুনয়ের গলায় বললাম, 'অন্তত যে কাজে এসেছি সেটা তো আগে সিদ্ধ হোক, যাকে দেখতে এলাম তাকে দেখতে দাও।'

'তাকে দেখা হয়ে গেছে।' ভুরু কুঁচকে জগু পাকুড় গাছটার দিকে আঙুল তুলে দিল। 'এতক্ষণ ওই ডালটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তবে কি দেখলি হাঁদারাম।'

প্রথমটায় বুঝতে পারলাম, তারপর খি-হি করে হাসলাম। জগু রসিকতা করছে। পাকুড়ের জলে সাপ ঝুলছিল, সাপের কথা বলছে। দোষ নেই তার, মনে মনে বললাম, নেশা ভাং-এর শরীর, হাতের কাছে তেমন কিছু পাচ্ছে না বলে হঠাৎ মেজাজ খারাপ করে এমন একটা মোটা রসিকতা করল। অস্বীকার করব না, নেশার অভাবে আমার কেতরটাও আইঢাই করছিল। হুঁ, দশটা বেজে গেছে, এগারোটা বাজে এখন ঠিক এই সময়টায়, তেমন কিছু কাজ করবার থাকে না বলে বৈঠকখানা বাজারের আমুর ওষাদের পিছনে বসে আমরা কষে নিয়ে বসি। আরো দু-চারজন ইয়ার দোস্ত এসে জোটে। বৈঠকখানায় সুবিধা না হলে সোজা চলে যাই রাজাবাজারের আড্ডায়। সেখানে গুলিটা জমে ভাল। গুলি চরস দুটোই জমে। হুঁ, ঠিক এই সময়, রোদ ঝিমঝিম করে রাস্তায় পিচ গলতে আরম্ভ করে, আপিসবাবুদের ছুটোছুটি থেমে যায়, ছেলেমেয়েরা কাঁক বেঁধে ইস্কুল কলেজে, ছোট্ট মাছের বাজার গরম হতে থাকে, আনাজের বাজারে জল ছিটানোর ধুম পড়ে যায়—উঁহু, এবেলা তেমন জুতসই শিকার জোটে না বলে বেহদা এখানে ওখানে ঘুরঘুর না করে আমরা কোথাও একত্র হয়ে জমে থাকি, গাঁজা আফিং চরস ভাং—যা হোক একটা শুকনো নেশা।

'আর একটা সিগারেট খাও গুরু।' জগুর দিকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বাড়িয়ে দিলাম।

জগু সিগারেট তুলে নিল। বিড় বিড় করে বলল, 'ধোঁয়া দিয়ে মুখের স্বাদ মেটাতে বলছিস।' এক বলা থুথু ফেলে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল সে।

কথাটা অস্বীকার করলাম কেমন করে। চুপ করে রইলাম। সিগারেটের ধোঁয়া গিলে কি আর সে সব নেশা জমে।

ইচ্ছা হচ্ছিল না, তা হলেও জগুর দেখাদেখি আমিও শেষটায় একটা সিগারেট ধরালাম। দেখতে দেখতে ভাওয়াটা আবার পড়ে গেল। আবার যেন আকাশ মাটি জল গাছপালা সব জমে পাথর হয়ে গেল। পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ গরম সীসা হয়ে গলে গলে মাথায় মুখে পড়ছিল। তা তো হবেই

মধ্যাহ্নকাল, লাফিয়ে লাফিয়ে সূর্য কোথায় উঠে যাচ্ছে। চোখের ওপর দেখছিলাম।

'এবার কিন্তু জায়গা বদল করে বসতে হয়।' আস্তে বললাম, তবু শব্দ করল না। চোখ বুজে একমনে সিগারেট টানছিল। যেন সিগারেটই তার নেশা ধরে যাচ্ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দেখছিলাম, কোথাও ঘর বাড়ি কিছু চোখে পড়ে কিনা। কিন্তু চারিদিকে ঝোপ ঝাড় ও লম্বা লম্বা গাছ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছিল না। আর মাঝখানে আয়নার মতন টলটলে এই দীঘি। পুঁটিমাছগুলি একভাবে খেলা করে যাচ্ছিল।

'কি দেখছিস?' তবু চোখ খুলে আমার মুখ দেখল।

'কিছুই না।' চোক গিলে বললাম, 'পুঁটিমাছ দেখছি।' তারপর হেসে বললাম, 'মাথায় রোদ লাগছে।'

'তবে আর না ছায়ায় গিয়ে বসি।' তবু ঘাড় ফিরিয়ে কলসা গাছের পিছনে বাতাবীলেবুর বন ছায়াটা দেখল। 'ওখানটায় ঠাণ্ডা আছে।'

দুজনে উঠে গিয়ে বাতাবীলেবু গাছের নিচে বসলাম।

'কিন্তু ঘরবাড়ি যে কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না গুরু।' হুট করে কথাটা না বলে পারলাম না।

'ঘরবাড়ি দিয়ে আমাদের কী হবে।' তবু আলস্যের হাই তুলল। ঘন্টা ঠাণ্ডা ছায়া পেয়ে ঘাসের ওপর শরীরের আধখানা ছড়িয়ে আরাম করে বসল সে। তার কথা শুনে হাবভাব দেখে অবাক হলাম, মনে কেমন খটকা লাগল। এই মাত্র পাহাড় গাছের সাপটাকে নিয়ে সে রসিকতা করছিল। তবে কি সেটাই সত্য! ঘর বাড়ি না থাকলে এখানে মানুষ থাকবে না জানা কথা। তার মানে সবটাই জঙ্গল। অথচ একজনকে দেখতেই এতদূর ছুটে আসা। তবুর গরজেই আসা। তবুর সঙ্গে আসিও সুন্দর মানুষটিকে দেখব।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

'কি হল!' এক চোখ ছোট করে তবু মিটিমিটি হাসে।

'এক ঠাণ্ডা মিছু গুরু।' না বলে পারলাম না। হেসে হেসেই বললাম যদিও, 'কোথায় তোমার সেই মানুষ? বলছিলে ঠাদের আলোর মতন গায়ের রং, হরিণীর চোখের মতন চোখ, চুল দেখলে অমাবস্যার রাত মনে পড়ে—'

'হুঁ, তবে কি মিছা বলছি তোকে।' যেন ধাক্কা খেয়ে তবু সোজা হয়ে বসল। 'ঐ দেবদারু গাছটার মতন একহারা ছিপছিপে শরীর, তবে কিনা পিছনটা বেশ ভারি, ডিমঅলা হাঁসের মতন, যখন হাঁটে মনে হয় যদি হাঁসটা হেঁটে যাচ্ছে।'

যেন আমার জিভে জল এল, বড় করে একটা ঢোক গিললাম। 'কিন্তু কোথায়, কাউকে তো দেখছি না। এই ঝাড় জঙ্গলের ভেতর জনমনষ্যি আছে বলে মনে হয় কি।' ঘাড় ঘুরিয়ে আবার চারদিক দেখতে লাগলাম।

'সবটাই ঝাড় জঙ্গল হবে কেন বুঝ, আঙুল দিয়ে দীঘির পুব পাড়ের কদম গাছটা দেখাল। 'বনতুলসী আর কাশবাসকের ঝোপে ওদিকটা ঢেকে আছে, দুপা এগিয়ে গিয়ে ওখানে উঁকি দিলেই ঘর দেখতে পাবি।' হুঁ, টিনের ঘর। 'তাই বলো।' ঝোপঝাড়ের পিছনে ঘর লুকিয়ে থাকতে পারে এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। দীঘির পুব পাড়ে কদম গাছের দিকে তখনই আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করল। তবুর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'তা হলে আর এখানে বসে থেকে লাভ কি, অনেকক্ষণ তো জিরানো হল, এবার আমরা আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগোই।'

'এমন উতলা হয়ে গেছিস তুই।' তবু উঠল না, বরং ঘাসের ওপর আবার শরীরের অর্ধেকটা ছড়িয়ে দিয়ে বড় করে হাই তুলল। 'একটু অপেক্ষা কর না গাধা, দীঘিতে চান করতে আসবে, দেখবি তখন রাজারানীর মতো কেমন ঘাট আলো করে যেবে।'

'কোথায় ঘাট!' জলের দিকে চোখ ফেরালাম। 'ঐ যে!' আঙুল দিয়ে দীঘির পুব দক্ষিণ কোন দেখিয়ে দিল তবু। 'তালের গুঁড়ি বিছিয়ে কেমন চমৎকার ঘাট বাঁধা হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না!

তাই দেখলাম, দীঘির কালো জল তিরতির করে ঘাটের দিকে ছুটে যাচ্ছে, তাদের গুঁড়িতে বাড়ি খেয়ে জল ছলছল শব্দ করছে। জলের শব্দ পরিষ্কার কানে এল।

'তুমি এই ঘাট বেঁধে দিয়েছিলে শুভ, তাই না?'

'হবে হয়তো, ভাল মনে নেই।' পাত ছড়িয়ে হাসতে গিয়ে শুভ গম্ভীর হয়ে গেল। তবে এই ঘাট বাঁধা হয়েছিল সব তারিখ মনে করতে গিয়ে সব সে গুলিয়ে ফেলছিল যেন। 'হবে কিনা', কাঁকড়া চুলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে শুভ মাথা চুলকায়, 'হালে ঘাটটা মেরামত করা হয়েছে, দুটো নতুন গাছ কেটে বসান হয়েছে, তাই মনে হচ্ছেনা তোর?'

'হবে হয়তো।' বিড়বিড় করে বললাম, 'কতকাল তুমি এদিকে আসছ না, হয়তো কাঠ পচে গিয়েছিল, সিঁড়ি ভেঙে পড়েছিল, তারপর আবার নতুন গাছ কেটে বসান হয়েছে।'

কথা না বলে শুভ শরীরের বাকি আধখানা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিল। তার রকমসকম মোটেই ভাল লাগল না। আমার মনে হয় ওখানে গিয়ে বসলে ভাল হত। দীঘির পূবদক্ষিণ কোণ থেকে কিছুতেই চোখটা সরাতে পারছিলাম না। হুঁ, তাদের গুঁড়ির ওপর দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসা যেত, ঠাণ্ডা জলে হাওয়াটা গায়ে লাগত, আর ঠিক ঘাটের ওপর ওটা বুঝি কামরাঙা গাছ, আধা কতটা জায়গা জুড়ে ছায়া ছড়িয়ে আছে।'

কথাটা নিজের মনেই বলছিলাম। শুভ শুনল। শুনে রাগ করল না, চোখ লাল করল না। বরং শুয়ে থেকে তলপেট নাচিয়ে হাসল একটু সময়। তারপর মুখটা গম্ভীর করে বলল।

'শালা নেমেমানুষের নামে এমন আদেখলেপনা শুরু করেছিস। ওখানে বসে কামরাঙা গাছের হাওয়া খাব দুজনে। ঘাটে গিয়ে আমরা আসন পাতলে একটি জেনানা চান করে কেমন করে শুনি। পেটে সাবান মাখতে হয় তাকে, পিঠে সাবান ঘষতে হয়।'

তাও বটে! যেন ব্যাপারটা মনেই ছিল না। লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম। আমি এখানে কালচু লোক। শুভর সামনে যেমন তেমন, কিন্তু আমি কাছে থাকলে কেউ পিঠ উদম করে আর একটি মানুষের সামনে মাথায় অনেক অসুবিধা যে।

হুঁ, শুভর জেনানা আছে—কথাটা কি জানতাম, জেনেছিলাম এভাবে। সেদিন দুপুরে মানিকতলা খালপোলের কাছে দাঁড়িয়ে দুজন সিগারেট টানছিলাম। ইচ্ছা করেই শুভ ও আমি পোলের মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। না, তেমন কোনো শিকার সামনে ছিল না, দাঁড়াতে হয়েছিল অন্য কারণে। দেখছিলাম লাইটপোস্টের একফালি ছায়াটার নিচে একটি জেনানা কতক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ভারি খাপসুরত চেহারা। আগুনের মতন গায়ের রং, এদিকে সঙ্গে কেউ নেই, আর রাস্তাটাও তখন হঠাৎ এমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কলকাতা শহরে অনেক সময় তাই হয়, কোনো কোনো রাস্তা যদিও, তা বলে আমাদের সেয়ানদা বৌবাজারের ওদিকটা এই জন্মে কোনোদিন, অন্তত দু'মিনিটের জন্য ফাঁকা হু হু ময়দানের চেহারা ধরবে ভাবতেও গা কেমন কাঁটা দেয়—বলে কিনা রাত দুটো আড়াইটায়ও যেখানে মাছের বাজার লেগে থাকে।

কিন্তু সেই গনগনে দুপুরের রোদে, মানিকতলা পোলের কাছটা তাই ঘষেছিল। এই বাস চলছিল, ট্রাক চলছিল, রিক্সা ট্যাক্সি প্রাইভেট টেলা, আর পিপড়ের সার বেঁধে রাস্তার দুধারে কিলবিল করে ছুটছিল মানুষ, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঝুতুড়ে সময় এল, যেন মন্ত্রের জোরে কোথায় কোন্‌দিকে সব মিলিয়ে গেল। তাজ্জব বনে যাওয়ার মতন ব্যাপার আর কি। কিছু নেই বলতে পোলের এপাড় ওপাড় ও এতবড় পোলটার ওপর মাছিটাও যেন চোখে পড়ছিল না। তিন থেকে চার মিনিটের মতন এই সাংঘাতিক থমথমে ভাবটা ছিল। একবার চিন্তা করে দেখুন, ঝটঝট করছে দিনের আলো, মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছে, পোলের নিচে খালের ভিতর কটা খড়ের নৌকো না কাঠের নৌকো দাঁড়িয়ে।

মার্কিনদাদের কথাবার্তা শোনে, ওদিকে আমাদের পিছনে বাঙালদের কথাবার্তা বেশ কানে আসে, ওদিকে মারহাট্টাদের ঝোড়ে মোটরের পোঁ পোঁ ভোঁ ভাঁ, ট্রানের চাকা, আর এখানটা একেবারে নিঝুম শ্মশানপুরী, আর সেই শ্মশান আলো যে পাঁড়িয়ে আছে তা না কাটা পরী। যুবতী নারী। যেমন নাক চোখ তেমনি কোমর পাছা মাথার চুল পায়ের নখ। আমাদের জন্যদিতে

দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ভয়ও। যেন খাসে বন্ধ হয়ে এল। দুই মদের কিন্তু কী করতে পারতাম আমরা, কিছুই করার ছিল না। পলিসুঁতি হলে কথা ছিল, হাতেরবেলা হলেও একটু চেষ্টা চরিত্র করা যেত, কিন্তু ঐ যে বলসাম, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—শ' ফেরুন গজ ছুটে গেলেই খাড়ি খোড়া মাঠ বৈ নয়। অবশ্য পুরো তিন ঘেকে চার মিনিট জায়গাটা ফাঁকা ছিল। তবে কিনা যদি পোলের দিকটা ফাঁকা থাকত তাহলে নৌকো-টৌকো কিছু না থাকলেও তা হলেও একটা সুবিধে হয়ে যেত। কাছেই চুপ করে দাঁড়িয়ে দুজন কেবল ফিসফিসাচ্ছিল আর একজন আর একজনের গা টিপছিল। বুঝতে পারছিলাম, খুব একটা ধনে জনে মেয়েছেলে না, অবশ্য একটা খুব খানদানী ঘরের জেনানাও না এই মাঝারি ধরনের ঘরের মেয়েছেলে। কিন্তু তাহলেও যেন ভালিম ফাটা হল। আমার মাথা ঘরে ছিল তার মাথা গরম হচ্ছিল। টসটস করে ঘাম পড়ছিল। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। চারমিনিট আমাদের পক্ষে উদ্ভুক মাথার ওপর প্লেন, যে কোন ট্রানবাস বোমারু বাজারে ছিড় হয়ে নৌকোয় মার্কিনের —কিছুই আমরা গ্রাহ্য করতাম না, পরিষ্কার কাছে কাঁপিয়ে পড়তাম, দুজনের সঙ্গে ছোরা ছিল। কিন্তু না, কেবল ওদের জন্য নয়ের ওই মাংসের জন্য একটা সুঁচি আমরা সাধারণত ব, নিতান্ত, ওই মেয়েছেলে গায়ে বেশ সোনা দানা আছে, ব এরকম অবস্থায় পাঁচশ টাকে সঙ্গে রয়েছে। ছিল না, কাজেই অপমান করে সঙ্গে টাকাকড়ি নেই। আর গয়না? কী বলে, ঐ চুল বাঁধার মতন একটা ঘড়ি, তা-ও কব্জির বাঁধা দিয়ে আসবেন—এ ছাড়া সারা গায়ে সোনাদানা দুরের কথা দু'চুল ভিনিস বলতে যেকটিন পাঁচ চোখে পড়ল না। দুই এক এক সময় ভাবি, কলকাতার মেয়েছেলে, খানদানি ঘরের মেয়ে কি সাধারণ পরিবারের মেয়ে, বড্ড বেশি চালাক হয়ে গেছে। হাতাদ চলাচলি করার সময়, হুঁ, সবই থাকে হাবের, চুল বাঁধার স্টাইল কাপড় পরার স্টাইল হাঁটার কায়দা কথা বলার কায়দা গালে হাত ঠোঁটে হাত চোখে কাজল কপালে টিপ কিন্তু গয়নাটি গায়ে রাখবে না, সব খুলে রেখে একেবারে নিরুক সেজে রাস্তায় পা বাড়াবে। যেন ওটাই আর একটা স্টাইল। এই জন্য আমাদের

অসুবিধা হত, আমাদের দিন কে দিন রুমিরোজগারের রীতিমত ভাঁটা পড়ছিল। তার পরার কিছুই নেই সে না হয় এই স্টাইল করুক, এছাড়া উপায়ই বা কি, কিন্তু যার আছে সে কেন এমন ন্যাংটা হয়ে বেরোবে, নিদেন চুড়িটা হারটা গায়ে রাখতে দোষ কি, না-ই বা পরল বাউটি চুর অনন্ত টায়রা কোমর-বিছে। সেসব ভারি ভারি গয়না বাক্সে তোলা থাকুক ব্যাঙ্কে তাই জমা পড়ুক, আমাদের কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু—

যাকগে, যে কথা হচ্ছিল, যখন দেখলাম শ্রীমতীর গায়ে মালকড়ি কিছুই নেই, আমাদের উৎসাহটা দপ্ করে নিভে গেল। তবে কিনা যুবতী মেয়েছেলের শরীরের লোভ, কিন্তু সে আর কতক্ষণ কতটুকুন, যতক্ষণ চোখে দেখা ততক্ষণই জ্বালা হাঁসফাঁস, চোখের বাইরে গেলে কিছুই মনে থাকে না। তা না হ'লে কলকাতা শহরে রাতদিন কত জেনানা তো চোখের ওপর দেখছি। চারদিকে রূপ যৌবনের কিছু কমও নেই। যদি ওই কেবল মাথায় নিয়ে ঘুরতাম তো ধরেছিল আর কি। রুমিরোজগার করে খেয়ে পরে শরীরটাকে খারা রাখতে হত না, ফুসফুসে পচন ধরত নয়তো ব্লাড প্রেসারে ভুগে এই দুর্বল ছোট বয়সেই পটল তুলতে হত, তবুকেও ত্রিশ বছরের তাগড়া পেটানো শরীরটা নিয়ে কলকাতা শহরের বুকের ওপর এমন কাপ্তেনি করে খেয়ে বেঁচে থাকতে হত না, অনেক আগেই স্যুটুস করে নিভে যেত, ফুরিয়ে যেত।

মেয়েমানুষকে ভোগ করতে হয় আমরা অন্যভাবে করি, তার লাইন আলাদা, এর ফন্দিফিকির আমাদের কম জানা নেই। আর এ লাইনের ছুড়িটুড়ি পেলে আমরা কখনই তার পিছু ছাড়ি না। কিন্তু রুমিরোজগারের সঙ্গে এই জিনিস আমরা কখনো ভুলিয়ে ফেলতে দেই না। সেদিনের নারকেলডাঙার ব্যাপারটা মনে রাখার মতন। শাঁসালো একটা শিকারের খবর পেয়ে রাত দু'টোর সময় ওই তল্লাটে আমাকে প্রভুকে ছুটে যেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিকারটা ফস্‌কে যায়। ভুল খবরের জন্য এটা হয়েছিল পরে বোঝা গেছে, এবং যে লোক খবরটা এনে দিয়েছিল তাকে যে প্রভু কী মারই না মেরেছিল সে আমি জানি। তা হলেও সেদিন নারকেলডাঙায় গিয়ে আমাদের লাভই হয়েছিল।

শিকারটা হাতছাড়া হয়ে যেতে প্রভু ও আমি সুখনের দোকানে ঢুকে পড়লাম, আমাদের জানা লোক, দলের লোকও বলা চলে। সেই যে নতুন লেক হয়েছে, কাছাকাছি কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার ডিপো, ঠিক তার পিছনেই একটা খুব মাথা উঁচু লাল গাছ আছে, লালগাছের নিচেই সুখনের তাড়ির দোকান। অনেকদিন দেখা হয় না, আমাদের দেখে সে খুব খুশি হল। ঘুমোচ্ছিল, ঘুম থেকে ডেকে তুলতে দোকানের ঝাঁপ খুলে সমাদর করে দুজনকে ভিতরে নিয়ে বসাল। তাড়ির দোকান, তা হলেও আমরা তাড়ি না গিলে তিনজন জুড়ে নিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলাম। ঘনটম নিয়ে সুখনের দোকান থেকে, যখন বেরোই তখনো বেশ একটু অন্ধকার ছিল। কেবল পুব দিকটায় পাতলা সিঁদুরের একটা পোচ দেখা যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না। তখনো রাস্তায় বাস বেরোয়নি। কাদাপাড়ার ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে বেলেঘাটার দিকে চলে যাব, ততক্ষণে বাস বেরিয়ে পড়বে, সেখান থেকে একটা বাস ধরে শেয়ালদা কিম্বা এই মতলব নিয়ে দুজনে সুখনের দোকান থেকে বেরিয়েছিলাম। কেন না আসবার সময় রাজাবাজারের রাস্তা ধরে হেঁটে এসেছিলাম, যাবার সময় আর ওই পথে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তা হলে ঘোড়ের পুলিস সন্দেহ করত। পুলিস অবশ্য আমাদের চিনে গিয়েছিল, ন'মাস ছ'মাস করে আমি দু দুবার খেটে এসেছি, প্রভু একবারেই পুরো দেড় বছর খেটে এসেছিল। কাজেই সেদিক থেকে আমরা মার্কামারা হয়ে ছিলাম। যাই হোক সুখনের দোকান পিছনে রেখে কাদাপাড়ার রাস্তা ধরে আমরা প্রায় একশ গজ এগিয়ে গেছি, হঠাৎ চোখ পড়ল উল্টোদিক থেকে একজন কেউ আসছে। আমরা আরো দুপা এগোবার পর বুঝতে পারলাম মেয়েছেলে। বুকের ভিতর চড়াক করে উঠল। দুজন দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক রাস্তার মাঝখানে না দাঁড়িয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুঝুন কী আয়না, আর

ভোর হয়ে এসেছিল, কিন্তু কাক প্রাণীটিকেও রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন নিস্তব্ধি থমথম করছে। রাস্তার ওপারে কিছু জোপঝাড় একটা রাকড়া তেঁতুল গাছ। আর এপারে একটা পড়ো বাড়ি ছাড়া ধারে কাছে আর কিছু ছিল না। আগে ওখানটায় বস্তি ছিল। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটার সব ভাঙা পড়ে, জায়গাটা শ্মশানের চেহারা ধরেছিল। হুঁ, মেয়েটা আর একটু সামনে আসতে আমাদের দৃষ্টিও রীতিমত জাকাতে সুরু করল, দেখলাম একেবারে টাটকা যৌবন; যেন নতুন বিয়ে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর ও পায়ে আলতা পরবার নমুনা দেখে এটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কেন জানি কাঁদছেন, দেখলাম হাতে একটা পুঁটুলি। তখনি অনুমান করলাম রাগারাগি করে অথবা অন্য কোনো ব্যাপারে কষ্ট বা যন্ত্রণা পেয়ে মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কাছে কি ভাইয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। আবার উল্টোটাও হতে পারে, হয়তো ভাইদের সঙ্গে রাগারাগি করে শ্বশুরবাড়ি বরের কাছে ফিরে যাচ্ছে। এখন আসল ব্যাপার কি কে জানে। তবে মেয়েটি যে ধারে কাছে থাকে, অথবা ধারে কাছে কোনো বাড়িতে যাচ্ছে বুঝতে কষ্ট হল না, তা না হলে এমন অসময়ে গলির মতন একটা রাস্তা ধরে, যেখানে বাস চলে না রিক্সটার পর্যন্ত চলতে কষ্ট হয়, হেঁটে কোথায় যেতে পারে, কতদূর যাবে—এসব কথা আমরা পরে চিন্তা করেছিলাম, তখন একটা চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় ছিল না। যদিও এমন ফাঁকা জায়গা, আর ঐ বয়সের মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তৈরী হয়ে গেলাম, মুখে কাপড় গুজে মেয়েটাকে পড়ো বাড়িটার মধ্যে এনে ঢোকাব, জগু আমাকে চোখের ইসারাও করল, কিন্তু তখনি আবার সে আমার হাত চেপে ধরল। কি ব্যাপার? না, গায়ে সোনা আছে। চোখ দুটো ছোট করে গাছের আড়াল থেকে আমিও দেখলাম। গলায় একটা সরু হার রয়েছে, পূবদিকের সিঁদুরের আলোটা লেগে জিনিসটা চিকচিক করছে, হাতের চুড়িগুলি ব্রঞ্জের কিনতে কষ্ট হল না। তা হলেও যেটুকু সোনা পাওয়া যাচ্ছে তাই যথেষ্ট। জগুর দেখাদেখি কোমর থেকে ছোরাটা বার করে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক সেকেণ্ড দেরি না করে গলা থেকে হারটা খুলে সে আমাদের হাতে তুলে দিল। আমরা আমাদের রাস্তায় চলে গেলাম। সে যেদিকে যাচ্ছিল চলে গেল। আমরা আঙুল দিয়েও তাকে ছুঁয়ে দেখিনি।

এখন থানিকতলা পোলের মুখে থাকে দেখে আমাদের লাভা গড়াচ্ছিল, কিন্তু বললাম, এমন খোলামেলা জায়গা—কেবল ওই বকতকে রাস্তার চামড়াটার জন্য মেয়েগুলে একটা গোলমালের মধ্যে পা বাড়ান, উহুঁ, কিছুতেই পোষাত না।

অর্থাৎ ব্যাপারটা আমরা সেখানেই চুকে বুকে যেতে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আর একজন যেন তা চাইছিল না।

কী বলব, ইজ্জত যার যার নিজের কাছে। কলকাতা শহরে বাজে বেআদব মেয়েছেলে আমরা কম দেখেছি কি—কিন্তু ওই ছোটলোক মেয়েটা, ছোটলোকই বলব, জমকালো শাড়ি ব্লাউজ গায়ে জড়িয়ে মো পাউডার মেখে হাতে ঘড়ি বেঁধে সকলেই তো আর বের হয় না, এর চেয়ে একটা বেশ্যাও অনেক বেশি ভদ্র, অনেক বেশি সুন্দর ব্যবহার জানে—হুঁ, কারণ কি, না আমাকে দেখে থুতু ফেলল, জগুকে দেখে জগুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা বেঁকিয়ে আর একবার থুতু ফেলল। বুঝুন, কী আস্কেল! আমরা তার গায়ে গিয়ে পড়িনি, চোখের ইসারা করিনি, হাত দিয়ে ডাকিনি, কমসে কম বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে দু'জনে সিগারেট টানছিলাম।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে হাত রাখল। তার কোমরের ওটা, সাচ্চা নেপালী জিনিস—নেপালী কিরিচ, আমারটা দেশী কামারের তৈরী—হুঁ, যেন তখনি ছুটে গিয়ে জগু ছোটলোক মেয়েটার পেট ফেড়ে দেয়। আমি বাধা দিলাম বলে আমারও গা কামড়াচ্ছিল। তা হলেও এদের ক্ষেত্রে একজনকে সামাল দিয়ে চলতে হয়, জগুর হাত চেপে ধরলাম।

ধরে না রাখলে সেই দুপুরে সে খানিকটা খাল গোলের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত। রেগে গেলে জন্তু যে কী সাংঘাতিক মানুষ হয় আমি জানি, চার বছর তার সঙ্গে আছি।

হুঁ, ঠিক তখনই একটা রিক্স নিয়ে পুরুষটা এল। বুঝলাম এই জন্যই সুন্দরী এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ঈশ্বর জানে—সোয়ামী কি পেয়ারের কেউ। রিক্সটা যখন চলতে আরম্ভ করল পুরুষটার গায়ে গা ঠেকিয়ে কিতকিত করে হাসছিল আর পুটপুট করে কি সব বলছিল।

বলব কি আমার তখন আফশোস হচ্ছিল, জন্তুকে বাধা দেওয়া ঠিক হয়নি, আমার তখন ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে রিক্স থেকে টেনে নামিয়ে শালীর তলপেট ফাঁসিয়ে দেই।

দুপুরের ব্যাপার, রাত্রেও কামড়টা ভুলতে পারছিল না জন্তু। আমারও থেকে থেকে কথাটা মনে হচ্ছিল। ভিতরটা জ্বালা করে উঠছিল। তা হলেও অপমানটা জন্তুর বেশী লেগেছিল। লাগবে আমি জানতাম। বলে কিনা বিশটা মরদ যার কথায় ওঠে বসে—দরকার হলে যার এক কথায় তারা জান দিতেও পিছপা হয় না, অর্ধেকটা কোলকাতা শহর জুড়ে যার এক নাম ডাক, দরকার হলে পুলিসকে পর্যন্ত যে হপ্তা পাইয়ে দিতে জানে, দুবার একবার দিয়েছেও—আর ঠিক তাকে মেরে একটা মেয়ে খুন হেসল, এবা কাজটা করে দিব্যি পার পেয়ে গেল। আমরা কিছুই করতে পারলাম না।

রাত্রে বৈঠকখানা বাজারে আলুর আড়তের পিছনে একটা মাথাভাঙা অশথ গাছের নিচে দুজন বোতল নিয়ে বসেছিলাম। রাত একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বাজারের আলোটালো নিভে গিয়েছিল। অশথ পাতার ফাঁক দিয়ে ছুটো ঝকঝকে তারা দেখা যাচ্ছিল। শুঁটকির গুদাম থেকে শুঁটকির গন্ধ ভেসে আসছিল। পাশের প্রস্রাবখানা থেকেও চড়া গন্ধটা এসে নাকে লাগছিল। আবার থেকে থেকে চমৎকার বেলফুলের গন্ধও টের পাচ্ছিলাম। সম্ভবত আড়তের হিন্দুস্থানী দারোয়ান মাটির টবে বেলফুলের চারা লাগিয়েছিল, রাত্রে ফুল ফুটে গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

না, আরও একটা বারোয়ারি মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগছিল। ধারে কাছে কোথাও তাই করে রাখা হাঁড়ির ভিতর আখ আনারস ছিল, হয়তো অতিরিক্ত পেকে উঠে মদের মতন গন্ধ ছড়াচ্ছিল। অর্থাৎ তাল মন্দ নানারকম গন্ধের মতন মদ খেতে বসে তাল মন্দ নানারকম চিন্তা আমাদের বুকের ভিতর ঘরদোরের ভিতর পাক খেয়ে উঠছিল। যেন সেই রাত্রে আমরা অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। একেবারে ভিন্ন মেজাজ নিয়ে দু নম্বর ছুটো বোতল দুজনে মিলে সাবাড় করতে লেগে গিয়েছিলাম। খু খু ছিটানোর অপমানটা তো ছিলই, তার পরের ছবিটা মনে করেও আমরা কম উত্তেজিত হচ্ছিলাম না; উত্তেজিত হচ্ছিলাম, আবার কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়ছিলাম। রিক্সর চড়ে পুরুষটার গায়ের সঙ্গে লেপটে থেকে সেই ডাসাকাটা পরী, বজ্জাত মেয়েছেলেটা হাসতে হাসতে ধাপমারীর দিকে চলে গেল। 'যেন আমরা জেনানা নিয়ে ঘর করিনি, যেন শালা কলকাতার রাস্তা আমাদের ঘর বাড়ি, বৌয়ের আঁচলের বাতাস গায়ে লাগলে মন মেজাজ কেমন থাকে আমরা যেন কোনো কালে জানতাম না।' জন্তুর গলার ভিতর গুমগুম আওয়াজ হচ্ছিল।

'ঠিক বলেছ, গুরু, ঠিক বলেছ।' আমারও ঘরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, বৌয়ের কথা। কাঁকড়া চিবোনো বন্ধ করে জন্তু চোখ তুলে জলজলে তার ছুটো দেখছিল। আমার চেয়ে জন্তু অনেক বেশি কাহিল হয়ে পড়েছিল বুঝতে পারছিলাম। বললাম, 'গায়ের সঙ্গে লেপটে থেকে আমার জেনানাও কিতকিত করে হাসত।'

'তোর জেনানা এখন কোথায়।' জন্তু চমকে উঠেছিল। চমকে ওঠার কথা। বৌ নিয়ে ঘরবাড়ি নিয়ে কোনোদিন দুজনে এক জায়গায় বসে কথা বলিনি।

তখন আমি চোখ নিচু করলাম, ইতস্তত করলাম, তা হলেও গুরুর কাছে কথাটা স্বীকার না করে পারলাম

না। 'ভয়ানক খিটখিটে কত্ত আমার ঘরের জেনানা মেজাজ দেখাত, আমি জুয়া খেললে তার গোসা, মদ খেলে গোসা, গাঁজা টানলে গোসা—মানে একত্তর ঘর করা মুস্কিল হয়ে পড়ল।'

'তোর যা স্বভাব।' বোতল উপুড় করে গলায় ঢেলে জন্ত ঢেঁচি কাটার মতন চেহারা করল। 'হুঁ, তারপর?'

'নাসিরপুরের পাটকলের কাম ছেড়ে দিয়ে আড্ডা মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরঘুর করছি, ভয়ানক গোলমাল সুরু করল গিন্নী, তড়পাতে আরম্ভ করল, হৈ-চৈ করে বাড়ি ঘর মাথায় তুলল। হুঁ, কোর্ট কাছারির কথা বলছিল একদিন।'

'বাস্ রে! তারপর?' কাঁকড়া চিবোনো বন্ধ করে জন্ত কথা শুনছিল। চোখ বড় করে আমার মুখ দেখছিল। আমি হাসলাম। মনের কষ্টেই হাসলাম। 'অনেকদিন পর মানুষটাকে মনে পড়েছে গুরু, পেটে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম, পোয়াতি ছিল, পেটে বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজল।'

'শালা তুই একটা জানোয়ার'। জন্ত আর আমার মুখ দেখছিল না। অশ্বত্থ পাতার দিকে চোখ তুলে দিয়েছিল। যেন আমায় ঘেন্না করছিল। আমার মুখ থেকে এমন একটা গল্প শুনবে, মোটেই সে তৈরী ছিল না। তখনি আর একটা বোতলের ছিপি খুলে এক সঙ্গে এতটা গলায় ঢেলেছিল, আমার চেয়ে সে অনেক বেশি খাচ্ছিল। দুপুর বেলা মানিকতলার সেই ব্যাপারটার পর থেকে অনেক বেশি মাথা গরম ছিল তার, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

'তোমার জেনানা কোথায় গুরু?' ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছিলাম। এবার তোমার ঘরের কথা বলো, শুনি।'

'আছে, আমার ঘর আছে জেনানা আছে।' যেন মুখ থেকে গাঁজলা ছুটছিল, তাড়াতাড়ি কাঁকড়া তাবায় কামড় বসিয়ে জন্ত হাসছিল। 'আমি তোর মতন জানোয়ার নই, আহম্মক নই, আমার সোনার হরিণ আমি জিইয়ে রেখেছি, মরতে দেইনি।'

'আহা, বড় সুন্দর কথা ভাল কথা।' খুশি হয়ে মাথা নাঁকালাম। তারপর বিরস গলায় বললাম, 'তবে কিনা আমার ওটা কালো কুচ্ছিত ছিল পেত্নী ছিল খেংরা কাঠির মতন দেখতে ছিল, লাথি মারতে প্রাণে একটু লাগল না গুরু।'

'তুই শালা পশু, ভয়ানক বেরসিক।' আকাশের দিকে মুখ তুলে জন্ত ফুক ফুক করে হাসছিল। 'বলে কিনা ক্ষেত্তের বেগুন কানা হলেও মিষ্টি বেশি উঠোনের লাউ কুমড়ো বুড়ো হলেও তার অন্ত সোয়াদ। বলে কিনা, ঘরের বেড়াল, খোঁড়া হলেও মারতে নেই তাড়াতে নেই—'

একটা ছুটো ইঁদুর ধরে—তাই বা মন্দ কি। আহা, শোন কথা! অবাক হয়ে শুনছিলাম। অবাক হবার মতন কথাই বলছিল আমার গুরু সেদিন বৈঠকখানা বাজারে আলুর গুদামের পিছনে বসে।'

'হুঁ, বৌকে সে কদম অশ্বত্থ পাকুড় ফলসার ঘেসে রেখে দিয়েছে, ভয়ানক বড় একটা দীঘি আছে সেখানে, সারাক্ষণ জল ছলছল করে পুঁটি মাছ খেলা করে। উঁহু, জঙ্গলে আছে বলে গিন্নী যে কেবল ঘাসপাতা খায় শুধু সেটা তা নয়। জমিজিরেত করে দিয়েছে জন্ত, আরাম করে মানুষটা থাকবে বলে কত বড় টিনের ঘর বানিয়ে দিয়েছে। যদি কেউ একবার সেখানে যায় তো দেখতে পাবে জন্তর জেনানা কেমন মনের সুখে খৈ মুড়ি ভাজছে মুখ-মসুর ঘরে তুলছে হাঁস-মুর্গি তদারক করছে।

'ভয়ানক করিৎকর্মা মেয়েছেলে।' ধরাজ গলায় আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলাম, 'তা না হলে আমার গুরুপত্নী!'

শুনে খুশি হয়ে জন্ত হি-হি করে হাসছিল। তার মুখের কাঁকড়ার ছিবড়ে আমার গায়ে এসে পড়ছিল।

'হুঁ, গিন্নী শুখানে—আর আমি আছি এখানে তোদের পাঁচজনকে নিয়ে জমিয়ে ঠিক কিনা?'

'ঠিক কথা গুরু, একশবার ঠিক।' দাঁত ছড়িয়ে হাসছিলাম। 'তুমি আছ বলে আমাদের রুজি রোজগার ঠিক চলছে, মদ গাঁজা জুয়া আছিং—ছুরি চালাচালি মেরে চাখাচাখি কোনোটাই থেমে থাকছে না। বলে

কিনা আমাদের সকল কীর্তির ভাণ্ডারী তুমি, হুঁ আমাদের কাপ্তেন।'

'অথচ গিন্নী কিছুই দেখছে না জানছে না।' আহ্লাদে গুণ্ড আমার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছিল, বা যেন অতিরিক্ত টেনে শরীরটা সোজা রাখতে পারছিল না, আমি ধরে মানুষটাকে সোজা করে বসিয়ে দিয়েছিলাম।

তবে কিনা, গুণ্ডকে বুঝিয়েছিলাম, 'ধারে কাছে তোমার জেনানা নেই, দেখাদেখি নেই, তাই মেজাজ চড়ছে না চড়পাচ্ছে না গোঁসা করছে না কোটকাছারি বলছে না—পাকুড় জলসার দেশে বসে মনের সুখে খৈ-মুড়ি ভাজছে হাঁস-মুর্গির ডিমারক করছে সুখ মহুয় ঘরে তুলছে—খুব শান্তিতে আছ গুরু, মহাশান্তিতে আছ তুমি।'

তবে কিনা—নেশার ঝোঁকের মধ্যেও হঠাৎ কেমন থতিয়ে গিয়েছে গুণ্ড, পিটপিট করে আমার চোখ দুটো দেখছিল। 'হুঁ, দেখাদেখি নেই—' বলতে বলতে তাঁর দুটো মাটিয়ে তখনি সে আবার হাসতে শুরু করেছিল। 'তবে কিনা, যদি দেখা হয় কোনোসময়, সামনে গিয়ে দাঁড়াই—দেখবি কেমন তোয়াজ করে, কেমন খাতির করে নাচে—সোয়ামীর সেবা যার, সোয়ামির প্রতি ভক্তি ছেদার তুলনা আছে নাকি আমার বৌয়ের।'

'হুঁ, গুণী মানুষ, তোমার গিন্নীর গুণের শেষ নেই।'

'আর রূপ!' ধমক দিয়ে উঠেছিল গুণ্ড, শরীরটা খিচিয়ে হাতের মুঠ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। 'শালী থুথু ফেলছিল তখন আমায় দেখে, মুখ বেঁকিয়েছিল, হুঁ—রূপের দেমাকে, যা না আমার ঘরের মানুষটার সামনে, একবার গিয়ে দাঁড়া, তুই তার পায়ের নখের যুগ্যি কিনা নিজেই তখন যাচাই করলে বুঝবি।'

'থাক গুরু, থাক।' গুণ্ডকে বুঝিয়েছিলাম। 'ছোটলোকের মেয়ে ছোটলোকের মতন ব্যাভার করে গেল, এই নিয়ে মাথা গরম করে তো লাভ নেই, এসো বাকিটা আমরা শেষ করে ফেলি।' আমি একটুখানি গলায় ঢেলে নিয়ে আদর করে গুণ্ডর হাতে বোতলটা তুলে দিয়েছিলাম। গুণ্ড উপুড় করে সবটা একসঙ্গে গলায় ঢেলে ফেলে ছোট্ট কাটল, থুথু ফেলল, তারপর ঠাণ্ডা হল। তারপর আহ্লাদে গদগদ হয়ে তার ঘেনানার চুল চোখ নাক চুক গায়ের রং—খুঁটিয়ে সব বর্ণনা করল। প্রস্রাবখানার গন্ধ শুঁটকি মাছের গন্ধ পাকা আম আনারসের ভুরভুরে গন্ধ নাকে নিয়ে আমি কান পেতে শুনছিলাম। শরীরটা হাল্কা ছিপছিপে। তবে কিনা পিছনটা বেশ গোলগাল, ভারি।

আজ আবার এখানে ঘাসের ওপর বসে সেই ব্যাখ্যা শুনছি। তবে একটা দুটো নতুন শব্দ গুণ্ড যোগ করছে। হুঁ, রাজরানী সেদিন বৈঠকখানা বাজারে এই শব্দটা শুনিনি। রাজরানী ঘাট আলো করে স্নান করতে নামবে।

কিন্তু কোথায় রানী। দেখছিলাম একটা বাড়ি কাক নাকিয়ে নাকিয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভাঙছে। তারপর জলের কাছে নেমে ঠোঁট ডুবিয়ে জল খেল। জল খেয়ে ঘাড়ে পিঠে জল ছিটিয়ে গোসলটাও সেরে নিল। তারপরে কা-কা করতে করতে উড়ে চলে গেল।

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম কদম গাছের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য তিন হাত ওপরে উঠে গেছে। তার মানে এখন বেলা বারোটা।

'কি করছিস?'

'কিছু না।' ঘাস ছিঁড়ছিলাম। আধবোজা চোখ নিয়ে গুণ্ড মিটমিট করে হাসছিল। হাসিটা ভাল লাগল না। বললাম, 'বারোটা বেজে গেছে, গুরু।'

'বাজুক না বারোটা। বারোটা তেরোটা বাজা-বাজির ধার আমরা কোনোদিন ধেরেছি?'

হতাশ হলাম। আমার সন্দেহটা আর একটু পাকা হল। একটা শুকনো ঢোক গিলে চুপ করে রইলাম।

'দে, সিগারেট দে।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেট দিচ্ছিলাম। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বড়টা তুলে ধরে গুণ্ড সিগারেট নিচ্ছিল। যেন তখন জলের দিকে তার চোখ গেল। 'আমাকে

চমকে দিয়ে 'আরে, আরে, এসে গেছে।'

এসে গেছে! হরদিও ধড়াস করে উঠল। ঘাটের দিকে মুখ করে ভাল করে বসতে যাব সঙ্গে সঙ্গে আড়াড় খেলাম। যেন আমাকে বল হাত ওপরে তুলে ধরে তখন আবার কেউ নিচে ফেলে দিল।

কোথায় রাজরানী, কোথায় ভগুর সোনার হরিণ—তবে রং ছিল, চোখের ওপর একটা রঙের ঝলক খেলা করে উঠতে দেখলাম। দীঘির জল ছুঁয়ে ফুটফুটে একটা মাছরাঙা আকাশে উঠে গেল।

অর্থাৎ আর একটা রসিকতা করল ভগু। বুকটা ধসে গেল। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে সেই মাছিটে সে হাসছিল। যেন, তার ধারণা, দাম দিয়ে রসিকতার চেয়ে এবারের রসিকতাটা ঢের ভাল। এই জন্যই এত হাসি। মনে হচ্ছিল হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে যাবে। আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। আকাশে চোখ তুলে দিয়ে সে হাসছিল।

একটা কথা—আমার মন খারাপ হল, বুকটাও ধসে গেল ঠিকই, কিন্তু কেন যেন ভগুর ওপর রাগ করতে পারলাম না, বরং তার জন্য কষ্ট হতে লাগল।

হঠাৎ আমার মনে হল, সবটাই ভগুর রসিকতা না তাওতা না। যেন এইখানে এই গাছপালার মধ্যে দীঘির ধারে তার একটি মানুষ ছিল ঠিকই। হয়তো ধারেকাছে জোপজাড়ের ভিতর একটা টিনের ঘরও ছিল। কিন্তু আজ আর মানুষটা নেই। হয়তো মরে গেছে। হয়তো ভগুই একদিন মেরাজ খারাপ করে পেটে ছোরা বসিয়ে শেষ করে দিয়েছে। না, অসম্ভব কিছু না, কারো সঙ্গে পালিয়েও যেতে পারে।

কিন্তু সুন্দর মানুষটার স্মৃতি থেকে গেছে। হাসি মুখি মেয়ে, মুখ ভরা ঘরে তুলত, ডালের বড়ি বিছানো খাট আলো করে সাবান মেখে দীঘির জলে স্নান করত।

সেদিন মানিকতলা পোলের মুখে উটকো মেয়ে-ছেলেটার কাছে যা খেয়ে না এই কাণ্ডটা ঘটল। তা না হলে আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে মর পাজা অফিস ছোরা মেরার মেপামেপি করে বেশ কাটছিল দিনগুলি।

হুঁ, ঘর-ঘরের ভেনাসার ঘোর-ঘোর স্মৃতি ভগুকে এখানে টেনে নিয়ে এল। অথচ আয়নাটা দেখবে, দীঘিটা দেখবে। দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবে।

কিন্তু তারপর। তারপর আর কিছু দেখবার নেই, আমাকেও দেখবার নেই। তাই এখন ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে মুখ করে এমন করে হাসছে।

'ভগুদা।' আমি

আমার দিকে তাকাল না, আমার দিকে তাকাতে না হয়ে এই জন্য ঘাড়টা ঘুরিয়ে মাথাটা কাত করে উপুড় হয়ে শুয়ে সে হাসতে আরম্ভ করল। হাসির শব্দ হচ্ছিল না এবার। কিন্তু হাসির দমকে কাতলা মাছের মতন চওড়া বিশাল পিঠটা থরথর করে কাঁপছিল। দেখে আমারও হাসি পেল। জন্তু—জন্তু শুওা, কলকাতার একটা বিখ্যাত গাছুব। কিন্তু মনে হচ্ছিল এই বনজঙ্গলে এসে নিতান্তই ছেলেমানুষ হয়ে গেছে সে, শিশু হয়ে গেছে—তা না হলে এ ধরণের আমুলী রসিকতা করে এত হাসতে পারে। খামকা সে কোনদিন হেসেছে? কবিনই বা তাকে আমরা হাসতে দেখি কলকাতায়?

'শুন্ন!' তার পায়ের ওপর হাত রেখে আস্তে ঝাকুনি দিলাম। খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম, মাথার ওপর থেকে ছায়া সরে যাচ্ছিল। ব্রহ্মতালুটা আবার চড়চড় করে পুড়তে আরম্ভ করেছিল। জন্তুর মাথা তখনো ছায়ার মধ্যে ছিল। 'শোন!' অনুনয়ের গলায় বললাম, 'এভাবে এখানে আর বসে থেকে লাভ কি।'

জন্তু তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসল। দেখলাম, যা অনুমান করছিলাম, তার দু চোখে জল টলটল করছে। অদ্ভুত লাগল দৃশ্যটা। আমার হঠাৎ মনে হল, কেবল হাসির জন্য তার চোখে জল আসেনি। ঘাড় ঘুরিয়ে চোর কাঁটার জঙ্গলে ফড়িং-এর খেলা দেখতে লাগলাম। অর্থাৎ আমি তখন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম। হুঁ, যতই বজ্জাতি শুওামি করে বেড়াক, পাথর ছুঁড়ে মানুষের মাথা কাটাক কি ছোরা মেরে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিক, একটা সাংঘাতিক নরম জিনিস জন্তুর বুকের ভিতর লুকিয়ে আছে। সময় বুঝে আয়না বুঝে জিনিসটা গলতে আরম্ভ করে। আর তখন চোখ তার জলে ভরে ওঠে।

'কি বলছিলি!' হাতের পিঠ দিয়ে জন্তু চোখ দুটো মুছল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

একটা চোক গিললাম। একটু হাসলাম। অর্থাৎ বিরক্তির ভাবটা প্রকাশ না পায়, সাবধান হয়ে নরম গলায় বললাম, 'এবার আমরা উঠতে পারি শুন্ন—দেখতে দেখতে বেলা অনেক হল।'

'উঠে কোথায় যাবি শুনি।

তখনি আমার বলতে ইচ্ছা করল, স্টেশনের দিকে ফেরা যাক—' যেন বলতে পারলে ভাল লাগত, 'বিকেলে ট্রেন তা হলেও হেঁটে যেতে যেতে বেলা পড়ে যাবে।' কিন্তু সাহস পেলাম না। ঘুরিয়ে অন্যভাবে বললাম, 'এবার এখানে বসে থেকে কিছু লাভ হবে বলে মনে হয়না।'

'কেন! অ—' চমকে উঠতে গিয়ে জন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাঁকাল। 'তার মানে তুই বিশ্বাস করছিস না, তুই ধরে নিয়েছিস আমি শুল মারছি—খামকা তোকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে এসেছি, তাই না?' তার চোখ লাল হয়ে উঠল। গলার শির ফুলে উঠল। ভয় পেয়ে চুপ করে রইলাম।

সিগারেটটা—সে খেতে পারেনি। অতিরিক্ত হাসছিল বলে নিবিয়ে রেখেছিল। আবার ওপর থেকে পোড়া সিগারেটটা হঠাৎ তুলে ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে টানতে আরম্ভ করল।

আমি ঘাড় গুঁজে থাকলাম। কতক্ষণ এভাবে থাকতাম আর জন্তুই বা কতক্ষণ চুপ থাকত ঈশ্বর জানে, ঠিক এই সময়টায় একটা দমকা হাওয়া ছাড়ল, গাছপালার সরসরে তরবরে শব্দ হল, ফলসা গাছের মউমাছির ঝাঁক আকাশে ছড়িয়ে, পড়ল যেন ভয় পেয়ে কোনদিকে ঝোপের ভিতর একটা ঘুঘু ডুবার ডেকে উঠল।

অর্থাৎ সব কিছুই নড়েচড়ে উঠল শব্দ করে উঠল কিন্তু ঠিক এক সেকেণ্ডের জন্য। আবার সব চুপচাপ নিথর। যেন একটা ভূত এসে জঙ্গলটাকে হঠাৎ নেড়ে চেড়ে দিয়ে তখনি আবার ঘুম পাড়িয়ে গেল।

হুঁ, শব্দ থেমে গেল হাওয়া পড়ে গেল, আর তখন জন্তুও আমার বাঁ হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। হঠাৎ দীঘির পাড় যেখানটায় আমরা বসেছিলাম আমাদের ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে যার ওপর একটা পরিবর্তন হয়ে গেল, বড় রকমের ওলটপালট হয়ে গেল বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কী সেই পরিবর্তন কেনই বা এটা হল, আর জন্তুই বা এত জোরে আমার হাত চেপে ধরবে কেন

বুঝতে না পেরে চোখ আর করে তার মুখটা দেখলাম, কেমন যেন শ্বাস বন্ধ করে সে জলের দিকে ঘাটের দিকে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখটাও সেদিকে ঘুরে গেল।

তখন ব্যাপারটা বুঝলাম। আমিও শ্বাস বন্ধ করে রাখলাম। ঘাট আলো হয়ে গেছে ঠিকই, তবে গড়নটা যেন তেমন পাতলা ছিপছিপে নেই, তার মানে চিকন নবম সোনার হরিণ আর বনা চলছিল না, ধরং বাঘিনী, বলতে যেমন বানাতো ভাল, তেমনি বড়সড় জমকালো শরীর। তাই তো, বয়সের তার বলে একটা কথা আছে না? আষাঢ়ের ছলছলে নদী তাদের সেবে কেমন ওরা ঘেমঘমে চেহারা ধরে কতদিন ও তার ঘরের মানুষকে দেখছে না? দু বছর? চার বছর? না আরো বেশি?

যাই হোক, রং নিয়ে ঢেঁড় নিয়ে বাঘিনীও দেখতে কম সুন্দর কি? তবে ও বলেছিল রাজরানী—তাও ঠিক, এই তুলনাও খাটে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখার মতন মেয়েছেলে। কাঁধে তার গামলা, কঁকখে পিতলের ঘড়া, হাতের মুঠোয় সাবানের বাক্স। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো কুচকুচে রং ধরেছে তালগাছের গুঁড়িতে। তারওপর পা রেখে ঝরঝরে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে। ছবির মতন লাগছিল। যেন চোখ নামিয়ে এক মনে দীঘির জল দেখছিল, পুঁটি মাছের খেলা দেখছিল।

'ওঞ্চ!' ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি বরং একটু এগিয়ে যাও, আমি এখানে আছি।'

'তুই চুপ কর।' ভয়ানক কঠিন ঠেকল গলার স্বরটা যেন শরীরটাও পাথরের মতন শক্ত করে রেখে ও ঘাটের মানুষটিকে দেখতে লাগল।

তখন আমি বুঝলাম। নিশ্চয় মান অভিমানের ব্যাপার। অর্থাৎ জোরা চোখ তুলে এদিকে তাকাবে, ওকে দেখবে, তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকবে, তখন ও এগিয়ে যাবে। তার আগে নয়।

মনে মনে হাসলাম। নিশ্চয় দেখবার জন্য যখন বাড়ি থেকে বেরোয় খুব কষ্ট করে টসকা ধরেছিল। হুঁ, বৌ একটু বেশি খিটমিটি করছিল বোধহয় বেরিয়েছিল। এই জন্যই দীঘির পাড়ে এলেও ও গামলার অপেক্ষা করছিল, ও বাড়ি যেতে চাইছে না।

কিন্তু আমি বলব, ও ঠিক নয়। আমার তো খিটমিট করা মেয়েকে যেখানে একেবারে পোষাচ্ছিল না, ছোরা মেরে কবে শেষ করে দিয়েছি।

ও তুমি বিয়েও করে দিয়েছে, ও বড় টিনের ঘর তৈরী করে দিয়েছে।

'ওঞ্চা!' ফিসফিস করে বললাম, 'একবার গলা খাঁকারি দিলে হত।' আমার অবশ্য জোরে হাততালি দিয়ে শব্দ করতে ইচ্ছা করছিল। বললাম, 'বৌদি এখনো টের পায়নি তুমি দীঘির উত্তর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছ।'

'তুই চুপ কর, তোর পরামর্শ শুনে আমি কাজ করব না।' চুপ করে রইলাম। কপালের ঘাটা ক্রমশ ফুলে উঠছিল ওর। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার ঘাটের ওপর থুতু ফেলল। আর ওদিকে ঘাটের মানুষটির মাছের খেলা দেখা আর শেষ হয় না। জলের দিকে চেয়ে আছে তো আছেই। জলের ভিতর পরনের নীলাম্বরীর চমৎকার ছায়াটা দেখা যাচ্ছিল, গলা ও বুকের ছায়াটা তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না, তবে আলোর ভেলার মতন একটা কিছু নাড়াচাড়া করছে দেখতে পাচ্ছিলাম। হুঁ, ওখানে জলটা বেশি কাঁপছিল। বুকের ছায়া ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল।

'ওঞ্চা!' ডাকতে গিয়ে থমকে গেলাম। ভুরু কুঁচকোচ্ছে ও, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

তবে কি..... তবে কি—চিন্তা করলাম, এই মানুষ সেই মানুষ না? চিনতে দেরি হচ্ছে ওর? মনে খটকা লাগছে? তাই বা হবে কেন, ভাবলাম, ঘাট আলো করে রাজরানী এসে দাঁড়ান মাত্র ও যেমন লাফিয়ে উঠল, আমার হাত টেনে ধরল!

একটা প্রজাপতি, হলুদে সোনার চকচকে কব্জকে একটা প্রজাপতি সুন্দর মানুষটার চুলের কাছে বুকের কাছে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

'সুন্দর মুখের কাছেই প্রজাপতি উড়ে যায়', হেসে

গুণ্ডাকে একবার বলতে ইচ্ছে করছিল, এত-ক্ষণ লাল দীঘির এপাড়ে বাতাবীলেবুর ডালে পাতায় ওড়াওড়ি করছিল—আমাদের মুখের কাছে একবারও যেষে নি।, কিন্তু এসব কথা বলার সাহস ছিল না।

গরম গরম নিশ্বাস ফেলছিল গুণ্ডা। টের পাচ্ছিলাম, তার বুকের ভিতর বড়ের মতন একটা কিছুর ফোঁসানি সুরু হয়েছে।

'কিন্তু তুমি যে রাগ করছ দুঃখ করছ গুরু,' আবার যেন গুরুকে বোঝাতে চাইলাম, 'একবার গলার শব্দ কর, হাত তালি দাও, নয়তো চেঁচিয়ে ডাক—তবে তো তোমার জেনানা টের পাবে তুমি এসেছ, তুমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ চোখ তুলে দেখবে।'

ঠিক তখন, কি বলব, দৈব ঘটনার মতন,—তাই তো। তা না হলে গুণ্ডার গিন্নী চান করা, ঘড়ায় জল তোলা, তুলে নিয়ে অনেকদিন জলের নিচে মাছের খেলি দেখত, আর এখানে দাঁড়িয়ে গুণ্ডা ঠোঁট কামড়াত, হুঁ, আমাদের পিছনে কোথাও কোন ঝোপের ভিতর একটা হুতোম ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল। তরদুপুর, এক ফোঁটা শব্দ নেই, হঠাৎ এই বিকট আওয়াজ, গা ছমছম করে উঠল, যেন সমস্ত জঙ্গলটা চমকে উঠল।

বলব মজের তাল, ঠিক তখনই ঘাটের মানুষটা এদিকে চোখ তুলে তাকাল, তাকিয়ে আমাকে দেখে গুণ্ডাকে দেখে। তাকানটা এত সুন্দর লাগছিল, আমি তো খুবই খুশি, কিন্তু চোখের পলক ফেলার আগে যাচ্ছেতাই ব্যাপার ঘটল, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কাঁখের ঘড়া পিতলের জিনিস ঢং করে আওয়াজ হল, ছিটকে নিচে পড়ল, হাত থেকে সাবানের বাক্সটাও পড়ে গেল, তারপর, কি বলব, যেন ভূত দেখে ভয় পেল, এত ঢেউ এত রং নিয়ে বাঘিনীর মতন সুন্দর মানুষটা লাফিয়ে লাফিয়ে সব কটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠল। তারপর বয়স গাছটা পিছনে রেখে কলাবাগান ও বনতুলসীর ঝোপের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল।

'তোমায় চিনতে পারেনি গুরু।' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'তুই চুপ কর।' গুণ্ডা গর্জন করে উঠল। যেন তার চোখ ফেটে রক্ত বেরোবে। তখনও দীঘির ওপাড়ে ঝোপটা একটু একটু নড়ছিল।

'আমার মনে হয় অন্য কেউ।' একটু ভেবে নিয়ে চোক গিলে মিনমিনে গলায় বলছিলাম, 'হয়তো অপরিচিত মেয়েছেলে।'

'ঘটে!' গুণ্ডার গলার ভিতর একটা শব্দ হল। কেমন শব্দ, সামনে থেকে থাপ সরিয়ে নিলে কুকুরের গলা দিয়ে এমন আওয়াজ বেরোয়। বাকি দুঃখ কান্না আক্রোশের একটা ভয়ংকর ককানি।

'গুরু!' আস্তে ডাকলাম। কিন্তু আর সে কথা বলছিল না। যেন কি করবে বুঝতে পারছিল না। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার কপালে এক গাদা ঘাম জমে উঠতে দেখলাম। ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে ঘামটা মুছে দেই। খুবই কষ্ট হচ্ছিল তার চেহারা দেখে। বুকের ভিতর একটা ঝড়ের ঝাপাঝাপি সুরু হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল।

হুঁ, এক সেকেণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডা মতলব ঠিক করে ফেলল। একবার জোরে কাঁসল খুব ফেলল, তারপর কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিল। অর্থাৎ তারপর সে কী করবে আমার জানা ছিল, লক্ষণগুলি আমার মুখস্ত ছিল।

'গুণ্ডা!' আমি বাধা দিতে গেলাম। হাতটা চেপে ধরতে গেলাম।

'এই খবরদার।' কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে সে আমাকে সরিয়ে দিল।- 'বেশি ফ্যাকামো করলে তোকে আগে কাটব।' কোমর থেকে ছোরাটা টেনে বার করে সে ছুটতে আরম্ভ করল। দীঘির পুব পাড় ধরে সে দৌড়তে লাগল। আমিও পিছনে ছুটলাম। তাজের কড়া রোদ লেগে তার হাতের অস্ত্র ঝলসে উঠছিল। না, গুণ্ডার হাতে অস্ত্র দেখে আমি কোনদিন ভয় পাইনি, বরং কতদিন তার হাতে ছোরা বদল কিংবা তুলে দিয়েছি। কিন্তু আজ যে অন্য ব্যাপার। গুণ্ডার একেবারে কাছের মানুষ ঘরের মানুষ। শেষ পর্যন্ত ঝগড়া নিয়ে ঝগড়াঝাটিটাই কি থেকে গেছে দুজনের মধ্যে। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেমন হেঁয়ালীর মতন ঠেকছিল জিনিসটা। কখন

গাছ পিছনে ফেলে বনতুলসী ও কালাবাদরের জঙ্গল পার হয়ে আমরা একটা নালার কাছে পৌঁছে গেলাম।

জগু থমকে দাঁড়াল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—জগু হাঁপাচ্ছিল। উত্তেজনার জন্যই এটা হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম। তা না হলে আর কতটা রাস্তা আমরা ছুটেছি। জগুর ফুসফুসের জোর কতখানি কতটা দম সে রাখতে পারে, এক নাগাড়ে ক' মাইল পথ সে ছুটি মেরে ছুটে চলে গেছে এক এক সময় আমার চেয়ে এ কথা আর কে বেশি জানত।

কিন্তু আমি যেন দীঘির পাড়ের সারাক্ষণ পথ ছুটে এসেই মানুষটার দম ফুরিয়ে গেছে টের পাচ্ছিলাম। নালার পাশে একটা ছোট হাংচিতা গাছ একরত্তি ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জগু ঐটুকু ছায়া ঘেঁষে দাঁড়াল। যেন তার শরীর ঠাণ্ডা চাইছিল, তার প্রাণ একটা শীতল কিছুর স্পর্শ চাইছিল।

হবেই বা না কেন, চিন্তা করলাম, এই একটু সময়ের মধ্যে তার গা জ্বলে যাচ্ছে অথবা পুড়ে যাচ্ছে। তা না হলে দীঘির পাড়ে গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে এতক্ষণ কত শান্তিতে কত সুখে না কাটাচ্ছিল সে। তাই তো, এতটা সময় সে স্বপ্ন দেখছিল। তার সোনার হরিণ তার রাজরানী ঘাট আলো করে স্নান করতে নামবে। জগু প্রথম কথা বলবে না তাকাবে না গলার শব্দ করবে না হাততালি দেবে না, চুপ করে দীঘির আর এক পাড়ে বাতাবীলেবুর গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর একসময় যদি বৌ চোখ তুলে এদিকে তাকায় জগুকে দেখতে পায়। আর তখন পড়িমরি করে ঘাট ছেড়ে সুন্দর শরীরটা নিয়ে জগুর কাছে ছুটে চলে আসবে। অথবা সঙ্গে পরপুরুষ আছে, আমি আছি দেখতে পেলে, হয় যদি জগুর জেনানা খুব লজ্জাবতী হয় তো কিছুতেই কাছে আসবে না, শাড়ির আঁচলখানা ভাল করে বুকে পিঠে জড়িয়ে নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, তারপর চোখের ইসারা করে জগুকে ডাকবে। জগু তখন এগিয়ে যাবে! আহা! সে কী সুখের মিলন হত।

এমন একটা চমৎকার ছবি আমিও যে এতক্ষণ মনে মনে দেখছিলাম।

কিন্তু কোনদিক দিয়ে যেন কী হয়ে গেল। আর কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। জগু কি আশা করছিল তার ঘরের মানুষ তাকে দেখে তাঁখের কলসী ফেলে দিয়ে এমন করে পালিয়ে যাবে। জগু কি পরপুরুষ। না কি জগু একটা আক্রোশ নিয়ে এখানে এসেছে যে বৌকে দেখলেই সে মেরে ফেলবে। আর সেই ভয়ে মানুষটা ঘাট থেকে সরে গেল।

অথচ জগু একটু আগেও তার স্ত্রীকে নিয়ে কত সাধের গল্প করছিল। হুঁ, ঘর টৈ করে নিয়েছে জমি-জিরেত করে দিয়েছে সে বৌকে। মনের সুখে বৌ হৈ-মুড়ি ভাজে নয় মরার ঘরে তোলে হাঁস মুরগি ডিমারক করে।

আর সেই মানুষের কাছে জগু কিনা এমন ব্যবহার পেল। কাজেই জগুর গা জ্বালা করছিল আর গা পুড়ে যাচ্ছিল। ডান হাত থেকে ছোরাটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে জগু যেন একটু আরামের জন্য নালার ধারে হাংচিতা গাছের চিলতে ছায়াটুকুর নিচে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে নিতে চাইছিল, মনটাকেও।

'জগুদা, একটা সিগারেট খাবে?' ভয়ে ভয়ে আমি বললাম।

'নাঃ।' জগু মাথা নাড়ল।

আমার কষ্ট হচ্ছিল। এই সময় এক পাত্তর মদ কি এক কল্কে গাঁজা কি এক ডেলা আফিং হলে যেন ভাল হত। মনের এই অবস্থায় যা হোক একটা কড়া নেশার দরকার ছিল আমার ওস্তর, বেশ টের পাচ্ছিলাম। অথচ সঙ্গে কিছুই আনা হয়নি।

হুঁ, তীর্থ করতে যাচ্ছি, কোনো দেবদেবীর থানে যাচ্ছি—এমন মন নিয়ে আমরা এখানে ছুটে এসেছিলাম। নেশার সব সরঞ্জাম আমাদের বৈঠকখানা বাজারের ডেরায় রেখে এসেছিলাম।

এখন অনুতাপ হচ্ছিল। আমার জন্য না, জগুর কথা ভেবে। এখানে এসে জগুর মনের অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াবে যদি একবার আগত টের পেতাম।

অল্প একটু আগে ঘাসের ওপর শুয়ে জগু নেশার কথাটা তুলছিল। যেন সে তখনি টের পেয়েছিল মনের এই পবিত্র ভাবটা থাকবে না, ঈশ্বরই তাকে রাখতে দেবে না, আবার আবোল তাবোল ভাবনায় মন বোঝাই হয়ে উঠবে, যেমন শহরে থেকে সারাদিনই আমাদের এসব ভাবনায় তলিয়ে থাকতে হয়। কেবল অন্ধকারের জিনিস নিয়ে আমাদের কারবার, কথায় কথায় আমাদের মদ গাঁজা আফিং খরচ না হলে চলে না। সাদা মাথায় সাদা চোখে আমাদের খুব কষ্ট হয়, পা ফেলতে হাত চালাতে মুখ চালাতে ছুরি চালাতে। নেশা ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত চলে না।

'জগুদা, একটু জল খাবে?' আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। এমন জোয়ান পুরুষ, কিন্তু দেখে মনে হ'ল একটু সময়ের জন্য মানুষটা, কেমন যেন ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যাচ্ছে। 'কোথায় এখন জল পাবি।' জগু আমার চোখ দুটো দেখল।

'দীঘি থেকে নিয়ে আসব।'

'দরকার নেই।' যেন খুব ঘৃণা গিলে জগু গলা ভিজিয়ে নিল। 'হাঁড়ি কলসী কিছু আছে নাকি যে দীঘি থেকে জল তুলে আমার জন্যে এখানে বয়ে আনবি।'

তা-ও বটে, এক সেকেণ্ড চিন্তা করলাম। বোতলটা হাতের কাছে থাকলেও হত। সেটা বাভ্যবীলের গাছের নিচে ফেলে এসেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'হুঁ, ঠিক আছে।' জগুর চোখে চোখ রেখে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লাম। পিতলের ঘড়াটা খাটে পড়ে আছে। ঘড়ায় করে জল আনা যাবে।

'ওফ্!' জগু বিরক্ত হল। চোখ দুটো থেকে হঠাৎ আগুন ঠিকরে বেরোল। 'ওই ঘড়ার জল আমি মুখে দেব ভেবেছিস শুয়ার!'

তাই তো। ভুলটা বুঝতে পারলাম। ওই ঘড়ার ওপর জগুর ঘেন্না এসে গেছে।

চুপ করে রইলাম।

'দরকার নেই আমার জলের। কে বলেছে আমায় তেষ্টা পেয়েছে। খামকা তোকে ওকালতি করতে বলেছে কে।' ছোরাটা চোখের কাছে তুলে আঙুলের পেট বুলিয়ে জগু ধার পরীক্ষা করল।

মনে হচ্ছিল এই একটু সময় গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে তার রাগ আক্রোশ উত্তেজনা নতুন করে ফিরে এসেছে।

একটা সাঁকো পার হয়ে নালার ওপাড়ে যেতে হবে বুঝতে পারছিলাম। কেন না ওই একটি ছাড়া সামনে এগোবার আর রাস্তা দিশ না। ডাইনে বাঁয়ে শুধু কাঁটা ঝোপ দেখছিলাম।

ছোরার ধার পরীক্ষা করা শেষ করে জগু চোখ ছোট করে সাঁকোটা দেখছিল। বাঁশের সাঁকো। বাঁশ ঝুলোনো হয়ে গেছে। হলদে রং মরে গিয়ে সাদা রং ধরেছে।

আমার যেন মনে হচ্ছিল জগুর জেনানা দীঘিতে চান করতে আসবে বলে জগু বাঁশ কেটে ঐ সাঁকো তৈরী করে দিয়েছিল। ক' বছর আগে তৈরী করে দিয়েছিল জগুকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। খুব মন দিয়ে জগু সাঁকোটা দেখল। তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে সামান্য হাসল। খুবই বিষাদমাখা হাসি বোকা যাচ্ছিল। কিন্তু কেন এই হাসি বুঝতে না পেরে অবাক হলাম।

জগু আবার চোখ তুলে সাঁকো দেখল, তারপর আমার দিকে ঘাড় ফেরাল।

'নতুন বাঁশ লাগান হয়েছে দেখতে পাচ্ছিস।'

'নতুন বাঁশ!' জগুর মতন আমিও চোখ ছোট করে মন দিয়ে একটু সময় সাঁকোটা দেখলাম। তারপর ঘাড় কাত করলাম। 'হুঁ, তাই, নতুন খুঁটি লাগান হয়েছে।'

সাঁকোর এ মাথায় দুটো ও মাথায় দুটো। জগু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

পুরোনো হয়ে গিয়েছিল, হয়তো পোলটা ভেঙে পড়ছিল। বিড়বিড় করে বললাম, 'নতুন বাঁশ লাগিয়ে ঠেক দেওয়া হয়েছে।'

অশু চুপ করে রইল।

ঘাটের কথা মনে পড়ল আমার। নতুন তালের গুঁড়ি বিছিয়ে ঘাট মেরামত করা হয়েছে। অশুকে আবার কথাটা মনে করিয়ে দেব কি না চিন্তা করতে লাগলাম।

ঘাড় নামিয়ে অশু নালার ভিতরটা দেখছিল। জল ছিল না। আগাছায় ভরে গেছে। শুকনো শামুক গুগলী এবং কাদাও জায়গায় জায়গায় চোখে পড়ছিল। এবং পরে চোখ তুলে অশু আমাকে দেখল।

'হুঁ, তখন তুই কী বলছিলি? খুব করিৎকর্মা ভরাসিক একটা ভীরু মানুষ আমার গিন্নী, তাইনা?'

হ্যাঁ, অশুর, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন যেমে গাঁয়ে একলা থেকে সংসারটা ধরে রেখেছে বৌদি—তুমি তো শহর ছেড়ে আসতে পারছ না। রুজি-রোজগারের ধান্দায় বারো মাস কাটে তোমার কলকাতায়—

'হুঁ, তা কাটে! বলে যা বলে যা।' চোখ বুজে অশু মাথা নাড়ল। আমার কথাটা মনে ধরেছে বুঝতে পারলাম। মনে হল রাগটাও যেন একটু পড়ে এসেছে। ছোরা নিয়ে যেমন ছুটতে আরম্ভ করেছিল।

উৎসাহের গলায় বললাম, 'তুমি ফিরের দিকে দেনা পাওনা করছে, ফসল উঠলে ঘরে তুলছে হাঁস মুর্গির ব্যবসা করছে—

'মানে পাকা গিন্নীর মতো সব দিক সামলে নিতে পারছে, এই তো?'

'হ্যাঁ। শুরু—সাঁকো ভেঙে পড়ছিল—মেরামত করা হয়েছে ঘাটের সিঁড়ি পচে গিয়েছিল নতুন গাছ কেটে সিঁড়ি বসান হয়েছে—স্বচক্ষে তো আমরা দেখে এলাম—'

'হুঁ, বল্, বল—থামলি কেন।' মাকের ভিতর ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে অশু নিশ্বাস ফেলল। 'তোর কথা শুনে সত্যর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'যাই বলো শুরু।' শুরুকে বোঝাতে চাইলাম, 'আসলে তোমাকে চিনতে পারেনি বৌঠান, তা ছাড়া আমিও একটা অপরিচিত মানুষ সঙ্গে আছি, হুঁ, দীঘির ধারে দু দুটো অচেনা পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব ভয় পেয়েছে মানুষটা—তাই ধড়াচড়া ফেলে—'

'থাম, আর বলতে হবে না।' লাল চোখ পাকিয়ে অশু আবার সাঁকোটা দেখতে লাগল। 'চিনতে পারে নি!' তার গলার ভিতর গুমগুম আওয়াজ হল, যেন এবার নিজের মনে সে কথা বলছিল। বারো বছর একত্তর ঘর করা হল, আর এই দেড় দু বছরে তিনি সোয়ামীর মুখ ভুলে গিয়ে—হুঁ, তাই বলছিলাম, তোর যেমন মাথা, যেমন তোর আক্কেল—ওয়াক্ করে একদলা থুথু ফেলে অশু গুম্ মেরে রইল।

মোটে দেড় দু বছর! কেমন চমকে উঠলাম। মানে এক শীত গিয়ে আর এক শীত এল, তারপর বসন্ত, তারপর গ্রীষ্ম বর্ষা তারপর এই গনেগনে ভাদ্রের দুপুর—না, এর মধ্যে কোনো স্ত্রী সোয়ামীকে ভুলতে পারে না। ভোলে না। তবে কিনা—

কি যেন ভাবছিলাম। অশু হাঁটতে আরম্ভ করল। আমিও পিছনে চললাম। ভাদ্রের চড়া রোদে তার হাতের নেপালী কিরিচ ঝকঝক করছিল। যেন দেখছিলাম সেই মাছরাঙাটা সাঁকোর ওপর চুপ করে বসে আছে। আমরা সাঁকো পার হয়ে নালার ওপর পৌঁছে গেলাম। ও পাড়ে পৌঁছে অশু আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সাকোর নতুন বাঁশ দুটো দেখল। দেখে তখনই নতুন করে গজগজ করে উঠল।

এই জন্যই রাংচিতা গাছের ছায়ায় একটু দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে দেখলাম ঘাট মেরামত করা হয়েছে পোল মেরামত করা হয়েছে—অর্থাৎ পুরোনো জিনিস-গুলো এর মধ্যেই ঢেলে সাজাবার তোড়জোড় শুরু করেছে।

কথা বললাম না।

অশু চুপ থাকল না।

'তার মানেটা বুঝতে পারলি? ঘাট ঠিকই ছিল—তা হলেও একটা নতুন গাছ কেটে সিঁড়ি না বাঁধলে মন খুঁত খুঁত করছিল আমার গিন্নীর। হুঁ, সাকোটা ঠিকই

আছে, তা হলেও এ মাথায় ও মাথায় দুখানা করে নতুন বাঁশের খুটি না পুতলে গিন্নীর ভাত রুচছিল না।'

এখনটা কেন হল গুরু?

'তাই তো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, তোর বৌঠানকে,' আঙুলের গেঁট বুলিয়ে আর একবার ছোরার ধার পরখ করে হনহন করে সে হাঁটতে শুরু করল। আমি পিছনে। বুকটা নতুন করে কাঁপছিল, হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছিল। ছুটতে গিয়ে গরম, গরম নিশ্বাস পড়ছিল আমার। নালার ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে গুরু তা হলে সাঁকোটাই খুঁটিয়ে দেখছিল, যেমন দীঘির ধারে বসে ঘাটের সিঁড়ি পরীক্ষা করছিল। হুঁ, পুরোনো সিড়ির জায়গায় ক'টা নতুন সিড়ি বসেছে। গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে বসে তার বিশ্রাম করাটা কিছু না। কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কাজে নেমে কার হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আমার গুরু বিশ্রাম জানে না, ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে বসে শরীর ঠাণ্ডা করার মানুষ সে নয়। ঐ যে বিলাতী কুত্তা—যার নাম বুলডগ। আগে দাঁত দিয়ে মাংসের খাবলা তুলে আনবে, তারপর জিরোবার কথা চিন্তা করবে। শরীর ঠাণ্ডা করবে। তার আগে নয়।

অর্থাৎ এখানে এসে তালের গুঁড়ি—বিছানো ঘাটের চেহারা দেখে গুরুর মাথাটা প্রথম গরম হয়। দু নম্বর, তাকে দেখেই গিন্নী এভাবে পালিয়ে গেল কেন। তিন নম্বর, বাঁশের পোলের নিচে নতুন বাঁশের খুঁটি।

হুঁ, গুরুর হাতের তৈরী জিনিসে আর একটা নতুন হাত লেগেছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

হুঁ, মরদের হাত।

একটা মেয়েছেলে কিছু তাল গাছ কেটে ঘাটের সিড়ি বানাতে পারে না, বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে পোলের নিচে ঠেক লাগাতে পারে না।

হাতের ছোরাটা বন্ বন্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে গুরু, ছুটছিল। আমি পিছনে। আমার মাথাটা ঘুরছিল। আমি ঘামছিলাম। আমার চেয়ে গুরু অনেক বেশি ঘামছিল। কাতলা মাছের মতন চওড়া পুরু পিঠ বেয়ে কিলকিল করে ঘামের স্রোত নামছিল। গুরুর ঘাম দেখে আমি নিজে ঘামের কথা ভুলে গেলাম। যেমন তার হাতের অস্ত্র দেখে আমার নিজের কোমরে বেটা ঝুলছিল সেটার কথা একবারও মনে পড়ছিল না।

মনে পড়াটা ঠিকও হত না। সে গুরু—

আমি তার সাকরেদ, তার ছায়া। আমার নিজের বলতে কি-ই-বা ছিল।

মাঠের ওপর দিয়ে গায়ের চলা সরু পথ। আঙুল দিয়ে গুরু ক্ষেত খামার দেখাচ্ছিল। হুঁ, চার বিঘা জমি, আর সে বৌয়ের নামে লিখে দিয়েছিল।

মনে মনে বললাম, এতটা গিন্নীকে ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি গুরু, একটা না দিলেও পারতে। এত বেশি পেয়েছে বলেই তোমার ঘরনী তোমায় চিনতে ভুল করছে।

তারপর গুরু তার হাঁস মুরগি দেখাল। হুঁ, দুটো দুবেলা গাই, তিনটে ছাগল। ঘাড় গুঁজে তারা ঘাস পাতা খাচ্ছে, নাক দিয়ে গলা দিয়ে নানারকম শব্দ করছে তখন আমরা আম কাঁঠালের বাগিচার ভিতর দিয়ে ছুটছি।

একবার একটা কালো গরুর সামনে গুরু থমকে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে গরুটিকে আদর করতে চাইল। গুরুকে দেখে ভয় পেয়ে লেজ তুলে গরুটা ছুটতে আরম্ভ করল।

'দেখলি শালীর কাণ্ড!' গুরু গায়ের জোরে এত বড় একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারল। 'হুঁ, আমি রোজ দুবেলা নিজের হাতে ঘাস তুলে মুখে গুজে দিয়েছি, এইটুকুন বাছুর থেকে এতবড় করে তুলেছি, আর এই ধেড় দু বছরে আমায় দেখে এমন করে পালায়!'

গুরু হুঙ্কার ছাড়ল। কিন্তু আমি যেন-কান্নার মতন একটা কিছু তার গলার ভিতর গুমরে পেলাম। কথা বলছিলাম না। কষ্ট লাগছিল গুরুর জন্য। দেখছিলাম তার পায়ের শব্দ শুনে হাঁস মুর্গি এদিক ওদিক ছিটকে সরে পড়ছে, যেন একটা দুষমন যাচ্ছে—কক্ কক্ প্যাক প্যাক আওয়াজের সে কী ঘটা! একটা গোরগোল

পড়ে গেল চারদিকে আর ছুটোছুটি। শেয়ালের মতন টকটকে লাল চোখ দুটো তুলে ধরে জন্তু হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। বলব কি আড়াই বছরের একটা শিশুর মতন অসহায় মনে হচ্ছিল আমার ওকে। ঘরের কর্তা ঘরে ফিরেছে, তাকে দেখে তার পোষা হাঁস মুরগি ছাগল গরু দৌড়া-দৌড়ি, চেল্লাম চেল্লাম রব।

'বেইমান, তোমার ঘরটাই বেইমান হয়ে গেছে শুরু।' ওকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল।

'এসো আমরা স্টেশনে ফিরে যাই—এখনো হেঁটে গেলে বিকেলের ট্রেন ধরতে পারব। তোমারে ভাইসা শহরে—কলকাতায়, তোমার মান মর্যাদা ইজ্জত আমরা বুঝি, তোমার আদর সেখানে, বুড়িটা তোমার কথায় ওঠে বসে, তোমার চোখের ইশারায় তার জান দিতে কসুর করে না—কী হবে ঘরে গিয়ে, কার ওপর রোষ তুলতে এমন পাগলের মতন ছুটে নিয়ে ছুটছ।'

মেয়েমানুষ চিরকাল মেয়েমানুষ, বেইমান চিরকাল বেইমান, বেহায়া চিরকাল বেহায়া থাকবে। উঁহুঁ, মাছি মেরে হাত কালো করা তোমার সাজে না শুরু। তুমি দিয়েছ ওরা হয়ত পেতে নিয়েছে, তোমারটা খেয়ে ওরা এত বড়, তোমার ঘরের হাঁস মুরগি গরু ছাগল, তোমার বৌ—আজ যদি কেউ তোমায় চিনতে না পারে, তোমায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয় পালিয়ে যায়—যাক, তোমার তো কোনো ক্ষতি নেই, ওরা আরো যাক, আরো বড় হোক পুষ্ট হোক, তুমি রাজার মতন এসেছ, রাজার মতন ফিরে চলো—'

জন্তু থমকে দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। সেই গাছ পেয়ারা গাছ কয়েকটা গাছ বিছে লম্বা উঁচে লম্বা নিয়ে ছোট ঘাট বাগান। শালিক চড়ুই কিচিরমিচির করছে। ঝিরঝিরে বাতাস ও ঠাণ্ডা ছায়া পেয়ে জন্তু আর একবার ফিরিয়ে নেবে ভাবতে পারতাম, কিন্তু তার মনের যে অবস্থা চোখ বুজের যে ভাব দেখছিলাম তাতে ঠাণ্ডা ছায়ায় জিয়িয়ে গা জুড়োবার কথাটা আর একবারও মনে হল না।

তা হলেও সে, হয়তো শালিক চড়ুইয়ের কিচির-মিচির শুনে একটু সময়ের জন্য দাঁড়াল। বাগানের

পেয়ারা গাছ—সব আমার গাছের।'

হেসে বললাম, 'তা আমি বুঝতে পেরেছি

'এই তার মাস—কদিন আগে এলেই দেখতিস কত বড় এক একটা পেয়ারা ঝুলছে গাছে। কাশীর পেয়ারা। কলকাতা থেকে বীজ রেখেছিলাম।'

ছোয়াটা আর বন কাঁ জল না সে।
তাতে তুলিয়ে রেখেছিল। ক দিয়ে রোদের
যে ঘাটার এমন ঝিকমিক

সেবু গাছের দিকে চোখ রেখে জগু বলল, 'কলমের সেবু। একটা পাতা ছিঁড়ে শুঁকে ছাখ্, কী চমৎকার গন্ধ।'

সেবু পাতা ছিঁড়ে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলাম। 'খাঁটি গন্ধরাজ সেবুর গন্ধ। জগুর চোখের দিকে চেয়ে হাসলাম।

জগু খুশি হল।

'তুমি সব করে দিয়েছিলে গুরু—' লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাঁধান ঘাটের ঘাট—নালা পার হয়ে দীঘিতে যাবে, নালার ওপর চমৎকার বাঁশের সাঁকো—ঘরের ওপর গিন্নীর ওপর তোমার যে কত মায়া ছিল বোঝা যায়।'

জগু চুপ করে শুনছিল।

হুঁ, তবে কিনা স্বভাব দোষ—' খাটো গলায় বললাম, 'কলকাতার হাতছানি, যেমন নহরটা আমাকেও জোর টেনেছিল। তবে কিনা আমি সব শেষ করে দিয়েছিলাম, সংসার তুলে দিয়েছিলাম। এদিকে আর এক ছোঁটা মন ছিলনা।'

'আমার ছিল। আমি এদিকটাও রাখতে চেয়েছিলাম।' জগু, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তাই তো দেখছি জগদা। এই জন্যই তুমি আমাদের চেয়ে অনেক বড়, আমাদের গুরু, তোমাকে আমরা সব শুদ্ধায় মেনেছি—'

'কিন্তু বেইমান আমাকে ছোট করে দিতে চাইছে, আমার এই মনটা ভেঙে গুড়িয়ে দেবার মতলব।' হৈ চৈ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল জগু, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছিল হো—হো করে কেঁদে উঠল সে। 'দুঃখ করোনা গুরু, যার কাজ সে করুক—তুমি কোনকালেই ছোট হবে না। আমরা তোমাকে জেনে গেছি; তোমার মনটা ভাল করে আমাদের জানা হয়ে গেছে। তুমি আমাদের কাছে চিরদিনই বড়।'

সেবু গাছ কয়েকটা পাছে পিছনে রেখে সে হেঁটে চলল। আমিও হাঁটছিলাম।

সামনে টিনের ঘরের চাল দেখা গেল। জগু আর একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। ধারে গোয়াল ভাইনে ধানের মরাই। যেন মরাই দেখতে সে ডান দিকে চোখ ঘোরায়। আবার তার গরম গরম নিশ্বাস পড়ে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয়।

'হুঁ, ছোয়াটা আমার চোখের সামনে নাচিয়ে সে গুমগুম করে উঠল। 'কটা মরাই দেখছিস হাবু।'

টিনটে বাঁশের মাচার ওপর দায় করে টিনটে গোলা বসান। জগুর দিকে চোখ ঘুরিয়ে হাসতে চেয়েছিলাম। 'এখানে আর কটা মরাই তবে ওঠে, তাই না গুরু।'

'হুঁ, তবে অজাণ তবে অজাণ, এটা ভাদ্দর মাস।' জগু থু থু ফেলল, উল্টো করে ছোয়াটা ধরে ছোয়ার বাঁট দিয়ে বুকটা দুবার ঠুকল, তারপর দাঁত মুখ খিচিয়ে, আমাকে না, যেন আকাশটাকে ভেংচি কাটল। 'আমার আসলে দুটো মরাই ছিল, আবার একটা মরাই বলল কেন বলতে পারিস?'

তাই বলছিলাম। দুটো পুরোনো মরাইয়ের পাশে একটা নতুন মরাই বসান হয়েছে।

'তুই একবার ছাখ হাবু—ভাল করে চেয়ে ছাখ।' আমার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল জগু। যেন তার চিৎকারে আকাশটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল।

'বেশি ধান উঠছে ঘরে, তাই বোধ করি নতুন মরাই বসেছে।' বিড় বিড় করে বলছিলাম।

জগু গর্জন করে উঠল।

'বেশি ধান কোথা থেকে আসবে, বার বিঘে জমিতে ক'মন ফসল ফলে তার হিসাব রাখিস?'

'আমার খেত খামার নেই, গুরু ধানের হিসাব কেমন করে জানব।'

'বেশি ধান মানে বেশি জমি। হুঁ, কাগজে বাবুরা বলেছে বটে, কম জমিতে বেশি ফসল, তা হবে ফলবে তবে ফলবে, এখন নয়, তার জন্যে সারপাতি চাই এক নম্বর সার চাই—কিন্তু এই জমিতে, আমার জমিতে—' জগুর গলাটা কাঁপছিল।

'হুঁ' তাই তো।' এবার আর বুঝতে দেরি হল না,

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তবে বোধ করি তোমার গিন্নী জমি বাড়িয়েছে।"

'আমার গিন্নী জমি বাড়িয়েছে, এই ধমিতে তার ভুলোয় না?' যেন আগুনে ঘি পড়ল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল জগুর বুকের চিতা। কিন্তু একটা মেয়েমানুষ কেমন করে জমি বাড়ায়। নূতন জমি কেনার পুঁজি যোগায় তাকে কে বলতে পারিস!' জগু আমার দিকে তাকাল না, আমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না, ছুটে গিয়ে ধানের গোলার পাশে ডালিম গাছের গুঁড়িতে ঠকাস ঠকাস করে কপালটা ঠুকতে লাগল। 'গুরু! গুরু!, হুমড়ি খেয়ে পড়ে জগুর হাত ধরে টেনে তুললাম। 'এসো আর নয় অনেক হয়েছে, অনেক দেখা হল, এবার আমরা আস্তে আস্তে স্টেশনের দিকে –'

'তুই চুপ কর, তোর কিসে ঘাওয়ার তাড়া থাকে তুই যা—'। আমার হাত ছাড়িয়ে জগু টিনের ঘরের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। তার হাতের নেপালী ছোরা নতুন করে ঝিকিয়ে উঠল। আমি পিছনে ছুটলাম।

হুঁ, ঘরে ঢুকবার আগে বেশ চামেলী দুই মল্লিকার বাগান। বাগানের ভিতর দিয়ে পথ। সেই পথ ধরে ছুটতে ছুটতে ঘাড় ঘুরিয়ে জগু বেশ চামেলী যেনা মল্লিকার ঝাড় দেখল। তার নিজের হাতে লাগান গাছ, তার হাতের তৈরী সাজান বাগান।

ভাবছিলাম মল্লিকার কোপের কাছে একবার সে থমকে দাঁড়াবে। চমৎকার ফুল ফুটে আছে। আমার মনে পড়ল ঘাট ছেড়ে জগুর গিন্নী যখন পালিয়ে যায়, এত বড় এলো খোঁপাটা চোখে পড়েছিল। হুঁ যেন দূর থেকেও খোঁপাটা চোখে পড়েছিল। হুঁ, যেন দূর থেকেও খোঁপায় গোঁজা একটা মল্লিকা ফুল দেখতে পেয়েছিলাম।

'জগুদা', আমার বলতে ইচ্ছা করছিল, 'যদি মানুষটা তোমাকে ভুলেই যায় দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার ওই মল্লিকা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আজও সে মাথায় পরেছে, যেমন তোমার হাতের তৈরী গোলার ধান আজও তাকে খেতে হয়, তোমার টিনের ঘরে তাকে থেতে হয়, ঘাট তৈরী করে দিয়েছ, সেই ঘাটে নেমে আজও তাকে চান করতে হয়, সাঁকো বানিয়ে দিয়েছিলে, সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে হয়—তোমার গরু ছাগল হাঁস মুরগি নিয়ে তাকে থাকতে হয়—ও, নতুন ধানের বরাই বন্ধুক কি ধানের গোলে নতুন খুঁটি আবদালী হোক, পুরোনো জিনিসগুলি তাকে রাখতে হচ্ছে—তোমার হাতের গড়া কোনো কিছুই সে ফেলতে পারছে না ভাবতে পারছে না সরাতে পারছে না, তোমার সব কিছু নিয়ে তার বেঁচে থাকা—কাজেই তারপরও যদি তোমাকে মনে রাখবে না হলে মনে মনে সে ঠিক করে রাখে তো বয়ে গেল। তোমার কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। তুমি তার আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছ, তারপর তার যা খুশি করুক।'

কিন্তু এত সব কথা বলার সময় ছিল না। বাগানের ভিতর দিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মতন সে ছুটছিল।

গুরুকে চোখের আড়াল করব না—তাই আমাকেও প্রাণপণে ছুটতে হচ্ছিল, কিন্তু ছুটতে ছুটতেও একবার একটা ফুলগাছ দেখে জগু থুথু ছিটোলো। কাছে গিয়ে দেখলাম একটা নতুন গোলাপ চারা, যেন সদ্য কলম কেটে মাটিতে পোঁতা হয়েছে। নতুন ধানের বরাই দেখে যদি তার বুকে আগুন জ্বলে, নতুন গোলাপ গাছ দেখে তো তার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না, হবার কথা নয়। পুরোনো মল্লিকা গাছে ফুল ফুটলে গিন্নী সেটা তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজছে। নতুন গোলাপ গাছে গোলাপ ফুটলে তাও তার চুলে উঠবে, হয়তো বুকেও উঠতে পারে। হয়তো বেশি আদর করে গোলাপটাকে বুকের ওপর শুইয়ে রেখে জগুদার বৌ ঘুমিয়ে পড়বে। তাই তো—ঘরের বৌ পুরোনোর সঙ্গে নতুনকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলেছে এই চিন্তা কোন্ স্বামী বরদাস্ত করবে, তাও জগুর মতন একটা তেজী জোয়ান মরদ—যার কথায় দশটা মরদ ওঠে বসে, যার কথায় বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়।

বাগান শেষ হতে শুকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠোন। একদিকে তুলসী মঞ্চ আর এক দিকে পুঁই

কুমড়োর মাচা। .যেন ওপাশে ঢেঁকিঘর দেখা যাচ্ছে। উঠোনের চেহারা দেখে মনে হল এখানে ধান শুকোতে দেওয়া হয়, তিলতিসি রোদে ছড়ান হয়।

তাই তো, ভাবছিলাম একেবারে রাস্তার ওপর ঘর, বাড়ির সীমানা ঘর থেকে সুরু। কিন্তু এ তো কলকাতা শহরের বাবুদের বাসা নয় যে দুটপাথ থেকে রবারম শোবার ঘরে বসবার ঘরে ঢুকে পড়া যাবে।

উঠোনে ঢুকে জগু একবার থমকে দাঁড়াল। কেমন চুপচাপ চারদিক। জনমানুষের চিহ্ন নেই। উত্তরের ভিটায় প্রকাণ্ড টিনের ঘর নিয়ে গোটা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।

তাই তো হবে, জগুর ছেলেপুলে হয়নি, বৈঠকখানা বালাখানার আলুর আড়তের পিছনে সেদিন রাত্রে মদের বোতল হাতে নিয়ে মাথাটা কাঁকিয়ে দুবার সে বলেছিল, এদিক থেকে বৌ নির্ঝঞ্ঝাট। জগু কাছে থাকে না, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে তার দেনাদার ভয়ানক অসুবিধে হত, হুঁ, তখন মনের সুখে নুন মসুরি আর তুলতে পারত না, হাঁস মুরগির তদারক করতে পারত না, দীঘির ঘাটে বসে মাথার পিঠে সাবান ঘষে অঢেল সময় নিয়ে স্নান করাও হত না।

তাই দেখছিলাম এখন, কেমন ফাঁকা উদাস ঠেকছিল এতবড় উঠোনটা।

যেন মনে হচ্ছিল জগুর বুকের ভিতরটাও হঠাৎ হু হু করে উঠল। যেন একটা ছেলে কি মেয়ে থাকলে এই মুহূর্তে ছুটে এসে জগুর হাত ধরত, হুঁ বাবার হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে নিয়ে যেত।

যেন তাই দেখছিলাম। ছোরাটা আর ঝন্‌ঝন্‌ করে মাথার ওপর ঘুরছে না। হাতে ঝুলছে। ছোরার মাথাটা মাটির দিকে নোয়ান। জগুর চোখের লালও কিকে হয়ে গেছে। কঠিন চোয়াল দুটো হঠাৎ বুঝি নরম হয়ে গেল, কপালের শিরাটা আর মোটেই দপ্‌ দপ্‌ করে লাফাচ্ছে না।

যেন মনে মনে সে আশা করছিল, কেউ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরবে, 'বাবা' বলে ডাকবে।

তাই দেখছিলাম, তার চোখে একটা তৃষ্ণা, যেন একটু স্নেহের পাবার জন্য বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। একবার তুলসী মঞ্চের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, একবার ঢেঁকিঘরের দিকে মুখ ফেরাল, খুঁই কুমড়ো মাচার তলাটাও একবার চোখ বুলিয়ে দেখল—কেউ কোথাও নেই, তারপর একটা চাপা গরম নিশ্বাস ফেলে উত্তর দিকে অর্থাৎ ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। হুঁ, একজন আছে, একজনকে নিয়েই ওই অতবড় চৌচালা টিনের ঘর। দেখছিলাম আম কাঠের বড় বড় দরজা জানালা। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধান চমৎকার ঝোরান বারান্দা। ঘরের পিছনে মাথা উঁচু ঝোলান আম গাছ ছাড়ার মতন চালের ওপর ঠাণ্ডা ছায়া ঘরে রেখেছে।

হুঁ, ঘাট থেকে যদি পালিয়েই এল, দীঘির পাড় গাছতলার দাঁড়ান মানুষটাকে চিনতে না পারল, এখন তো চিনবে, এখন জগু তার বাড়িতে এসেছে, উঠোনে দাঁড়িয়েছে। এখন কেন গিন্নী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে না। জগুর হাতে অস্ত্র? তা ওটা তো থাকবেই ওটা তার জীবিকা বল ভরসা—সব। কিন্তু ঘরের মানুষের সঙ্গে এই জিনিসের তো কোনো সম্পর্ক নেই—জগুর হাতে কি আছে না আছে তা তোমার দেখবার দরকার কি? যেন চিৎকার করে জগুদার বৌকে ডেকে আমার বলতে ইচ্ছা করল, জগু তার বুকের ভিতর তোমার জন্য কী বয়ে নিয়ে এসেছে সেটা ভাখো। সাধ আদর সোহাগ, হুঁ, সহরে গুণ্ডামী গুণ্ডামী করে বেড়াক কি মদ গাঁজা আফিং বেচার লেপালেপি হয়ে থাকুক—তোমার পাওনা জিনিস জগুদা ঠিক নিয়ে এসেছে। ট্রেনে রাত জাগা হয়েছে, তারপর এতটা বেলা পর্যন্ত রোদ গরম মাথায় করে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঝুকতে ঝুকতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার হাসিমাখা সুন্দর মুখটা একবার দেখবে বলে, কোথায় তুমি?

কোথাও কাউকে চোখে পড়ছিল না।

মুখটা বিকৃত করে জগু ওয়াক করে একটা থু থু ফেলল। ভাদ্রের দুপুরের শুকনো ঠনঠনে উঠোন থুথুটাকে চোখের নিমেষে শুষে ফেলল।

আর দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে জগুর চোখ আবার টকটকে লাল, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। চোখটা শূন্যে উচিয়ে ধরে গলার ভিতর একটা চাপা হুস্ হুস্ আওয়াজ তুলে সে ঘরের দিকে ছুটল।

উঠোন পার হয়ে লাফিয়ে বারান্দায় উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। যেন সে আশা করছিল আমি উঠোন ছেড়ে আর এক পা নড়ব না, পরপুরুষ, জগুর সঙ্গে এতটা ভিতরে ঢুকে পড়লেও তার মতন লাফিয়ে বারান্দায় উঠব না।

কিন্তু আমাকেও বারান্দায় উঠতে হল।

কেন না আমার যেন মনে হচ্ছিল ঘরে কেউ নেই, দরজা জানালা হাঁ-খোলা হয়ে পড়ে আছে সত্যি, ঘাট থেকে পালিয়ে এসে জগুর বেনামা অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে, ঘরে ঢোকেনি, বা যদি ঢুকেও থাকে, এখন আর ভিতরে নেই, হয়তো পিছন দিকে দরজা আছে, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

কাজেই জগুর পিছে পিছে বারান্দায় উঠতে আমি একটুও সংকোচ বোধ করলাম না। তা ছাড়া এই অবস্থায় জগুকে একলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, কথাটা আমার সর্বদা মনে ছিল। হোক না তার নিজের বাড়ি। মাথা গরম করে ছোরা হাতে নিয়ে দীঘির পাড় থেকে সে ছুটে আসছে। থাক এটা যদি কলকাতা—হত, আমি তো থাকতামই, আমাদের আরো পাঁচটা ইয়ার দোস্ত জগুর পিছনে ছুটত। জগু আপত্তি করলেও আমরা শুনতাম না। কোনোদিনই শুনি না।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে-কেউ কোনো ব্যাপারে এমন ক্ষেপে গিয়ে ছোরা ছুরি নিয়ে কোথাও ছুটে যাচ্ছে দেখলে আমরা সঙ্গীরা কখনো চুপ করে বসে থাকি না, মানুষটা না চোখের আড়াল হয়, একলা, কোনো বিপদের মধ্যে গিয়ে না পড়ে—কথাটা মনে রেখে বাকি পাঁচজনেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটি। তা না হলে আর বন্ধু কেন।

আর এখানে তো কথাই নেই। আমার শুধু, যাকে ওস্তাদ বলে মেনেছি, শেষ পর্যন্ত একটা রক্তপাত ঘটুক বা না ঘটুক সেইজন্য খুব একটা ভাবি না কেন না রক্তারক্তির ব্যাপারটা আমাদের রক্তে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁচটা আমার গুরুর শরীর থেকে যে রক্ত ঝরবে না এমন কথা হলপ করে কে বলতে পারত।

হুঁ, একটু সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ভাবনা আমার মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছিল। সোহাগীকে চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে বৌ ঘাটের ঘাট থেকে পালিয়ে এসেছে। এই চিনতে না পারাটা যদি ইচ্ছা করে হয়, হুঁ, তাকে বলে লোক দেখান ভয় পাওয়া, জগু যেমন সন্দেহ করছিল, আমি সন্দেহ করছিলাম অন্য জিনিস। স্বামীর চেয়েও বেশি চেনা হয়ে গেছে।

এমন এক ধরনকে যে আমার গুণী বৌঠান বা কুড়ুল কি সড়কি বল্লম হাতে তুলে দিয়ে ঘরে বসিয়ে না রেখেছে তাই বা কে বলবে। জগুকে চোখের আড়াল হতে দিতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছিলাম না।

'কোথায় গেল শালী বলতে পারিস?' তাই তো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ঘরের ছিরি দেখছিলাম। আলনায় শাড়ি কাপড় ঝুলছে, আরশির তাকে আরশি খটান, তক্তপোষের ওপর বিছানাটা আধখানা গুটিয়ে রাখা হয়েছে, তাকের ওপর সাজিয়ে রাখা যেমা মাজা থালা গেলাস, হাঁড়ি খুন্তি চোখে পড়ল, কোণার দিকে কাঠের চৌকির উপর থাক করে সাজান বাক্স পেঁটরা। হুঁ, রাতে আলো জ্বালান হয়, দেওয়ালের দেরেকে হারকিনটা ঝুলছিল। দেখলাম কাচের আলমারি করে রিয়েছিল জগু বৌকে। ওপরের তাকে কিছু খেলনা টেলনা বেলোয়ারী কাঁচের জিনিস, নিচের তাকে তাঁজ করা দামী জামা কাপড়।

মানুষটা যে নেই, ঘরে ঢুকেই টের পাচ্ছিলাম। নিজে সুন্দরী বলেই বেশ একটা ছিমছাম রুচি নিয়ে ঘরখানাও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, হুঁ, জানলার পাশে উঁচুদরের কাঠের ছোট্ট টেবিল, টেবিলের ওপর কাঁচের ফুলদানীতে ডাল পাতা সমেত বেল ফুল জিইয়ে রাখা হয়েছে, জানলার পর্দা, বাক্স পেটরার ওপর হাতের কাজ করা ঢাকনা।

'আমার মনে হয় বৌঠান ঘাট থেকে ছুটে এসে আর ঘরে ঢোকেনি।'

'কোথায় যাবে?' জন্তু মাথা ঝাঁকাল, 'হুঁ, ঘাট থেকে পালিয়ে একবার ঘরে এসেছিল ঠিকই—দীঘিতে চান করতে গেলে দরজা জানালা বন্ধ করে যায়, তালা দিয়ে যায়, খালি ঘর খোলা ফেলে রেখে ঘাটে যাবার মানুষ নয়।'

'না, তা যাবে না, হুঁসিয়ার মেয়েছেলে। চোক গিললাম। কথাটা চিন্তা করলাম। তারপর জন্তুর চোখে চোখ রেখে অল্প হাসলাম। এখন দেখছি দরজা জানলা খোলা ফেলে গেছে।'

'তাই তো যাবে,' জন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের পিছনটা দেখল। পিছনের দরজা খোলা। 'ঘাট থেকে উঠে এসে ঘরে ঢুকেছিল। তারপর যখন দেখল নালার পোল পার হয়ে আমরা বাগানে ঢুকছি, উঠোনের দিকে আসছি তখন আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, ওদিক দিয়ে গেছে।' জন্তু আঙুল দিয়ে পিছনটা দেখাল। চোখ তুলে দরজাটা দেখলাম।

'তাই হবে।' ভাবলাম দ্বিতীয়বার যখন ঘর থেকে বেরোয় তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে কিছু বন্ধ করা হয়নি, সব খুলে মেলে রেখে চলে গেছে।

কিন্তু কোথায় গেল, কোন দিকে পালাল। পিছনের দরজা দিয়ে ঝড়ের মতন জন্তু বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম। হুঁ, ওদিকটায় রান্নাঘর, তেজপাতা গাছ চোখে পড়ল। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগল। পায়ের শব্দ পেয়ে একটা কাঠবিড়াল লেজ তুলে ছুটে পালাল।

রান্নাঘর ও তেজপাতা গাছ নিয়ে এখানেও ছোট্ট উঠোন। তেজপাতার ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে লাগল।

আবার যেন মনে হল রান্না করতে করতে চোখে ধোঁয়া লাগলে কি খেয়ে উঠলে জন্তুর গিন্নী এই গাছ তলায় পা ছড়িয়ে বসে একটু জিরিয়ে নেয়। হয়তো ওটা পোষা কাঠবিড়াল। সুন্দর মানুষটা যখন খোড়া পেতে কি পিঁড়ি পেতে এখানে বসে তখন কাঠবিড়ালটা গাছ থেকে নেমে এসে তার করসা ধবধবে পায়ের কাছে লাল টুকটুকে গোড়ালির কাছে নিশ্চয় ঘুরঘুর করতে থাকে। এখন ছুটো মরদের ভারি পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

পশার হুমহুম শব্দ করে ছোরাটা খুলে তুলে ধরে, জন্তু রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। উহুঁ, ঝাঁপ বন্ধ। লাথি মারতে বাঁশের ঝাঁপ আলগা হয়ে খুলে পড়ে। যেন ভেবেও যায় খানিকটা। নিচু চাল, ছোট্ট দরজা। জন্তু ঘাড় গুঁজে ভিতরে ঢুকল। পিছনে আমিও। ধনুদ লঙ্কা, ঘনে ঘিয়ের গন্ধ ঝাঁপটে গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ—এক সঙ্গে কত কি গন্ধ ধক্ করে নাকে লাগল। কিন্তু মানুষ কোথায়! উনুনের কাছে কাটা কাঠ জড়ো করে রাখা হয়েছে, বাটনা বেটে কাঠের থাঁচায় তুলে রাখা হয়েছে। হুঁ, একটা বাগনে ঢুকে রাখা তরকারি, পিতলের থালায় চাল, ডাল সব ধুয়ে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ঘাট থেকে ফিরে এসেই ভিজে চুলে গামছা জড়িয়ে জন্তুর গিন্নী উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়ে দিত বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর সময় হল না, যেন তার আগেই পালাতে হয়েছে।

'বৌদি এখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন বোঝা গেল না কিন্তু জন্তুদা।'

'গলদ আছে নিশ্চয়—গলদ না থাকলে সোয়ামীকে দেখে এত তরাস লাগবে কেন মনে, তরাস নিয়ে কুত্তি পালিয়েছে।'

তাই তো, কোথায় লুকোতে পারে মানুষটা।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জন্তু পাশের আর একটা চালার দিকে ছুটল। জালানি কাঠ ঘুঁটে খড়ের আঁটি পাটকাঠি দিয়ে বোঝাই হয়ে আছে ভিতরটা। দরজা ছিল না, জন্তুর মতন আমিও উঁকি দিয়ে দেখলাম। একটা বিড়াল মিউ মিউ করে উঠল। দুধের মতন সাদা কটা বাচ্চা নিয়ে পাটকাঠির ওপর আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে জেগে উঠে বোঝা গেল নতুন পোয়াতী হয়েছেন তিনি। না, মানুষের কোনো চিহ্ন ছিল না সেখানে।

জন্তু ছুটে গিয়ে ওধারে চালতা গাছের নিচে বাঁশ বাখারি দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটা উঁকি দিয়ে দেখে এল। বোঝা গেল ওটা গোয়ালঘর।

থুথু ছিটাতে ছিটাতে জন্তু চালতে তলা থেকে ফিরে এল।

'আমরা নালার ধারে বেহুঁশ করে ফেললাম। সেই সুযোগে হারামজাদী পালিয়েছে।' জন্তুর দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে কড়মড় শব্দ হল।

'হুঁ, ওখানে দাঁড়িয়ে পোলটা দেখতে গিয়ে আমাদের দেরী হয়ে গেল।' জন্তুর চোখ দুটো দেখছিলাম। মনে হল এবার সে উঠোনের মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করবে, বৌকে খুঁজে বার করবে, লাফিয়ে ঘরের চালে গিয়ে উঠবে। বললাম, 'আমার মনে হয় বাড়ির ভেতর লুকিয়ে নেই, শোবার ঘর রান্না ঘর কাঠের ঘর পায়খানা —সবই তো খোঁজা হল শুরু।'

'না না লুকোবার আরো অনেক জায়গা আছে, এই বাড়িতেই আছে।' জন্তু আমায় ছুটতে আরম্ভ করল।

তার গানের মতন শক্ত চওড়া কালো পিঠ বেয়ে নতুন করে ঘামের স্রোত নামতে আরম্ভ করল।

দেখলাম তার বাঁ কাঁধের ওপর একটা চাউস নীল মাছি বসে আছে। যেন পায়খানা থেকে ওটা উঠে এসে জন্তুর কাঁধে চেপে বসেছে।

খুব খারাপ লাগছিল দেখে। একটা সবজান্তা-বৌয়ের জন্য কেমন নাজেহাল হতে হচ্ছে জেন্তান জবরদস্ত পুরুষটাকে। গায়ে গুয়ের মাছি বসে আছে হুঁস নেই। অন্য সময় হলে এক থাবড়া মেরে জন্তু কখন ওটাকে যমপুরী পাঠিয়ে দিত।

রান্নাঘরের তেজপাতা গাছ পিছনে রেখে জন্তু আবার বড় ঘরে ঢুকল। এবার সে জামাকাপড় দিয়ে তক্তপোষের তলা দেখল, বাক্স পেটরার পিছনটা দেখল, আলনার পিছনটা দেখল। কপাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে, প্রত্যেকটা পাল্লা টেনে দুবার করে দেখল— উহুঁ, কোথাও কেউ নেই। লাফিয়ে সে সামনের বড় উঠোনে নামল,—তারপর ঢেঁকিঘরের দিকে ছুটল। আমি পিছনে।

উঠোনের মাঝখানে জন্তুকে থমকে দাঁড়াতে হল। যেন এতক্ষণ টের পায়নি, হাতে শিকার টিকার ধরতে বাইরে নিয়েছিল, হন্ হন্ করে কোথা থেকে একটা কুকুর, অন্ধকার রাত্রির মতন নিশমিশে কালো রং, ঘরেরী মিলমিলে চোখ, লকলকে লাল জিভ থেকে টস টস করে জল ঝরছিল, জন্তুর পায়ের কাছে চমড়ি খেয়ে পড়ল, জন্তুর দু'পায়ের ভিতর মাথা গুঁজে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

জন্তুর চেহারাটা একেবারে বদলে গেল, যেন এই প্রথম বাড়িতে ঢুকে আদর জানাবার মতন আহ্লাদ করার মতন কারো দেখা পেল সে।

'কালু, কোথায় ছিলি এতক্ষণ!' কালুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল জন্তু! কালু দু'পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আর দুটো পা দিয়ে জন্তুর কাঁধ ধরতে চাইল, লেজটা আরো বেশি করে নাড়ছিল, থুতনিটা জন্তুর নাভির কাছে ঠেকে ধরল। জন্তু মুঠো করে কালুর লম্বা ঝুঁটিটা মুঠটা ঠেকে ধরে আলতো করে কাকুনি দিল। 'কালু, কোথায় ছিলি বেটা এতক্ষণ?'

দেখলাম জন্তুর লাল চোখ ছল ছল করছে। কালু গলার ভিতর কুঁই কুঁই আওয়াজ করে কত কি যেন নালিশ করছে আর, করছে তার সঙ্গে অভিমান আছে আহ্লাদ আছে।

দেখে আমার এত ভাল লাগল। প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। জন্তুর কপালের শিরা মজে গেছে চোয়াল নরম হয়ে গেছে। সাদা দাঁত ছড়িয়ে সে হাসছিল।

'দেখলি, কেবল এই একজনেই আমার সঙ্গে বেইমানি করল না, আমায় চিনতে পারল, আমার করার আগেই কোলের কাছে কাপিয়ে পড়ল।'

'তাই তো!' আমারও ইচ্ছা করছিল কোথায় হাত বুলিয়ে কালুকে আদর করি। 'দেখলে না এই মাত্র—' জন্তুর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কাঠের ঘরে পাট-কাঠির আঁটির ওপর আর এক বেইমান তোমায় দেখেই কেমন লেজ দুলিয়ে কোঁস কোঁস করছিল, যেন কত বিরক্ত নখ বার করে আঁচড়াতে আসে আর কি—'

'তা তো আসবেই, এইটুকুন বাচ্চা ছিল, রোজ নিজের হাতে এক পো করে দুধ খাইয়ে বড় করে তুলেছিলাম।'

বেড়ালটার কথা মনে করিয়ে দিতে জগু দাঁত খিচোল, সঙ্গে সঙ্গে কালুর দিকে চোখ পড়তে তার অবশ্য মুখ আবার হাসি খুশি হয়ে উঠল। তার থুতনির কাছে গলা তুলে দিয়ে আবার ঘোরে নাড়ছিল।

'উহুঁ, কুকুরের মতন কেউনা।' বললাম, 'মানুষের মতন বেইমানের জাত দুটো হয় না ঠিকই, কিন্তু অন্য জীবও ফাঁক পেলেই বেইমানি করে, চট করে উপকার ভুলে যেতে চায়—বেইমানি করবে না তোমার কালু। কস্মিনকালেও না।'

'কালুকে রোজ আধসের করে মাংস খাইয়েছি।' জগু চোখ বড় করল।

'কালু কথাটা মনে রেখেছে। কুকুর কোনোদিন উপকার ভোলে না।'

'তাই তো!' জগু লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'ছোটলোকের মেয়ে আমায় ভুলতে পারে—সেটা বড় কথা না। কিন্তু যখন দেখলাম বাড়ির গরুটা ছাগলটাও আমায় দেখে পালাচ্ছে, প্রাণে কেমন লাগছিল, তুই একবার চিন্তা করে দাখ্, হুঁ, আর ঐ শালী বিড়ালী, আমায় কিনা আজ খামচাতে আসে।

'আমার তো তখন ইচ্ছা করছিল ছোরা দিয়ে হারামজাদীর পেট ফেঁড়ে দেই।'

জগু চুপ করে রইল।

'থাক গে, আর তোমার দুঃখ রইল না গুরু, এবাড়িতে অন্তত একজন আছে, যে চিরকাল তোমায় মনে রাখবে, তোমার সঙ্গে থাকবে।'

জগু মাথা নাড়ল।

'কুকুরই তো শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কুকুরটাই ছিল, আর কেউ ছিল না।'

'তাই তো।' অনেক দিন পর জগুর মুখে মহাভারতের কথা শুনলাম। কালু লেজ নাড়ছিল। চকচকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে লেজ নাড়ছিল। চকচকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে এবার আমার মুখটা দেখছিল। যেন আমার মনে হল, আমাকেও তার ভালবাসতে ইচ্ছা করছিল। যেন বুঝে গিয়েছিল জগু আমার গুরু, আমি তার এক নম্বর সাকরেদ, তার ডান হাত। আমার মুখ দেখা শেষ করে কালু জগুর হাতের ঝকঝকে অস্ত্রটা দেখল। তাই মনে মনে আরো বেশি অবাক হচ্ছিলাম। যেখানে বিশ্বাস আছে ভালবাসা আছে সেখানে ছোরাকে ছোরা মনে হয় না, মনে হয় হাতের খেলনা। কালু তাই ভাবছিল, জগুর হাতে ওটা খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। তা না হলে জগু ওটা হাতে নিয়ে ছুটছে, আর এই অবস্থায় কালু এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে! আদর জানায়? মুখের কাছে মুখ তুলে চুমু খেতে চায়?

হুঁ, জগুদার বৌ দীঘির ঘাটে ছোরা দেখেনি। তখন ইচ্ছা করে জগুকে চিনতে পারেনি। ইচ্ছা করে ভয় পেয়েছিল। তার পরে তো জগু কোমর থেকে অস্ত্রটা বার করে। তারপর বুঝি রাজরানী ঘরে গিয়ে দেখেছিল জগু ছোরা নিয়ে বাঘের পোজ পার হচ্ছে, ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ির দিকে ছুটছে। তখন গিন্নীর প্রাণে সতীকার ভয় ঢুকল, তখন ঘর ছেড়ে পালাল। আর জগুর হাতে ছোরা দেখেও কিনা কালু খুশিতে ডগমগ। যে হাতে জগু অস্ত্রটা ধরে রেখেছে শেষ পর্যন্ত সেই হাতটাই কালু জিভ দিয়ে চাটতে আরম্ভ করল।

'আচ্ছা একটু দাঁড়া বাবা, আমি চেকিঘরটা একবার দেখে আসছি।'

কালু কিছুতেই জগুকে এগোতে দেবে না। পা বাড়াতে গেলেই কালু সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, জগুর হাঁটুর ওপর মাথা ঘষছে মুখ ঘষছে নরম দাঁত দিয়ে কাপড়টা টেনে ধরছে।

'হুঁ, ঠিক আছে।' জগু রাগ করে না বিরক্ত হয় না। নরম গলায় কালুর সঙ্গে কথা বলে। 'আমি ওখানটায় উঁকি দিয়ে দেখে আসি, তারপর আবার আমরা খেলা করব।'

কিন্তু কালুর যেন ইচ্ছা না। জগু ওদিকে ছুটে যায়।

'হুঁ, আমরা ফিরে এসে খেলা করব।' এবার আমি কালুর পিঠে হাত রাখতে গেলাম, তাতে অনর্থ বাধল।

রেগে গিয়ে কালু খাঁক করে আমার হাতে প্রায় কামড় বসিয়ে দেয়।

'থাক থাক, আমি বোঝাব।' জগু হাত দিয়ে ঠেলে আমাকে সরিয়ে দেয়।

'আমি কথা বললে কালু শুনবে, কালু—'

কালুর রাগ কমে না। সব কটা দাঁত ছড়িয়ে ভেংচি কাটে, চিৎকার করে, যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। 'হুঁ, হু' মিনিট দাঁড়া বাবা, ওই তালিম গাছটার ছায়ায় দাঁড়া।' জগু তার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে।

কালু ঘামছিল। আমি ঘামছিলাম। জগুর কপালে পিঠে ঘামের বন্যা বইছিল। মাথার ওপর সূর্য বেঁকতে আরম্ভ করেছিল। হাওয়া গরম হয়ে আগুনের হল্কা ছড়াচ্ছিল।

জগুর কথায় কিছুটা ঠাণ্ডা হল কালু, আর চিৎকার করছিল না ভেংচি কাটছিল না। তবে তালিম গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল না। জগুর পিছে পিছে চলল। আমি একটু দূরে থেকে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম।

জগু ঢেকিঘরে ঢুকে পড়ল। কালু সৈঠার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। যেন দরজা পাহারা দিতে লাগল। আমি দরজার দিকে এগোতে গিয়েও পিছিয়ে এলাম। কালু ঘাড় ঘুরিয়ে এমন ভাবে তাকাল বুঝলাম আমাকে ঢেকিঘরে ঢুকতে দিতে তার ঘোর আপত্তি।

হু, জগুকেও ঢেকিঘরের দিকে সে যেতে দিতে চাইছিল না, এই জন্যই জগুর পায়ের সঙ্গে হাঁটুর সঙ্গে লেপটে থেকে কাঁই কুঁই করে কী যেন কেবল বলছিল।

হঠাৎ মাথার ভিতর কেমন একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তবে কি জগুদার বৌ ওই ছোট ঘরটার ভিতর বসে আছে, দরজার ঝাঁপ ছিল না, বাইরে থেকে ভিতরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। যেন একপাশে খৈ মুড়ি ভাজার হাড়ি কুড়ি চালুনি ধামা কুলো জড়ো করে রাখা হয়েছে, প্রকাণ্ড ঢেকিটাও চোখে পড়ছিল, কোণার দিকে কিছু কাঠ-বাঁশ।

ভাবলাম তখন, জগুরা যেমন ধনিক, তেমনি জগুদার গিন্নীও কালুর কাছে কিছু কেলনা নয়, তার বালিনী, এক কালে জগুরা নিজের হাতে তাকে রোজ মাংস খাইয়েছে, এখন জগুদার বৌ নিশ্চয় কালুর। ধরে করে নিজের হাতে তাকে দুবেলা খাওয়ায় রোজ সাবান মাখিয়ে গা পরিষ্কার করে দেয়, তা না হলে এমন চেকনাই এমন চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—দেখলেই মনে হয় কালু খুবই সুখে আছে, হাড় গিরগিরে ছাল বাকল ওঠা কত বাজে চেহারার কুকুর কারার ঘাটে চোখে পড়ে। কালু তাদের দলে পড়ে না। গলায় কী সুন্দর একটা বেল্ট, মনে হয় নতুন কিনে এনে কালুর গলায় এটে দেওয়া হয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যায় দেড় দু বছর আগে এই বেল্ট ছিল না, তা হলে চামড়াটা এত চকচকে পালিশ থাকত না, বকলসটা তো একেবারে আনকোরা নতুন, নতুন গয়নার মতন থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছিল।

হুঁ, এমন আদর যে পাচ্ছে যার কাছে, তাকে কালু ভুলে থাকবে কেমন করে—সে বেইমানি জানে না। কাজেই সে বুঝতে পারছিল, ভয় পেয়ে হোক। ইচ্ছা করে হোক জগুদার জেনানা যদি ঐ ছোট ঘরটির ভিতর লুকিয়ে থাকে তো ছোরা হাতে নিয়ে জগুদাই বা তবে মারতে যাবে কেন। চোখের ওপরও অন্তত কালু যতক্ষণ জীবিত আছে, এমন একটা রক্তপাত ঘটতে দেবে না সে। তাই জগুদাকে বাধা দিচ্ছিল, আমাকে তো ওদিক ঘেঁষতেই দিল না।

হুঁ, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জগু আমার এই সন্দেহ, বৌঠান নিশ্চয় ঢেকিঘরে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু জগু সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'নেই নেই, ওখানেও পাওয়া গেল না।' পাগলের মতন মাথাটা ঝাঁকাতে লাগল সে।

আমি দেখছিলাম কুকুরটার কাণ্ড। যেন গিন্নী ঠাকরুনকে খুঁজে পাওয়া গেল না বলে কালুরও উত্তেজনার অন্ত ছিল না। ঘন ঘন লেজ নাড়ছিল কান নাড়ছিল, দাঁত ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখটা তুলে উঁচু কী তার বিকট আওয়াজ, উঠোনটা কেঁপে

উঠল, জন্তু ও আমি দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠলাম, আওয়াজটা কোপঝাড় ডিঙিয়ে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল ঠিক আন্দাজ করতে আমাদের কষ্ট হল।

জন্তু আমার চোখের দিকে তাকাল।

'এমন চেয়েছে কেন!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না গুরু।' জন্তুর মুখ থেকে চোখ নামিয়ে কালুকে দেখলাম।

কালু ততক্ষণে জন্তুর কাপড় কামড়ে ধরেছে, তাকে টানছে।

'তোমাকে কোথাও যেন যেতে বলছে গুরু।'

হুঁ, তাই মনে হচ্ছে।' জন্তু বিব্রত হয়ে পড়ল। কালুর কাঁধে হাত রাখল। 'এমন করে কাপড় ধরে টানছিস কেন, কালু?'

কাপড় ছেড়ে দিয়ে কালু আবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল।

'আঃ, এই রোদে গরমে আর চেঁচামেচি ভাল লাগছে না। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে জন্তু কপালের ঘাম মুছল, বিরক্ত চোখে কালুর মুখটা দেখল। কোনদিকে যেতে বলছিস বাব।'

কথাটা কালু বুঝল। খুশি হয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে আগে আগে চলল। জন্তুর পিছে পিছে আমিও এগোতে লাগলাম।

উঠোন পিছনে রেখে আবার সেই সেগুন করমচা পেয়ারা গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় চলে এলাম। আবার পাখির কিচিরমিচির কানে এল।

'মনে হয় কোনো কিছুর গন্ধ পেয়ে কালু আমায় কোথাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' জন্তু বিড়বিড় করে উঠল।

'কিসের গন্ধ গুরু?' কথাটা শুনে অবাক লাগছিল।

'দুর্গন্ধ।' যেন চিন্তা করতে হল না জন্তুকে। কথাটা বলে সে হাসল, সেই দুঃখের হাসি বুক ভাঙা হাসি। এত কষ্ট লাগছিল এভাবে তাকে হাসতে দেখে। ভাবছিলাম কলকাতা থেকে কেন সে এই পাকুড় কলসার জঙ্গলে ছুটে এল, এসে এখন তার আত্মা পুড়ে যাচ্ছে, মনটা তেতে শুকো শুকো হয়ে যাচ্ছে।

তবু যদি এতক্ষণ গায়ে জোর ছিল, ভিতরটা শক্ত রাখতে পেরে ছুটোছুটি করে এঘর ওঘর খোঁজাখুঁজি করছিল, কালু এসে ছুটেছে বিশেষ করে এখন, যেভাবে সে আমাদের দুর্গন্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছিল জন্তু আর সেই জন্তু নেই, একেবারে নেতিয়ে পড়ল, যেন কোনোমতে ছোরাটা হাতে ঝুলিয়ে ঝুকতে ঝুকতে নেহাৎ করমচার বাগানটা পার হতে লাগল।

'দুর্গন্ধ, জন্তু আমাকে বোকায়। 'তার মানে কোনো গলদ—রেখে গেছে শালী যাবার আগে, হুঁ, গলদ না থাকলে ঘরের বৌ সোয়ামীকে দেখে এমন করে পালায়!'

কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। কালুকে দেখছিলাম। জিভটা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথাটা দোলাতে দোলাতে আগে আগে চলেছে। যেন তার গলার ভিতর একটা চাপা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল।

আর জন্তু যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছিল। চোখ দুটো আধবোজা। একটু আগে তার লাল টকটকে পাকান চোখ দেখে কতেকবার আমার গলা শুকিয়েছে। এখন মনে হচ্ছিল আস্তে একটা ঠেলা দিলে সে মাটিতে পড়ে যাবে।

নিশ্চয় আমাদের কথাটাই বেশি করে ভাবছিল সে। না জানি কোন দুর্গন্ধের দিকে কালু তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার কতরকম দুর্গন্ধ সাধারণত আমাদের নাকে লাগে। কত রকম গলদ চোখ দিয়ে দেখতে হয়। দেখে চোখ ফিরিয়ে নেই, নাকে রুমাল চাপা দেই। কেননা ওটা দুর্গন্ধের জায়গা। এই জন্ত আমরা একটুও অবাক হই না। ভাবি না।

কিন্তু এখানে এমন চমৎকার রোদ গাছপালা হাওয়া, পাখির ডাক, ফাল্গুন পড়তে নতুন পাতা কুঁড়ির গন্ধে দশ দিক ম-ম করে ওঠে, অঘ্রাণে পাকা ধানের গন্ধ, আষাঢ়ে নতুন বৃষ্টি ও কচি ঘাসের গন্ধ, ভাদ্র শুরু হতে শিউলি ফুল ফুল-কমলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে—তা ছাড়া এমন ছবির মতন চমৎকার বাড়ি জন্তুর, কতবড় ঘর, শুকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠোন, গোয়ালঘর ঢেঁকিঘর ফল ফুলের বাগান, হুঁ, তুলসী মঞ্চ—উঠোনে পা

দিতেই তো তুলসীপাতার গন্ধ প্রথম নাকে লেগেছিল, আর তখনই জগুর কথাটা মনে পড়েছিল, ঠাট্টা করেই বলছিল অবশ্য, কোনো তীর্থে এলাম বুঝি।

এখন এমন একটা জায়গায় একটা খারাপ গন্ধ খুঁজে পেয়ে কুকুরটা জিভ ঝুলিয়ে লালা ফেলতে ফেলতে দু জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—জগুর তো হতভম্ব হবার কথাই, আমারও মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

লেবু কয়েকটার বাগান পিছনে রেখে কালু ডান দিকে ঘুরে গেল, যেন গোয়ালঘরের দিকে ছুটল। হুঁ, গোয়ালঘরের ভিতরটা খোঁজা বাকি ছিল জগুর। যেন তখন বাড়িতে ঢোকার সময় ওদিকে ভাল করে সে তাকায়ও নি।

তাই তো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, একটি মানুষের লুকিয়ে থাকার পক্ষে জায়গাটা চমৎকার।

বোঠান নিশ্চয় এখানে লুকিয়ে আছে। জগু যেমন ভাবছিল গলদ দুর্গন্ধ—সে সব কিছু আসলে নয়, কালু গিন্নী ঠাকরুণের কাছেই তার মনিবকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে মনিবের দিকটাই সে দেখেছে বেশি, মনিবানি তার জন্য এতকাল কী করেছে না করেছে, মনে রাখতে তার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। গিন্নীকে ধরিয়ে দিতে পারলেই যেন সে খুশি।

আমিও অবশ্য জগুর দলের। তার দিকটাই বেশি দেখব জানা কথা। সে ওঝা, আমি তার সাকরেদ। জগুর সঙ্গে ছোটাছুটি করে এ-বাড়ির মেয়েমানুষটাকে আমিও খুঁজছিলাম। কিন্তু কুকুরটার বদমাইসি বুদ্ধি দেখে মেজাজটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। ইচ্ছা করছিল ওটার পাছায় একটা লাথি বসিয়ে দেই। জগুর সঙ্গে বেইমানি করছে না ঠিকই, আর এক জনের সঙ্গে তো করছে।

কিন্তু দেখলাম গোয়ালঘরের সামনে কালু দাঁড়াল না। গোয়ালঘর পিছনে পড়ে রইল।

কালু কচু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটছে। আমরাও পিছনে ছুটেছি। অবশ্য জঙ্গল খুব বেশি না। খানিকটা জায়গা। জমিটা নিচু। একটু জল কাদা জমে আছে। এই জন্যই কচু ঝোপের এত বাড়াবাড়ি। আমাদের পায়ের শব্দে দু চারটে ব্যাঙ লাফিয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল।

জগু আমার মুখের দিকে তাকায়, আমিও তার মুখটা দেখি।

অর্থাৎ দুজনেরই তখন দুর্গন্ধের কথা, গলদের কথাটা আবার মনে হয়েছে।

হুঁ, এই জঙ্গলের ভিতর কোথাও জগুর বেনানা তার গলদটা লুকিয়ে রেখে গেছে।

'এটাও আমার জমি।' জগু হিসহিস করে কথা বলছিল।

'কিছু মাটি ফেলে উঁচু করে নিলে এখানেও ভাল ফল ফুলের গাছ হয়।' যেন জগুকে খুশি করতে কথাটা বললাম।

জগু মুখ বেঁকাল। থুথু ফেলল। বুঝলাম কথাটা তার পছন্দ হয় নি। হবে না জানতাম। বিশেষ করে এখন তার মনের যখন এই অবস্থা। ফল ফুলের গাছ সে কম রেখে গিয়েছিল কি! কিন্তু তাতে কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কচু জঙ্গল পার হয়ে শুকনো খটখটে উঁচু জমিতে উঠে গেলাম দুজন। সামনে পাহাড়ের মতন উঁচু খড়ের গাদা। খড়ের গাদার সামনে কালু থমকে দাঁড়াল।

'আমার জমি।' জগুর গলার ভিতর থেকে বাতাসের মতন খানিকটা হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল। 'আমার খড়ের গাদা।'

'তা বুঝতে পেরেছি।' জগুকে খুশি করতে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লাম। 'কেমন পাকা সোনার রঙের খড় তোমার জমির।'

কথাটা মিথ্যা ছিল কি। রোদের খড়ের গাদা সোনার পাহাড় হয়ে জ্বলছিল। যেন অনেকক্ষণ তাকান যাচ্ছিল না সেদিকে, চোখ ঝলসে যাচ্ছিল।

না, কালু আর এক পা নড়ছিল না।

মুখটা আকাশের দিকে তুলে ধরে আবার চেঁচাতে সুরু করল।

'এখানেই যেন গন্ধটা রয়েছে।' জন্তু বিড় বিড় করে বলল, 'মনে হয় একটা কিছুর গন্ধটন্ধ পেয়েছে—বেটা চেঁচাচ্ছে, খাক্।'

ধানের মাচার ওপর গাদা করা খড়। ওপরে যেন নীচে ছায়া। শালিক চড়ুই মাচার তলায় ঢুকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। না কি খান। হয়তো খড়ের সঙ্গে কড়ুই পড়তি কিছু ধান চলে এসেছিল।

'বাইরে থেকে কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছেনা গুরু, কিছুই চোখে পড়ছে না।'

'এটা ধর।' জন্তু আমার হাতে ছোরাটা তুলে দিল। অবাক হলাম না। গিন্নী পালিয়েছে, জন্তুর মনে আর সন্দেহ ছিল না।

এখন সে দুর্গন্ধ খুঁজছে। তা না হলে কালু এমন একটা জায়গায় তাকে টেনে আনবে কেন।

হাঁটু গেড়ে মাটির সঙ্গে বুক মাথা ঠেকিয়ে জন্তু মাচার নিচের অন্ধকার দেখতে লাগল।

আমি দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি, অপেক্ষা করছি। যেন খড়ের ভিতর থেকে একটা পোকা ঝী ঝী করে ডাকছিল। হাওয়া বন্ধ। কোথাও গাছের পাতাটি নড়ছিল না।

দেখলাম জন্তু একসময় মাচার নীচে চলে গেল, কুকুরটাও ঠিক সেখানেই নাকটা গুঁজে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন খুব মনোযোগের সঙ্গে গন্ধটা শুঁকছে। একটা মাছি তার কানের কাছে ঘুর ঘুর করে উপদ্রব করছে, তাতে কালুর ঝোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্য সময় হলে দাঁত ছড়িয়ে এত বড় একটা হাঁ করে মাছিটাকে নির্ঘাৎ গিলে ফেলতে চাইত।

এক মিনিট পর জন্তু মাচার তলা থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে ওটা কী! আমার চোখ কপালে উঠল। হুমড়ি খেয়ে জন্তুর সামনে বসে পড়লাম। জন্তু দাঁত ছড়িয়ে হাসছে। শব্দ ছিল না হাসির। অর্থাৎ এ সেই হাসি, যেন কেউ করাত দিয়ে তার কলজেটা চিরে ফাঁক করছে, আর যন্ত্রণায় জন্তু সব কটা দাঁত পেলে দিয়েছে।

'গুরু!' আমি ফিসফিস করে উঠলাম জন্তু মুখ তুলল না। কাঁধা ও অয়েলক্লথ দিয়ে জড়ানো ছোট্ট মানুষটাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল। আঙুল চুষছিল মানুষটা, বোতামের মতন নতুন ঝকঝকে চোখ দুটো মেলে ধরে তাদের আকাশ দেখছিল।

'গুরু!' আমি আবার ডাকলাম।

'থাম, তুই চুপ কর।' জন্তুর মুখের ছড়ান হাসি একটু একটু করে গুছে আসছিল।

আর এদিকে নতুন করে সেজ নাড়া দিয়ে কালু চিৎকার করে উঠল।

'এই শালা!' জন্তু গর্জন করে উঠল।

কালু আর সেজ নাড়ল না আর শব্দ করল না। যেন আকাশ মাটি গাছপালা হঠাৎ জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেল। যেমন দীঘির ধারে দুবার হয়েছিল।

ঘাসের ওপর বুকে পড়ে জন্তু খুটিয়ে খুটিয়ে নতুন মুখটা দেখছিল, বেইমানের মতন চকচকে চোখ এইটুকুন নাক কান কপাল, বেলফুলের কলির মতন ছোট ছোট আঙুল।

যেমন তখন খুটিয়ে ঘাটের নতুন সিঁড়ি দেখছিল সে, নালায় পোষের নতুন বাঁশ দেখছিল, বাড়িতে ঢুকে নতুন ধানের মরাই দেখছিল।

রক্তজবার মতন টকটকে লাল হয়ে আছে চোখ, কিন্তু মুখের হাসিটা বার বার নিভে যেতে চাইলেও জন্তু নিভতে দিচ্ছিল না। যেন নিভে যাবার ভয়ে দাঁতগুলি বেশি করে ছড়িয়ে রাখল। তাই হাসিটা আরো ভয়ংকর লাগছিল।

'হুঁ, চুপ করে রইলি কেন।' কনুই দিয়ে জন্তু আমাকে ধাক্কা দিল। 'বয়সটা একবার আন্দাজ কর।'

বয়স। যতদূর দেখলাম। দু মাস আড়াই মাসের পুচকে একটা মানুষ তার আর বয়স কি! পাটের আঁশের মতন লাল লাল কটা চুল মাথায়। এখনো কালো রং ধরতে আরম্ভ করেনি।

'না কি আমার দু বছরের ছেলে এটা।' বলে জন্তু শব্দ করে হাসল। বুঝলাম বাচ্চার বয়স নিয়ে সে

রসিকতা করছে। তখন দিদীর পাড়, সাপ নিয়ে, মাহুরাদাটাকে নিয়ে যেমন রসিকতা করল।

'যা, তা কেন হবে গুরু।' যেন লজ্জায় আমার মুখটাই ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। আস্তে মাথা নাড়লাম।

'বল্ না, বলতে ক্ষতি কি—'জগু হাসি থামাল না। দু বছর আগে এখানে যেদার ফল ফুলের গাছ লাগিয়েছি, তখন এই বীজটাও পুতে গিয়েছিলাম। কেমন তাই না?'

'না গুরু, তা কেন হবে—দু মাসের বাচ্চা দেখলে চেনা যায়।'

হাতের পিঠ দিয়ে জগু চোখ মুছল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেছে। চোখ মোছা শেষ করে সে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

অল্প হাওয়া ছাড়ছিল তখন। সূর্য হেলে গেছে। খড়ের গাদার নিচে ছায়াটা ক্রমশ বড় হচ্ছিল।

'শালি ভেবেছিল গলদ লুকোনো যাবে। খড়ের গাদার নিচে বাচ্চা রেখে পালিয়ে গেছে।' জগু নতুন করে হাসল।

আমি থুথু ফেললাম।

'গলদ লুকোনো যায় না। মেয়েছেলে এই জিনিস গুম করতে পেরেছে কবে?'

'মাথার ওপর এক বেটা বসে আছে তো—সময় হলেই আঙুল দিয়ে সব বেরিয়ে দেয়।'—বলে হাসতে হাসতে জগু কাঁথা অয়েলক্লথ সমেত বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল।

'উঁহু, আর ওটাকে ধরো না গুরু—নাও, এই বেলা সেব করে দাও—পাপের বীজ রাখতে নেই।' ছোরাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

জগু চোখ বড় করে ফেলল। হাসিটা নিভে গেল। এক সেকেণ্ড আমার মুখটা দেখল। তারপর ভেংচি কাটল।

'শালা তুই চিরকালের কসাই—উঁহুঁ, এমন ফুলের মতন জিনিস আমি নষ্ট করব না—এর গায়ে তো পাপ নেই, যারা পাপ করেছে—করেছে, তা বলে এই মানুষটা দোষ করল কী!' বুকের কাছে বাচ্চাটাকে তুলে নিল জগু।

গলার ভিতরটা তোতো তোতো ঠেকছিল। তা হলেও চোখের পলক না ফেলে জগুকে দেখছিলাম। আমার গুরু। মানুষটা যে আমার চেয়ে অনেক বড় নতুন করে চিনা করলাম।

'স্যাখ্ স্যাখ্—আমার কোলে চড়ে কেমন কিতকিত করে হাসছে।' আমি দেখলাম না। ছোট মানুষটাকে জগু চুমোয় চুমোয় ভরে তুলছিল।

'বুঝলি, আমি আর কলকাতা যাব না—তুই ফিরে যা। আমি এটাকে বড় করব, মানুষ করব। একটা কাজ পেয়ে গেছি যেন শহরে গিয়ে আর দরকার নেই।'

ঘাড় ফিরিয়ে জগুর চোখ দুটো দেখলাম। চোখে জল নিয়ে সে হাসছে।

'বুঝলি', একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সে আবার বলল, 'শালী এতবড় একটা পাপ করে আমার সব পাপ ধুইয়ে দিয়েছে—আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি।'

শিশুর মতন খি-খি করে হাসছিল জগু। কোথায় কোন কোণের ভিতর একটা দোয়েল শিস দিয়ে উঠল।

॥ শেষ ॥

মন খারাপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধকার রাস্তায় আগাগোড়াই হেড লাইট জ্বেলে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। সেই আলোয় বেশ দূর থেকেই দেখা গেল, ঠিক মাঝ রাস্তায় একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পাহাড়ী রাস্তা। ঘন ঘন বাঁক—এই ঘাট পেরুবার সময় তাই সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। মাঝে মাঝে ডাকাতির খবর শোনা যায়—তাই স্পীড কম করলেও চলে না—ট্রাক ড্রাইভারেরা ঝড়ের গতিতে গাড়ী চালায়—সামনে কিছু পড়তে বাধা মানে না।—পিষে, গুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে দেখার কেউ নেই।

এই রকম পথের মাঝখানে একটা লোক শুয়ে আছে—সন্দেহ কি বেশ কয়েকটা লরি তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সুবিমল তা ভাববে না। গাড়ির গতি আস্তে করে দিয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার?

চন্দনের একটু তন্দ্রা এসেছিল, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিল। বরুণা রীতিমত ঘুমিয়ে পড়েছে। চন্দনের ছড়ানো ডান হাতের ওপর তার হেলানো মাথা, প্রবল হাওয়ায় তার চুল একেবারে এলোমেলো। চন্দন সুবিমলের কথা শুনে জেগে উঠে প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলো না। তার পর রাস্তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে চমকে উঠে বললো, আরেঃ, ওটা কি?

—একটা লোক বলেই তো মনে হচ্ছে।

—মরে গেছে?

—বুঝতে পারছি না। গাড়ি থামাবো?

—এই রাস্তায়? গত মাসেই একটা স্টেশন ওয়াগন খাদিয়ে দুর্ঠ করেছে।

—তা হলেই কি, তার ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবে?

—পাশ দিয়ে যাওয়া যায় না?

—চেষ্টা করতে পারি, গাড়ি একেবারে ধারে নেবে যাবে—রিস্কি।

—স্টীড তো মো করতেই হবে তা হলে।

মাথার নিচ থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ায় বরুণাও হঠাৎ জেগে উঠলো। গাড়ি তখন লোকটার খুব কাছা-কাছি এসে পড়েছে, সেদিকে চোখ পড়তেই বরুণা চেঁচিয়ে উঠলো। একটা শোক, চাপা পড়বে, চাপা পড়বে—শিগগির থামাও—

বরুণার চিৎকার শুনেই যে হ্যাচকা ব্রেক কষে গাড়িটা থামলো। লোকটার থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে। সুবিমল আর চঞ্চল লোকটাকে দেখার আগে প্রথমেই রাস্তার দু'দিকে তাকিয়ে দেখে নিল ফাঁক। বলা যায় না ফাঁদও হতে পারে। এ রকম ভাবে গাড়ি থামিয়ে তারপর দু পাশ থেকে ছুটে আসবে। কিন্তু কেউ নেই। জমাট অন্ধকারের মধ্যে গাছ গুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—তাদেরও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় হাওয়ার শব্দে। রাস্তার পাশেই একটা কালভার্ট, কাছাকাছি জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বরুণা তাড়া দিয়ে বললো, দেখছো কি! নামো?

সুবিমল উদাসীনভাবে বললো, নেমে কি করবো? যদি মরে গিয়ে থাকে—আমি ডেড বডি ছুঁতে পারবো না।

—রক্ত নেই, রক্ত তো দেখছি না! চেহারা দেখে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে।

—মড়া আবার ভদ্রলোক আর ছোটলোক! খানিকটা আগে পর পর তিনটে ট্রাক আমাদের ওভার টেক করে যায় নি?

—তা বলে নেমে দেখবে না তোমরা?

সাইট বোর্ড থেকে বড় টর্চটা বার করে চঞ্চল ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলেছে। সুবিমলকে বললো, চল্, একবার দেখা যাক্। যদি মরে গিয়ে থাকে—পা ধরে টেনে রাস্তার একদিকে সরিয়ে দেবো এখন! বরুণা তুমি গাড়িতে থাকো!

লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে হাত পা ছড়িয়ে। কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ। পাণ্ট সার্ট পরা যুবক—এত রাত্রে এই রকম চেহারার কাউকে এ রাস্তায় দেখতে পাবার কথা নয়। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। হতে পারে কেউ চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তা হলেও তো রাস্তার এক ধারে থাকার কথা। কিন্তু আশেপাশে সত্যিই রক্তের চিহ্ন নেই। সুবিমলের এসব ব্যাপারে কুসংস্কার আছে—অপরিচিত মরা সে ছোয় না। চঞ্চল পা দিয়ে ঠোক্কর মেরে দেহটা ওল্টাবার চেষ্টা করলো। পারলো না। সুবিমল ঘুরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে চুমুক দিয়ে নিল একটা। চঞ্চল নিচু হয়ে হাত দিয়েই ঠেলে দেহটাকে এবার উল্টে দিল। শরীরে কোথাও কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। লোকটার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলো চঞ্চল। জীবন্ত। চোখের পাতা টেনে দেখতে যেতেই লোকটা চোখ মেললো। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, উঃ, আপনারা এত দেরী করছিলেন যে আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিলো!

লোকটা উঠে বসার সময় সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে এসেছিল চঞ্চল। চেঁচিয়ে উঠছিল বরুণা। ব্র্যাণ্ডির বোতলের ছিপিটা টাইট করার ব্যাপারে সামান্য অন্যমনস্ক ছিল বলে সুবিমল ভয় পাওয়ার সুযোগ পায়নি। এবার সে ধারুল চটে উঠলো। বললো, এসব কি ব্যাপার?

আগে যেমন যা মনে হয়েছিল, বয়েস তার চেয়েও কম, ছাব্বিশ সাতাশের বেশি নয়। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে তখন ধুলো ঝাড়ছে পোশাক থেকে। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললো, আপনারা তো রাঁচি যাচ্ছেন আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?

—এখানে আপনি কি করছিলেন?

—সেই সন্ধে থেকে হাত দেখাচ্ছি—একটা গাড়িও

থামছে না। সাড়ে বার চলে গেছে বিকেল পাঁচটায়—সেটা মিস্ করেছি—কোনো ট্রাক বা গাড়িই নিকট দিচ্ছে না, তাই শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে···

—এখানে আপনি কোথা থেকে এলেন?

—হেসাতি'র ডাক বাংলোয় ছিলাম। হঠাৎ সেটা ছাড়তে বলো—ভেবেছিলুম পায়ে হেঁটেই চলে যাবো—কিন্তু এই রাত্তিরে—পাহাড়ী রাস্তা কি রকম সাংঘাতিক আপনি কিছুই জানেন না! আমাদের সবাইকেই যাবতে বলেছিলেন।

—না, না, এ রাস্তা তেমন খারাপ নয়। আমি তো অনেকক্ষণ থেকেই এখানে বসে আছি—ভয়ের কিছু নেই।

—আপনার কোনো কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

—সেকি? কেন? অবিশ্বাসের কি আছে?

দূর থেকে ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল। সুবিমল ব্যস্ত হয়ে উঠে বললো, আবার ট্রাক আসছে—যাব রাস্তায় আমাদের গাড়ি—একেবারে চাক্কু করে দেবে! চন্দন, কুইক! কুইক! ব্যাক টু দি কার—

চন্দন আর সুবিমল ছুটে এসে ঘুমার থেকে উঠে পড়লো। ছেলেটিও এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি পেছনের সীটে বসবো?

চন্দন রুক্ষভাবে বললো, আপনার পুরো ব্যাপারটাই কি রকম মিসি মনে হচ্ছে। অজানা—অচেনা লোককে আমরা গাড়িতে তুলতে পারবো না!

চন্দনের উরুতে হাত রেখেছে বরুণা। সামান্য চাপ দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললো, ওকি, তুমি ওকে এখানে ফেলে রেখে যাবে নাকি?

সুবিমল স্টার্ট দিয়েছে গাড়িতে। অন্যদিকে ভাবে বললো, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। নিন্ নিন্ উঠে পড়ুন মশাই পেছন দিকে। এ ভাবে মাঝ রাস্তায় ইয়ার্কি করে গাড়ি থামানো সত্যিই অন্যায়। যে-কোনো মুর্তে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারতো!

—ইয়ার্কি নয়, বিশ্বাস করুন! শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই—

ছেলেটির নাম জানা গেল, দীপক সরকার। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে কিসব ইয়ারে পড়ে। একটু পাগলাটে ধরনের, একটু বেশী কথা বলে, নিজেই গড়গড় করে নিজের সব কথা বলে যেতে লাগলো। একা একা বেড়াতে বেরিয়েছে। কোথায় কখন থাকবে ঠিক নেই। দুদিন ছিল হেসাতির ডাক বাংলোয়। আজ সন্ধেবেলা সেখানে বিহারের এক উপমন্ত্রী সদলবলে এসে উপস্থিত। বাংলোর দু'খানা ঘরই তাঁর লাগবে। প্রথমে সে ঠিক করেছিল বাংলোর বারান্দায় শুয়েই রাত কাটিয়ে দেবে—যদিও এখানে হায়েনা আর ভালুকের উপদ্রব আছে—তবুও সে রাজী ছিল—কিন্তু উপমন্ত্রীর চ্যালারা তার সঙ্গে অপমান জনক ভাবে কথা বলায় সে রাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল। ঠিক করেছিল সারারাতে হেঁটেই রাঁচী চলে যাবে। ওর গল্প শুনতে শুনতে চন্দন ভাবলো, পাগল ছাড়া কেউ এখান থেকে রাঁচী পর্যন্ত হেঁটে যাবার কথা ভাবে? রাঁচীই এ লোকের যোগ্য জায়গা!

চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তায় চার পাঁচ মাইল হেঁটেই হাঁপিয়ে পড়েছিল—বুঝতে পেরেছিল সারারাত এই জঙ্গলে কাটানো অসম্ভব। তারপর থেকে একটার পর একটা গাড়ি থামাতে চেষ্টা করেছে। ডাকাতের ভয়ে কোনো গাড়িই থামে নি। শেষ পর্যন্ত গাড়ি থামাবার এই অভিনব উপায়টি সে নিজেই মাথা থেকে বার করেছে।

একটা ট্রাক তীব্র হর্ণ বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল। সেই দিকে ইঙ্গিত করে কঠিন হেসে সুবিমল বললো, আমরা বলেই গাড়ি থামিয়েছি। ঐ রকম একটা ট্রাকের সামনে পড়লে ওরা কোনো দয়া মায়া করতো না—এতক্ষণে গালগোল পাকিয়ে ভূত হয়ে যেতেন।

সরলভাবে হাসতে হাসতে ছেলেটি বললো, তা আর জানিনা। দু'দিন এখানে আছি—ট্রাকের দৌরাত্ম খুব দেখেছি। আমি কালভার্টের ওপর বসেছিলুম—ট্রাক দেখে আর এগোইনি। আপনাদের গাড়ির আলো দেখেই বুঝেছিলাম প্রাইভেট কার—তখনই মাঝ রাস্তায় এসে···।

বরুণা প্রায় সম্পূর্ণ ঘুরে বসে উৎকর্ণ হয়ে ছেলেটির কথা শুনছিল। এখন আর চঞ্চলের উরুতে তার হাত নেই, বরং চঞ্চলের হাত তার উরুর ওপর। বরুণার উরুতে চঞ্চলের হাত দুষ্টুমির খেলা খেলছে। বরুণা মাঝে মাঝে টেনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সেই হাত।

বরুণা এবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন্ সাহসে ওখানে শুয়ে ছিলেন? যদি সত্যিই আমরা আপনাকে চাপা দিয়ে চলে যেতুম?

দীপক এতক্ষণ অনেকটা আপন মনেই কথা বলছিল। ঠিক কারুর মুখের দিকে তাকায় নি। কখনো সে বাইরের চলন্ত অন্ধকার দেখছিল, কখনো দেখছিল নিজের হাতের পাঞ্জা। এবার সে বরুণার মুখের দিকে তাকালো। গাড়ির অন্ধকার চাপা অন্ধকারে বরুণার ফর্সা মুখখানি গন্ধরাজ ফুলের মতন ফুটে আছে। দীপক কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে আলতো ভাবে বললো, যাঃ, তাকি হয় নাকি? একটা মানুষ দেখেও কেউ কখনো চাপা দেয়?

—যদি দেখতে না পেতুম?

—ঐ জন্যই তো রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে ছিলুম। তাছাড়া কি জানেন, কান পেতে আওয়াজও শুনছিলুম—গাড়ির স্পীড কমলে সেই আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়। বেগতিক্ দেখলে গড়িয়ে রাস্তার পাশে চলে যেতুম!

যেন একটা খেলা, দীপকের কথার ভঙ্গি এই রকম। বরুণা উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকিয়ে রইলো। তার জীবনে সে এরকম দেখেনি কখনো। নিজুম মাঝরাত্তিরে এই রকম ভয়ঙ্কর রাস্তার মাঝখানে সে শুয়েছিল গাড়ি থামাবার জন্য। আবার নাকি গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশে চলে যেত। একটুও প্রাণের ভয় নেই ছেলেটার। বরুণা জোর করে নিজের উরু থেকে চঞ্চলের হাতটা সরিয়ে দিল। চঞ্চলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটা বিরক্ত ভঙ্গি করলো বরুণা।

সুবিমল ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ মশাই, আপনি কি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?

সামান্য বিব্রত ভাবে দীপক বললো, কেন বলুন তো?

—নইলে এই জঙ্গলে একা একা বেড়াতে এসেছেন। এরকম উৎকট শখ আর কার হবে?

—বাঃ, মানুষ বেড়াতে যায় না।

—তা যাবে না কেন, কিন্তু বেড়াবার জায়গা-অজায়গা বলে তো একটা ব্যাপার আছে!

বরুণা অপলক ভাবে ছেলেটিকে দেখছিল, তার মুখ থেকে একবারও চোখ সরায় নি। এবার আবার জিজ্ঞেস করলো রাঁচীতে আপনার চেনা কেউ আছে? কোথায় থাকবেন?

—কোনো ঠিক নেই। দেখি, কোনো একটা জায়গা খুঁজে নেবো। ধর্মশালা আছে নিশ্চয়ই।

—ধর্মশালা কেন? আপনার জন্য খুব ভালো একটা জায়গা আমরা ব্যবস্থা করে দেবো। আপনাকে সেখানেই ঠিক মানাবে।

সুবিমল জোরে হেসে উঠে বললো, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, বরুণা। কাকের সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর সঙ্গে আমার চেনা আছে। একে সোজা সেখানেই ভর্তি করে দিতে হবে!

যতক্ষণ বরুণা কথা বলছিল, দীপক মুখ টিপে হাসছিল। সুবিমলের কথা শুনে কিন্তু বললো, দেখুন, রাঁচী যাবার কথা শুনলে কিন্তু সবাই ঐ এক রসিকতা করে! এতদিনেও এটা পুরোনো হয়ে যায় নি!

—না, পুরোনো হবে কেন? পাগলের কি অভাব আছে?

রাঁচী পৌঁছোতে ভোর হয়ে গেল। চঞ্চল অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বরুণা আর ঘুমোয় নি, সুবিমলকে জাগিয়ে রাখার জন্য সারারাত জেগে গল্প করেছে। সবচেয়ে আরামে ঘুমিয়েছে দীপক—পিছনের সিটটা সম্পূর্ণ তার একার—দিব্যি আরাম করে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়েছে। শহরে ঢোকার মুখে সুবিমল বলেছিল, ছোঁড়াটাকে জাগিয়ে দি, নেমে যাক্ এখানে। বরুণা বলেছিল, আহা থাক্ না, বাড়ি পর্যন্ত চলুক্। চা-টা খেয়ে না হয় যাবে।

কম্পাউণ্ডে ঢোকার পর বরুণা চঞ্চলকে জাগালো,

দীপক তখনও ঘুমিয়ে। চঞ্চল যেন ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল, জিনিসপত্র নামাতে গিয়ে ওর প্রতি চোখ পড়ায় বললো, একি ছেঁড়াটা এখনো রয়েছে দেখছি। মহানন্দে ঘুমোচ্ছে! সুবিমল, একে এখনো বিদায় করিস্ নি? বরুণা বললো, ওকি, ও কিরকম বিশ্রী ধরণের কথা? ভদ্দরলোকের ছেলে—এক কাপ চা না খাইয়েই বিদায় করবে?

ঘুম থেকে উঠেই দীপক মহা আরামে আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো, এইটা আপনাদের বাড়ি, বাঃ, চমৎকার বাড়িটা তো! তাকে আমন্ত্রণ জানাবার কোনো সুযোগ না দিয়ে সে নিজেই ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গট্‌গট্ করে হেঁটে বারান্দায় উঠলো। বেতের চেয়ারে কপ্ করে বসে আরেকবার বললো, ভারী সুন্দর বাড়িটা, ফার্স্ট ক্লাস!

সুবিমল আর চঞ্চল চোখাচোখি করলো, দু' জনেই তারপর তাকালো বরুণার দিকে, বরুণা হেসে ফেলতেই ওরাও হাসতে বাধ্য হলো। চাকর মালপত্র তুলছে—বরুণা বারান্দায় উঠে এসে দীপকের দিকে তাকিয়ে বললো, বসুন, চা খেয়ে তারপর যাবেন।

দীপক ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করছিল। এল শেপের বাড়ি, খান চারেক ঘর, পাশ দিয়ে টানা বারান্দা, মাঝখানে ছোট্ট বাগান। সদ্য রং লাগানো হয়েছে দেয়ালে, সেই টাটকা গন্ধও পাওয়া যায়।

দীপক বললো, বেশ বড় বাড়ি তো আপনাদের—এখানেই থেকে যাই না দু'একদিন। এরপর পালামৌ যাবো। আপনাদের ঘর খালি নেই?

ছেলেটার হাবভাবে বরুণা তখনো হাসছে, উত্তর দিল, এ বাড়ি আমাদের নয়। ঐ যে ওর!

চোখের ইসারায় সুবিমলকে দেখিয়ে দিল বরুণা।

দীপক তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সুবিমলের দিকে। সরাসরি বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলো, আপনার বাড়িতে দু'একদিনের জন্য থাকতে দেবেন আমাকে খুব উপকার হয় তা হলে।

চঞ্চলের সঙ্গে কি ব্যাপারে যেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিল সুবিমল। বাধা পড়ায় ভুরু তুলে তাকালো। দীপক কথাটা আবার বললো, দু'একদিনের জন্য আপনার বাড়িতে একটু থাকতে দেবেন? খুব ভালো হয় তা হলে—আমার হোটেলে থাকার পয়সা নেই।

—না। মাপ করবেন, আমার অসুবিধা আছে।

—আমি কিছু অসুবিধে করবো না। চুপচাপ এক কোণে থাকবো।

সারাদিনের বেশীর ভাগ সময় বাড়িই থাকবো না শুধু রাত্তিরটা, কোনো অসুবিধে হবে না।

—আমি আপনার অসুবিধের কথা বলিনি। আমি বলেছি, আমার অসুবিধে আছে।

—কি অসুবিধে? আপনার বাড়িতে এতগুলো ঘর রয়েছে, লোকজনও বিশেষ কেউ নেই—

—ঘর থাকলেই যে আপনাকে থাকতে দিতে হবে, তার কোনো মানে আছে?

—কেন থাকবে না? আপনি ভেবে দেখুন, আপনার ঘর শুধু শুধু খালি পড়ে থাকবে, আর আমি ওদিকে—

মাঝ পথে বাধা দিয়ে চঞ্চল রুক্ষভাবে বললো, এসব কি এড়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে ভাই, শোনো, তুমি বিপদে পড়েছিলে—এতটা রাস্তা তোমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—এবার কেটে পড়ো!

—আপনি ওরকম ভাবে কথা বলছেন কেন? আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন বলে কি আমার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা বলবেন? আপনাদের গাড়িতে জায়গা ছিল, তাই আমাকে এনেছেন—এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় এটা।

চঞ্চল আহত ভাবে তাকালো সুবিমলের দিকে। জিভ দিয়ে আক্ষেপ সূচক শব্দ করে বললো, একটু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই আজকালকার ছেলেদের। ঐ জন্যই বলেছিলুম, না আনলেই হতো। এরা বসতে পেলে শুতে চায়! এখন ঠ্যালা সামলাও!

—আমি এমন কিছু অন্যায় কথা বলিনি আপনাকে।

আপনাদের বাড়িতে শুধু শুধু খানি দর পড়ে আছে—আমি দু'একদিন থাকবো—কোনো অসুবিধে করবো না।

হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেললো চকল। দীর্ঘ চেহারা নিয়ে সে দীপকের কাছে চলে এসে প্রচণ্ড চিৎকার করে বললো, তুমি যাবে, না তোমাকে ঘাড় ধরে তাড়াতে হবে?

সেই চিৎকারে দীপক কেঁপে উঠলো না। স্থির চোখে চকলের দিকে তাকিয়ে বললো, অত চ্যাঁচাবার ছিল না! থাকতে না দিলে আমি এমনিই চলে যেতুম!

—তোমাদের টাইপের ছেলেদের আমি খুব চিনি। ভাগাবও, শুচ্চা—

—আপনি যাতে যাতে বলা বলবেন না! আপনি আপনার কথা উইথড্র করুন!

—কের ভাঁদড়ামি।

—আমার গায়ে হাত দেবেন না

হবে না।

—কি করবে কি? অ্যাঁ? বেশ তেল হয়েছে—

—আমার পকেটে ছুরি আছে, আপনার ঘাড়ে বসিয়ে দেবো। ভাগাবেন না আমাকে—ভেবেছেন একা পেয়ে—

ছেলেটি সত্যিই পকেট থেকে একটা পেনসিল কাটা ছোট ছুরি বার করলো। সুবিমল ওদের মাঝখানে এসে চকলকে সরিয়ে দিয়ে তিক্ত গলায় বললো, ঠিক আছে ভাই, আপনাকে গাড়ি করে এনে আমরাই ভুল করেছি—এখন আর আপনাকে বাড়িতে থাকতে দিয়ে কৃতার্থ হতে পারবো না। এবার হাত জোড় করে বলছি, আপনি যান।

দীপক আর কোনো কথা বললো না। ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে তার জোলাটা তুলে নিল। বরুণা মূর্তির মতন নিঃশব্দে আগাগোড়া বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার মৃদুস্বরে বললো, আপনাকে চা খেতে বলেছিলাম। একটু বসে চা খেয়ে যান্।

ঘাড় ঘুরিয়ে বরুণার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসলো দীপক। মৃদু গলাতেই বললো, আমি পর বাড়িতে চা খাই না।

তারপর সোজা হেঁটে গেট পেরিয়ে চলে গেল সে। গেটের বাইরে গিয়ে ডানদিকে যাবে না বাঁ দিকে—ঠিক করতে পারলো না যেন—হাতা পেরিয়ে ডানদিকেই চলে গেল। যতদূর তাকে দেখা গেল—সেইদিকে চেয়ে রইলো বরুণা।

চায়ের টেবিলে কিছুক্ষণ ঐ ছেলেটির কথাই হলো। চকল খুবই রেগে গেছে। আবার পুঁচকে ছুরি তুলে তাকে ভয় দেখান। উচিত ছিল হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দেওয়া। বিনা পয়সায় এতখানি পথ গাড়ি ঠেলে আনতে পেলো তার জন্য এটুকুও কৃতজ্ঞতা নেই! ওর পেটের ওপর গাড়ির চাকাগুলো চালিয়ে দিলে তখন কে দেখতো! ছাড়া চোর-ছ্যাচোড় কিনা ঠিক নেই। বাড়িতে থাকতে দিলে নির্ঘাৎ কিছু চুরি করে পালাতো! সেই মতলবেই এসেছিল নিশ্চয়ই!

বেশীর ভাগ সুবিমল আর চকলই বলছিল। বরুণা শুনছিল চুপচাপ। একটু পরে যখন পাড়া বেড়াতে এলো নিজের ঘরে, চকলও এলো তার পিছু পিছু। ঘরে ঢুকিয়েই দরজা ভেজিয়ে চকল তাকে জড়িয়ে ধরলো। যখন তখন আদর করাই চকলের খেয়াল। বরুণা বললে, এই, ছি, ছি, কি হচ্ছে, সুবিমলবাবু এক্ষুণি এসে পড়বেন!

কিন্তু মিনিট পাঁচেকের আগে চকল ছাড়ে না। নিস্পৃহ ভাবে ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে বরুণা চলে যায় আলমারির দিকে। সেখান থেকেই ফিরে তাকিয়ে বলে, তুমি ছেলেটাকে ওরকম ভাবে তাড়িয়ে দিলে কেন?

চকল অবাক হয়ে বললো তাড়াবো না?

—তোমার তো বাড়ি নয়, সুবিমলবাবুর বাড়ি—তাড়াবার হলে উনি তাড়াতেন—তুমি বেশী বেশী করে বলতে গেলে কেন?

—সুবিমলটা একটু ভীতু ধরণের। ও মিন মিন করতে জানে না। ঐ সব ছেলেদের লাই দিলে মাথায়

ওঠে। নিশ্চয়ই কিছু চুরি করতে এসেছিল। আমি আর সুবিমল দু'জনেই ব্যস্ত থাকব সারাদিন।

—ছিঁচকে চোর হলে কি ঐ রকম দুঃসাহসীর মতন মাঝ রাতে গাড়ির রাস্তায় শুয়ে থাকে?

—ভদ্রলোকের ছেলেরাও রাস্তায় শোয় না। ওসব ইউনিভার্সিটি কিউনিভার্সিটিতে পড়ার কথা সব ভাহা গুল!

—আমার তা মনে হয় না। আমি চা খেয়ে যেতে বলেছিলাম, তোমরা তাও দিলে না! যাবার সময় কি ঘৃণার চোখে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে!

—একটা লোফার, তার জন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না!

তারপর সারাদিন সুবিমল আর চঞ্চল দু'জনেই খুব ব্যস্ত রইলো। সুবিমল যে অফিসের অফিসার সেই অফিসে শিগগিরই একটা বড় সাপ্লাইয়ের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হবে। এমন জরুরি ব্যাপার যে টেনডার বন্ধ করারও সময় নেই। সুবিমল ভেতরের কথা জানে—এই কণ্ট্রাক্টটা চঞ্চলকে দিয়ে করাতে পারলে—দেড় লক্ষ টাকার ডিল—অন্তত তিরিশ হাজার টাকা নীট লাভ থাকবে। শনিবার দুপুরেই সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জামসেদপুর থেকে চঞ্চলকে নিয়ে ফিরেছে রাতারাতি। সারাদিন যার যার সঙ্গে দেখা করার সেরে এলো দু'জনে। সন্ধ্যেবেলা কর্তাদের খুশী করার জন্য পার্টি হবে। তার জন্য বাজারও সারতে হচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে।

সারাদিন বরুণা প্রায় একাই বাড়িতে রইলো। ওরা দু'জন যেন ফাঁকে ফাঁকে বাড়ি আসছে—তখনও তারা নিজেদের মধ্যে সেই কণ্ট্রাক্ট, ওয়াগন রিজার্ভেশান, ঘুষ, টাকা—এইসব কথাতেই মত্ত হয়ে রইলো। বরুণা তার স্বামীর এই রকম ব্যস্ততা আগেও দেখেছে। আগে কখনো তার খারাপ লাগে নি। কোনো ব্যাপারেই সময় নষ্ট করতে চায় না চঞ্চল। এমনকি স্ত্রীকে আদর করার ব্যাপারেও—ছুটো শহরের মাঝখানে দশ মিনিট সময় হাতে থাকলে সেই সময়টুকুতেই আদর করে যায়—কিন্তু কখনো বরুণার মনই গোটা এক সপ্তাহ বা একটা দিন—সে কল্পনা করতেই পারে না! যার আটত্রিশ বছর বয়েস, এই বয়সেই কত উন্নতি করেছে চঞ্চল।

সন্ধ্যেবেলা পার্টিও খুব জমে গেল। পার্টিতে কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে একটু বেশী মিষ্টি হেসে কথা বলবে বরুণা—চঞ্চল এক ফাঁকে দেখিয়েছিল। একটু মিষ্টি হেসে কথা বললে দোষ কি, একথা মিষ্টি হেসেই বলেছিল চঞ্চল। বহু বোতল মদ খোলা হয়েছে, দেখতে দেখতে উড়ে গেল দেড় ঘণ্টার মধ্যে।

উৎসবের শেষে নিজের ঘরে এসে চুপ করে শুয়ে আছে বরুণা। সব চুকিয়ে দিয়ে চঞ্চলও ফিরে এলো। বেশ নেশা হয়েছে তার—বরুণাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজলো। উত্তাপহীন ভাবে বরুণা বললো, ছাড়ো, আর ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগছে না? কি বলছো বরুণা! আজ দারুণ লাকি ডে একটা, কত সহজে কণ্ট্রাক্টটা হয়ে গেল। অবশ্য সুবিমল হেল্প করেছে—ওকে দেবো থ্রী পারসেন্ট—আরও অনেক কণ্ট্রাক্ট বাগাবার চান্স আছে। ভাবছি রাঁচীতে একটা অফিস খুলবো। জামসেদপুর আর রাঁচী—দু'জায়গায় যদি চালাতে পারি—একটু বেশী ঘোরাঘুরি করতে হবে—আর, এত শক্ত করে গিট বেঁধেছো কেন?

কাঠের মতন শক্ত হয়ে শুয়ে রইলো বরুণা। তার বার বার মনে পড়তে লাগলো সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটার কথা—যে অকারণে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে, কোথায় কখন থাকবে ঠিক নেই—রাস্তায় শুয়ে পড়তে পারে অনায়াসে, কি সরল ভাবে বলেছিল, আপনার বাড়ীতে বেশী জায়গা আছে—আমাকে থাকতে দেবেন না কেন? এরা অন্য কোন্ জগতের মানুষ।

—তুমি সেই ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে—সারাদিন আমার মন খারাপ লাগছে।

—আবার সেই চোর ছোঁড়াটার কথা; তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—সেই ছেলেটাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছে, তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করেছি।

॥ শেষ ॥

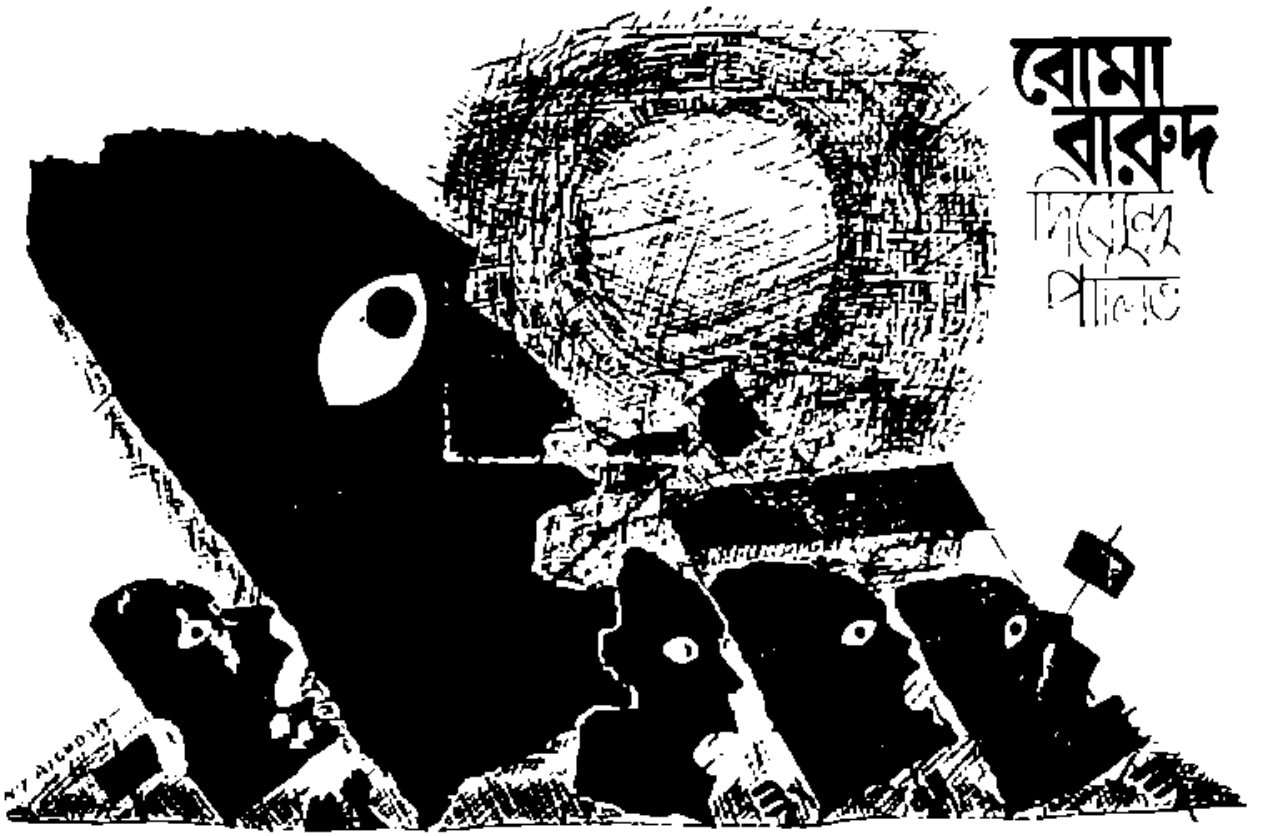

বোমা বারুদ দিয়েছে পালাতে

প্রথমে ট্যাক্সিটা স্লো করতে দিল। সামনে ট্রাম, ট্রাফিক চালু হয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বেশক্ষণ না হাত নামে।

ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল শশধর। এখনো সময় আছে। আধঘণ্টা তো বটেই, কিছু বেশিও হতে পারে। সময়ই নির্ভর করছে যারা আসবে তাদের ওপর; আপাতত কখন আসবে তার একটা আন্দাজ আছে মাত্র।

গলা দিয়ে ধোঁয়া নামলে শশধর কর্তব্যটার বেড় অনুমান করতে পারল। ট্রাম ও ডবল ডেকারের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখে নিল ওদিকের ফুটপাথে পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি; নাকের নিচে মোচড়ানো পুরু গোঁফ ব্যাকব্রাশ চুল, পাজামা, হালকা হাতের খদ্দরের পাঞ্জাবি। বর্ণনায় যেমন ছিল, হুবহু। এখন রাস্তা পেরিয়ে শশধরকে লোকটির সম্মুখীন হতে হবে।

মধ্যেই

'আরে—!' লোকটি, চেরা চোখে তাকাল। বুকের ভিতর পর্যন্ত হাতটা বাড়াবে কি না ভাবতে বাড়িয়ে দিল বুড়োর মতো চেহারা লোকটির হাত থড়থড়ে, কড়ে আঙুলটা বেঁকা। বেঁকা আঙুলের সূত্রই কাজ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে

'ননী না!'

'তাই তো দেখছি…'

'ক' বছর পরে…

'আর হিসেব! সব গুলিয়ে গেছে!'

অকারণেই পকেটে হাত ঢুকে গেল শশধরের। থেকে কাজ শুরু হয়ে এখন থেকেই বিশ্বাস করতে হবে ননীগোপালকে। এখন থেকে সতর্ক ও

ছুরন্ত বয়ে চলাফেরা করতে হবে। সময়ের চিহ্ন থাকলে যারা অসবে তারা এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে, চুপচাপ, অগোচরে, শিরার ভিতর যে-ভাবে রক্ত চলাচল করে। তারপর এক সময়, জড়ো হতে হতে, জড়ো হতে হতে ফেটে পড়বে হঠাৎ। এইভাবেই আসার নিয়ম। আর, অন্তত যতোক্ষণ তারা না আসে, ততোক্ষণ পকেটে হাত দিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে শুধু।

'কতোক্ষণ এসেছো?'

'মিনিট দশ বারো।' ননীমাধব, অন্যমনস্ক, রাস্তা দেখল। 'ও লাইনে ট্রাম ফুলে নিচ্ছে এখন কেই-ই বা আসবে এদিকে! যত তাড়া বাড়ি ফেরার। শালা লোকজন দিন দিন ভিতু হয়ে যাচ্ছে।'

'কেন!'

'কি ক'রে বলব! স্বভাব বোধ হয়!'

'বোধ হয় তা নয়। আমি তো দেখছি কিছু লোক নতুন করে সাহসী হচ্ছে, হঠাৎ জোর পেয়ে যাচ্ছে মনে। সবাই ভিতু নয়।'

'আমি ও-সব বুঝি না—।' একটু থামল ননীমাধব, কিছু ভাবল। 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কালী পুজোর পটকা বানাতে গিয়ে ছোটবেলার আঙুলটা গেল, আর সোজা হল না। অভ্যাসটা থেকে গেছে, এখন কাজে লেগে গেল। এ বছর মরশুম ভালো। একটা যেতে না যেতে আর একটা আসছে। দশ বিশ পকেটে এলেই হল।'

বঁড়শির মতো বেঁকা আঙুল সুদ্ধ হাতটা ওপরে তুলে ধরল ননীমাধব। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল এবং দেখাল, দ্যাখো, কতো বাহাদুর আমি। শশধর ভাবল, ননীর রাখঢাক নেই; কিন্তু নিষ্ঠুর। ও পারবে।

ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে খুব দ্রুত একটা ট্রাম চলে গেল। ওপরের তারে আগুনের ফুলকি। কিছু লোক গেটে গেটে ঝুলছে, পিঠে পিঠ, পায়ে পা লাগিয়ে। ননীমাধব হয়তো ঠিকই বলেছিল, লোকজন ক্রমশ ভিতু হয়ে পড়ছে, দিন দিন ফেরার তাড়া বাড়ছে। এইভাবে ক্রমশ রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে! পায়ের তলায় ফুটোর ওকড়া যেমে উঠল শশধরের। যারা আসবে তাদের দেখা নেই।

'শীত চলে গেল!' আপন মনে একটা বিড়ি ধরাল ননীমাধব। 'দু' দিন বেশ গরম পড়েছে, তাই না?

আকাশে রোদ। দুপুর শেষ হয়ে আসছে। ফাল্গুন এটা কোন মাস মনে পড়ে না। পৌষ বা ফাল্গুন, যে কোনটা হতে পারে। কিছু খুচরো হাওয়া থেকে থেকে ঘুরে যাচ্ছে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে কবে শীত পড়েছিল!

ননীমাধব প্রশ্নের উত্তরে হাসল শুধু। ধোঁয়া টানল গলা ভর্তি করে। কিছু বলার নেই, সত্যিই কিছু বলার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা।

'ঘড়ি আছে?'

'না—'

'ক'টা বাজল?'

এদিক ওদিক তাকাল শশধর, যদি কোন ঘড়িঅলা হাতের দেখা মেলে।

নেই। ফুটপাথ ফাঁকা। মাঝে মাঝে যাদের দেখা যাচ্ছে, তারা দাঁড়াচ্ছে না। কাছেই বাস স্টপ; খানিক আগে পর্যন্ত ওখানে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখা যাচ্ছিল। খানিক আগে তারা হেঁটে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে। দূর পর্যন্ত তাকিয়ে শশধর তাদের হেঁটে যেতে দেখল। তারপরেই অপরিচিত কয়েকজন তাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল। আজ হয়তো গুলি গোলা চলবে, তারা বলছিল। খুব শিথিল ভাবে কথাটা কানে পৌঁছল শশধরের।

দুপুর শেষ হয়ে আসছে। পড়ন্ত রোদ্দুরে হঠাৎ চোখ রাখলে মনে হয় শেষ করেছে, বৃষ্টি নামবে। হড়হড় করে একটা বাস পিচে চাকা ঘষতে ঘষতে চলে গেল। এই সময়, পকেটে হাত দিয়ে, হঠাৎ বোমারু বিমানের কথা মনে পড়ল শশধরের। হাঁটু দুটো ঠুকে গেল জোরে, হাতের তালু ঘেমে উঠল। কেমন অস্বস্তি বোধ করল শশধর। অকারণেই একবার আকাশের দিকে তাকাল: এটা কোন মাস, মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝেই এমন হয়। দিন, ক্ষণ, সময় গুলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধাঁধার মতো লাগে, তারপরেই চোখের ওপর একটা পর্দা নেমে আসে। নানারকম চিন্তা শুরু হয়। যেমন আজ, খানিক আগেও, ট্যাক্সিতে আসার সময় মনে হয়েছিল, এত তাড়া কেন। বরং ওরা আসবে তাদের প্রস্তুতির দরকার; তার ব্যস্ততার কারণ কি! সে তৈরীই আছে, পকেটে টাটকা বোমা—একবার বিস্ফোরণে তিন মাইল শব্দ ছুটবে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। তাহ'লে তাড়া কেন! উত্তর খুঁজতে গিয়ে কোন কিছু পাবার আগেই পরস্পর হারিয়ে গেলন হঠাৎ। চোখের ওপর ভারি একটা কিছু নেমে এল যেন।

'কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব!' কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে দিল ননীমাধব, চল, ঘুরে আসি।'

'কোথায়?'

'গলা ভেজাবো।'

'সময় পাবে না—'

'ওরা এলে আওয়াজ পাবো। কাছেই তো—'

'কি দরকার!' স্বগতোক্তির গলায় বলল শশধর, 'তুই ঘুরে আয়—'

'তুমিও চল।' ননীমাধব একটু অপেক্ষা করল, শশধরকে অনিচ্ছুক দেখে বলল, 'চল না—'

'ননী, এভাবে চলে না। বেসামাল হয়ে পড়বি।'

'তা নয়—'

শশধর এগুলো, পাশে ননীমাধব। বন্ধ না হলেও দোকানপাটের শাটার নামানো, দরজা টানা। শেষ মিনিটের খদ্দেরের অপেক্ষায় কুচকাওয়া ফুটপাথে দাঁড়িয়ে; পুলিশ বোঝাই একটা ট্রাক মোড়ে এসে পজিশন নিতে সওয়া মাথায় তুলে দোকটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এখন রাস্তা শুনশান। এক লাদনুখো ট্রাক থেকে নেমে লাইটপোস্টের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল; তার মাথার ওপর উলঙ্গ নর্তকী টাকা মাপের নাভি দেখাল।

শশধর দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ননীমাধবও। আবার চলতে চলতে নিবে-যাওয়া বিড়িটা ধরিয়ে নিল ননীমাধব।

'বাইরের আমদানি।,

'না হ'লে পারবে কেন!' বিমর্ষ গলায় বলল শশধর, 'ইনস্ট্রাকশন আছে, দরকার হলে আজ গুলি চালাবে। বাইরের আমদানিই ভাল, হাত কাঁপে না!'

'ওরা আসবে কখন?'

'যে-কোন সময়—', শশধর থামল, কিছু চিন্তার জন্য সময় নিল যেন।

'ননী, এখন না গেলেই হত। ওরা যে-কোন সময় এসে পড়বে। হিসেবের গোলমাল হলে ভেস্তে যাবে।'

'চল।' শশধরের কব্জিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল ননীমাধব, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন!'

'সেই ছেলেটা মারা গেছে হাসপাতালে।'

'কে!'

'সেদিন আগে আগে আসছিল, নিশানা ভুল হয়ে গেল। নেতাগুলো জায়গা বুঝে সরে পড়ে—'

'তাই নিয়ম। আমরা ধরা পড়লে কর্তার ফাঁসি হবে না। এটাই রাজনীতি।'

'কাগজে দেখলাম হাসপাতালে মারা গেছে। একটা হাত তখনই উড়ে গিয়েছিল। বাপ নেই, মা কর্পোরেশনের নার্স। নেহাতই বাচ্চা।'

'দুধের বাচ্চা, এ্যা!'

হঠাৎ হা হা শব্দে হেসে উঠল শশধর। শব্দটা জোরেই হয়েছিল। ওষুধের দোকানের লোকগুলো সেই শব্দে চোখ তুলল। পিছনে তাকিয়ে ননীমাধব দেখল মোড়ের মাথায় পুলিশগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা ক্রমশ নির্জন হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে একটাও বাস বা ট্রাম দেখা যায় নি।

'ননী, তুই তাকে শহীদ করে দিলি! ওর নামে একটা বেদী হবে, কিছুদিন হৈ চৈ করবে। তারপর ভুলে যাবে।'

ভাটিখানার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বার দুয়েক ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আর তখনই, অনর্গল মাছি তাড়ানোর মতো চাপা ভনভনে শব্দটা কানে এল শশধরের।

অন্ধকারে। ছিঁড়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক বসে আছে; সবই বন্ধ থাকায় মুখগুলো স্পষ্ট হয় না। অন্ধকার প্রায়ান্ধকারের সঙ্গে জায়গা বদল করছে, প্রায়ই। আগে নলীমাধব, পিছনে শশধর। জায়গা খুঁজে মুখোমুখি বসল দু'জনে।

নলীমাধবের মাথার বোঝা আটকে গিয়েছিল। কাশল, কাশতে থাকল।

'ডাক্তারেরা বিশ্বাস বোঝে না—'

'নলী, চুপ কর।'

চুপচাপ। লোক আসতে নলীমাধব জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবে?'

'কিছু না—'

'খাও, ভাল লা নলীমাধব দুটো আনতে বলল।

চুপচাপ। চারদিক বন্ধ, আর ঘরটা মিহি অন্ধকারে ঢাকা। পেটের ভিতর অদৃশ্য কলকব্জার মতো অন্ধকারে গুড়গুড় করছে, খাবি খাচ্ছে মানুষগুলো। রোলিং শাটারের বহির্গত শব্দে চকিতে মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল নলীমাধব। শশধরের চোখ নলীমাধবের মুখের ওপর, ওর ঘন জোড়া ভুরু ও কপালের কাটা দাগের ওপর নিবদ্ধ। নলীমাধবের ভুরুর রঙ পরিষ্কার কালো নয়, একটুখা ছাই মেশানো, হঠাৎ দেখলে মনে হয় দুটো রোমশ গুয়োপোকা মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের ঘ্রাণ নিচ্ছে। শশধর চোখ ফিরিয়ে নিল।

আজ কি বৃষ্টি হবে! ভিতরের অদ্ভুত গুমোটের মধ্যে বসে শশধর টের পেল শরীর থেকে রসের মতো চিটচিটে ঘাম বেরুচ্ছে। অন্ধকার মুখগুলি একান্তভাবে অস্পষ্ট, রহস্যময় টানে ঝুঁকে পড়েছে পরস্পরের দিকে, পচা ফলের গন্ধের মতো একটা মিশ্র রাসায়নিক গন্ধ নাক ছুঁয়ে পিছলে যাচ্ছে বার বার। অনুরূপ না হোক, প্রায় এই পরিবেশে পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে বুকের মধ্যে মৃত্যুর হাওয়া ঘোরাফেরা করত। তখনো বারুদের গন্ধ মিশে থাকত রক্তে। রাত ভোর হবার আগেই হিসেবহীন বেরিয়ে পড়া, লক্ষ্য স্থির রেখে রাস্তার কোণে অপেক্ষা। ঐ পথে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি আসবে মনে রেখ, একটু ভুলচুক হলেই পস্তা পড়বে, ভুলের শাস্তি—। দেশের জন্য আর কী করছ, শশধর, কর্তা বলেছিল একদিন, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তার মূল্য পাবে না। পাবে, যদি বেঁচে থাকো।

এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা পারল শিলে ফেলল শশধর। কপালের ঘাম ভুরুর মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য কীটের মতো সন্তর্পণে চোখের ওপর নেমে এল। বাকি চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে টেব্‌লের ওপর নামিয়ে রাখল শশধর।

শব্দ করে ঢেকুর তুলল নলীমাধব। চোখের দৃষ্টি ঘন ও আরক্ত, মোচড়ানো গোঁফ ঝুলে এসেছে পাশে।

'আরো খাও—'

'না।'

'খাও?'

'না।'

'কেন!'

'কাজটা ভালো হচ্ছে না। আজও একটা বাচ্চা মারা পড়বে।'

'শশটা মরুক আমার কি!' ফাঁকা গ্লাসটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ক্রমশ চোয়াল শক্ত করল নলীমাধব। 'আমি মিছিলে তাব্ করব, যে মরে মরুক। মিছিল ভাঙলেই হল। কেউ আমার ভাই ভাগুর নয়। শালারা আসে কেন!'

'কেন আসে তুই বুঝবি না—'

আলগা হাতে গ্লাসটা সরিয়ে দিল শশধর। অবস্তি। মাথার ভিতর এক লক্ষ ঝিঁঝি ঝিল্লিরব তুলেই শান্ত হয়ে গেল। যারা আসবে, এতোক্ষণে তাদের এসে পড়ার কথা। শশধর কান খাড়া করল, সতর্ক হল, দূরের শব্দ কানে পৌঁছল না। শুধু একরাশ মাছির ডানার মতো ঘোরাফেরা, ভনভনে আওয়াজ। এখন সময় কতো?

'কি ভাবছ?'

'সময়টা জানা দরকার।'

'ঘাবড়ে যেও না। এসে চিল্লাবে—'

ইশারায় নলীমাধবকে নিরস্ত করল শশধর। এখানে

ভয় নেই। তবু, নেশা ধরে গেছে মনীর, যেকোন কিছু বলে ফেলতে পারে। শশধর ওর ফুর মুখের দিকে তাকাল, তাকিয়ে থাকল।

'মনী, তোর বিবেক নেই!'

'ন্-না' যেন সহিত কিছু বলে ফেলেছে শশধর, প্রবল আপত্তিতে মাথা ঝাঁকাল মনীন্দ্রাধব, 'আমার হাত আছে, পা আছে, লিভ আছে। বোমা মারতে পারি, দু'দশটা মাগীকে কাত্ করতে পারি। আর কিছু বুঝি না।'

'তবু—' শশধরের মুখে কথা জোগাল না। দম নিয়ে বলল, 'যাদের মারছিস তারা তোর দেশের লোক, তোর ভাষার কথা বলে—'

'ধুৎ! আমার আবার দেশ কি! ও সব বুজরুকি, বুঝলে, ধাপ্পা।' হাতের উল্টো পিঠে চোখ রগড়ে ঘাতস্থ হবার চেষ্টা করল মনীন্দ্রাধব, সময় নিল। শশধর লক্ষ্য করল কোটিক চোয়ালের ওপর দুংস্থ গর্ত থেকে মনীন্দ্রাধবের চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠছে।

'তুমি কে!' টেব্‌লে কনুই গেড়ে ডান হাতটা প্রায় তার নাকের ডগায় তুলে আনল মনীন্দ্রাধব, 'হু আর ইউ! এককালে সাহেব মেরে বিপ্লবী সেজেছিলে; এখন শালা বিপ্লবের দোহাই দিচ্ছ! দোহাই?'

একটা ভাবে নি। ঘ'রে পড়া মানুষের মতো অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল শশধর, জানে না। বুক থেকে শেষ পাঁজরটি খুলে নিতে শশধর যন্ত্রণা অনুভব করল, কোন রকমে হাত তুলে মনীন্দ্রাধবের উদ্যত হাতটি সরাল। তারপর মুখ ঝুকিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল, জানি না।

'কেউ শালা সাচ্চা নয়। মনীন্দ্রাধব বলল, 'তুমিও না, আমিও না। তাহ'লে অত খুশি কিসের!' বলতে বলতে উঠল, টুকটাক গ্লাস ঠুকে মার্ড-করা লোকটির আকর্ষণের চেষ্টা, পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করল। —'চল।'

'একটু বস।'

'কেন!'

'বসে যা—'

চোখ তেরছা করে শশধরকে দেখল মনীন্দ্রাধব।

'ওরা আসছে। শোন, আওয়াজ দিচ্ছে—'

'বসা যাবে না। ওঠ।'

অস্বস্তির ঘোরে পকেট চেপে ধরল শশধর। জীবন বস্তুটা খানিক আগে পর্যন্ত শরীরময় উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। এখন শশধর কোন উৎসাহ বোধ করল না।

দরজার দিকে চাকরটা, মাতাল নিয়ে দু'তিনজন ভিতরে এল। এই সময় স্লোগানের শব্দ হঠাৎ কেমন দুরাগত মেঘের শব্দ, শুনল শশধর। মনীন্দ্রাধব ওর হাত চেপে ধরল, 'তাড়াতাড়ি—'। তারপর আবার, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুড়ে কিছু যেন গড়িয়ে চলেছে।

স্লোগান জোরালো হতে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা চলছিল, ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তা জুড়ে মেঘলা বিকেল আর বিচ্ছিন্ন পায়ে ছুটো। বলা যায় না, আজ হয়তো দুই হবে।

একটা অস্বস্তিকর বিচলিত ভাব এতোক্ষণ ঝিমিয়ে রেখেছিল, অথচ, বাইরে বেরিয়েই চমৎকার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল শশধর। আগে মনীন্দ্রাধব, পিছনে সে, এইভাবে হেঁটে ক্রসিংয়ে এসে শশধর মনীন্দ্রাধবকে দাঁড়াতে বলল। ঘর্মতল বরাবর যতোদূর দেখা যায় ট্রাম লাইনের ওপর পরিষ্কার আলো খেলছে, লোকজন বিরল, একটা পেট্রোল ভ্যান ক্যাপা গতিতে ছুটে আসতে আসতে মুখ পাল্টিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে যাওয়া করল। ওখানে লাইন বেঁধে রেল-বেট পুলিশ, একটা ট্রাক; আরো দূরে, বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও, লোক চলাচল অব্যাহত। কিছুক্ষণ আগেও এই এই জায়গায় পুলিশ ছিল, এখন নেই, অল্প সময়ের মধ্যেই সব যেন ঢেলে সাজানো হয়েছে। মিছিলটা এগিয়ে আসছিল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ওরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

'পুলিশ তুলে নিল কেন!'

'জানি না—'

শশধরের চোখ মিছিলের দিকে। যে-ভাবে আসছে তাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওদের মিছিল বেরিয়ে যাবে। এখান থেকে সামনের সারির মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যায়, স্লোগানের তালে শক্ত মুঠোগুলো ওপরে

উঠছে, নামছে, ক'রো কাছে আসতে একসঙ্গে অনেক হাতে ছোট ছোট ক'রে ছুলে ওঠল। নবীমাধব উত্তেজিত; ডান হাতটা আলগোছে পকেটে ঢুকিয়ে, চাপা গলায় বলল, 'কোথায় জায়গা দেবে?'

'দেখি—'

শশধরের স্বর অস্পষ্ট। স্থির দাঁড়িয়ে ও মিছিলটাকে সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখল। কতো লোক বোঝা যায় না; হাজার হতে পারে, দুহাজারও হতে পারে। পায়ে-ব্যাণ্ডেজ একটি চোদ্দ পনেরো কিশোর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, তার পিছনে কয়েকটি মেয়ে, এক বৃদ্ধা—পুরু চামড়ার মতো দুটি শুকনো স্তন ঝুলে পড়েছে নিচে। ওইসব মুখ ক্রমশ শশধরের চোখের ওপর ছায়াতে লাগল। গভীর নিঃশ্বাস নিল শশধর। মিছিলের পাশ কাটিয়ে একটা পুলিশ ভ্যান দ্রুত চলে গেল। এতোক্ষণ রাস্তা ফাঁকা ছিল। কিন্তু এখন যেন চারপাশে অতিরিক্ত মানুষ, ছোটখাটো ঘটনা, ওপরের ব্যালকনী ও জানালার কৌতূহলী মুখ। এই সব দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে শশধর নবীমাধবকে খুঁজল, পেল না।

ঘর ঘুরে চোখ মিছিলের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যায়। চোখে মুখে নিষেধহারা ভাব ফুটে উঠল শশধরের। সামনে তাকিয়ে দেখল ওরা প্রায় ধর্মতলার মোড় বরাবর পৌঁছে গেছে, মিছিলের জোর ক্রমশ বাড়ছে। আরো দূরে পুলিশের কর্ডন—আর বিপুল চীৎকার; শশধরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসংখ্য পিঁপড়ের নির্বোধ চলাফেরা। সন্দেহ নেই, সময় বুঝে মিছিলের ভিতর আত্মগোপন করেছে নবীমাধব—এই ভাবেই সুবিধে।

ফুটপাথ থেকে নেমে মিছিলের পাশে হাঁটতে লাগল শশধর, বহুদিন পরে সে হাঁটুতে জোর অনুভব করছিল। আজ তার নবীমাধবকে নিরস্ত করা উচিত ছিল, যে করেই হোক, একটি দিন অন্তত ওদের বুক টান করে গন্তব্যে পৌঁছতে দেয়া উচিত—ভাবতে ভাবতে গলা উসখুস করে উঠল শশধরের স্লোগানগুলো পেটের ভিতর থেকে উঠে এসে গলায় চাপ দিল, হয়তো এবার সেও চেঁচিয়ে উঠবে। 'আচ্ছা, এই খাদের ব্যাপারটা,' পাশে, ধাবমান দুই প্রৌঢ়, চাপা গলায় আলাপ, 'কি মনে হয়?' 'ভালো না।' 'এই লোকগুলো, যারা মিছিল করে, এদের সবাই তো ভোটও দেয় না।' চুপচাপ। 'পৃথিবীতে স্পষ্ট দুটো দল হয়ে যাচ্ছে—'। শশধরের কাছে এইসব কথার অর্থ স্পষ্ট হল না। এরা কারা—তারপর ভাবল, আমি কোন দলে তারপর, 'হু আর ইউ?' 'একদিন সাহেব মেরে বিপ্লবী সেজেছিলে—'; অন্যমনস্ক চিন্তার ভিতর এগিয়ে যেতে যেতে শশধরের হাতের মুঠো ক্রমশ শক্ত হতে থাকে। ঠিক সেই সময়, অতর্কিতে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ছুটে এল—

ধাতস্থ হবার আগেই সম্মুখের মিছিলটা ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখল শশধর। যে যেদিকে পারল, ছুটল। সামনে, বেটনধারী পুলিশ হুড়মুড় ক'রে ছুটে এল, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে উঠল; পুনরায় টিয়ারগ্যাস শেল্ ফাটার শব্দ। একা দাঁড়িয়ে শশধর দেখল, বিশ পঁচিশটা ছেলে মাঝপথে দাঁড়িয়ে ব্যারিকেড তৈরী করছে, চটপট দুটো পরিত্যক্ত ঠেলা গাড়ি চলে এল। সরে গিয়ে থামের আড়ালে দাঁড়াল শশধর। পিছু হটে যেতে যেতে জনতা এক জোট হয়ে স্লোগান দিচ্ছে, আর ওখানে ব্যারিকেড আগলে কয়েকটি যুবক ও কিশোর, উত্তেজিত, মরণাপন্ন মুখ। মোড়ে ঘনঘন পুলিশের হুইসল। মাইক স্পীকারে গলা এল, ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আপনারা চলে যান। না হ'লে কারার করব।'

ব্যারিকেডের পিছনে, ক্ষুব্ধ, ওদের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'চালাও। আমরা তৈরী আছি, বলেই রাস্তায় বসে পড়ে খান ইট ভাঙতে শুরু করল। আর সেই মুহূর্তে, আবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—

শারীরিক বিস্ফোরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে, পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারার আগেই, শশধর লক্ষ্য করল একটা পুলিশ ভ্যান এগিয়ে আসছে। আর একটু এগোলেই ওদের নাগাল পাবে—তারপর শুধুই ট্রিগারে হাত রাখার অপেক্ষা। ওরা নড়ল না। থামের আড়ালে শরীর

লুকিয়ে শশধর ফেরার চেঁচাবার চেষ্টা করল, 'পালাও—' স্বর বেরুল না। শুধু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তৎপর ছেলেগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের বয়েস ভুলতে লাগল শশধর —সেই অন্ধকার গাছের নিচে অপেক্ষমান যুবক। শরীরের প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করল শশধর, যা করার এখনই করতে হবে। নিজের ব্রেন সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ নেই। পুলিশভ্যান ওদের নাগাল পাবার আগেই তার হাত ছুটবে ঢাকা লক্ষ্য করে, অব্যর্থ, পর পর। বড় ভালো বাবার তৈরী দক্ষতেজী হাত দুটি, কখনো প্রতারণা করে নি।

শেষবারের মতো ফাঁকা ট্রাম লাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে পৃথিবীর শেষ চাওয়ায় বুক ভরে নিল শশধর। আর ভাবল, খবরের কাগজগুলো চমৎকার লেখে যদি মৃত্যু হয়, হবেই, রক্তাক্ত শরীরের ছবির নিচে কাল সকালে সে হয়তো বর্ণিত হবে গৃহগত, নিরীহ এক পথচারী রূপে—

॥ শেষ ॥

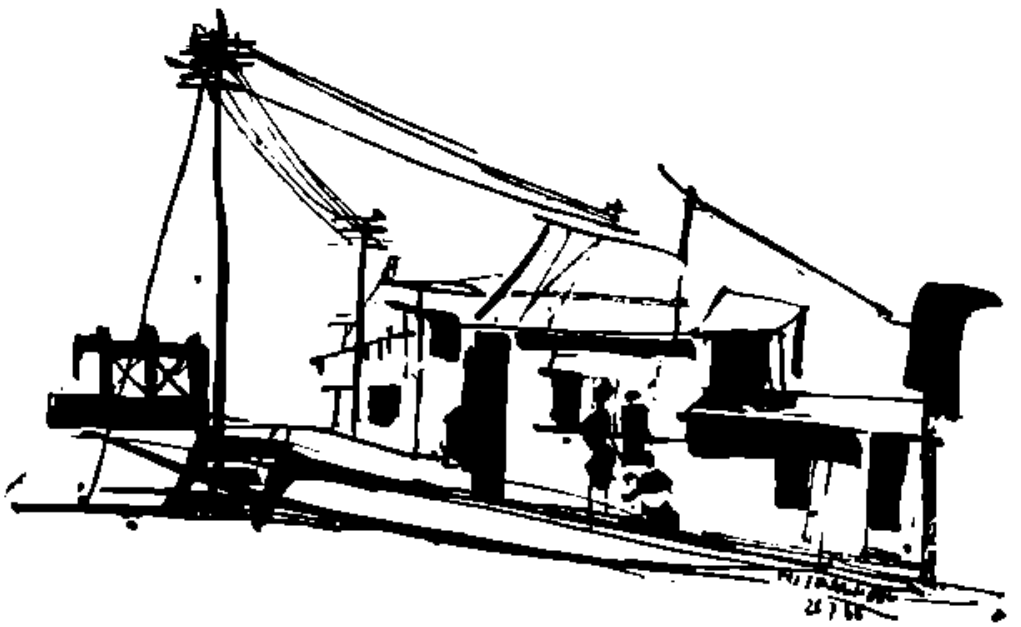

স্কেচ : নিতাই ঘোষ (পেন্টাল্স ক্যালকাটা)

তেজরাতি কারবার। নানা জায়গায় সোনা কিনতে হয়। দেখতে একরত্তি দোকান। কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার টাকার বেনাবেচা রোজ। অথচ দিনে বিশ ভরির ওপর সোনার লেনদেন আইনে বারণ। তাই দু'রকম খাতা করতে হয়েছে কর্তার। সেইসব খাতার হিসেবের গোলমাল হয়ে টান পড়েছে বলেই কাটালবেড়ের গৌরচন্দ্রের কাজ জুটেছে।

মাথা গুঁজে কাজ করছিল একনাগাড়ে। কর্তাই ডেকে বলল, এখন গুটিগুটি ধাটা না ধরলে শেষ ট্রেনেও বেশ মেরে দেবে ঘোষ।

তিন বছরের সাধেক হিসেব। ভেবেছিল মাস চারেকের খাটুনি। তাই আটশো টাকার কড়ারে কাজ হাতে নিয়েছিল। গৌরচন্দ্র এখন দেখছে আট মাসেও এ কাজ শেষ হবার নয়। জমা খরচে হাজারো গরমিল জড়ানো। টিফিনের বাটিটা ধুয়ে জল খেয়েছে সেই বেলা বারোটায়। বাড়ি পৌঁছতে না হোক রাত এগারোটা। গৌরচন্দ্র খাতাপত্র বাঁধাছাদা করে মই বেয়ে কাঠের তাকে তুলে রাখল। তারপর চোখ মুছে চশমাটা পরে কর্তার তবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আজ ষোল দিন কাজ ধরেছে। দশ পাঁচ করে বাহাত্তরটা টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। কাজ খুব এগোয়নি। তবু গোটা তিরিশেক টাকা না হলেই নয়। হাতের তেলোয় দু'খানা দশ টাকার আর পাঁচখানা এক টাকার নোট পাকিয়ে ভাজ করে কর্তা চেপে রেখে দিল। চাইতেই দিয়ে দিল, 'বাজার খরচের তোলা টাকা দিয়ে দিলাম ঘোষ। একটু দেখে শুনে কাজটা উদ্ধারে

দিও। কোর্ট-কাছারি করে কারবার লাটে বেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

গৌরচন্দ্র দেখেছে কথা বলার সময় কর্তার থুতনীতে ঘামের ফোঁটা মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করে নড়ে। তারই বয়সী হবে। চারপুকুরের দোকানী। গজরখানা দুধ দি দিয়ে ছেঁচে নেয়। নিজের দিকে তাকাতে পারে না গৌরচন্দ্র আজকাল।

'দোকানের দিকে চেয়ে কাজ করে যাও ঘোষ। তোমাকে দোকান দেখবে—'

গৌরচন্দ্র ঘোষ সাঁখা দোকানে মালিকের সামনে লাউডগা হয়ে হুয়ে হুয়ে বাসল। তারপর দু'পা এগিয়েই ক্যানিং ষ্ট্রীটে পড়ল। হাঁটা পথে বেহালদা এখান থেকে আধঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট। ফুটপাথে বাজার সেরে ঘোষ গিয়ে তেওয়ার কামরায় বসলো।

কলকাতার ছিঁড়িছাঁদ যে কী ধরেছে ইদানীং! গৌরচন্দ্র সব মিলিয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পথ হাঁটে। কর্তা দোকান দেখতে বলে তাকে। ছোটা কথা—দোকানের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হিসেবের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিলে ঝামেলা মিটে যায়। তাহলে কর্তাও তাকে দেখবেন। কর্তা! তুমি কাঁঠালবেড়ে বাজারে মিত্তীদের মিষ্টির দোকান বরাবর স্টেশনের সামনে গৌরচন্দ্র ঘোষের আসল খাগড়াই কাঁসা পেতলের বাসনের দোকান যদি দেখতে! পৈতে থেকে দশকর্মার শতেক খেয়মত এই গৌর ঘোষ তখন পোঁছাতো। হপ্তায় তিনদিন বড়বাজারে গতে ঘুরে বেত। সে তিনদিন ছোট ভাই পুলিন গদিতে বসত। তখন কী রবরবা কাঁঠালবেড়ে বাজারে। মিহি ধুতির ওপর সিল্কের শার্ট পরে এই গৌর ঘোষ হাসিমুখে দোকানে বসে থাকত। খোকা থেকে বাড়ীর ঝিঝী সবাইকে আদরে বসাতো গৌরচন্দ্র। কারবার একদিনের নয়। ব্যাভারই আসল। সব ধুয়ে যাবে। থাকবে শুধু ব্যাভার। সবাই তার দোকানে ঘুরে বেত।

এখন গৌর ঘোষ দোকানের আসল কারবার কর্তাকে সোনাতে যায় তবে জানাবে কেন। তবু খাতা দেখতে দেখতে সিন্দুকের গাদিকে বসে গৌরচন্দ্রের হাত পা কিল্ বুল বুল করে ওঠে। কাঁদের বাড়ির গিন্নি মা কাঁচা সোনা ভাঙিয়ে নাতির কোমর হার গড়াতে দিতে এসেছে—কর্তার মেজো ছেলে হাঁড় কড়িয়ে রেখে শোকেসের এলাশ থেকে সরসর করে ধরো পত্তরের কিরিস্তি দিতে শুরু করে দিল। গৌরচন্দ্র হলে আগে মোড়া এগিয়ে দিয়ে তারপর বলত—মা মণি কি হাঁটতে শিখেছে? শিখে থাকলে তবে একটু যাঁটো করে গড়ান—না হলে খুলে পড়ে যাবে। তাগরটি না হয়ে থাকলে অত খরচে যাবেন কেন মা? তিন আনা সোনা কমিয়ে দিন। আপনাদের মত ঘরে কাজ তো লেগেই আছে। খবর নেবেন—গিয়ে ডিজাইন দেখিয়ে যেপে দিয়ে আসব।

রাস্তার ওপর ছুরি, কাচি, চামড়, জুতোর কিতে, তালা, চিরুনি নিয়ে একদল বসে থাকে। কিছুদিনই ভাবছে একখানা ছুরি আর চামড় কিনবে গৌরচন্দ্র। মোটমাট দশ এগারো আনার মধ্যে। সুন্দর আজ উঠেছে। টিফিনের সময় একটা তাল বেখে কিনে ছুরি দিয়ে তিন ভাগে কাটবে। তারপর চামড় ডুবিয়ে বইয়ের কারবার আর ঘুরে ঘুরে খাবে। শেষে কোন এক ফাঁকে আটটা চুষে ফেলবে। করপোরেশন মার্কেটের সেই একই জায়গায় ফুটপাথে হরেক কিসিমের ফিরিওয়ালার মেলা পাওয়া গেল। অনেক টানা হাঁচড়ার পর একখানা চামড় আর ছুরি বের আনায় নামালো লোকটা। কিনে ফেলে দিল আর একটু হলে। ছ্যাৎ করে উঠল বুকটা। নফরবাবুর বাজার থেকে পাইকারীর ঘরে কিনলে পটলের কেজি টাকা টাকা। ছোট মেয়েটা জ্বর থেকে উঠে পটলের ঝোল খাবে বলে বায়না ধরেছে আজ তিনদিন।

'অত থাক ভাই। কাল দেখা যাবে।'

লোকটাও নাছোড়বান্দা, 'দিন বারো আনা। পছন্দ করেছেন যখন—'

'আজ আর হল না ভাই। মন ঘুরে গেছে—' চন্দ্র লজ্জায় মাথা খেয়ে একখানের দোকানদার গৌরচন্দ্র ঘোষ হ্যারিসন রোডে পড়ল। আর পাঁচটা মিনিট হাঁটলেই শেয়ালদা। এ পথে কতবার ঘুরে গেছে গৌরচন্দ্র। তখন এত দোকান হয়নি এদিকে। এখনকার মত কাঁচের আলমারিতে খড়া, খালা সাজিয়ে বাসনের দোকানদারি চলত না। তখন খাকত খ'টের ওপর মাদুর বিছানো। সেখানে গিয়ে বসতে হত। মেঝেতে বাসনের ডাই থাক থাক সাজানো থাকতো। হাড়িই গৌরচন্দ্র রাখতো পাঁচিশ রকমের। জগদলার মুখে মুখে বরের বাসনপত্রে লাভ থাকতো মোটা রকমের।

পুলিন না? থমকে দাঁড়িয়ে গেল গৌরচন্দ্র।

সিঁথির ধার ধরে পাকা হয়ে পাকতে শুরু করেছে। নাকের দু'পাশে বয়েসের রেখা এখনও তেমন চেপে বসতে পারেনি। একেবারে সামনে এগিয়ে গেল গৌরচন্দ্র। প্রথমে সে, দু'বোনের পরে মায়ের কোলের ছেলে পুলিন। বাংলা তেরোশো চল্লিশের পাঁচুই মাঘ ভোরে কাঠালবেড়ের হারাণচাঁদ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র পুলিনচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। ছোট পিসির সঙ্গে সঙ্গে দশ বছরের গৌর—তখন সবাই ডাকতো গৌয়্যা বলে—আঁতুড়ে যাকে মালসা মালসা আগুন দিয়ে এসেছে।

বাষট্টি বছরে হাংলাদি শেষ করে গৌরচন্দ্র পুলিনের সামনে গিয়ে পড়ল। হাঁটুরে লোক ভেবে পুলিন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে বড় খোকা নারাণ। বেশ ভাগরটি হয়েছে। সে ই থমকে দাঁড়ালো, 'বাবা। জ্যাঠামশায়—'

নারাণকে কোলে নিয়ে গৌর দোকানে বসত। বৌমা রান্না করতেন। সেসব শোনার পাত্তর ছিল না গৌর। চ্যাওাই ম্যাওাই করলে পুলিনকেই তখন কষে ধমক লাগাতো।

ছোট মেয়ের হাত ধরে খানিক এগিয়ে গিয়েছিল পুলিন। ফিরে দাঁড়ালো। রাস্তা ভর্তি লোক। পেছন মুটের মাথায় নানান্ জিনিসপত্তর। হাত ঘড়ি দেখল পুলিন, ট্রেনের আর বাইশ মিনিট, 'তুমি কোত্থেকে?'

দোকানের আলোর রাস্তাটাই শেয়ালদা অবধি চকমক করছে। এবার পুজো পড়েছে আগেভাগে। বড়বড় ব্যবসাদারের ঘর দওবার বোঝাই। এত হৈ চৈ —তার মধ্যে ষোল বছর পরে পুলিনকে এই প্রথম দেখে মুখে প্রায় কিছুই এল না গৌরের, অথচ কত কথা ছিল, 'এমনি। বড় বাজার থেকে ফিরছি। খাতা লিখি একটা দোকানে। তোরা কোত্থেকে?'

ছোট মেয়েটাই কথা বলল, একে দেখেনি গৌর, শুনেছে যেদিন থেকে আশি বিঘে জমির ধান সবটাই পুলিনের একার গোলায় উঠছে—সে বছরই এই খুকিটি শুভঙ্করীর কোলে এসেছে। গোলবার বিত্তিরবাড়ির মেয়ে শুভঙ্করী গৌরচন্দ্রের পছন্দেই এবাড়ি এসেছিল।

'তোমার হাতে ওটা কি।'

'কোলা, টিফিনের বাটি আছে না।' একটু হেসেও দিল গৌরচন্দ্র খুকিটির কথায়। শুভঙ্করীর মুখ পেয়েছে — না পুলিনের।

'এসে পারো বড়দা। তুমি ত এখন আগের মত ব্যস্ত থাকনা।'

এতদিন পরে পুলিন একটা কথার মত কথা বলেছে। খুব সত্যি কথা। আগে দোকানের হাল ধরে বসতে হত তাকেই। তখন খদ্দের দেখবে—দোকানের ঝালাকের ম্যাটেল পাল্টাওবে—সবই গৌরচন্দ্রকে দেখতে হত। তারপর মাঝে মাঝেই রেজিষ্ট্রি অফিস ছোটবে ডাকা ডোবা —সব তখন গৌরচন্দ্র ঘোষ কিনে চলেছে। মাটির নেশা বড় নেশা। বাবা বেঁচে, মা বেঁচে। বড় সংসার। সম্পত্তি মার নামেই কিনে চলেছে গৌরচন্দ্র। বাড়ির বড় ছেলে সে। ছেলেদের বিয়ে দিতে হচ্ছে। বাসা বাড়ছে।

'ঠিক বলেছ।'

পুলিনের ছেলে হাত ধুলে ট্যাক্সি থামালো। ট্যাক্সিতে বসে বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এল পুলিন। 'উঠে এস। তুমিওতো শেয়ালদা যাবে—'

না বলতে পারল না গৌর। কতকাল পরে মোটরে বসল। হাতে টাকা থাকতে কোনদিন ফূর্তি করা হয়নি। একা একা মোটরে চড়া, পথ মিটিয়ে বেড়ানো, কেনা-কাটা এসব কোনদিন করতে পারেনি।

'এসব রাস্তা মনে আছে তোর?'

থাকবে না কেন?' পুলিন বেশ অবাক হয়েই বলল। একটু রাগও হল, 'কলকাতায় এসে এ-রাস্তা না মাড়িয়ে উপায় আছে?'

'সে কথা বলিনি রে—,' হাসল গৌর। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় লোকজন ঘটি বাটি থালা বাসন জলের দরে বেচে দিচ্ছে। চোর ত্রিশ চল্লিশ মণ মাল কিনতে হত তখন। 'সন্ধ্যের ট্রেনে দুই আর আমি মুটে ধরে শেয়ালদা থেকে কাড়ি কাড়ি বাসন নিয়ে এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতদিন মহাজনের ঘরে গিয়ে উঠেছি—'

ছেলে মেয়ের মাথার ওপর দিয়ে পুলিন চোখ টিপলো গদাকে, 'ওসব কথা থাক—,' বলেই পুলিন জানলা দিয়ে রাস্তায় তাকিয়ে থাকল।

শেয়ালদায় উঠেই গৌর ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল।

পুলিন ভেড়া ভাড়ার গাড়ীতে উঠে ফোনের পুতিটিকে জানলায় বসিয়ে দিল। মেয়েটি সব সময় টরটর করে কথা বলছে। সেই শুরু করল, 'লোকটা কে বাবা?'

পুলিন বলল, 'আমার দাদা—'

পুলিনের ছেলে নারায়ণ বলল, 'বলনাম না ভ্যাঠামশায় শুনলি নে? ছোটবেলায় আমায় ঘুড়ি পরিয়ে কাঠাল-বেড়ের পঞ্চাননতলায় নিয়ে যেত দুর্গা দেখাতে।'

'ওরকম দেখতে কেন বাবা?'

'বুড়ো হয়েছেন—' বলে পুলিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকল। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। একটু পরেই দু'ধারে জল দাঁড়ালে ধানক্ষেত এসে পড়বে। এধারে জল বেশি হওয়ায় বীজতলা ডুবে গেছে। চালা জমি এখন হেড় হাত জলের নীচে। পাটনাই আর কিছু মোটা ওখড়া ধান দিয়ে সামলাতে হবে। এসব কথা ভাবতে শুরু করে পুলিনের মনে পড়ে গেল,—দাদা দোকানে বসে বসেই আগচাষীদের চাষের কুটকচালি বাতলে দিত। পাশে বসে পুলিনের তিক্তবিরক্তি ধরে যেত। অথচ সেই লোক আজ কতখানি বুড়ো হয়ে গেছে।

ভেতর কামরায় গৌরচন্দ্র এক দঙ্গল মেছোর পাশে জায়গা পেয়েছে। লোকগুলোর কোমরে গেঞ্জির নোট আর খুচরোর আণ্ডিল। ক্যানিং যাচ্ছে। রাত রাতের মীমাংসে ভাউন ভেটকি পারসে কিনবে। যে লোকটা পয়সা গুনছিল তার গায়ে হেলান দিয়ে গৌরচন্দ্র বুঝলো ট্যাকে জোর থাকলে মন যেরাত ফুর্তিতে টলটল করে। ঘিবি তর্ক করছে, পা ঝুলে দিয়ে হাসছে—অথচ সে নিজে এত ধাপাধাপির কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে বোধ হয় বয়েস চলে গেছে। এই মনে আসতেই বুঝলো এই বয়সে তাকে কেউ আর সান্ত্বনা দিতে আসবে না।

মা নাকি ছোটবেলায় তাকে কোল থেকে নামাতো না। একটু কাঁদলেই বুকে চেপে ধরে বলত, 'সোনা আগের জন্মে তুমি বড় বুড়ো হয়ে মরেছিলে। তাই নাতিপুতির জন্যে কষ্ট হচ্ছে।'

গৌরের একজন ছোট পিসি ছিল। ঘুটিয়ারি শরিফে নেমে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল বরাবর একবেলা হেঁটে গেলে হোগড়া-পলতা গাঁ। সেখানে ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে যায় পিসির। গৌর তার খেলুড়ে ছিল। বিয়ের পর পিসি আর একদিনও আসেনি। শুনেছে, জোজবরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে পিসির একটুও কষ্ট নেই মনে। ঘর ভরতি তৈরি সংসার পেয়েছে। তাই নিয়ে সুখে আছে। পিসির নাকে জন্ম ইস্তক নাক ছাবির দাগ। অথচ কোনদিন নাক ফোটায়নি। দেখতে নাকি অনেকটা তার ঠাকুরমার মত ছিল। ঠাকুরমার আমলের কত কথা দিব্যি বলে দিত। পিসেমশাইকে শুধু বিয়ের রাতে একবার দেখেছে গৌর। পেল্লায় পেল্লায় ধানের পাটের মালিক। শহর বন্দরে আসে না মোটে। সব আছে। বাড়ছে বোকাই পুকুর, ধানে বোকাই গোলা। তাই-ই করতে চেয়েছিল গৌর। ভাবতে ভাবতে প্রায় 'উ হু হু' করে চেঁচিয়ে উঠল।

সেজের পরদা সামলে মেজো লোকটা ঠেলে উঠল, 'সরে বসো দিকিন। আরও ত কত জায়গা রয়েছে। অত ঘনাঘনি কেন!'

'চটছ কেন ভাই।' আজও চড়া গলায় কথা বলতে দেখেনি গৌর। ওই তার কাল হল। তখন যদি পুলিনকে কড়কে কথা বলত! আজ আর বাবা মাথার ওপরে নেই। মাও নেই। পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ে নিয়ে খাবি খেতে হত না গৌরের। সবই করেছিল এক জীবনে।

অথচ পুলিন—

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। সকলিয়াসল ষ্টেশন ছাড়িয়ে একটা খাল পড়ে। তার ওপরের ব্রীজটা কিছু নরম হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ট্রেনটা এখন সে-জায়গা পার হচ্ছে।

কী করেনি গৌর। সংসারটা টেনে তোলার জন্য সবই করেছে একা। অথচ আজ পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ের গর্ভধারিণী রেণুবালা হাড় কালি করেও সবাইকে মুখির মত রাখতে পারছে। আর সে নিজে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শুধু ঘুমোতে বাড়ি ফেরে। রেণুবালা তবুও ঘুমোতে পারে না। অজীর্ণের ব্যথা, অম্লশূল কত কী যে আছে। বেচারার জন্যে কষ্ট হয় ভাবলে। অথচ এই সংসার চালিয়েছে রেণু ফেলে ছড়িয়ে। মাস গেলে সত্তার আমলে হাজার বারোশো খরচ ছিল। আহা! হা হা! কী ভুল করিছি! হাতে টাকা থাকলে টাকার মর্ম বুঝিনি। অছেদ্দা করার বেসারৎ গুনতে হচ্ছে এখন। সারা ব্যাপারটাই এ ভাবে দেখে এখন গৌর।

বাংলা তেরোশো চৌত্রিশের বোশেখ মাসে শ্বশুরের কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়ে কাঠালবেড়ের বাজারে দোকান করেছিল গৌর। তখন তাজা বয়েস। ফুর্তি কত মনে। পুলিন নেহাৎ ছেলেমানুষ। খেলাধুলো করে। তাকে এনে তবিলে বসিয়ে দিল গৌর। গোঁজ মেরে বসে থাকত পুলিন। উহুঁ ওসব ভাল না। দাবড়ে সিধে করে দিত গৌর। নিজের ব্যবসা ভালবাসতে শেখো। তাহলেই লক্ষ্মী সেধে আসবেন। ব্যবসা মানে কি? ব্যাভার। ব্যাভারটাই আসল। এ জগতে কেউ কারও ধার ধারে না। আবার ধারেও বটে। কাঠালবেড়ের বাজারে বসে এসব শিখেছে গৌর।

আরও অনেক কিছু শিখেছে। তুমি যদি কাউকে ভালোবাসো তবে কিছু আশা কোরো না। করেছো কি অমনি পুড়ে মরবে। কিছু চেয়ো না। তার কাছে। শুধু দিয়ে যাও। দেওয়া থামলে সে বিগড়ে যাবে। যাবেই। সে-যদি ভালবাসার ভাই হয়।

এই পুলিন। এই পুলিনের কথাই গৌর বলতে পারে। নাক দিয়ে পোটা পড়তো সব সময়। কানে পুঁজ। সেই অবস্থায় দু'বছরের পুলিনকে কাখে নিয়ে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দশ বারো বছরের গৌর গুলোতে দেওয়া ধান পা দিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে রোদে ঘুরিয়ে দিত। এসব আর কে মনে রেখেছে। তখনকার ত কেউ আর সাক্ষী নেই। সবাই মরে হেজে গেছে।

অথচ পুলিন থার্ড মুনসেফের আদালতের বারান্দায় প্রেফ বলে দিল, 'মামলায় যখন দাঁড়িয়েছি তখন আর ফেরা যায় না দাদা। আদালতের বাইরে সালিশী মীমাংসায় অনেক ঝক্কমারি।'

পুলিন তুই যদি বুঝদার হতিস, তাহলে কী আর আজকে আমায় বড়বাজারে খাতা লিখতে যেতে হয় এই বয়েসে। এখন ত আমার সুখ আহ্লাদ করার বয়স। গদিতে বসে বসে শুধু টাকা গুনে তুলে রাখার কথা এখন আমার। একটু যদি বুঝদার হতিস তাহলে কাঠালবেড়ে বাজারে অমন ডল দোকান ঘর আমাদের হাতছাড়া হোত না। তুই কি পেলি বল। কিছু টাকা, কিছু আরাম। নিজের ব্যাপার সঙ্গে ভাগ করে নিলে কী এমন ক্ষতি হোত তোর পুলিন। সবই তো আমার হাতে বানানো।

'এই বুড়ো ভাম। ঠিক হয়ে বস নয়ত ধরমা দিয়ে ফেলে দেব।'

ঘোর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যায় গৌর। বুকে হাত পড়ে বোধায় ধরেছিল বোধ হয়। গো গো আওয়াজ পেয়ে মেজোগুলো তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিল।

'মুখ খারাপ কোরলে কেন ভাই?'

'কে আমার শ্বশুর রে।' আরও কি বলল। গৌর মাথার ওপরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। পাশেই ক্যানের ভায়গায় একটা গর্ত। কালো কালিতে লেখা—'স্টোলেন'—তারপরেই লেখা—'রিপ্লেস্ড।' এবার চুরির পর আর কিছু লেখা হয়নি।

কল্যনগর পার হয়ে গেছে। খুকি খোকা নিয়ে পুলিন নেমে গেছে কখোন। কল্যনগরেই প্রথম জায়গা কেনে গৌর। দুর্ভিক্ষের বছর। তারপর আবার সেবারকে বুড়ি হল। এক নাগাড়ে একুশ দিন বৃষ্টি। ডাঙা ডোবা জলে সব একাকার হয়ে গেল। খালপাড়, রেলধার—সর্বত্র মড়ার ছড়াছড়ি। ঘটি বাটি থালগড়াই পেতল কাড়ি কাড়ি এসে দোকানে জড়ো হতে লাগল। জলের দরে গৌর সেসব কিনতো। পান্সায় বসে কাঁটার ওপর নজর রাখতো পুলিন। তারপর সন্ধ্যের ট্রেনে কলকাতায় এসে মহাজনের গোদায় পৌঁছে দিত। কি সস্তো বেড়শো দুশো টাকা নগদ লাভ।

টাকা জলে যেতে দেয়নি গৌর। জলে ডাঙায় জমি ডেকে নিয়ে কিনেছে তখন। সেই মুড়োগাছা, নবীনবাবুর আবাদ—কল্যনগর স্টেশন থেকে নেমে গিয়ে চড়াবিস্তায় এক ধোপেই তিরিশ বিঘে জায়গা কিনে ফেলল সে বছর। বাবা বেঁচে। মার নামে জায়গা কিনে গেছে দাগের পর দাগ। মাঠে দাঁড়িয়ে চৌকো শাদা দলবলে মাটির জায়গা দেখেই বায়না করে ফেলেছে। সেবে সেই মা'—

মা তুমি, এ কি করলে! কোলের ছেলের কথায় না জেনে শুনে এ তুমি কি করলে! ওই যে আছে না—ভালবাসার আলা বড় জ্বালা। পুরনো পাশা অঙ্কের ধারগুলি ফিরে ফিরে আসে। ঘরে মারে। সেই পুলিন কত বুড়ো মেরে গেছে। মুখে এখনও সেই দাগগুলো আছে। ওপরে তাকিয়ে গাছে ফল পাকুড় দেখার সময় পুলিনের কণ্ঠমণি শিরদাড়ার সিটের কায়দায় বাগড়া দাগড়া হয়ে ঠেলে উঠতো। আজও মাথা ঘোরানোর সময় পুলিনের গলায় সেই একই ছবি দেখতে পেয়েছে। ছেলেবেলায় পুলিন একবার পুকুর নামলে আর উঠতে চাইতো না। একদিন দেরি দেখে বাবা গৌরকে বলেছিল পুলিনকে তুলে আনতে। বড় বসরাগের পরীর ছিল তখন গৌরের। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে দু'বার ডাকলো। পুলিন উঠলো না। তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের মধ্যে চেপে চুবিয়ে রাখল খানিকক্ষণ। ছেড়ে দিতে পুলিন আর ওঠে না। ভুস করে ওঠে আর ডুবে যায়। ভয় পেয়ে গেল গৌর। তাড়াতাড়ি পাড়ে টেনে এনে শুইয়ে দিল। চোখ লাল, কথা বলতে পারছে না, মুখ চুপসে গেছে। পা টিপে, বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বাড়ি নিয়ে এল। সেদিন বিকেলেই জ্বর—চৌদ্দ দিন পরে ছাড়ল। এই দু'হপ্তা গৌরের কীভাবে কাটলো তা সেদিনের মত আজও মনে নেই। সেবারের পর আর কোনদিন গৌর পুলিনকে কিছু বলেনি। মাস-পুকুরে মাছি খাওয়া পুলিনের মুখখানা আজও ভোলেনি গৌর। চোখের শিরাগুলো শুকিয়ে এসেছে সেই অল্পক্ষণের চুবুনিতে।

ছোটবেলা থেকেই গৌর দেখেছে—বাবা বাইরের ঘরে শুতেন।

বাড়ি বলতে গোলপাতার ছাউনি—তবে দেওয়াল ইটের ছিল। দুখানা কেরোসিন কাঠের চৌকিতে মা, পুলিন, গৌর আর দুই বোন ঠাসাঠাসি করে শুতো। ভোরে উঠে গায়ে কী ব্যথা হয়ে থাকতো। শোবার জায়গায় অভাব রাখবে না, দিনে চারটি চারটি সবাই যাতে খেতে পায় এমন ব্যবস্থা করতেই কাঠালবেড়ের বাজারে আসর জাকিয়ে বসেছিল গৌর।

অবশ্য ফিরতির মুখে। দানা অন্নপ্রাণ পুলিন তার এককথায় ওঠে বসে। গোলবার মিত্তিরবাড়ি মেয়ে-ছেলে এসে সেই ঠিক করল পুলিনের বিয়ে। তখন কল্যনগরে নতুন কেনা জায়গায় বাড়ি হয়েছে। কাজের সুবিধের জন্যে কাঠালবেড়ের বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে গৌর থাকে। গঙ্গা কাছে বলে কল্যনগরের বাড়িতে পুলিনকে নিয়ে মা থাকে। বিয়ের পর শুশুরবাড়ী সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলো।

একা থাকলে সব বলা যায় তাইকে। কিন্তু বৌকলা হবার পর কিছু বলা কঠিন। তার এতদিনের ভাই পুলিন

প্রথম বেসরকারী করতেই কবে ধরেছিল গৌর। টাকা থেকে গন্ধের নগদ ভেঙে শুভঙ্করীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল। ফেরাৎ করেনি গৌর।

তারপর আর কিছু কাছাখোলা ভাবে করেনি পুলিন। সব বুঝতে পেরেছে গৌর। কিন্তু বলার কিছু উপায় ছিল না। ভদ্রনগরের বাড়িতেই সম্বচ্ছরের ধান মজাই হত। তিন তিনটি গোলা। বাবা সব দেখে যেতে পারেন নি। সেই সময় একগোলার ধান হঠাৎ চুরি হয়ে গেল।

পুলিনকে গৌর বলল, 'তোমাকে আর দোকানে বসতে হবে না। বাড়ি আগলাও গে।'

সেই কাল হল। পুলিন আর বাড়ি থেকে এদিকে এল না। সেখান থেকে মাকে নিয়ে গিয়ে কোর্টে নিজের নামে গায়গা জমি ভদ্রাসন লিখিয়ে নিল। সব জানা গেল মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সময়। তখন ধান মাড়াইয়ের দিন। তার কয়েক দিনের মধ্যে দোকানের হিস্সা চেয়ে পুলিন আদালতে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিল।

ক'দিনের মধ্যে বিছানা থেকে উঠতে পারলো না গৌর। বেণুবালা সেক'দিন সারাটা দুপুর মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকত। বেণু যে কত স্নান রাখতো মাথায়। সেবার পুলিনকে দোকানে বসিয়ে বুড়োবুড়ি তীর্থে যাবে ছেলেমেয়ের বিয়ে-থার পর। আর বোল বছর তার বৌদির একটা খবর নেয়নি পুলিন। শোনা যায় পুলিনের ছেলে মেয়েরা ভাল হয়েছে। স্কুলকলেজ ডিঙিয়েছে বোধ হয় বড়টা। একবার জ্যাঠাইমাকেও ছেলেমেয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারিস পুলিন।

'এই বুড়ো ওঠ।'

হড়মুড় করে দাঁড়াতে গিয়ে মেছুড়েদের একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল জোর, 'কাঠালবেড়ে ছেড়ে গেছে?'

'কাল ভোরে কাস্ট লোকালের সময় সময় আবার ছাড়বে। নাও পথ ছাড়ো। কী ঘুম, যে ঘুমোচ্ছিলে বুড়ো—'

ওদেরই ভেতর নরম সরম একটা ছেলে হাঁক দিল, 'কাথায় যাবে বুড়ো?'

এই কথায় গৌর দেখল তারই চোখের সামনে ক্যানিং স্টেশন কাৎ হয়ে দুলে উঠলো। এখন রাত বেশ। ফেরার গাড়ি নেই।

'যাবো আর কোথায় বাবা!'

'চলে এসো আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'এসোনা। পয়লা ভেড়ির ভেটাকির ডাক হবে। নীলামের সময় ক্লোর ধরটা মনে রাখবি বুড়ো। ঠিক ঠিক লাগাতে পারলে একটা মাছ দোব তোকে—'

'তা দিয়ো বাবা—'

মাতলার শুকনো বুকে গ্যাসবাতির সারি। তার নীচে আবাদ, লাট অঞ্চলের সব মাছ এসে হাজির হচ্ছে। কনুয়ার পকেটে নগদে টাকার হাত বুলোতে বুলোতে ডাক দিচ্ছে মেয়ে'রা। জ্যান্ত রুইয়ের দরদে বড় বড় মাছ ভাষায় উঠে খাবি খাচ্ছে। চোখের নিরা শুকিয়ে ওঠার জোগাড়।

সাইডিংয়ে দুই সারি বাঁশ গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে অন্ধকার। শহর বাজারের বাড়ি সব এখন ঘুমে। অন্ধকারে কিছু আলো ছড়ানো এই অজানা জায়গায় গৌর দাঁড়িয়ে গেল।

'শেষ ডাকটা মনে রাখিস বুড়ো।'

'ঠিক রাখবো বাবারা।' এসব বোঝে গৌর। সব বুঝে যায়। থাকে শুধু ব্যাভার। ব্যাভারই ঘাতলা। দশ বারো সেরের একটা কাতলা তখন ঘটা পায়ে হাঁ করে খাবি খাচ্ছে। লেজের কাছে কেটে গেছে। জল থেকে তোলার সময়কার জখম।

। শেষ ।

স্বর্ণচাঁপার দিন

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ইঁট কাঠ পাথরের দানবপুরী যেন পলকে অন্তর্হিত হ'ল। পরিবর্তে দু'পাশে সবুজের সমারোহ। কাকচক্ষু জল টলমল দীঘি, অবারিত দিগন্তের বিস্তার।

জানলার ধারে বসে দেখতে দেখতে অমিয় মুগ্ধ হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম, যদিও বয়স আঠারো পার হয়েছে, হায়ার সেকেণ্ডারির জলধি পার হয়ে বি এস্ সি-র চড়ায় তরী ঠেকিয়েছে, তবু কখনও শহরের বাইরে যায় নি। যাবার প্রয়োজন হয় নি।

আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই এই শহরে ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে, বাড়ির মোটরে তাদের নাগাল পাওয়া যায়। যখন ইচ্ছা যাওয়া যায়, ফিরে আসাও সম্ভব এক দিনের মধ্যে। মাঝে মাঝে বাইরেও অবশ্য রাত কাটিয়েছে। মামার বাড়ি ভবানীপুরের বনেদী পাড়ায়। চার মামা। চারজনেই কৃতী! অমিয়কে পেলে সহজে ছাড়ে না। অন্তত দিন তিনেক আটকে রাখে। অন্য সব আত্মীয়রাও ধারে কাছে।

রেলে চড়া এই প্রথম। কথাটা স্বীকার করতে অমিয় যথেষ্ট লজ্জা পেল, কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, এর আগে সে কোন ট্রেনে চড়ে নি। দু'একবার ষ্টেশনে এসেছে বন্ধুবান্ধবকে নামাতে বা তুলে দিতে, কিন্তু নিজে এমনভাবে গদিতে হেলান দিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে লৌহ দানবের গতির সঙ্গে নিজের মনকে ছুটিয়ে দিতে পারে নি।

প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি মুহূর্ত নতুন বিস্ময়ের দ্বার খুলে

দিচ্ছে। নতুন রংয়ের প্রলেপে তার ওপর দিশাহারা

মা বাপের একমাত্র সন্তান। কাজেই বাড়িতেও সঙ্গীর যথেষ্ট অভাব। খেলাধুলায় আসক্তি কম। পাঠ্য অপাঠ্য পুস্তকের বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় কম। বৃত্তি নিয়ে, তৃতীয় হয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে।

মনে আছে অমিয়র।

পাশের খবর, বৃত্তিলাভের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বাপ ফেরেন অনেক রাতে। ফেঁপুড়ে লোহার যন্ত্রপাতির কারখানা। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। কারখানা বন্ধ হবার পরও বাবা অনেকক্ষণ বসে থাকেন। চিঠিপত্র লেখেন। অনেকগুলো ফোন করেন, ফেরার মুখে মহাজনদের গদিতে ঘুরে তবে বাড়ি আসেন।

কিন্তু সে রাতে অমিয় ঘুমাল না। বাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মা কয়েকবার তাগাদা দিয়েছিলেন।

তুই শুয়ে পড় না, আমি বলব তোর রেজাল্টের কথা।

অমিয় নড়ল না।

বেশ, তুই-ই বলিস। কাল সকালে বলিস।

এবারেও অমিয় মাথা নাড়ল।

না মা, খবরটা বাসি হয়ে যাবে।

মা হেসে সরে গেলেন।

অমিয়র একটু বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হতেই টান হয়ে বসেছিল। মোটরের আওয়াজ কানে যায় নি।

অমিয়কে দেখে বাবাও একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন।

একি রে, তুই এখনও জেগে?

অমিয় কোন উত্তর দেয় নি। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করেছিল।

অমিয়র বাবা যে একেবারে আন্দাজ করতে পারেন নি, এমন নয়।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, কি অমিয়বাবুর ফার্স্ট ডিভিশন নিশ্চয় হয়েছে। ক্লাসের সেরা ছেলে যখন।

কি হয়েছে অমিয় বলেছিল। সোজাসুজি বাবার দিকে চোখ না ফিরিয়ে। অন্যদিকে চেয়ে।

অমিয়র বাবা পকেট থেকে দুটো একশ টাকার নোট বের করে ছেলের হাতে দিয়ে ছিলেন।

হঠাৎ অমিয় হাততালি দিয়ে উঠল।

তারের ওপর পাশাপাশি গোটা চ'রেক লাল রঙের ছোট ছোট পাখি। এমন সুন্দর, এতগুলো পাখি অমিয় এর আগে খাঁচার বাইরে দেখে নি।

হাততালি দিয়েই অমিয় লজ্জা পেল।

আড়চোখে ট্রেনের কামরার দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। কামরার মধ্যে অমিয় ছাড়া যাত্রী মাত্র দু'জন।

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক নিদ্রাভিভূত। আর সুবীর স্পোর্টস্ ম্যাগাজিনের পাতায় বিভোর।

অমিয় আবার বাইরের দিকে চোখ ফেরাল।

এ ভাবে বাড়ি থেকে একলা বের হবার কল্পনাও সে কখনও করে নি। সুবীর ওভাবে জিদ না করলে হ'তও না কোনদিন।

সুবীরের সঙ্গে অমিয়র পরিচয় মাত্র বছর খানেকের। বাইরের স্কুল থেকে পাশ করে সে শহরে এসেছে। সুবীরও ফার্স্ট ডিভিশন, কিন্তু বৃত্তি পায় নি। রসায়নে অনার্স নিয়ে পড়ছে। অমিয় পদার্থ বিজ্ঞানে।

অমিল দু'জনের মধ্যে প্রচুর। ইতিমধ্যে সুবীর খেলাধুলায় নাম করেছে। কলেজ স্পোর্টস্-এ অনেকগুলো প্রাইজ কুক্ষিগত করেছিল। আর অমিয় কোনদিন মাঠেই পা দেয় নি। লেখাপড়ার ব্যাপারে দু'জনের খুব মিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে আলোচনা করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে গিয়ে বসে। অবসর সময়ে গঙ্গার ধারে, কিংবা লাইব্রেরিতে।

সুবীর হোস্টেলে থাকে। অমিয় ছুটির দিন মাঝে মাঝে যায় সেখানে। দুজনে নানা গল্পগুজব করে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতে সুবীরই কথাটা পাড়ল।

এবার দেশে গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে আসি। দুটো মাস এ শহরে বসে কি করব? অমিয় সুবীরের বিছানায়

শুয়েছিল। সুবীরের দিকে চেয়ে বলল, বেশ ?

এমন একটা শব্দের সঙ্গে তার যেন কোন পরিচয় নেই। তারা চারপুরুষ এই শহরের বাসিন্দা। যে রাস্তায় তাদের বাড়ি অম্বা মুখার্জী লেন, সেই অম্বা মুখার্জী তার প্রপিতামহ। কোম্পানীর আমলে সুতোর ব্যবসা করে যেন গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের কোন পুরুষে কেউ চাকরি করেন নি। পিতামহের চুণ আর ইঁটের গোলা ছিল, আর বাবার লোহার যন্ত্রের কারখানা।

ভাবনার দেখে মনে হচ্ছে অমিয় চাকরি করুক, এটাও তার বাবার ইচ্ছা নয়। অমিয় বৈজ্ঞানিক হয়ে তাঁর কারখানার যোগ দিক। বিশ্ব ধাতু দিয়ে এমন কিছু গড়ে তুলুক, যাতে যন্ত্রগুলো দীর্ঘায়ু হয়।

অমিয় হাসে, তা'হলে তো রসায়নে অনার্স নিলেই ভাল হ'ত বাবা।

অমিয়র বাবা থতমত খেয়ে আস্তে আস্তে বলেন, না, না, কিমিস্ত্রি ভাল। কিমিস্ত্রি ডক্টরেট পেলেও আমার কারখানার সাহায্য হবে। মোট কথা, তোমার মেধা আমি আর কাউকে পেতে দেব না। আমার কাজে লাগাব।

সুবীর বলেছিল, হ্যাঁ, বেশ, মানে আমার গ্রাম পাঁশলাগোড়া।

সে আবার কোথায়।

শেয়ালদা থেকে ঘণ্টা আটেকের পথ।

তারপর সুবীরের যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভাবে বলল, তুমিও চল না আমার সঙ্গে। এখন তো আর পড়ার চাপ নেই।

উত্তেজনায় অমিয় বিছানার ওপর উঠে বসেছিল।

আমি ? আমি যাব তোমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ, কি হয়েছে। আমাদের বাড়িতে কোন অসুবিধা হবে না। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই মাকে তোমার কথা লিখি। মাও লিখেছে, এবার ছুটিতে তোর বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসিস সুবি।

সুবীরের বাড়ির কথা অমিয় ভাবছে না, সে ভাবছে নিজের বাড়ির কথা, বাড়ির লোকজনের কথা।

এই শহর থেকে সুবীর অন্য কোথাও যাবে এটা ভাবতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু তার মা বাবা কি অনুমতি দেবেন তাকে বাইরে যাবার জন্য ? চোখের আড়াল করবেন ?

আমাকে কি ছাড়বে বাড়ি থেকে ?

অমিয়র কণ্ঠে চতুরালির রেশ।

আমি গিয়ে মাসীমা আর মেসোমশাইকে বলে অনুমতি নিয়ে আসছি। একটু এদিক ওদিক না গেলে ভাল লাগে কখনও ? ইট, কাঠ, পাথরে মানুষের মনটন্ধ হয়ে যায়।

সত্যি তাই। সুবীর ঠিক বলেছে। মাকে মাঝে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমিয় ভেবেছে। শহরে বৃষ্টিও যেন সীমিত। চার পাঁচ হাত দূরে দুই আটকে যায় পাশের বাড়ির দেয়ালে। কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। একেবারে বাঁধা জীবনযাত্রা। পরিমিত এলাকার মধ্যে চলাফেরা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

সুবীর অসাধ্য সাধন করেছিল।

প্রথমে অমিয়র মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় অমিয় সঙ্গে আসে নি। বাইরের ঘরে বসেছিল।

কথাটা শুনে অমিয়র মা ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন।

অমিয় তো কোনদিন কোথাও যাই নি সুবীর। ও কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে।

ছেলেকে মায়ে মাঝে কোল থেকে সরিয়ে দিতে হয় মাসীমা, বিশেষ করে যখন সে কোলের চেয়েও আকারে বড় হয়ে যায়।

আমি, আমি কি বলছে।

অমিয় তো যাবার খুব ইচ্ছা, অবশ্য যদি আপনাদের মত হয়।

সে বলছে, সে আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে ?

শেষদিকে অমিয়র মার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

তারি তো বেড় মাসের ব্যাপার মাসীমা। আমি অমিয়কে বলে দেব, প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে একখানা করে চিঠি দেবে।

অমিয়র মা সোজাসুজি কিছু বলেন না।

ঘর থেকে সরে যেতে যেতে কেবল বললেন, তুমি একবার ওঁকে বলে দেখ সুবীর। উনি যা বলবেন তাই হবে।

সুবীর নিরুপায় হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অমিয় বাইরের ঘরে বসেছিল। সুবীরকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল।

কি হল, মা কি বললে?

বাসীমা বললেন, মেসোমশাইকে জিজ্ঞাসা করতে। তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

অমিয় কৌচের ওপর বসে পড়ল। ভরোৎসাহ হবে।

তারপর নিম্নস্বরে বলল।

বাবা অফিস ঘরে রয়েছে। বলে দেখ।

সুবীরও ভেবেছিল, আশা নেই। অমিয়র বা বখন বিশেষ ইচ্ছুক নয়, তখন বাবাও হয়তো মত দেবেন না।

তবু সে আস্তে আস্তে অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ভাগ্য ভাল সুবীরের। অমিয়র বাবা একলাই ছিলেন। টেবিলে বসে কি একটা হিসাব করছিলেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুবীর বলল, আসব মেসোমশাই?

অমিয়র বাবা মুখ তুললেন। টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে বললেন, আরে এস এস, সুবীরবাবু, বল কি খবর?

সুবীর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল তারপর নীচু গলায় কথাগুলো বলল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে অমিয়র বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

বেশ তো, খুব ভাল কথা। মাঝে মাঝে বাইরে বের হওয়া খুব ভাল। দশখানা বই পড়ে যা না শেখা যায়, একবার দেশভ্রমণে গেলে অনেক কিছু জানা যায়। তার ওপর তোমরা রয়েছ, ওর কোন কষ্টও হবার কথা নয়।

সব ঠিক হয়ে গেল।

তারপর জিনিসপত্র কেনা কাটা আরম্ভ হয়ে গেল।

মা সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। সতর্ক করে দিতে লাগলেন পদে পদে।

খুব সাবধান গ্রামে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। সর্বদা গায়ে চাদর জড়িয়ে থাকবে। জোলো হাওয়ার দিকে একেবারে যাবে না। সুস্থদের জিনীষানার নয়। সময়ে খাওয়া দাওয়া করবে। কোন অনিয়ম নয়।

সুবোধ বালকের মতন অমিয় প্রতিটি কথায় ঘাড় নেড়ে গেল।

অস্বীকার করে লাভ নেই, শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়ে অমিয়র হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়েছিল। লোকের ভীড়, কুলির হৈ চৈ, ইঞ্জিনের বাষ্পিক শব্দ, এ সবের সঙ্গে সে আগেই পরিচিত ছিল, কিন্তু এতদিন শুধু দর্শক মাত্র। প্র্যাকটিকর্মের এই দৃশ্যের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এবারে সে দর্শকমাত্র নয়। সে আরোহী। এ নাটকে তার অংশ আছে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

দু'জনেই ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট করেছিল।

অন্তবার যখন সুবীর একলা যায়, তখন সেকেণ্ড ক্লাশেই যাতায়াত করে। অথবা এতগুলো টাকা খরচ করা তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।

কিন্তু এবার অমিয়র বাবা লোক দিয়ে টিকিট কিনে দিয়েছেন। দুখানা ফার্স্ট ক্লাশ। ট্রেনে একটু হাতপা ছড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

আসল কথাটা সুবীরের বুঝতে অসুবিধা হল না। পাছে অমিয়র কষ্ট হয়, তাই এই রাজকীয় ব্যবস্থা।

ট্রেন স্টেশনের এলাকা ছাড়াতেই অমিয়র পিছনে ফেলে আসা বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন সব বিস্মৃত হয়ে গেল। নতুন এক জগৎ, তার বিচিত্র বর্ণ আর বিচিত্রতর গন্ধ নিয়ে দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হল।

অমিয় জানলার ধার থেকে সরল না। রোদের তীব্রতা বাড়তেও চুপচাপ বসে রইল। প্রতি মুহূর্তে যে রূপান্তর হচ্ছে, সে দিকে চোখ মেলে।

একসময়ে বই ছেড়ে সুবীর উঠে পড়ল। অমিয়র পাশে গিয়ে বসল।

আর দেরী নেই।

কিসের? আকাশে গোধূলীর অপূর্ব রঙের খেলা

দেখতে দেখতে অমিয় প্রশ্ন করল।

পাশলাপোতা পৌঁছবার মাঝখানে আর দুটো স্টেশন বালকরা আর চন্দ্রলীঘি।

আবার অমিয়র বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। মা-বাবার কথা। কারখানা থেকে এই সময় বাবার ফেরার কথা নয়। মা একলা চুপচাপ বসে থাকে; মায়ের এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে অমিয় কাছে কাছে থাকে। কলেজের বন্ধুর মজার মজার গল্প বলে, কিংবা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের নতুনতম কাহিনী।

এখন কিন্তু মা একেবারে একলা। ঠাকুর চাকরের সংসারে মা যেন দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন।

আমার মা তোমাকে দেখে ভারি খুশী হবে।

কেন?

প্রশ্ন অর্থহীন, কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার বলেই যেন অমিয় কথাটা বলে।

বা-রে কেন আবার। তুমি কলেজের বন্ধু। বৃত্তি পাওয়া ছেলে। তোমার কথা আমি যে প্রত্যেক চিঠিতে মাকে লিখি।

পাশলাপোতা এল।

দুজনেই তৈরী হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কামরার অন্য ভদ্রলোকটি আগেই নেমে গেছে।

জানালা দিয়ে মাথা নীচু করে বাইরের দিকে দেখেই অমিয় হতাশ হ'ল।

সার সার কয়েকটা নিমগাছ। টালিছাওয়া ছোট একটা ঘর। গোটা চারেক কেরোসিনের আলো। অন্ধকারকে আরো যেন বীভৎস করে তুলছে।

ছোট ছোট নানা রংয়ের নুড়ি বিছানো প্লাটফর্মের ওপর।

ওই যে বাবা।

সুধীরের কণ্ঠের সুরে যেন নতুন আবেগ।

কোথায়?

এদিক ওদিক চেয়েও অমিয় কাউকে দেখতে পেলনা।

ওই যে স্টেশনের বাইরে। গরুর গাড়ীর পাশে।

কথার সঙ্গে সুধীর আঙুল দিয়ে দেখাল।

এবার অমিয় দেখতে পেল।

স্টেশনের বাইরে বাঁশঝাড়ের পাশে ছই ঢাকা একটা গরুর গাড়ী। তার কাছে দীর্ঘ চেহারার একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইনি সুধীরের বাবা! অমিয় আশ্চর্য হ'ল, কারণ সুধীর মাঝারি আকৃতির, রোগাটে ধরনের ছেলে। অথচ তার বাবা তো বেশ দীর্ঘ। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ।

ট্রেন সম্পূর্ণ থামবার আগেই সুধীর নেমে পড়ল। তার হাতে শুধু একটা সুটকেশ।

অমিয় কিন্তু ট্রেন সম্পূর্ণ থামতে তবে নামল। খুব

সাবধানে পা ফেলে।

প্লাটফর্মে লোক বিশেষ নেই। জন চারেক। স্টেশনের বাইরে দাঁড়ানো দীর্ঘকায় লোকটি প্লাটফর্মের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুধীর গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি একটা হাত তার মাথার ওপর রাখলেন।

বাবা, এই অমিয়।

অমিয় হাতের সুটকেশটা নামিয়ে রেখে প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের বাবা দুটো হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এস অমিয়। তুমি তো ক্লাসের সেরা ছেলে। এ দেশে

তোমার মতন ছেলেরই আজ দরকার।

অমিয় লজ্জায় অনেকক্ষণ মুখ তুলতে পারল না। গাড়োয়ান দু'জনের জিনিস তুলে নিল। প্রথমে সুধীরের বাবা, পিছনে সুধীর আর অমিয় চলতে শুরু করল।

স্টেশনের এলাকা পার হয়ে গরুর গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল।

সুধীর গাড়ীর মধ্যে উঠে বসল।

অমিয় ইতস্তত করছে দেখে সুধীরের বাবা বললেন, কি হল, উঠে পড়।

সুধীর হাসল, অমিয় গরুর গাড়ীতে এর আগে আর কোনদিন ওঠে নি বাবা। তাই ওর ভয় করছে। তাই না অমিয়?

না, না, ভয়ের কি আছে।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সব ভয়, সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার ভান করে অমিয় গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টা করল।

তার আগেই সুধীর নিজের একটা হাত প্রসারিত করে দিল।

সব শেষে উঠলেন সুধীরের বাবা!

গাড়ীর মধ্যে মোটা করে খড় বিছোনো। এমন কি হেলান দেবার জায়গা পর্যন্ত খড়ের বালিশ।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। দুটো গরুর মাঝখানে ঝোলানো হ্যারিকেন। মৃদু দ্যুতি। ভাল করে পথ দেখাও দুষ্কর। দু'পাশে বাঁশ ঝাড়, আকন্দর ঝোপ।

এত দেরী করলে কেন আসতে?

গাড়ীর মৃদু মন্দ দোলানিতে অমিয়র ঝিমুনি এসেছিল। সুধীরের বাবার কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠল।

প্রশ্নটা সুধীরকে। সুধীরই উত্তর দিল।

এইতে অমিয়র জন্ম দেরী হয়ে গেল।

আবছা অন্ধকার। ভাল করে কারও মুখ দেখবার উপায় নেই, কিন্তু অমিয়র মনে হল সুধীরের বাবা যেন অমিয়র দিকে ফিরে দেখলেন।

অমিয়র জন্ম কেন?

সুধীর বলল, অমিয় জীবনে এই প্রথম ট্রেনে উঠল। এর আগে কলকাতার বাইরেই আসেনি। তাই মাসীমা আর মেসোমশাইকে বলে রাজী করাতে সময় নিল।

অমিয় অনুভব করল, একটা হাত তার পিঠের ওপর এসে পড়ল। সামান্য একটু সস্নেহ আকর্ষণ।

তোমার আর ভাইবোন নেই বুঝি?

অমিয় মাথা নাড়ল। মুখে বলল, না, কিন্তু মুখ থেকে কোন শব্দ বের হলনা।

সেই জন্য তোমার মা বাবা তোমায় চোখের আড়াল করতে চান না। খুব, দেখো তোমার বন্ধুর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

লজ্জায় অমিয় মাথা নীচু করে ফেলল।

চালু জমি বেয়ে খুব দ্রুত গতিতে গরুর গাড়ী নামছে। অমিয় প্রাণপণ শক্তিতে পাশের কাঠের হাতল আঁকড়ে ধরল।

আধ ঘণ্টার ওপর। ঘন অন্ধকার নামল দুপাশের ঝোপ ঝাড়ের ওপর। নীল আকাশ কালো বর্ণ হয়ে এল। এখানে ওখানে জোনাকির মেলা। ওপরে পাতুর চাঁদের ফালি।

বাঁকটা ঘুরতেই চারপাশের চেহারা অনেক বদলে গেল ঝোপ জঙ্গল উধাও। ধানক্ষেত, তরি-তরকারির বাগান। কলাগাছের সারি।

সুধীর বলল, অমিয় এই দেখ পার্বতী।

অমিয় মাথা নীচু করে দেখল। দেখবার চেষ্টা করল। উল্টো দিকে।

ম্লান চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা সম্ভব, সেইটুকুই দেখল। বিরাট নদী। আর দেখা যায় না। ছোট ছোট ঢেউয়ের ওঠা নামা। মনে হবে নদীর বুকে যেন হাজার রূপোর টুকরো ছড়ানো।

নদী? অমিয়র বিস্মিত প্রশ্ন।

উপনদী বলতে পার। এখান থেকে দশ মাইল দূরে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

গঙ্গা অমিয় দেখেছে অনেকবার। কলকাতার গঙ্গা। স্তিমিত সাম্পান জাহাজ কণ্টকিত, আবর্জনাবাহিনী। শীর্ণ, দুঃস্থা রমণীর মতন শক্তিতাও।

কিন্তু এ নদী অনেক অবারিত, অনেক দুর্বার।

একমনে বুজ চোখে অমিয় পার্বতীর রূপসুধা পান করছিল, হঠাৎ অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত চীৎকারে চমকে ঘুরে বসল।

প্রকাণ্ড একটা লোহার গেট। তার সামনে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে গোটা তিনেক লোক।

সুবীর বলল, এই আমাদের বাড়ি।

সুবীর লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর সুবীরের বাবা। একেবারে পিছনে অমিয়।

একটা লাল বাড়ীর কাঠামো। মস্ত বড়, রীতিমত প্রশস্ত একটা বারান্দা প্রায় পার্বতী নদীর ওপর। আলো অন্ধকারে মোটা মোটা থামগুলো অস্পষ্ট দেখা গেল।

খোকাবাবু।

বুড়ো দারোয়ান একজন সুবীরকে প্রায় কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করল।

লজ্জায় সুবীর এঁকে বেঁকে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করল।

মুখে বলল, ছাড়ুন্ আমি কি আগের মতন বাচ্চা আছি নাকি যে তুমি কোলে নেবে?

তুমি বুঝি মস্ত বড় হয়ে গেছ? ওই তালগাছের মতন?

দরোয়ান হাত দিয়ে পিছনের বাগানের দিকে দেখাল।

সবাই চলতে শুরু করল। অমিয় পিছনে। সবচেয়ে পেছে দরোয়ান, ঠাকুর, চাকর-বাকর।

চওড়া সিঁড়ি লাল রংয়ের। দু'পাশে দুটি পরী। একদিকের পরী অবশ্য শুধুদেহ। সিঁড়িতে ওঠার সময় সুবীর অমিয়র পাশে এসে দাঁড়াল।

সিঁড়ির ঠাঠালে রিয়াট একটা বাঘের মুখ। আলোয় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। লোল জিহ্বা, মনে হচ্ছে শোনিতসিক্ত।

এই বাঘটা আমার ঠাকুরদা শিকার করেছিলেন।

আস্তাজে অমিয় প্রশ্ন করল।

সুন্দরবনে।

হ্যাঁ, আগে ঠাকুরদার ওখানে জমিদারী ছিল। বছরে বার চারেক যেতেন।

হঠাৎ সুবীরের কণ্ঠস্বর বদলে গেল। ব্যাকুল একটা চাপার সুর ধ্বনিত হল কণ্ঠে।

মা।

অমিয় চোখ তুলে দেখল।

ম্লান আলো নয় দরজাকের তীব্র ধাঁধানো প্রায় আলো।

একরাশ কুঞ্চিত কেশ পিঠের ওপর ছড়ানো। গোল সিঁথি সাইজের সিঁদুরের টিপ। আরক্ত গৌর বর্ণ। উজ্জ্বল আয়ত দুটি চোখ। বাঘের। পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ী, লাল ব্লাউজ।

সুবীর ছুটে গিয়ে সেই মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করল।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই অমিয়র দিকে ফিরে বলল।

অমিয়, আমার মা।

অমিয় নীচু হয়ে পা ছুঁতে যাবার আগেই সুবীরের মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখটা তুলে চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে দেখি ভাল করে। তুমি তো হীরের টুকরো ছেলে। সুবী দু'পাতা চিঠি লেখে, তার মধ্যে একপাতা তোমার কথায় ভরা।

অমিয় কিছুক্ষণ আর মাথা তুলতে পারল না।

সুবীর এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে বলল।

নিতা কই মা।

এতক্ষণ তো বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, তোদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ভেতরে পালিয়েছে।

দাঁড়াও ধরে নিয়ে আসি ওকে।

সুবীর দ্রুতপায়ে অন্তঃপুরের দিকে ছুটল।

অমিয় জানে। সুবীরের কাছেই শুনেছে।

নিতা সুবীরের বোন। তাই বোনে যেমন তার, কপড়াও তেমনই। নিতার আর একটা কি নাম আছে। সুবীর বলেছিল। এই মুহূর্তে অমিয়র মনে পড়ছে না।

সুবীরের মা অমিয়র হাত ছাড়েন নি। তার হাত ধরেই ভেতর বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন।

বড়ো একটা খাট জানালার একপাশে। মেহগনি কাঠের মজবুত টেবিল। টেবিলের পায়াগুলোর সাপের

আকৃতি। একটা ধাকাধি আলমারি। কোণে আলনা।

এটা সুবীরের ঘর। তোমরা দুজনেই থাকতে পারবে। নাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। স্নান করবে নাকি?

না, এখন আর স্নান করব না।

বেশ, তাহলে মুখ ধুয়ে নাও।

তুলসী, অ—তুলসী।

প্রৌঢ় একটি পরিচারিকা এসে দাঁড়াল।

নতুন দাদাবাবুকে স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দাও তো।

তুলসী পাশের একটা দরজা খুলে দাঁড়াল।

স্নানের ঘর একেবারে সংলগ্ন। বড় বড় বালতিতে জল টলমল করছে। সেলফ-এ সাবান, ব্রাশ, দাঁতের মাজন। এদিকের ব্র্যাকেটে বিরাট-সাইজের নতুন গামছা। কল নেই। এদিক ওদিক চেয়ে অমিয় হতাশ হ'ল।

তারপর সাবান দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেলল। ঠাণ্ডা জল। মনে হল সারাদিনের ক্লান্তি যেন মুছে গেল। পথ-শ্রমের সব চিহ্ন অপসারিত।

স্নানের ঘর থেকে বাইরে বের হয়েই অবাক হয়ে গেল।

আলনায় তার জামা কাপড় প্যান্ট সাজানো। সুটকেসটা খাটের তলায় রাখা। টেবিলের ওপর তার কলম আর ডায়েরি।

যে সময়টুকু সে স্নানের ঘরে ছিল, তার মধ্যেই কে তার সুটকেস খুলে কাপড় জামা সাজিয়ে রেখেছে।

হয়েছে?

দরজায় সুবীর এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াও চুলটা আঁচড়ে নিই।

দেয়ালে টাঙানো বড় একটা আয়নায় চুল আঁচড়ে নিয়ে অমিয় সুবীরের পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়াল।

এস।

সুবীর বারান্দা পার হয়ে বাঁ দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পাশাপাশি তিনটি কার্পেটের আসন পাতা। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল।

সুবীর বসল। অমিয়কে বসাল পাশে।

অমিয় বলল, আর একটা আসন কার?

বাবার। বাবা ঠাকুরঘরে গেছে, এখনই এসে পড়বে।

অমিয়দের বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা টেবিল চেয়ারে। মাঝে মাঝে কাঁটা চামচও ব্যবহার করে।

ঠাকুরঘর একটা আছে বটে, কিন্তু শুধু সেটা ঠাকুরের ঘর নয়; অকেজো হাঁড়ি কুড়ি, বেতের ধামা, সাজি, অমিয়র ছেলেবেলার প্যারাফুলেটর সব আছে সে ঘরে। দেওয়ালে মোটা তিনেক পট। বিশেষ পালাপার্বণে, অথবা বাড়িতে কারো অসুখ বিসুখ হলে মা ঠাকুরঘরে ঢোকে।

মা, আমরা এসে গেছি।

সুবীরের চীৎকারে অমিয়র চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

বাই রে হয়ে গেছে।

এদিকের দরজা দিয়ে সুবীরের বাবা এসে ঢুকলেন। পরনে পরিষ্কার ধোপ। ঠাকুরঘর থেকেই সোজা চলে এসেছেন।

আসনে বসে বললেন, তোমাদের পরীক্ষা কেমন হ'ল?

প্রশ্নটা ঠিক কাকে কিংবা কে আগে কথা বলবে সেটাই অমিয় ভাবতে লাগল।

সুবীরই উত্তর দিল।

আমার পরীক্ষা মোটামুটি একরকম হয়েছে। কোয়েশ্চেন পেপার একটু দীর্ঘ হয়েছিল। বিশেষ করে কেমেস্ট্রি সেকেণ্ড পেপার।

একটু জল নিয়ে সুবীর আবার বলল।

অমিয়র পরীক্ষা ভালই হয়েছে। ও তো ভাল ছেলে। পরীক্ষা ওর কাছে কিছুই নয়।

একটা প্রতিবাদ করা উচিত, অন্তত ওজরভাব খাটিয়ে, এই ভেবে উত্তর দিতে গিয়েই অমিয় থেমে গেল।

সুবীরের মা ঘরে ঢুকেছেন। দু হাতে দুটি কাঁসার থালায় গুণীকৃত সাদা লুচি।

মহিলা বোধহয় নিজেই লুচি ভাজছিলেন, আগুনের তাপে সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। মাথে চূর্ণ কুন্তল কপালে আটকে রয়েছে।

অমিয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

একটা থালা অমিয়র সামনে আর একটা সুধীরের সামনে নামিয়ে রেখে বললেন, ওমা, তুমিও এসে গেছ। দাঁড়াও তোমারটা নিয়ে আসি।

খেতে বসে কোন কথা হ'ল না।

অমিয়র মা সামনে বসে খাওয়া তদারক করলেন। তরি তরকারি পাচকই নিয়ে এল। অমিয় বাধা দেওয়ে, হাত নেড়েও নিষ্কৃতি পেল না। বাড়িতে সচরাচর যা খায়, তার প্রায় দিগুণ খেতে হ'ল তাকে।

খাওয়া শেষ হতে সুধীরের বাবা বললেন, যাও তোমার বন্ধুকে নিয়ে একটু বাগানে গিয়ে বস, আর যদি ক্লান্ত মনে কর তাহ'লে বরং শুয়ে পড়।

অমিয় বলল, না, ক্লান্তি আর কি। সারাটা পথ তো গরুর গাড়িতেই এসেছি।

সুধীর হাসল, ঠিক আছে, তাহলে চল বাগানে গিয়ে একটু বসি।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে পার্বতী নদীর পাশ দিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। আকাশে জ্যোৎস্না আরো উজ্জ্বল। চারদিকে দুধবরণ আলোতে।

ধারে কাছে কোথাও অজস্র ফুল ফুটেছে। বাতাসে মদির সুরভি।

একটু এগিয়ে সুধীর বলল।

এস, এইখানে বসি।

ঠিক নদীর পারে লাল রংয়ের সিমেন্টের বেঞ্চী। দু'পাশে। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে পার্বতী নদীর জল পর্যন্ত। সিঁড়িগুলোর রংও লাল।

দুজনে বসল পাশাপাশি।

রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে দিলে যেমন অস্পষ্ট সঙ্গীত ভেসে আসে, নদীর স্রোতে তেমনই দূরাগত সঙ্গীতের আভাস।

বেশ কিছুক্ষণ অমিয় কথা বলল না। বলতে পারল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই অনাবিল সৌন্দর্যরাশির দিকে চেয়ে রইল।

তারপর খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, এই নদীতে তোমরা স্নান কর না?

হাঁ করি বৈকি। আগে যখন এখানে ছিলাম, তখন তো রোজ করতাম, কেবল বর্ষাকাল ছাড়া।

কেন বর্ষাকালে নয় কেন?

বর্ষাকালে পার্বতী নদী মহানদী হয়ে যায়। দারুণ স্রোতের টান, আর কি গর্জন। স্নান করা যায় না।

তোমার বাবা কি এখানেই চাকরি করেন, না কোন ব্যবসা বাণিজ্য?

কোনটাই নয়। আমাদের অনেক জমিজমা ছিল, বেশির ভাগ গভর্নমেণ্ট নিয়ে নিলেও এখনও কিছু আছে, তাতেই চলে যায়। তাছাড়া বাবার বোধহয় কোম্পানীর কাগজও কিছু আছে, যার সুদ পান।

অমিয় আর কিছু বলল না। চাকরি বা ব্যবসা কিছুই না করে একটা লোক কিভাবে দিনাতিপাত করে, সেটা সে শহরের ছেলে, তার জানা নেই। জীবিকার জন্য যেখানে উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম, বিরামহীন ছুটোছুটি, তিলে তিলে রক্তক্ষরণ, সেখানে এই নিশ্চিন্ত আরামের রহস্য তার অজানা।

সে অন্য প্রশ্ন করল।

তুমি তো রিসার্চ করবে পাশ করলে, তাই না?

সে রকম তো ইচ্ছা আছে। জানি না কি হবে। বাবার ইচ্ছা আমি দেশের কেমেস্ট্রী নিয়ে গবেষণা করি, যাতে এদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতি হয়।

খুব ভাল কথা। তোমার বাবার বোধ হয় ইচ্ছা, এদেশের উৎপাদন যাতে বাড়ে, এমন কিছু কর। এদের উন্নতি কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত একথা অনেক মনীষীরাই বলেছেন। অবশ্য বিদেশের মনীষীরা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিছু করার চেষ্টা বিশেষ হয় নি। তাড়াতাড়ি কৃষিপ্রধান একটা দেশকে তাঁরা শিল্পকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন।

তাইতো বাবা বলেন। বেদের যুগ থেকে এদেশে ধানের চাষ হয়ে আসছে, অথচ কি করে নতুন উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপণ করতে হবে সেটা আমাদের শেখাতে বিশেষজ্ঞ আসছেন জাপান থেকে।

ঠিক বলেছেন। এছাড়া আরো একটা কথা ভাব—

হঠাৎ অমিয় থেমে গেল। কথা শেষ করতে পারল না।

প্রথমে মনে হ'ল পিছনের লতাকুঞ্জের অন্তরাল থেকে বুঝি কোন নিশাচর পাখী ডেকে উঠল। বাতাস কাঁপিয়ে অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠস্বর।

দাদা।

অমিয় এদিক ওদিক চেয়ে দেখল।

বাবা বলছে এবার শুতে এস। রাত হয়েছে।

অমিয়র কানে বয়াপাতার মর্মর ধ্বনি এল। মনে হল পাতা নাড়িয়ে নাড়িয়ে কে যেন সরে গেল।

কে? অমিয় সুধীরের দিকে চোখ ফেরাল।

আমার বোন নিভা। চল, উঠি।

এ বাড়িতে পা দিয়েই অমিয় একবার নিভার নাম শুনেছিল। এই আবার শুনল। শুধু নাম নয়, কণ্ঠও।

অবারিত জ্যোৎস্নাধারার সঙ্গে, আলোছায়ার রহস্যময় পরিবেশের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কোথায় একটা মিল আছে।

একবার অমিয়র মনে হ'ল, মানুষ নয়, অশরীরী সুধিই শুধু একটা কণ্ঠস্বর।

যেতে যেতেই অমিয় প্রশ্ন করল।

তোমার বোন কি পড়ে?

স্কুলে যায় না, এখানে মেয়েদের ভাল স্কুল নেই। বাড়ীতেই পড়ে। মার কাছে, বাবার কাছে। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে।

সেদিন আর কোন কথা হ'ল না। দুজনে শোবার ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

মা অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন, তোমরা দুজনেই নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়।

সুধীর আর অমিয়র পিছন পিছন মাও ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। মাথায় বালিশ ঠিক করে দিলেন। হাত দিয়ে পেতে দিলেন বিছানার চাদর।

অমিয়র শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন অমিয়র নিশ্চয় মার কথা খুব মনে পড়ছে?

বালিশে মুখ গুঁজে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা নেড়ে অমিয় বলল, না, না।

মুখে না বলল বটে কিন্তু মনে মনে ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল, সুধীরের মা কি অন্তর্যামী? মনের কথাটা ঠিক কি করে টের পেলেন?

এই সময়, রাতে যখন বিছানায় অমিয় শোয়, তখন মা তার মাথার কাছে এসে বসেন। হাত দিয়ে চুলে বিলি কাটেন। অমিয় ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত। খুব ছেলেবেলার অভ্যাস, কিন্তু বড় হয়ে পর্যন্ত এ অভ্যাস তার যায় নি।

সত্যিই এই মুহূর্তে মা'র কথা খুব বেশী মনে পড়ছে। তার আঠার উনিশ বছরের জীবনে এই প্রথম বাইরে আসা। মাকে ছেড়ে থাকা। মা'র স্নেহ মমতার আওতার বাইরে চলে আসা। প্রত্যক্ষ স্পর্শের বাইরে।

অমিয় ভেবেছিল নতুন জায়গায় ঘুম আসবে না, কিন্তু শোবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সুধীরের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারল না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানার ওপর। বেশ চড়া রোদ। সুধীর পাশে নেই। কখন উঠে গেছে।

অমিয় বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

পার্বতী নদীর ওপর দিয়ে কয়েকটা নৌকা চলেছে। গোটা দুয়েক ছেলে ডিঙি, একটা পাল তোলা।

জানলার গরাদ দুটো দুহাতে ধরে অমিয় নিবিড় বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

কী, শরীর ভাল আছে তো?

সুবীরের গলা।

অমিয় ফিরে দাঁড়াল। তুষ্টিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, ভালই আছে। উঠতে একটু দেরী হয়ে গেল।

আমি তোমাকে ডাকছিলাম, মা-ই বারণ করল। বলল, বোধহয় ক্লান্ত। ওঠানো ঠিক হবে না।

সুবীরের পরণে হাফপ্যাণ্ট আর হাফশার্ট।

একি পোশাক?

বাবার সঙ্গে বাইশ মুয়েক বেড়িয়ে এলাম। মর্নিং-ওয়াক। কাল থেকে তোমাকেও বেড়াতে যেতে হবে।

অমিয় হাসল।

ঠিক আছে। বেড়াতেই তো এসেছি।

এস, মুখ ধুয়ে খাবে এস।

এবার বারান্দায় আসন পাতা হয়েছে। পর পর তিনটে। অমিয় আর সুবীর বসল।

সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

অমিয়র দিকে ফিরে বললেন।

অমিয় বাড়িতে কি খাও সকালে? চা বিস্কুট কিংবা চা পাঁউরুটি তাই না?

মাথা নীচু করেই অমিয় মাথা নাড়ল।

এখানে আমরা কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মানুষ। তোমাকে একেবারে গাঁয়ের খাবার খাওয়াব।

বলে মা আর দাঁড়ালেন না। বারান্দা পার হয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই আবার এসে দাঁড়ালেন। পিছনে পাচকের হাতে প্রকাণ্ড একটা থালা। সেই থালাটা সে নামিয়ে রাখল।

তিন বাটি ধূমায়মান দুধ। তিনটে সাদা রেকাবিতে প্রচুর মুড়ি, নারকেল আর তিনটে বড় সাইজের সন্দেশ। সে তিনটে আসনের সামনে সবগুলো সাজিয়ে রাখল।

তোমার যদি চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে, বল অমিয়, সে ব্যবস্থাও আমাদের কাছে।

এবার অমিয় মুখ তুলল। মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, না, অভ্যাস আমার নেই। বাড়িতে মাঝে মাঝে আমি দুধও খাই।

দুধও যে খায় সেটা প্রমাণ করার জন্যই অমিয় নীচু হয়ে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়েই উঃ করে থেমে গেল।

মা হাঁটু মুড়ে অমিয়র পাশে বসলেন।

আহা বাছারে, পুড়ে গেল মুখটা?

জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটো বোলাতে বোলাতে অমিয় বলল, না, পুড়ে যায় নি।

নাও, মুড়ি খাও।

অমিয় মুড়ি আর নারকেল চিবতে লাগল।

আমাকে আর একটু নারকেল দাও মা। তুমি অমিয়কে বেশী দিয়েছ।

সুবীর আঙুল দিয়ে অমিয়র রেকাবির দিকে দেখাল।

অমিয় হাসল। মাও হাসলেন।

কি হিংসুটে ছেলে বাবা। নিজের চাই বললেই হয়।

মা চলে যেতে অমিয় তৃতীয় আসনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

তোমার বাবা আসবেন না? দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ওটা বাবার জন্য নয়। বাবা বেরিয়ে গেছেন, দুপুরের আগে ফিরবেন না। ওখানে নিতা বসবে।

মা ফিরে এলেন রেকাবিতে নারকেল নিয়ে, শুধু সুবীরকে নয়, অমিয়কেও দিলেন।

সুবীর বলল, নিতা কোথায় গেল মা?

মেয়েকে তো বলেছি আসতে। লজ্জাতেই খুন হচ্ছে। দাঁড়া, ডেকে নিয়ে আসি।

মা সরে গেলেন।

একটু পরেই মা ফিরলেন, একটা হাতে নিতার হাত শক্ত করে ধরা।

মেয়ে লজ্জাতে গেল। দাদাদের কাছে আবার লজ্জা কিরে? নে বস।

অমিয় মুখ তুলে দেখল। আনত দুটি চোখ, আংক

দুখ, লজ্জাবনতা একটি কিশোরী। এক মাথা কুঞ্চিত কেশ, মুখ যেন নিকষিত হেম।

এই নিভা। আগের রাতে মাথো অন্ধকারে যাকে ভাল করে দেখতে পায় নি। দেখতে পায় নি, কিন্তু কণ্ঠ শুনেছে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা একটা গানের কলি অমিয়র মনে পড়ল।

এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।

নিভা আসনে বসবার আগে একটা কাণ্ড করে বসল।

হঠাৎ টিপ করে অমিয়কে প্রণাম করল।

অপ্রস্তুত, হতবাক অমিয় প্রায় চীৎকার করে উঠল।

একি, আমাকে কেন?

সুধীরের মা বললেন, কেন কি হয়েছে? দাদাকে প্রণাম করবে না।

খেতে খেতে আর কোন কথা হল না।

অমিয় এইটুকু বুঝতে পারল, তার পাশে বসার জন্য নিভা স্বস্তিতে খেতে পারছে না।

থালার ওপর মাথাটা নুঁইয়ে দিয়ে কোন রকমে মুড়ির গ্রাস মুখে দিচ্ছে।

প্রথমে সুধীর উঠে পড়ল।

অমিয়র খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নিভা পাশে বসে তখনও খাচ্ছে বলে সে উঠল না। উঠতে পারল না।

সুধীরের মা সরে গেছেন সেখান থেকে। তাঁর অনেক কাজ বাকি। এ সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর চলে না।

রান্নাঘরে পাশাপাশি শুধু অমিয় আর নিভা। খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও চুপচাপ এভাবে বসে থাকতে অমিয়র ভারি সঙ্কোচ হ'ল। অথচ হঠাৎ উঠে যাওয়াটাও বোধহয় অশোভিত হবে না।

অনেক কষ্টে সাহস সংগ্রহ করে আড়চোখে নিভার দিকে চেয়ে অমিয় বলে ফেলল।

আমি উঠব?

নিভার মাথাটা প্রায় মাটি ছোঁয়ার মতন। মনে হ'ল, এক মুঠো আবির কে যেন তার সারা মুখে ছড়িয়ে দিল।

কোনরকমে আস্তে আস্তে সে মাথাটা কাত করল।

অর্থাৎ, অমিয় উঠতে পারে।

অমিয় উঠে পড়ল।

সিঁড়ির কাছ বরাবর যেতেই অমিয় দেখতে পেল সুধীর একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। ওপর দিকে চেয়ে।

অমিয়র সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হাত নেড়ে অমিয়কে ডাকল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে অমিয় সুধীরের পাশে দাঁড়াল।

গাছটার কাছে এসে অমিয় চিনতে পারল, সেটা বকুল গাছ। গাছে কোথাও ফুল নেই। বোধহয় এখন বকুল ফুলের মরশুম নয়। তলাটা গোল করে বাঁধানো। এটাও সিমেন্টের।

অমিয় কাছে আসতে সুধীর জিজ্ঞাসা করল।

একটা কথা সত্যি বলবে?

কি কথা?

তোমার খেতে খুব কষ্ট হ'ল তাই না? মুস্কিল এখানে শহরের মতন পাউরুটি খাবার উপায় নেই।

অমিয় সুধীরের একটা হাত চেপে ধরল।

তোমার কি মাথা খারাপ? এমন খাবার খারাপ লাগবে? এ সব জিনিস আমরা শহরে পাচ্ছি কোথায়?

একটু থেমে, প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় অমিয় বলল, এখন তোমার কি প্রোগ্রাম?

চল নদীর ধার ধারে বেড়ে আসি। কোনদিন তো গ্রাম দেখ নি। গ্রাম দেখবে।

অমিয় রাজী।

দু'জনে হাঁটতে শুরু করল। একেবারে পার্বতী নদীর কিনারা দিয়ে।

রোদের তাপ কম। আকাশের বুকে ছড়ানো ছিটানো মেঘের টুকরো। বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। হাঁটতে অমিয়র একটুও কষ্ট হ'ল না। বরং ভালই লাগল। শহরের যত্তন যানবাহন কণ্টকিত পথে শঙ্কিত পদক্ষেপ নয়, প্রতি মুহূর্তে পরমায়ু রক্ষার প্রয়াস তো নয়ই। স্বচ্ছন্দ গতি। গল্প করতে করতে অনায়াসে অন্যমনস্ক হওয়া যায়। আশঙ্কার কারণ নেই।

ওই দেখ আমাদের স্কুল। রজনী নিকেতন।

সুবীর আঙুল তুলে দেখাল।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো সাদা রঙের কোঠাবাড়ি দেখা গেল। চারপাশে বাঁশের বেড়া।

অমিয় দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই স্কুল থেকে তুমি হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছ?

না, সুবীর মাথা নাড়ল, এই স্কুলে সাত ক্লাশ পর্যন্ত আছে। এখান থেকে পাশ করে যাইল দুয়েক দূরের বড় স্কুলে পড়তে যেতাম।

কে রে সুবী নাকি?

অমিয় চমকে ঘাড় ফেরাল।

খালি গা, পরণের ধুতিটা লুঙ্গির মতন জড়ানো। হাতে লাঠি। এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ঝোপের পাশ থেকে বেরিয়ে এল।

হ্যাঁ, দাদু, আপনি ভাল আছেন?

নত হয়ে সুবীর প্রণাম করল। সঙ্গে সঙ্গে অমিয়কেও ইশারা করল।

অমিয় প্রণাম করতেই বৃদ্ধ দুটি চোখের ওপর একটা হাত রেখে অমিয়কে দেখবার চেষ্টা করল। নাবিকরা জাহাজের ডেক থেকে যে ভাবে দূরের দ্বীপ দেখে, সেই ভঙ্গীতে।

এটি কে চিনতে পারলাম না তো?

এর নাম অমিয় মুখোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে পড়ে। খুব ভাল ছেলে। স্কলারশিপ পাচ্ছে।

বা, বা, জলপানি পাচ্ছ। বাহাদুর ছেলে। বেঁচে থাক বাবা, বংশের মুখোজ্জ্বল কর। তা এখানে কি উদ্দেশে? বেড়াতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর বাবা, গ্রামে কি আর সে শ্রী আছে, না সম্পদ আছে। এতো বসতভূমি। গ্রামের সব মানুষ যদি শহরের দিকে ছুটে যায় তাহলে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি আর হবে কি করে?

লোকটি যেমন আচমকা দেখা দিয়েছিল, তেমনই আচমকা ঝোপের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সুবীর সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বাস মানুষকে ছেড়ে গুঁড়িয়ে দেয়।

সুবীরের এই আকস্মিক বার্ধক্যের অর্থ অমিয় বুঝতে পারল না! তাই সে বলল, এ কথা বলছ কেন?

যাকে দাদু বললাম, ইনি কানাই দত্ত। এক সময়ে ইংরাজরা এঁর ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপত। অহিংস নীতি নয়, হিংসা নীতি। বোমা বারুদের ব্যাপার। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটা প্রাচীরের অন্তরালে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এ স্বাধীনতায় ইনি সন্তুষ্ট নন। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। দেশের লোকের দুঃখ দারিদ্র্য যদি না ঘুচে থাকে, তাহলে খবরের কাগজের এ স্বাধীনতা অর্থহীন। একবার সরকার এঁকে একটা মাসোহারা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ইনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চলতে চলতে সুবীর এ কাহিনী বলছিল। অমিয় শুনছিল।

সুবীরের কথা শেষ হতেই অমিয় দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল। ঝোপের অন্তরালে মিলিয়ে যাওয়া লোকটাকে যদি আর একবার দেখতে পায়। শান্ত গাছপালা, নির্জীব এই তৃণভূমির সঙ্গে যে লোকটার অন্তর-প্রকৃতির সাদৃশ্য কম। বেশী মিল পার্বতী নদীর সঙ্গে।

গর্জন মুখরিত, অশান্ত, বিক্ষুব্ধ পার্বতী।

অমিয় বিজ্ঞানের ছাত্র। ইতিহাস তার পাঠ্য ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের অনেক বই সে পড়েছে। গ্যারিবল্ডি, নেপোলিয়ঁ, ডি ভ্যালেরার বীরত্বের অধ্যায়। এদেশের তিউক, লাজপত, নেতাজীর বৈপ্লবিক সাধনার কথা। দেশের প্রান্তে প্রান্তে বহ্নির দাবানল জ্বলে উঠেছে। সেই দাবানলের এঁরাই স্ফুলিঙ্গ। গ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত বীর সৈনিকের দল।

রাজনীতির ব্যাপারে অমিয়র প্রত্যক্ষ কোন আকর্ষণ নেই। তবে পথে ঘাটে, হাটে মাঠে রাজনীতির পাঁচালী অনবরত শোনানো হচ্ছে। ইচ্ছা না থাকলেও কানে আসে। জাগ্রত চেতনা তার পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে দেশে বাস করে, যে মানুষদের মধ্যে, তার সম্বন্ধে, তাদের সম্বন্ধে জানতে হয়, ভাবতে হয়। অনেকের

মুখেই এ ধরনের আক্ষেপ শুনেছে।

দেশের অবস্থার পরিবর্তি ঘটছে। বেউলে হয়ে গেছে দেশটা, কৃষি প্রধান একটা দেশকে রাতারাতি শিল্প প্রধান উপ-মহাদেশ গড়ে তোলবার হাস্যকর প্রচেষ্টায়। মানুষ খুশি নয়। দেশের বুকে তাই হাহাকার, তাই বিক্ষোভ।

অমিয় বাবার কাছ থেকে অন্য কথা শুনেছে।

তিনি বলেছেন, এত দিনের পরাধীন একটা দেশ এক মুহূর্তে সমৃদ্ধ হতে পারে না। তার জন্য আরও ত্যাগ-ত্যাগের প্রয়োজন। সব বিষয়েই আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী। আমাদের সব সমস্যার সমাধানের চাবি যেন কেবল তাদেরই হাতে। এই চিন্তা, এই মনোভাব আমাদের আরো দুর্বল, আরো নিষ্ক্রিয় করে তোলে। ছোট ছোট শিল্প, ছোট ছোট প্রচেষ্টায় যদি দিয়ে দেশকে উন্নীত করতে হবে। তার অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় করতে হবে।

কি হ'ল, চল।

সুবীর তাড়া দিল।

বিব্রত অমিয় দ্রুত পা চালাল।

কি ভাবছিলে?

তোমার দাদু ভাবনার খোরাক দিয়ে গেলেন।

কি রকম?

দেশের জন্য যে এঁরা এত ত্যাগ করলেন, কি হল দেশের অবস্থা। জগত সভায় আমরা নাবের গ্র্যাকার্ড ছাড়া আর কি আহরণ করতে পারলাম?

সুবীর কি ভাবল, তারপর বলল, কৃষিউন্নয়ন ছাড়া এ দেশের প্রকৃত উন্নতির কোন পথ নেই। গান্ধীজী যে বলতেন, back to village, তার মানে এই নয় যে গ্রামের জীবন গ্রহণ কর। তার অর্থ, গ্রামকে উন্নীত কর। ভারতবর্ষের কৃষিসম্পদ আর বনজসম্পদের মধ্যেই তার উন্নতি নিহিত। শিল্প সমৃদ্ধি শুধু জীবনের জটিলতা বাড়ায়। মানুষকে অলস করে।

জানে না অমিয়। এদেশের প্রকৃত মুক্তি কিসে তা তার ধারণার বাইরে। তার বাবা বলেন শিল্প প্রচেষ্টায়, সুবীরের বাবা বলেন কৃষির উন্নতিতে। হয়তো দুজনেই ঠিক, কিংবা দুজনেই ভ্রান্ত।

এসব কথা চিন্তা করে এখন লাভ নেই। তার সামনে অজ্ঞাত ভবিষ্যত। সেই ভবিষ্যত তাকে পাড়ি দিতে হবে। অধ্যয়নই তার একমাত্র সাধনা। অন্য কোন দিকে দৃকপাত করা, অন্য কথা চিন্তা করা তার পক্ষে অন্যায়।

পেন্নাম দাদাবাবু।

অমিয় মুখ তুলল।

সুবীরের সামনে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। পরণে ছাপড় হাটুর ওপর ঊর্ধাঙ্গে কিছু নেই। পায়ের প্রকট চেহারা।

এই যে দুলু, পরাণ ভাল আছ সব।

ভাল আর কোথায় দাদাবাবু। গত দু'বছর অজন্মা গেল। আগে জমিদারের আমলে ভয় কেঁদে কেটে পড়লে খাজনা মাপ হত, এখন তো আর তা হবার যো নেই। গলায় গামছা দিয়ে কড়ি আদায় করে নেবে। হাল গরু, বীজ ধান বেচে মহাজনের ঋণ শোধ করতে হয়। এতটা পথ যখন এসেছেন, তখন একটু বসবেন আসুন।

সামনেই গোটাকয়েক কুঁড়ে ঘর। গোলপাতার চাল, মাটির দেওয়াল। গোবর নিকানো উঠান।

সুবীর আর অমিয় দাওয়ায় গিয়ে বসল। চাটাইয়ের ওপর।

দুটো থালায় মুড়ি এল। তেল নুন মাখা। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা।

অমিয় বলল, আমি আর পারব না ভাই। তুমি বলে দাও।

সুবীর ফিসফিস করে বলল, অন্তত দু-এক মুঠো মুখে দাও, নইলে এরা মনে দুঃখ পাবে।

যখন সুবীর আর অমিয় ফিরল তখন রোদ বেশ প্রখর। এলোমেলো হাওয়ায় তালপাতা ঘূর্ণীর আকারে উড়ছে। দুজনের মুখই আরক্ত হয়ে উঠেছে। ধূলি, মলিন, পুরানো একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, যার ঐতিহাসিক খ্যাতি ছিল, সব দেখা হয়ে গেছে। দুই বন্ধুতে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে ফিরছিল।

নীচের সিঁড়িতেই মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তাঁকে দেখেই মনে হল তিনি যেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

কিরে এত বেলা? উনি কখন থেকে স্নান করে অপেক্ষা করছেন।

সুবীর হাসল, অমিয়কে সব বেমিয়ে আনলাম মা। শিবমন্দির, বারভূইঞার এক ভূইঞার বাড়ি, এমন কি দাদুকে পর্যন্ত।

যাও, যাও, স্নান করে এস দু'জনে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আমরা এখনই নদী থেকে স্নান করে আসছি মা। না, গামছাটা নিয়ে আসি।

নদী থেকে? অমিয় যমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পার্বতী নদী; ওপার দেখা যায় না এমনই অগাধ বিস্তার। সূর্যের আলোয় এত প্রখরতা যে চেয়ে থাকা যায় না।

আমি বাড়িতেই বরং স্নান করব।

খুব মৃদুকণ্ঠে থেমে থেমে অমিয় বলল।

সুবীর সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেছিল। অমিয়র কথা কানে যেতেই থেমে গেল। স্মিতহাস্যে প্রথমে অমিয়র দিকে তারপর মায়ের দিকে দেখল।

মা একহাত দিয়ে অমিয়কে কাছে টেনে নিলেন।

হ্যাঁ, তোমার নদীতে স্নান করতে হবে না। তুমি বাড়িতেই স্নান কর।

তারপর সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় পা দিয়ে মা আবার বললেন।

তুমি বুঝি সাঁতার কাট না অমিয়।

অমিয় ঘাড় নাড়ল, না। আমি তো কোনদিন শহরের বাইরে যাই নি। অবশ্য শহরেও সাঁতার শেখার সুযোগ আছে অনেক জায়গায় শেখায়, কিন্তু আমাকে বাড়ি থেকে যেতে দেয় নি।

মা আর কোন কথা বললেন না। অমিয়কে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

এঘরেও তিনটি আসন, একটিতে সুবীরের বাবা বসে আছেন।

পরিষ্কার দিনের আলোয় তাঁকে ভাল করে দেখবার সুযোগ অমিয় পেল।

দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা। পরিশ্রমী লোক তাঁর পেশীপুষ্ট দেহেই প্রকট। রং এক সময়ে গৌরছিল, ইদানীং তামাটে।

পাশাপাশি নিজের বাবার ছবিটা অমিয়র মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল।

দীর্ঘ চেহারা, কিন্তু এতটা বলিষ্ঠ নয়। চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা। সারা মাথায় চুলের সংখ্যা কম, যে কয়টি আছে তার বেশীতেই রুপালী ছোপ।

একদিন আমার বাবার দেখতে চল অমিয়।

খেতে খেতে সুবীরের বাবা বললেন।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। সুবীরের দিকে চোখ তুলল।

গোটা দুয়েক ট্রাক্টর এনেছি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করার চেষ্টা করছি। গত বারে আখের ফলনটা খুব ভাল হয়েছিল। এখানে একটা সুবিধা, পার্বতী নদীর কল্যাণে জলের কোন অসুবিধা নেই। এদেশে জলই একটা সমস্যা। সরকার বড় বড় বাঁধ তৈরি করলেন, তাতে চাষীদের যে খুব সুবিধা হ'ল, এমন তো মনে হয় না। বরং মাঝে মাঝে বাঁধ ভেঙে বেচারিতে খেত ডুবিয়ে আরো কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

সুবীরের বাবা কথা শেষ করে উচ্চহাস্য করলেন।

কাল খুব ভোরে উঠেই রওনা হয়ে যাব।

কিসে যাব? সুবীর প্রশ্ন করল, তুমি তো যাবে। আমরা?

তোমরা গরুতে। সুবীরের বাবা হাসতে হাসতে বললেন, চৈতনকে বলে রেখ, ভোরবেলা গরুর গাড়ী নিয়ে আসবে। ভোরে রওনা হলে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসতে পারব।

পরের দিন ভোরে ঘুম থেকে নীচে নেমেই অমিয় অবাক হয়ে গেল।

ঘোড়ার পিঠে সুবীরের বাবা। পরণে প্যান্ট নয়, ধুতি মালকোঁচা দেওয়া। গাছের নীচে সুবীর আর নিতা।

সুবীরের পরণে সার্ট আর হাফপ্যান্ট। নিতার অঙ্গে

টকটকে লাল শাড়ী। সেই রঙেরই ব্লাউজ। নিভাও তাদের সঙ্গে যাবে এমন কথা অমিয় শোনে নি। কেউ বলে নি।

এবারের ব্যবস্থা আরও ভাল। খড়ের তাকিয়া গরুর গাড়ীর মধ্যে। দু'ধারে কাপড় টাঙানো। রোদ আটকাবার জন্য।

প্রথমে নিভা উঠে একধারে বসল। অন্যধারে সুবীর আর অমিয়। পাশাপাশি। অমিয় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতে গেলেই নিভার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে। কথা বলতে পারছে না।

সুবীরের বাবা গাড়ীর আগে আগে ঘোড়া ছোটালেন। লালচে ধুলোয় ধূর্ণী। তার পিছন পিছন গরুর গাড়ী চলল।

কিছুক্ষণ পর মেঠোপথ ধরে দু'পাশের গাছের ছটলা পার হয়ে গাড়ী চলবার পর সুবীর বলল।

জান অমিয়, আজ আমরা খামারে গিয়ে বনভোজন করব।

বনভোজন?

হ্যাঁ, ওই দেখ না।

সুবীর আঙুল দিয়ে দেখাল।

গাড়োয়ানের পাশে বড় একটা টুকরি। ওপরটা কাপড় দিয়ে ঢাকা।

বরুলবটা কার জান?

কার?

আমার ভগ্নির।

অমিয় সামনের দিকে চোখ তুলেই লজ্জায় পড়ে গেল। নিভা একদৃষ্টে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই দুটি গালে রক্তের ছোপ। তাড়াতাড়ি সে চোখ নামিয়ে নিল। দৃষ্টি নত করার আগে, অমিয় লক্ষ্য করল, নিভার ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির ঝিলিক।

অমিয় আর সুবীর যে কলেজে পড়ে সেখানে সহশিক্ষার প্রচলন। ক্লাশে অনেক মেয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে নিভার কোথাও কোন মিল নেই। কলেজের মেয়েরা বাকপটু, সপ্রতিভ ধরনের, আর নিভা লাজুকতার প্রতিমূর্তি। মুখে চোখে কোথাও অভিজ্ঞতার কোন ছাপ নেই। একবার বোধহয় নিভার কণ্ঠস্বর শুনেছে। কাছাকাছি দেখেছে দু'একবার।

অমিয়র ইচ্ছা হ'ল একবার কথা বলে। কি ক্ষতি! পাশে তো সুবীর রয়েছে। একটা পথ চুপচাপ যাওয়ার কোন মানে হয় না।

একটু যেতেই নাতিবৃহৎ একটি গাছ। যেমনি রংয়ের ফুলে আচ্ছন্ন। অমিয় উঁকি দিয়ে দেখেই বলল, ওটা কি ফুলের গাছ? ভারি চমৎকার রং তো!

অমিয় বিশেষ কাউকে জিজ্ঞাসা করে নি। কথাটা মনে উচ্ছ্বাসের বশেই বলে ফেলেছিল।

সুবীর ওদিকে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। নিভা একটা হাত গালের তলায় রেখে বাইরের দিকে চেয়েছিল। সে একটু ঘুরে বসেছিল, সম্ভবত অমিয়র একেবারে মুখোমুখি বসাটা এড়াবার জন্য।

জানল।...

কণ্ঠস্বর নয় যেন সঙ্গীতের সুর। অন্তত অমিয়র তাই মনে হ'ল।

সারা শরীরে একটা অদ্ভুতপূর্ব শিহরণের স্রোত। তার প্রশ্নের উত্তরে নিভা কথাটা বলেছে।

ভারি চমৎকার রং।

অমিয় আবার বলল। নিভার সুডৌল গালের দিকে দৃষ্টি রেখে।

এবার নিভা ফিরে দেখল। প্রথমে ঘুমন্ত সুবীরের দিকে, তারপর অমিয়র চোখে চোখ রাখল।

বলল, এ রংটা আমারও খুব ভাল লাগে।

পরস্পরের একটা রাখীবন্ধন হয়ে গেল। অমিয়র যে রং প্রিয়, নিভারও তাই।

অমিয় বিজ্ঞানের ছাত্র। রঙের রহস্য তার অজানা নয়। সূর্যরশ্মি যে সাত রং বহন করে আনে তার মধ্যে থেকে বিশেষ একটা রং কেন গাছপালা, ফুল, কোরক আহরণ করে নেয় তা বিশ্লেষণ করতে অমিয় সক্ষম। প্রয়োজন হলে স্পেক্ট্রাসের মাধ্যমে সবই বোঝাতে পারবে।

অমিয়র আর নিভার ছাড়া বিভিন্ন রংয়ের ভাণ্ডার থেকে

বিশেষ একটি রংই বেছে নিয়েছে এই একান্তবোধ সহসা করেই অমিয় পুলকিত হয়ে উঠল।

তুমি জারুলের রং ভালবাস তো লাল রং শাড়ী আমা পরেছ কেন?

অমিয় একটু একটু করে সাহসী হচ্ছে।

তার অসুবিধা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে বাধ্য হয়েই কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। তারা এসে কথা বলেছে।

পিকক্কের কেমিস্ট্রি বইটা আপনি নিয়েছেন লাইব্রেরি থেকে। অনেকদিন হয়ে গেল এবার ফেরত দিন, আমরা পড়ব না।

কিংবা, ফিরোরি অফ লাইট বইটা কোথা থেকে যোগাড় করে দিতে পারেন। ওইর শাস্ত্রীর লেখা। অহু, ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স-এর হেড।

চেষ্টা করব। ওটা আমিও এখনও পড়ি নি।

অল্প কথার উত্তর।

এভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রকৃতির রূপবর্ণনায় মাতে নি।

নিভা হাসল। প্রবালরাঙা ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তাশুভ্র দাঁতের সারি।

বারে, ভালবাসি বলে আমাকে সেই রং পরতে হবে, তার কি মানে? গাছে, পাতায়, পথের গায়ে এই রং ভালবাসি।

হেসে নিভা মুখ ফেরাবার আগেই অমিয়র চোখ পড়ে গেল।

আশ্চর্য, রং নিয়ে এত কথা বলে যাচ্ছে, আর এটাই চোখে পড়ে নি।

অমিয়র সার্টের রং হাল্কা বেগুনি। জারুলের ফুলের রং।

এই দেখ, এদিকে দেখ।

অমিয়র কণ্ঠে অনুরোধের আবেদন।

নিভা অবাক হল। ভুরুটো তুলে বলল, কি, কি দেখব?

অমিয় নিজের সার্টের দিকে আঙুল দেখাল।

এটাও তো জারুল ফুলের রং।

ধোটেই না। জারুলফুলের রং আরো গাঢ়। আপনার সার্টের রং অনেক হালকা। সুবীর উঠে পড়ল। গাড়ীর ঝাঁকানিতে।

নিভার শেষ বিকেলের কথার কিছুটা তার কানে গিয়েছিল।

একবার অমিয়র দিকে, একবার নিভার দিকে চেয়ে বলল, কিরে কি ঝগড়া শুরু করেছিস? গাঢ়, হালকা কি ব্যাপার?

পরণের শাড়ীর রংয়ের ছোপ নিভার দুটি গালে লাগল। তাড়াতাড়ি মুখটা বাইরে দিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। ফিরল না।

অমিয় বলল। জারুল ফুলের রংয়ের কথা হচ্ছিল।

জারুল ফুল এল কোথা থেকে?

আসে নি। পথের পাশে একটা গাছে অজস্র ফুটে ছিল। চমৎকার রং। তাই বলছিলাম।

অ—।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সুবীর বলল, কি গরম পড়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। নিভা একটু জল দে তো।

নিভা উঠে গাড়োয়ানের পাশ থেকে একটা জলের বোতল তুলে নিল। গ্লাসে জল ভরে সুবীরকে দিল।

সুবীরের খাওয়া শেষ হতে নিভা অমিয়র দিকে চেয়ে বলল, আপনাকে দেব এক গ্লাস?

অমিয় কোন উত্তর দেবার আগেই সুবীর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। এত জোরে যে গাড়োয়ান পিছন ফিরে একবার দেখে নিল।

বাবা, অমিয়কে তুই আবার আপনি বলতে আরম্ভ করেছিস। অমিয় আমার চেয়েও রুমালের ছোট যে!

নিভা কোন কথা বলল না। কোন উত্তর নয়। উত্তর দেবার মতন কিছু ছিলও না।

সে জল গড়িয়ে অমিয়র দিকে এগিয়ে দিল।

অমিয় গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েই ঘুন্সিলে পড়ল। গাড়ী জোরে চালু জমি বেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। টাল সামলাতে না পেরে গ্লাসের জলের প্রায় সবটুকুই অমিয়র সার্টের ওপরে গিয়ে পড়ল। ভিজে উঠল সার্টের অনেক খানি।

এবার নিভা শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল। একসময়ে

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ঘরের সাজের ধরণটা আজকাল স্কুলের মতন হয়েছে কিন্তু।

এসে গেছি। আর একটুখানি।

সুধীর কাপড়ের ঘেরাটোপ তুলে বাইরের দিকে চেয়ে বলল।

অমিয়ও নীচু হয়ে দেখল।

সবুজ গাছপালার সার। মাঝে মাঝে কিসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাকে কাকে টোকা মাথায় কয়েকজনকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

গাড়ী থামল। গাড়োয়ান নেমে দাঁড়াল।

প্রথমে সুধীর নেমে নিচার দিকে হাত বাড়াল।

সে হাত ধর, না হলে সেখানের বহুল মাঠের ওপর গড়াগড়ি দিবি।

যাও!

সুধীরের প্রসারিত হাতটা ঠেলে দিয়ে আরক্তমুখে নিজা নেমে পড়ল। খুব সাবধানে।

অমিয় নামল সব চেয়ে শেষে। নেমে চারদিক দেখেই অবাক হয়ে গেল।

এপাশে ওপাশে গাছপালা। ছোট বড় মাঝারি। সব গাছের নামও অমিয় জানে না।

এগুলো কি গাছ? বাঁদিকের ঘন বাঁশের মতন গাছগুলোর দিকে অমিয় আঙুল দিয়ে দেখাল।

আখ গাছ। যাকে সাধু ভাষায় বলে, ইক্ষু।

সুধীর হাসতে হাসতে বলল।

সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবাকে আসতে দেখে থেমে গেল।

একটা বাঁকড়া আমগাছের তলায় সুধীরের বাবা এসে দাঁড়ালেন। কাপড় হাঁটুর ওপর তোলা। গায়ে খাঁকি হাত কাটা শার্ট।

এসো, এদিকে এসো সব।

তিনজনে তাঁকে অনুসরণ করল।

সব ক্ষেত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও তারা করল না। মোটামুটি আসল জায়গাগুলো দেখল। তুলো গাছ, আখ গাছ, নানা রকমের তাল, সব্জীর চারা। মাঝে মাঝে বিরাট কুয়া, তা থেকে নলে করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে পুকুরের মতন করে জল আটকাবার আয়োজন করা হয়েছে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা, পার্বতী নদী থেকে জল আনা হয় না?

সুধীরের বাবা বললেন।

কতকগুলো গাছে পার্বতীর জল ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে সে জলে চুনের ভাগ বেশী, অর্থাৎ তোমাদের বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে ক্যালসিয়ম কারবনেট।

তার মানে, আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে অমিয় বলল, যেখান থেকে পার্বতী নদীর উৎপত্তি সেখানে কোথাও লাইম ডিপজিট আছে। জলের সঙ্গে লাইম আসছে।

সম্ভবত, সুধীরের বাবা সায় দিলেন, তারপর সুধীরের দিকে ফিরে বললেন, তুমি অমিয়কে কাঁচের ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাও, আমি কুষাণদের সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা বলে আসছি।

একধার বিলাতী সুপারী গাছের মাঝখান দিয়ে ঘাসে ঢাকা পথ। ধারে ধারে কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ। কচি পাতার অদ্ভুত গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

অমিয়র ভারী ইচ্ছা করল, এই ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেয়। চুপচাপ করে ভিজে সোঁদা মাটি আর নাম-না-জানা কুঁড়ির ঘ্রাণ নেয়। শহরের কোথাও এই কোমলতা নেই।

বাঁ দিকে।

সুধীরের গলার শব্দে অমিয়র হুঁস হ'ল।

সবাই বাঁদিকের জামরুল বাগানের ধার দিয়ে এগিয়ে চলল।

মস্ত বড় কাঁচ ঢাকা ঘর। কাঁচ ভাল করে দেখাই যায় না। তার ওপর অনেক রকমের লতা উঠেছে। ঝোকা ঝোকা লাল আর হলুদ রংয়ের ফুল।

সুধীর কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পিছনে বাকি দুজন।

রাশি রাশি টব। নানা সাইজের। সিঁড়ির মতন ধাপ। তার ওপর থাকে থাকে বসানো। গাছের পাশে

পাশে একটা বয়ে কাঠি গোঁতা। তারও পর ছোট কাগজে কি লেখা।

অমিয় ভেবেছিল, কলকাতায় শিবপুর বোটানিক্যাল বা এক্রি-হর্টি-কালচারাল বাগানে যেমন দেখেছে, গাছের নাম, ধাম, বংশ-পরিচয় লাটিন ভাষায় লেখা থাকে। হতাশ হয়ে করাই ঘুরিল। এখানেও নিশ্চয় তাই।

কিন্তু একটা গাছের কাছে গিয়েই তার ভুল ভাঙল।

কলমালেবুর গাছ। সিলং থেকে আনা। নতুন পদ্ধতিতে সার দিয়ে গাছের সাইজ ছোট আর ফলের সাইজ বড় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রকম সব কাগজেই পরিষ্কার বাংলা ভাষায় লেখা।

ঘুরে ঘুরে অমিয় দেখতে লাগল।

নিতা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। অনেকবার এসব দেখেছে বলে তার উৎসাহ কম।

হঠাৎ সুবীরের খেয়াল হ'ল।

তোমরা অপেক্ষা কর। আমি গাড়োয়ানকে দিয়ে

খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে আসি। এখানে বসে খাওয়া যাবে।

সুবীরের পিছন পিছন অমিয়ও বাইরে আসছিল, সুবীর হাত নেড়ে বারণ করল। তুমি থাক, নিভা একলা রয়েছে।

অবশ্য এখানে একলা থাকতে কি আর অসুবিধা নিভার। এতো তাদেরই ক্ষেত। চারিদিকে তাদেরই লোক।

তবু সুবীর বারণ করাতে অমিয় রয়ে গেল।

একেবারে কোণের দিকে কচুপাতার মতন বিরাট পাতাওয়ালা একটা গাছ। মাঝখানে সরু একটা কাণ্ডে অজস্র গোলাপী রংয়ের ফুল ফুটেছে। কাগজে গাছের নাম লেখা বাত্তিকা।

নিভা কাছেই ছিল। একটা গাছের পাতা নিয়ে দু আঙুলে ঘষে গন্ধ শুঁকছিল। তার দিকে ফিরে অমিয় বলল, এ গাছটার তো অদ্ভুত নাম। এত সুন্দর ফুল, কিন্তু নামটা ভারি বিশ্রী।

পায়ে পায়ে নিভা এগিয়ে এল।

গাছটার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে বলল, এ গাছটা বাবা আফ্রিকার থেকে এনেছে। তিনটে এনেছিল, দুটোকে বাঁচানো গেল না। মরে গেল। এটা বহু যত্নে বেঁচেছে। এটা বাতের ওষুধ।

বাতের ওষুধ, তাই বুঝি এর নাম বাত্তিকা?

হ্যাঁ, কি একটা বিদ্‌ঘুটে বিদেশী নাম ছিল, উচ্চারণ করা যেত না। বাবা নাম রেখেছে বাত্তিকা। একটা ফুল দু'হাতে টিপে দেখুন।

অমিয় সাবধানে একটা ফুল ছিঁড়ে দু'হাতে টিপে দেখতে গেল, কিন্তু ফুলটা ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয় ঘটল।

চীৎকার করে নিভা অমিয়কে জড়িয়ে ধরল। সজোরে।

এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলে তার সঙ্গে লাভার তরল স্রোত, গলিত মৃত্তিকা চারদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। পারিপার্শ্বিক সব কিছু থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। মাটির নতুন কাটলের ফাঁক থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসে। সমস্ত ব্যাপারটায় একটা আমূল পরিবর্তন হয়, তেমনই অমিয়র স্নায়ুমণ্ডলীতে, শিরায় উপশিরায়, দেহের কোষে, মেদে মজ্জায় যেন একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হ'ল। পুরোনো চাকলাহীন কাটলের মধ্যে থেকে এক অনুভূতির স্রোত তার সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হ'ল।

অনেকক্ষণ অমিয় নিজেকে ভুলল, পরিবেশ ভুলল, একটা হাত দিয়ে নিভাকে জড়িয়ে ধরা যে অন্যায় সে বোধও ভুলে গেল।

যখন খেয়াল হ'ল, তখন নিভাও নিজেকে সামলে নিল।

আগোছাল শাড়ীটা ঠিক করে ঘুরে সরে দাঁড়াল।

সব কিছু বুঝতে অমিয় বেশ একটু সময় নিল।

পুষ্প স্তবকের মধ্যে একটা গিরগিটি আত্মগোপন করেছিল, সেটা তার জানবার কথা নয়। সে ফুলে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরগিটিটা লাফ দিয়ে নিভার শাড়ীর ওপর গিয়ে পড়েছিল। নিভার পক্ষে বিচলিত হয়ে ওঠাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ গিরগিটিটা রীতিমত ভয়ালদর্শন।

অমিয় বুঝতে পারল তার সর্বশরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। দেহের সমস্ত শোণিত মুখে এসে জমেছে। কৈশোরের বাকল ছিঁড়ে নবযুবক আত্মপ্রকাশ করছে। অসহ্য এই যৌবনের ভারে অমিয় বুঝি অন্ধকারে পরিণত হবে।

সুবীর যখন এসে দাঁড়াল, তখন দু'জন দু'দিকে।

একেবারে কোণের দিকে অমিয় একটা ক্যাকটাস নিরীক্ষণ করছে আর নিভা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সুবীরের পিছন পিছন গাড়োয়ান ঢুকল। এক হাতে জলের কুঁজো, অন্য হাতে খাবারের ঝুড়ি।

জিনিসগুলো মেঝের ওপর নামিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল।

কই রে নিভা, জিনিসগুলো বার কর। কিসে কি আছে, আমি জানিই না।

ধীর পায়ে নিভা এগিয়ে এল। মাটির দিকে চেয়ে। মেঝের ওপর বসে কলাপাতা বের করে খাবারগুলো তিন ভাগ করে রেখেল। লুচি, পটলভাজা, আলুর তরকারী,

মিষ্টি। বুড়ির মধ্যে ছোট ভাঁড়ও ছিল। তাতে কুঁজো থেকে জল ভরে দিল।

অমিয়ও অস্বাভাবিক গম্ভীর।

খেতে খেতে সুধীর একবার জিজ্ঞাসা করল।

কেমন দেখলে?

অমিয় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ যেন সচেতন হ'ল, এইভাবে বলল, ভালই তো, বেশ ভাল।

বাবার ইচ্ছা এম্ সি পাশ করে আমিও বাবার সঙ্গে যোগ দিই। আমার সত্যেন কেমিষ্ট্রি পড়ার খুব ইচ্ছা।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। ম্লান হাসল।

সারাক্ষণ নিভা মাথা নীচু করে বাচ্ছিল। একটি কথা তো নয়, মুখ তুলে কারো দিকে দেখল না পর্যন্ত।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে সুধীর বলল, চল, ফলের বাগানটা ঘুরে আসি। তারপর একটু বিশ্রাম করে ফিরে যাব।

অমিয় সুধীরের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। পিছিয়ে যেতে তার সাহস হ'ল না। কি জানি যদি নিভার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

এত নরম হয় মেয়েদের দেহ। যেন ফুলের মালার মতন। স্পর্শে এত মাদকতা। ল্যাবরেটরিতে অসাবধানে অমিয়র বিদ্যুতের তারে একবার হাত লেগে গিয়েছিল। সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দেহের মূল ধরে কে যেন সবেগে নাড়া দিয়েছিল।

এও ঠিক তাই। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার বেশী নয়, কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই অমিয়র মনে হয়েছিল যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তার শরীরের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কিন্তু এ বিদ্যুতের দাহ নেই, দীপ্তি আছে, আর আছে সুখকর এক অনুভূতি।

যে অনুভূতি স্থায়ী হোক চিরন্তন হোক, এমন একটা কামনা বার বার তার মনে রূপায়িত হয়ে উঠল।

একেবারে কোণের দিকে ফলের বাগান।

আতা আছে, ফুল, বাতাবি লেবু আর লোলোপজাম, কামরাঙ্গার ঝোপ। এখন এসব ফলের সময় নয়। শুধু গাছ আর গাছ।

আরো দক্ষিণে সার সার আমগাছ। নানা ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আনা আমের চারা এখানে লাগানো হয়েছে। আলফন্সো থেকে গোলাপখাস। মুর্শিদাবাদের বেগম পসন্দ-ও আছে।

ঘুরে ঘুরে অমিয় সব দেখল। সুধীরও দেখল।

ফিরে আসার সময় সুধীরের খেয়াল হ'ল।

আরে, নিভা কোথায় গেল?

অমিয় এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

বলল, আমাদের পিছনেই তো ছিল।

দু'জনে এগিয়ে গেল। ফলের বাগান শেষ হতেই নজরে পড়ে গেল।

একটা বাঁকড়া জামরুল গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। গালে হাত দিয়ে। এত তন্ময় যে, সুধীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেও খেয়াল হ'ল না।

কিরে, এখানে বসে আছিস?

নিভা চমকে উঠল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, পা ব্যথা করছে।

সুধীর উচ্চরোলে হেসে উঠল।

এস অমিয়, নিভাকে আমরা কোলে করে নিই। ওর পা ব্যথা করছে।

কথাটা নিছক পরিহাস, কিন্তু অমিয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরক্ত হ'ল।

নিভা চেঁচিয়ে উঠল, কি অসভ্য বর দাদা, ভাল লাগে না।

সুধীরও একটা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিল না। কাঁচা রাস্তার ওপর সুধীরের বাবাকে দেখা গেল।

এই যে এদের একটা করে যাও।

সুধীরের বাপের পিছনে একটা চাষী। হাতে ডাবের কাঁদি।

শহরে মাঝে মাঝে অমিয় ডাব খেয়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় বাড়ীর নির্দেশ ছিল, রোজ একটা করে ডাব খাবার।

কিন্তু এত মিষ্টি জল অমিয় এর আগে আর পান করে নি। পুরো একটা ডাবের জল পান করতে গিয়ে সে

হিমসিম খেয়ে গেল। বিশেষ করে এক্সপেট খাবার পর।

সুবীরের বাবা বললেন।

এস তোমাকে, নারকোল গাছগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অমিয় সুবীরের বাবাকে অনুসরণ করল।

একেবারে নদীর ধারে সার সার নারকোল গাছ। উচ্চতায় অমিয়র চেয়ে বোধহয় একটু বেশী। অথচ তাদের কাঁধি প্রায় মাটি স্পর্শ করেছে।

এই দেখ গাছের নীচে কি প্রচুর সুর দিতে হয়েছে।

কেন?

নারকোল গাছ শিকড়ে স্যালাইন চায়। এই জন্যেই সমুদ্রের ধারে নারকোল গাছের ভীড় দেখা যায়।

অমিয়, বিড় বিড় করে বলল, কখন সল্ট নারকোল গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মানুষের রক্তেও লবণ আছে, তাই তার স্বাদ নোনা। সেই রক্ত কিসের স্পর্শে উত্তাল, উদ্দাম হয়ে ওঠে?

সুবীরের বাবা নারকোলপাতার পোকা নিবারণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অমিয়র কানে গেল, অনেকটা গেল না।

কিছু সহপাঠীর ফিসফাস কথাবার্তার শ্লেষ তার কানে ভেসে আসত। নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে আলোচনা। কোন বিশেষ বিশেষ সহপাঠিনীর দেহতত্ত্বের বর্ণনা।

এতদিন সে সব কথা রহস্যময়, অর্থবহ মনে হয়েছিল, সে সব কথার নিগূঢ় অর্থ, এখন অমিয়র বোধগম্য হচ্ছে।

একবার অমিয় ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল। বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করল প্রকৃত অবস্থা।

সেই চরম মুহূর্তে, পুলকানন্দের শিখরে অমিয়ও কি আচমকা নিভাকে বেষ্টন করেছিল? ইচ্ছা করে নয়, একেবারে হঠাৎ। ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নিভা কি বিশ্বাস করবে?

পুরোপুরি বিকাশ হবার আগেই গাছপালার জন্য জায়গাটা ছায়াঘন হয়ে উঠল। শুকনো পাতার মর্মর। গাছের ডালে ডালে কীট পতঙ্গের নানা রকম ডাক।

গরুর গাড়ীতে জিনজন বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

সারাটা পথ সুবীরই কথা বলে গেল। তার বাবা প্রায় একক চেষ্টায় কিভাবে এত বড় একটা জিনিস গড়ে তুলেছেন, তার লোভনীয় ইতিহাস।

মাঝে মাঝে অমিয় এক অক্ষরে হাঁ না বলল। নিভা একটি কথাও নয়। একেবারে কোণের দিকে চুপচাপ বসে রইল।

গাড়ীর মধ্যে অন্ধকার। দুটো গরুর মাঝখানে ছোট একটা হ্যারিকেন। স্বল্প আলোয় যাত্রাপথের কিছুটা মাত্র আলোকিত হচ্ছে। দু পাশে জমাট অন্ধকার। বাইরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের কিছুটা গাড়ীর মধ্যেও হানা দিয়েছে।

নিভাকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু তার চুড়ির নিক্কণ শোনা যাচ্ছে। মশা তাড়াবার জন্য সে বোধহয় হাত নাড়াচ্ছে।

একবার শুধু অমিয় বলল।

তোমাদের এখানে মশা খুব।

সুবীর বলল, চারদিকে জোপঝাড় তো। এই সবই তো মশার স্বর্গ।

তোমাদের বাড়ীতে কিন্তু বিশেষ মশা নেই।

বাড়ীর চারপাশ সর্বদা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া চারদিক অবারিত, সেই জন্য প্রচুর বাতাস। বাতাসে মশা থাকতে পারে না।

অমিয় কিছু বলল না। সে শুধু বসে বসে ভাবতে লাগল, এমন কি কথা বলা যায় যার উত্তর নিভার মুখ থেকে পাওয়া যেতে পারে। একটা সহজ সরল উত্তর পেলে অন্ততঃ কাঁচঘরের মধ্যের অপ্রীতিকর ঘটনাটা যে সে মনে রাখে নি, ঘটনাটা যে নিতান্ত আকস্মিক এ বিষয়ে অমিয় স্থির নিশ্চয় হতে পারে।

কিছু বলা যায় না, নিভা হয়তো মনে করেছে, অমিয় ইচ্ছা করেই ফুলের বৃন্তটা হাত দিয়ে নাড়িয়েছিল। গিরগিটিটাকে দেখতে পেয়েও। যাতে গিরগিটিটা লাফিয়ে নিভার গায়ে পড়ে। তাকে বিব্রত করে।

নিভা যে এতটা বিচলিত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত এমন ব্যাপার করবে সেটা হয়তো অমিয় বোঝে নি।

নিভাকে কোথাও একলা পেলে অমিয় সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে তাও সম্ভব নয়, কারণ ও ঘটনার পুনরুল্লেখ করা অমিয়র পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পর অমিয়র খেয়াল হ'ল।

সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ চেয়ে দেখল, সুবীরও ঘুমাচ্ছে। নিভা উইয়েতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। অস্পষ্ট একটা কাঠামো। তার মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে নিভা শাড়ীর আঁচলটা মুখে চাপা দিয়েছে।

একটু পরেই অমিয় অনুভব করল। তৃষ্ণায় তার তালু শুকিয়ে কাঠ। দুপুর বেলা লুচি খেয়ে, প্রচুর ঘোরাঘুরি করে তৃষ্ণা পাওয়াটা অবশ্য স্বাভাবিক।

জলের কুঁজো গাড়োয়ানের কাছে। তার কাছ থেকে জলের কুঁজোটা চেয়ে নিয়ে অনায়াসেই জল খেতে পারে, কিন্তু যে ভাবে অসমতল পথ দিয়ে গাড়ী ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে, জল কতটা মুখে পড়বে সেটাই বিচার্য। বেশীটাই জামাকাপড় ভিজিয়ে দেবে।

কিন্তু তৃষ্ণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। অমিয় আর পারছে না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গাড়োয়ানের পিছনে গিয়ে বলল ভাই, শুনছ।

গাড়োয়ান চালাতে চালাতেই পিছন ফিরে দেখল।

বলুন বাবু।

কুঁজোটা একটু দাও তো এদিকে।

গাড়োয়ান হেসে উঠল।

খালি কুঁজো নিয়ে যাচ্ছি বাবু। কুঁজোয় এক ফোঁটা জল নেই।

তাহলে।

ডাব আছে বাবু। ডাব খান না।

ডাব? কিন্তু কে কেটে দেবে?

গাড়োয়ান কোন উত্তর দিল না। তার বসবার আসনের তলায় হাত দিয়ে খড়ের মধ্যে থেকে একটা কাটারি বের করল। ঝুড়ি থেকে বেছে একটা ডাব নিয়ে মুখটা কেটে অমিয়র হাতে দিল।

গাড়ী চিমে তেতালায় চলছিল। গাড়োয়ান ডাব কাটায় ব্যস্ত ছিল বলে। এবার গাড়োয়ান গাড়ীর গতি দ্রুত করল।

অমিয় কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এক চুমুকে জলটুকু শুষে নিয়ে বলল, আঃ।

তারপর ঘুরে বসে গাড়ীর পাশের কাপড়টা তুলে ডাবটা ফেলে দিতে গিয়েই নজরে পড়ল।

চাঁদের আলোর তেজ বেড়েছে। ভিতরের সব কিছু এখন খুব অস্পষ্ট নয়। বেশ দেখা যাচ্ছে। আঁচল সরিয়ে নিভা ওর দিকেই চেয়ে আছে। বাইরের জোনাকির দীপ্তির সঙ্গে সে দুটির অদ্ভুত মিল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করল, তুমি ডাব খাবে?

নিভা কোন উত্তর দিল না। শুধু মাথাটা নাড়াল। একদিক থেকে আর একদিকে।

ডাব খাবে না। তবে তার প্রয়োজন নেই। সে তৃষ্ণায় কাতর নয়।

অমিয় চেয়েছিল, নিভা একটা উত্তর দিক।

তার কণ্ঠস্বরে মেজাজটা বোঝা যাবে। সে অমিয়র প্রতি বিরক্ত হয়ে আছে কিনা। অবশ্য বিরক্ত যদি হয়েই থাকে, তাহলে অমিয় নাচার। সত্যিই সে কোন দোষ করেনি। তার কোন অপরাধ নেই। কেউ যদি অবশ্য তার সম্বন্ধে কিছু ভেবে বসে থাকে তাহলে সে কি করবে। কি করতে পারে।

অমিয় ভেবেছিল পরিশ্রান্ত দেহটা বিছানায় ঠেকালেই ঘুম আসবে। কিন্তু এল না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করল।

পাশে সুবীর নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। পাশ বালিশ আঁকড়ে। বিরাট খাট। খাট নয় পালঙ্ক। কাঠের ওপর নানারকম অলঙ্করণ। দুদিকে দুটো পরী। মাথার ওপর হাত তুলে।

আগের দিনের কারুকার্যে পরীর প্রাধান্য খুব বেশী। কলকাতাতেও অনেক বনেদী বাড়ীর গেটে পাঁচিলে অমিয় পরীর মূর্তি লক্ষ্য করেছে।

নিদ্রাহীন দুটো চোখ তুলে অমিয় পরীর মূর্তি দেখতে লাগল।

জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। দিনের আলোর মতন প্রখর। দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে লজ্জার ছায়া নামল অমিয়র দুটি চোখে। সঙ্কোচে সে দুটি চোখ নিমীলিত করল।

নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পষ্ট। নিপুণ শিল্পীর হাতে বাস্তব রূপ পেয়েছে।

এতদিন এসব অমিয় অন্যভাবে লক্ষ্য করে এসেছে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। ফটো, ছবি, প্রাচীনপত্রে বহুবার চোখে পড়েছে।

কিন্তু তার দৃষ্টি আর নিরাসক্ত নয়। স্পর্শের পরশ-পাথরে সব কিছু অন্য রূপ নিয়েছে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রক্তকণিকায় নতুন উন্মাদনা।

হঠাৎই যেন পরীর মুখটা বদলে নিভার মুখে পরিণত হ'ল। দেহটাও নিভারই।

পরের দিন সকালের দিকে অমিয় আর সুবীর পড়ার টেবিলে বসেছিল। অমিয় সঙ্গে করে খান তিনেক পাঠ্য পুস্তক এনেছিল। ইচ্ছা, যে কদিন এখানে থাকবে যাকে মাঝে বইগুলোর পাতা ওল্টাবে। কিছু নোটস নেবে।

জানলার বাইরে সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

অমিয় পাঠে তন্ময় ছিল। সে মাথা তুলল না।

অমিয়।

এবার অমিয় বই সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাড়ীতে বোধহয় কোন চিঠি লেখনি? তোমার পৌঁছানো সংবাদটা দেওয়া দরকার।

লজ্জিত হল অমিয়। একেবারে তার খেয়াল নেই। খাম পোষ্টকার্ড দুই-ই সঙ্গে এনেছে। কি লিখবে, কাকে লিখবে আসতে আসতেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছে।

বাবাকে লিখবে না। মাকে লিখবে। মাকে লিখলেই বাবা জানতে পারবে। বেশী নয় ছোট্ট ক লাইনের চিঠি। মায়ের উদ্বেগ দূর করার জন্য যেটুকু দরকার।

অমিয় মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল।

না চিঠি দেওয়া হয়নি। আজ দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, আজকেই দিয়ে দিও। তোমার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা ভাববেন তো।

জানলা থেকে সরে যাবার আগে মা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

এ বিষয়ে দুটি বন্ধুতে তো ভাবি মিল।

শেষের কথাগুলো অমিয়র কানে যায় নি।

সে বলল, মিলের কথা মাসীমা কি বললেন?

সুবীর হেসে বলল, ওই যে কলকাতায় গিয়ে আমিও চিঠি দিতে ভুলে যাই কিনা। মার চিঠি না পেলে তবে খেয়াল হয় তাই।

অমিয় চেয়ার ছেড়ে সরে যেতে যেতে বলল, সত্যি আমার চিঠি লেখা দরকার। মা-বাবা নিশ্চয় খুব ভাবছেন।

তুমি এখনই লিখে রাখ। দুপুরবেলা কারো হাতে দিয়ে দিলে সে একেবারে ট্রেনে ট্রেনে ফেলে দিয়ে আসবে।

অমিয় প্রথমে সুটকেশ খুলে একটা পোষ্টকার্ড বের করল। তারপর ভাবল, না পোষ্টকার্ড নয়। পোষ্টকার্ড খুব খোলাখেলা, খুব নয়। কি লিখছে সকলেই পড়ে নিতে পারবে। এমন কি যে লোকটা নিয়ে যাবে পোষ্ট-কার্ড, সে যদি লেখাপড়া জানা লোক হয় তো, পড়তে পড়তেই যাবে। এ যেন মা আর ছেলের মাঝখানে আর একজনের ছায়া এসে পড়া। গোপনতা থাকে না। পবিত্রতাও নয়।

অমিয় খাম বের করে টেবিলে ফিরে এল না। সুবীরের সামনে লিখতে অসুবিধা হবে। এটা ঠিক মাকে লিখতে গেলেই চোখের সামনে মনের সামনে মার অস্পষ্ট মুখটা ভেসে আসবে। কি জানি অমিয়র দুটো চোখে, চোখের কোণে যদি জল ভরে ওঠে। সুবীর চোখ তুলে দেখলেই বুঝতে পারবে, জানতে পারবে।

অমিয় পালঙ্কের ওপর বসল।

সামান্য ক' লাইনের চিঠি লিখতে অমিয়র বেশ সময় লাগল। এর চেয়ে লাবরেটরিতে একটা গোলমেলে এক্সপেরিমেন্ট কিংবা আলো সম্বন্ধে দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে তার হয়তো এতটা অসুবিধা হ'ত না।

জীবনের এই প্রথম চিঠি। প্রথমে সম্বোধন নিয়েই

ঘুমিয়ে পড়ে গেল। শুধু যা লিখতে পারলেই বোধহয় সে বাঁচত, কিন্তু চিঠি লেখার একটা রীতি পদ্ধতি আছে। তাই অনেক ভেবে লিখল, পূজনীয়াসু মা।

ডাক্তারটার কথা, যাওয়া-দাওয়ার কথা, সুধীরের মা বাপের যত্ন আদরের কথা সব লিখল। কেবল নিভার কথাটা কিছুতেই লিখতে পারল না। একবার নামটা লিখেও কলম-তুলিয়ে তুলিয়ে নামটা ঢেকে দিল। তাও অমিয়র মনে হল যে পড়া যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে।

চিঠিটা শেষ করে খামের মুখটা বন্ধ করে, ঠিকানা লিখে অমিয় সুধীরের কাছে ফিরে এল।

হয়ে গেছে চিঠি লেখা।

বাঃ, যে যাবে তাকে দিয়ে আসি।

সুধীর চলে গেল।

আর পড়তে অমিয়র ভাল লাগল না। চোখের ঘুম তেমন নেই। পার্বতী নদীর জলের আওয়াজ ছাপিয়ে ঘুম থেকে আর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে খট্-খট্-খট্।

এটা কিসের আওয়াজ অমিয় জানত না। সুধীরই তাকে বলেছে।

কাঠ ঠোকরা পাখী শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছের কাণ্ড ফুটো করে চলেছে। নিজের বাসা করবার জন্য নয়। গাছের বাকলের মধ্যে পোকামাকড় ধরে খাবার জন্য।

অমিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নীচে উঠানের একপাশে সার সার গোটা তিনেক গরু। এইবার রোজকার মতন তাদের মাঠে নিয়ে যাবে। চাকর-বাকরেরা এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে।

সুধীরের বাবা নেই। ভোর বেলাই তিনি খামারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। এখানে সব কিছুতে বেশ একটা শৃঙ্খলা। ঘড়ির কাঁটার মতন একভাবে কাজ হয়ে যাচ্ছে।

শহরে কিন্তু কেবল বিশৃঙ্খলা আর হৈ-চৈ। ট্রাম আর বাস কোনটাই ঠিক সময়ে আসা যাওয়া করে না। ফলে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে বিদ্বেষের আর অসন্তোষের বেশ ঘূর্ণায়িত হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনের ভোরে শৃঙ্খলা নেই। মাঝে মাঝে মনুষ্যত্ব গোসলখানা আটকে যায় বাসের-ট্রামের ঢাকা। অমিয়র বাপের কপালে চিন্তার বলি আঁকা ফুটে ওঠে। এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। সেই সঙ্গে মায়েরও দুশ্চিন্তা বাড়ে।

কোন জরুরী কাজে বের হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথে ট্রাম বাস মোটর থেমে থাকে। এগোবার উপায় নেই। পিছোবারও নয়। বিশ্রীকুৎসিত অবস্থা। সামনে মিছিল চলেছে। বুভুক্ষার মিছিল।

এখানে সব কিছু যেন প্রকৃতি নির্ভর। শাসনভার প্রকৃতির ওপর ন্যস্ত।

পিছন ফিরেই অমিয় অবাক হয়ে গেল।

আলুলায়িত কুন্তল, কপালে চন্দনের টিপ, পরণে গরদ, হাতে কাঁসার রেকাবিতে খুপীকৃত নানা রংয়ের ফুল।

নিভা পুজোর ঘর থেকে বের হচ্ছে।

দু'জনের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়।

কিছু একটা বলা দরকার, কিন্তু কি বলবে ভাবতে ভাবতে নিভা ঠোঁট চুকে হাসল।

অমিয়র বুক থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। সেও হাসল।

আপনার বন্ধু কোথায়?

সুধীর চিঠি নিয়ে নীচে গেছে।

চিঠি?

হ্যাঁ, আমি যাকে চিঠি লিখেছি, সেই চিঠিটা নিয়ে গেছে।

নিভা আরো কয়েক পা এগিয়ে এল।

আমাদের কথা লিখেছেন যাকে?

নিভার কথা আটকে গেল। বোধহয় আমার বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে আমাদের বলল।

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

নিভার হাসি এবারে আরো স্নিগ্ধ।

লিখেছেন এখানে একটা মেয়ে থাকে যে গিরগিটিকে ভীষণ ভয় করে?

পলকের জন্য অমিয়র মুখে আবিরের খেলা। দুটো

ঠোঁট খুব্‌ড়িয়ে কেঁপে উঠল। একটু বুঝি ভ্রূকুটির হ'ল ভ্রূকুঞ্চন।

অমিয় বলল, সিংগিটিকে আমিও খুব ভয় পাই। ওভাবে আচমকা লাফিয়ে পড়লে কারে, সবাই ভয় পেত।

আপনি ঠাকুর দেবতা মানেন তো?

কেন, বল তো?

শুনেছি বৈজ্ঞানিকরা এসব কিছু মানে না। তারা বলে সব নাকি প্রকৃতি।

আমি মানি, কারণ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করল কে?

তবে হাঁ বলুন।

হাঁ করব? অমিয় বিস্মিত হল।

ঠাকুরের চরণামৃত। খাবেন তো?

অমিয় কোন কথা না বলে হাঁ করল।

বাবা, অত উঁচুতে আমি নাগাল পাই কি করে?

তাহলে নীল ভাউন হব।

নিভা হাসল, অতটা বলব না। একটু নীচু হলেই চলবে।

অমিয় একটু নীচু হ'ল।

সাবধানে কমণ্ডলু থেকে জলটা অমিয়র মুখে ঢেলে দিল।

শুধু জল নয়, তাতে চন্দনের গন্ধ আছে, আরো একটা কিসের সুবাস।

বারে একলা অমিয়কেই খাওয়াচ্ছ। আমিই বাদ?

সুবীর সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল।

একটু লজ্জিত হল নিভা। হাতটা একটু কেঁপে চরণামৃতের কিছুটা অমিয়র গালে পড়ে গেল।

নিভা ঘুরে সুবীরের দিকে ফিরে বলল।

তুমি তো আবার ভগবান মানো না।

সুবীর ছুটে এসে নতজানু হয়ে নিভার সামনে বলল।

ওরে বাবা, এখনও কত পরীক্ষা দিতে হবে, ভগবান মানি না মানে?

চরণামৃত পান করা হতে সুবীর বলল, বারে শুধু জল, ফলটল দাও।

মা নিয়ে আসছে।

নিভা সরে গেল।

সুবীর এসে অমিয়র পাশে দাঁড়াল।

খুব ভাল লাগল অমিয়র। গুমোট আবহাওয়াটা যেন অনেকটা তরল হয়ে গেল। নিভা খোলাখুলিভাবে মিশছে, কথা বলছে তার মানেই ঘটনাটা তার মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করেনি। এটা যে আকস্মিক, কারো দোষ নেই না নিভার, না অমিয়র সেটা সে বুঝতে পেরেছে।

তা না হলে, যে কদিন অমিয় এখানে থাকত তার বেশ অসুবিধা হত। এ পরিবারের সঙ্গে সহজভাবে মেশার পক্ষে কোথায় একটা অসুবিধার প্রাচীর থাকত। ভুল বুঝাবুঝির ফাটল।

একটু পরেই সুবীরের মা এসে দাঁড়ালেন।

কাঁসার থালার ওপর দুটো কলাপাতা। নানা রকমের ফল, ছানা মিষ্টি আর কিসমিস।

কি সব চরণামৃত খেয়েছো?

অমিয় আর সুবীর দু'জনেই ঘাড় নাড়ল।

খেতে বস। আমি জল নিয়ে আসি।

একটা জিনিস এরমধ্যেই অমিয় লক্ষ্য করেছে। বাড়ীতে পাচক রাঁধুনী থাকা সত্ত্বেও সুবীরের মা নিজে প্রায় সব সময় আহার্য পরিবেশন করেন।

মা সরে যেতে সুবীর বলল।

আমি তোমাকে যে দিন দিনেক একলা থাকতে হবে।

একলা?

একলা মানে আমি থাকব না।

সেই তো একলাই হ'ল। কেন তুমি কোথায় যাবে?

আমি বাবার সঙ্গে পিসিমার বাড়ী যাব। নৌকোয় এখান থেকে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। রামগোবিন্দপুরে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমরা একটা অপ্রিয় কাজ করতে সেখানে যাচ্ছি। তারমধ্যে আর তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না।

অপ্রিয় কাজ?

এটুকু বলেই অমিয় থেমে গেল। বেশী কৌতূহল প্রকাশ করাটা সমীচীন হবে না। সুবীরদের পারিবারিক ব্যাপার। সে সম্বন্ধে তার কোন রকম উৎসাহ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সুবীর বলল।

ইতিমধ্যে মা এসে দু' গ্লাস জল রেখে গেছেন। দেখে আর দাঁড়ান নি। আবার চলে গেছেন রান্নাঘরের দিকে। ব্যস্ত পায়ে।

আমার পিসিমার চার ছেলে। কোন ছেলেই বিশেষ মানুষ হয় নি। এখন চারজনে আলাদা হতে চায়। এই নিয়ে বছর খানেকের ওপর অশান্তি চলেছে। কাল পিসিমার চিঠি এসেছে বাবার কাছে। প্রতিদিন হৈ হল্লা চীৎকার আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তার চেয়ে সম্পত্তি চার ভাগ হয়ে যাক। যার যা ইচ্ছা করুক। এতদিন পিসিমা ইচ্ছা করেই ছেলেদের কথায় কান দেননি। জানতেন, বুঝতে পেরেছিলেন, আলাদা হলে কেউ সম্পত্তি রাখতে পারবে না নষ্ট করে ফেলবে। উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে। যতদিন পিসিমার তাঁকে আছে ততদিনই ভাল। কিন্তু ছেলেরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরপরে, এক ছাদের তলায় তারা থাকবে না।

তাই বাবাকে যেতে হবে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার জন্য। যাতে ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল না হয়। সুবীর যাচ্ছে অন্য কারণে একেবারে ছোট ছেলেটি সুবীরের বন্ধু। এক সঙ্গে দু'জনে খুব অন্তরঙ্গতাও ছিল। তাকে দেখাশোনার ভার সুবীরের ওপর।

এ কদিন আমি কি করে কাটাব?

অমিয় সত্যিই চিন্তান্বিত হ'ল।

কেন মা থাকবে, নিভা থাকবে। কথা বলার লোকের অভাব হবে না। তিন দিনও হয়তো লাগবে না। যদি ভালোয় ভালোয় সব মিটে যায়, তাহলে দু'দিনেই ফিরে আসব।

অমিয় আর কিছু বলল না। বলার আর কি থাকতে পারে? অমিয়র যদি হয়ই একটু কষ্ট, তা বলে এদের পারিবারিক কাজকর্ম তো সেজন্য আটকে থাকতে পারে না।

চল বাগানে যাই।

বলাপাতার ওপর গ্লাস চাপা দিয়ে দু'জনে নেমে এল। বাগানের মধ্যে ঢুকতে যাবার মুখেই কানে এল বীণা-মন্ডিত কণ্ঠ। সুরেলা, যাদুময়। কিন্তু কারা বিষণ্ণ গুরুতা, স্বাভাবিক প্রমত্ত, শাপেনাস্তগমিতমহিমা যৌবনোদ্যানে তন্ময়।

নিভার কণ্ঠ।

অমিয় সুবীরের দিকে চোখ ফেরাল, সুবীর বলল।

পণ্ডিতমশাই এসেছেন। নিভাকে পড়াতে।

অমিয় জানলার দিকে দেখল। নিভাকে দেখা গেল না। গৌরকান্তি এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল। ইনিই বোধ হয় পণ্ডিতমশাই।

খুব নীচু ক্লাসে অমিয়কে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃতের ক্লাস মানেই ঝাঁকির ক্লাস। সেটা ছাত্রেরা যেমন বুঝত, শিক্ষকও তেমনই বুঝতেন। সংস্কৃতে অমিয় কোনদিন কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি।

কিন্তু নিভার কণ্ঠে মেঘদূতের শ্লোক যেন নতুন রূপ নিল।

বাবা নিজে এসে খুব চর্চা করে। বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকলে হবে কি, বলে প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনতে হলে সংস্কৃত জানা খুব দরকার। পরীক্ষায় পাশ করার মতন সংস্কৃত জানা নয়, যতটা সংস্কৃত জানা থাকলে এদেশের জ্ঞানভাণ্ডার করায়ত্ত হয়, সেই পরিমাণ বিদ্যা।

তুমিও ভাল সংস্কৃত জান?

ভাল জানি না। তবে ছেলেবেলায় আমিও পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে পড়েছি। পণ্ডিতমশাই বলেন, আমার চেয়ে নিভার সংস্কৃত উচ্চারণ অনেক ভাল। রসগ্রহণেও ওর কৃতিত্ব বেশী।

নিভার সম্বন্ধে আর কোন কথা হ'ল না। দু'জনে বাগানে গিয়ে নামল।

আমার কি ইচ্ছা হয় জান অমি?

কি?

আমি যেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেন বাবাকে সাহায্য করতে পারি। দেখেছ, বাবা কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত পরিশ্রম করে। একটু একটু করে বয়স তো হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি, বাবা ক্লান্তি অনুভব করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

তোমাদের তো ছোট ফ্যামিলি। বোনের বিয়ে আর তোমার মানুষ হওয়া, কি বল?

অমিয়র কথার ধরনে সুধীর হেসে ফেলল।

তোমার কথাগুলো ঠিক পীতাম্বর বুড়োর কথার মতন মনে হচ্ছে।

তার মানে?

মানে, বেশ বুড়োটে কথা আয়ত্ত করেছ।

দুজনেই হেসে উঠল।

সুধীর বলল, তোমাদের ফ্যামিলি তো আরও ছোট। তুমি তো সবে ধন নীলমণি।

অমিয় হাসতে হাসতে বলল।

এতদিন মনে হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা বোন থাকলে বেশ হত। তার সঙ্গে ঝগড়া, ভাব, খুনসুটি করে সময় কাটত।

সত্যি অমি, নিভাটা না থাকলে যে আমি কি করতাম তার ঠিক নেই। বিশ্বাস কর, কলকাতায় গেলে মা-বাবার জন্য যত না কষ্ট হয়, তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয় নিভার জন্য। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমি যে কি করব!

কেন অমিয় নিজেই জানে না, তার বুকের মধ্যে ছমছমিয়ে একটু ভয় হ'ল। আচমকা ধাক্কা লাগলে, আঘাত লেগে পরীরের মাংস ছিঁড়ে গেলে যেমন চিন চিন করে, অবাক্ত একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে শিরায় শিরায়, তেমনই একটা বেদনাবোধ করল অমিয়।

বলল, নিভার বিয়ে হয়ে যাবে নাকি?

প্রশ্নটা করেই উপলব্ধি করেছিল।

তার আগেই সুধীর হেসে উঠেছে।

যাবে মেয়েছেলে বিয়ে হবে না। অবশ্য বিয়ে যেয়ে পুরুষ দু'জনেরই হয়, তবে মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই হয়।

একটু থেমে সুধীর বলল।

নিভার তো বিয়ের কথা এর মধ্যেই হচ্ছে দু' একটা সম্বন্ধও এসেছে।

আবার সেই বিশ্রী যন্ত্রণাটা অমিয় অনুভব করল।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল।

এর মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ? বয়স কত নিভার?

নিভার নামটা উচ্চারণ করতে অমিয়র ভালই লাগল।

সুধীর হিসাব করল।

আমার চেয়ে নিভা তিন বছরের ছোট? তার মানে বয়স পনের হ'ল বৈ কি। বাবা বলে বেখতে বেখতেই বয়স দুকে কেটে যাবে।

একটা সম্বন্ধ তো পিসিমাই পাঠিয়েছেন। ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর; আমরা দেখেছি, কিন্তু বাবার আপত্তি।

কেন?

ছেলেটির অমি জমা বাড়ীঘর অনেক। কিছু করতে হয় না, করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু লেখাপড়া একেবারে শেখে নি। বাবা বলে ধনবান মূর্খ হলে আরও ভয়ের।

অমিয়র মনে হল তার বুক থেকে একটা পাথর তার নেমে গেল।

শুধু একটু স্পর্শ, যে স্পর্শে অনিচ্ছাকৃত নিবিড়তা ছিল। নতুন এক আস্বাদে অমিয়র মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছিল। তার বেশী কিছু নয়। এই টুকুর ওপর নির্ভর করে যে জাল বোনে, বোনার চেষ্টা করে সেও কম মূর্খ নয়।

তাছাড়া, অমিয়র সংসার জীবনে প্রবেশ করার এখনও বহু দেরী। সামনের পথ উপল বিষম। কত উত্থানপতন কণ্টকিত।

এই সময় এই সব চিন্তাও পাপ। এতে ক্ষতি হয়, মানুষ আদর্শচ্যুত হয়।

অমিয় অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল।

কাল তোমরা কখন যাচ্ছ?

ভোরবেলা। তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না। তুমি তখন ঘুমাবে।

না, কাল আমি খুব সকালে উঠব। তোমাদের যাওয়া দেখব।

বেশ তো উঠ। কোন অসুবিধা নেই। আমরা তো ওই ঘাট থেকেই রওনা হব।

সুধীর আঙুল তুলে সামনের ঘাটের দিকে দেখাল।

আমি জীবনে কোনদিন নৌকা চড়ি নি।

আমরা ফিরে আসি। একদিন নৌকায় শিবমন্দির দেখতে যাব।

শিবমন্দির?

হ্যাঁ, বাবল শিবমন্দির আছে। বাবাই দেখাশোনা করে, বাবে মধ্যে খরচপত্র দেয়। এখান থেকে নৌকায় আধ ঘণ্টার পথ।

অমিয় কিছুক্ষণ ভেবে দেখল সুবীরের দিকে তারপর বলল।

তুমি তো ঠাকুরদেবতা মান না, সুবনাথ।

উত্তর দেবার আগে সুবীর একবার এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল, তারপর বলল।

তোমার কাছে বলতে সঙ্কোচ নেই, বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে প্রতি পদে সরিয়ে নিচ্ছে না। আগে মানুষ যে রহস্য ভেদ করতে পারত না, সে রহস্যের আকর হিসাবে ঈশ্বরের নাম করত, কিন্তু বিজ্ঞান ধীরে ধীরে সে সব রহস্যের কিনারা করছে। উত্তর দিচ্ছে। আজ আমরা বলদের প্রতিদ্বন্দ্বের হিসাবে টাকা নিই, ঈশ্বরের পূজা দিই না, বা তাঁর চরণামৃত পান করি না।

কিন্তু এইমাত্র যে তুমি চরণামৃত পান করে এলে?

সুবীর বিব্রত হল। কিন্তু দিয়ে ঠোঁট টিপে নিয়ে বলল।

কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত নয় অমি। আমি ওই চরণামৃতটুকু পান না করলে, মনে মনে আঘাত লাগত। মা ভাবত, ছেলে আমার ধর্মে আস্থাহীন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই পান করেছি বলে চরণামৃতের শক্তির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এ ভাবার কোন কারণ নেই। তুমি, তুমি নিশ্চয় এ সবে বিশ্বাস কর?

কি জানি আমি ঠিক ওভাবে কখনও চিন্তা করি নি। তবে আমার মনে হয় পৃথিবীময় এই যে এনার্জি, এর নিশ্চয় একটা উৎস আছে। অবলম্বনহীন হয়ে কিছু থাকতে পারে না। হঠাৎ কিছুর বিকাশ হয় না। জানি না, হয়তো আমি ফিজিক্স-এর ছাত্রের মতন কথা বলছি।

বলতে বলতে অমিয় থেমে গেল।

কোণের আড়ালে বাগানের কাঁচা সড়কের ওপর পণ্ডিতমশাই আর নিতাকে দেখা গেল।

পণ্ডিতমশাই হাত মুখ নেড়ে কি বলে চলেছেন, আর নতমুখে নিতা শুনছে। নিতার চুলে একরাশ বকুল ফুল করে পড়ল। তার খেয়াল নেই। আলোচনায় সে নিবিষ্টচিত্ত।

বাইরে যাবার পথের পাশেই সুবীর আর অমিয় বসেছিল। ওরা ঘুরে ঘুরে সেদিকেই এল।

কাছে আসতে সুবীর দাঁড়িয়ে উঠল। তার দেখাদেখি অমিয় উঠে দাঁড়াল।

সুবীর পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করল।

পণ্ডিতমশাই মাথায় হাত রাখলেন।

তারপর বাবা সুবীর, অফিসের কেমন চলছে?

ভালই।

সুবীর সরে যেতে অমিয় প্রণাম করল। পণ্ডিতমশাই দুটো চোখ কুঞ্চিত করলেন।

এটি কে? আমার পরিচিত কেউ বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে নিজের দৃষ্টিশক্তির ওপর আমার খুব আস্থা নেই।

না পণ্ডিতমশাই, একে আপনি দেখেন নি। আমার সহপাঠী, ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছে।

পণ্ডিতমশাই মুখ তুলে অমিয়কে পর্যবেক্ষণ করে বললেন।

কি নাম বাবা তোমার?

অমিয় নাম বলল।

ব্রাহ্মণ।

পণ্ডিতমশাই দুটো হাত যোড় করে নমস্কারের ভঙ্গী করলেন।

খুব ভাল ছেলে পণ্ডিতমশাই বৃত্তি পাচ্ছে।

তাতো হবেই। চেহারাতেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সূর্যের মত পদ্মপলাশ লোচন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ যে বিদ্যানেরই চেহারা বাবা সুবীর। সুখী হও বাবা, সুখী হও দরিদ্রের প্রতিপালক হও অন্যায়ের প্রতিকারক হও।

শেষের কথাগুলো পণ্ডিতমশাই চলতে চলতে বললেন।

অমিয় লজ্জায় কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বিশেষ করে নিতার সামনে এভাবে তার সৌষ্ঠব বর্ণনা করায়।

পণ্ডিতমশাই রাস্তায় গিয়ে উঠতে সুবীর বলল।

জানো অমিয়, পণ্ডিতমশাইয়ের বয়স প্রায় পঁচাত্তর।

এখনও দু বাইশ ছেঁড়ে নিভাকে পড়াতে আসেন। ওঁর কাছে প্রচুর হাতে লেখা পুঁথি আছে। ছারিকেনের আলোয় কিছুদিন আগেও সেই সব পুঁথি বেশ পড়তে পারতেন। আজকাল চোখে ছানি পড়াতে একটু অসুবিধা হয়েছে।

অমিয় সুধীরের কথাগুলো শুনল বটে, কিন্তু তার চোখ ছিল রাস্তার দিকে।

পণ্ডিতমশাইকে বিদায় দিয়ে এই পথেই নিভা ফিরে আসবে। যাবার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিশ্চয় কথা বলবে সুধীরের সঙ্গে। নিভা যদি নাই বলে, সুধীরই ডাকবে তাকে। নিভা যদি দাঁড়ায়, তাহলে অমিয়ও দু একটা কথা বলবে।

এটা কি অন্যায়? পাপ?

সুধীরের বোন তো তারও বোন? অমন্ত্রে কথা বলতে কিসের অসুবিধা? সঙ্কোচেরই বা কি কারণ?

অমিয় নিজের মনকে ধমকাল। অথচ তবুও চিন্তা করে সব ব্যাপারটা ঘোরালো করে তুলছে। নিভা তো সহজভাবেই তার সঙ্গে কথা বলছে। লোকাচারি তার দিকে চোখ তুলে দেখছে। তবে তার এই বিদ্রূপভাব একেবারেই অর্থহীন।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অমিয়র খেয়াল হল, নিভা ফিরল না। বোধহয় বাগানের মধ্যে অন্য কোন পথ দিয়ে ওপরে চলে গেছে।

তারপরই অমিয় লজ্জা পেল। সুধীর তার এই অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছে কিনা কে জানে? হয়তো প্রশ্ন করেছে উত্তর পায় নি।

অবশ্য সুধীর যদি কিছু বলে তখন বললেই হবে যে বাড়ীর জন্য মন কেমন করছিল। মার কথা, বাবার কথা ভাবছিল। সেটা নিশ্চয় স্বাভাবিক।

পরের দিন সুধীরের চেঁচামেচিতে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল।

অমিয় যখন বিছানার ওপর উঠে বসল, তখনও আবছা অন্ধকার রয়েছে। ভাল করে আলো ফোটে নি।

এই ওঠ, আমরা একটু পরে রওনা হব।

চোখ মুছে অমিয় দেখল, এর মধ্যেই সুধীর স্নান সেরে নিয়েছে। বিছানা পোশাক পরাও হয়ে গেছে।

এত সকালে?

হ্যাঁ, একটু অন্ধকার থাকতে যাত্রা করলে রোদটা বিশেষ লাগবে না। ডোরের হাওয়ায় হাওয়ায় পাল তুলে দিব্যি এগিয়ে যাওয়া যাবে।

বাইরে থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সুধী।

যাই মা।

তোয়ালে নিয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। একটু পরেই চোখে মুখে জল দিয়ে বের হয়ে এল।

চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল।

লাল শান বাঁধানো ঘাটের পাশে বিরাট এক নৌকা। পাল তোলা। ভিতরে রীতিমত বসবার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন হলে শোবারও।

মাঝি নৌকোর পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে। দু'জন চাকর কুড়ি বোঝাই তরিতরকারি তুলে দিচ্ছে নৌকার ওপর।

ঘাটের সিঁড়িতে সুধীরের মা, বাবা, সুধীর আর নিভা।

অমিয় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

পূবের আকাশ সবে রাঙা হতে আরম্ভ হয়েছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া মেঘের কোণে কোণে আবিরের প্রলেপ। জলেও লালচে ছায়া। মৃদু মন্দ বাতাস বইছে।

অমিয়কে দেখে সুধীরের বাবা হাসলেন।

এস অমিয়, তোমার জন্য তোমার বন্ধু খেতে পারছে না।

অমিয় হাসল। সুধীরও।

মিনিট খানেক সুধীরের মা আর বাবা ফিসফিস করে কথা বললেন, তারপর সুধীর বাবার পিছন পিছন নৌকায় গিয়ে উঠল।

নৌকার ওপর দুটি মোড়ায় দু'জনে বসল।

মাঝি ঘড়ি খুলে দিতেই সর সর করে নৌকা অনেকটা ঘুরে চলে গেল। আর একজন মাঝি হাল ধরেছে।

নৌকা নদীর প্রায় মাঝ বরাবর যেতে অমিয় দেখল, সুধীরের মা গলায় আঁচল দিয়ে আকাশের দিকে হাত যোড় করে বিড় বিড় করে কি বললেন, তারপর একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন চলমান নৌকার দিকে।

অমিয় নিভার দিকে চোখ ফেরাল।

নিভা একটা গাছের ডালে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

অমিয় ঘাটের চাতালে বসে পড়ল।

নদী বাঁকে যখন নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন যেন সুধীরের মার চেতনা হল। তিনি অমিয়র দিকে চেয়ে হেসে বললেন, অমিয়বাবুর তো বড় কষ্ট, বন্ধু এরকমভাবে চলে গেল।

অমিয় একবার চোখ তুলে সুধীরের মায়ের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

সুধীরের মা এগিয়ে এসে একটা হাত অমিয়র কাঁধে রাখলেন।

চল বাবা ওপরে চল। এই নিভা, অমিয়বাবুকে ওপরে নিয়ে যা।

সুধীরের মা ওপরে গেলেন না। তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। নিভা অমিয়র পাশে এসে দাঁড়াল। বলল।

এখনও পুরো সকাল হয় নি। আপনি কি আর একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি?

সলজ্জভাবে অমিয় ঘাড় নাড়ল। না, না, আর ঘুমাব না।

তা হলে ওপরে চলুন। দুধ খেয়ে নেবেন।

দুজনে ওপরে উঠল। নিভা আগে, অমিয় পিছনে।

আজ আর রান্নাঘরে আসন পাতা নেই। পরিবর্তে লোটা দুয়েক বেতের মোড়া। আগে একলো বোধহয় অন্ত ছিল।

একটা বেতের মোড়ায় অমিয় বসল।

নিভা মোড়া চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

একটা কথা অমিয়র মনে পড়ে গেল। কদিন এখানে

এসেছে, এ বাড়ীতে কোন খবরের কাগজ চোখে পড়ে নি। অথচ কলকাতায় সকালে উঠেই খবরের কাগজের পাতার ওপর একবার চোখ না বোলালে যেন দিনই আরম্ভ হ'ত না। রাজা জোড়া গোলমালের খবর, হাসিয়া আর আমেরিকার চাঁদে রকেট পাঠাবার প্রতিযোগিতা, আরো কত রকমের সংবাদ। অন্তহীন বৈচিত্র্য।

অথচ খবরের কাগজ না পেয়ে খুব যে অসুবিধা হচ্ছে এমন নয়। আজ সুধীর নেই বলেই বুঝি খবরের কাগজের কথাটা মনে পড়ে গেল।

মানুষ অভ্যাসের দাস।

নিভা ফিরে এল হাতে দুধের বাটি, রেকাবীতে গোটা কয়েক মিষ্টি।

আচ্ছা নিভা।

দুধের বাটি নামাতে গিয়ে কিছুটা দুধ চলকে উঠল। মিষ্টির রেকাবীটা যখন নামাল, তখনও তার হাত রীতিমত কাঁপছে।

অমিয় বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখল। হঠাৎ কি হ'ল নিভার?

এ মাস ধরে তো সবাই তাকে অনবরত। মা, বাবা, সুধীর, পণ্ডিতমশাই। কিন্তু এই মানুষটার কণ্ঠে এ নাম এত মধুক্ষরা কি করে হ'ল।

পাড়ার ঘাঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে নিভা জিজ্ঞাসা করল।

কিছু বলছিলেন আমাকে?

হ্যাঁ, বলছিলাম। তোমাদের বাড়ী কোন ঘরের কাগজ আসে না?

হ্যাঁ, আসে।

কি কাগজ?

নিভা মুখ টিপে হাসল।

যে কাগজ আসে তা আপনার পড়তে ভাল লাগবে না।

কেন?

কাগজের নাম কৃষি-বিজ্ঞান।

নিভার সঙ্গে অমিয়ও হেসে উঠল।

অল্প দিনের বন্ধন নিভা অমিয়র সামনে থেকে সরে গেল না। বারান্দার হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মুখের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে অমিয় বলল।

আজ তোমার পণ্ডিতমশাই আসবেন না?

না, তিনি সপ্তাহে তিন দিন আসেন। আজ তাঁর আসার দিন নয়।

আজ তুমি আমার কাছে পড়বে।

একটু একটু করে অমিয় সহজ হবার চেষ্টা করল। দু'জনের মাঝখান থেকে জড়তার বাধা অপসারিত না হলে ভারী অসুবিধা।

সুধীর নেই, প্রয়োজন হলে নিভার সঙ্গেই যখন কথাবার্তা বলতে হবে।

বেশ তো পড়াবেন। বাবার কাছে শুনেছি আপনি খুব ভালছেলে। জলপানি পেয়েছেন। দিনরাত নাকি পড়ার বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন।

এবার অমিয় লজ্জায় পড়ল। ঘাড় নেড়ে বলল।

না, না, মোটেই তা নয়। সুধীর তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে। আমি তোমাকে পড়াব মানে তুমি পড়বে, আমি শুনব।

নিভা দুটি ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল।

আমি কি পড়ব?

কাল সকালে বেটা পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়ছিলে।

ও, বেদমূত্রম। সংস্কৃত আপনার ভাল লাগে বুঝি?

শুনতে, পড়তে নয়। কি চমৎকার পড় তুমি। আমি তোমের সামনে যেন নিরাবিল ঝরকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আহা।

নিভা শাড়ীর আঁচলে মুখ লুকাল।

কি, লোনাবে না?

কাল যখন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পড়ব। আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনবেন।

উঁহু লুকিয়ে শুনব না। যেমভাবে তোমার সামনে বসে শুনব। আর তা নয় তো, গানে শোনাতে হবে।

বারান্দার অন্য কোণে সুধীরের মাকে দেখা গেল। হাতে কতকগুলো তরিতরকারি নিয়ে উঠছেন। সম্ভবত বাগান থেকে ঝিয়ের হাতে তুলে এনেছেন।

অমিয় কাছে এসে দাঁড়ালেন।

অমিয় নিভা সব ঠিক দিয়েছে তো?

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ একটু বেশীই দিয়েছে।

কি বল, বেশী কোথায়? এই তো তোমাদের খাবার বয়স। আর এতো বাইরের কিছু নয়। ঘরের গাইয়ের দুধ, আর বাড়ীতে তৈরী ঘি।

অমিয় কিছু বলল না। মিষ্টি মুখে তুলতে লাগল।

তুমি দুপুরবেলা ঘুমাও বুঝি? মানে ঘুমানো অভ্যাস আছে?

না, দুপুরে আমি ঘুমাতে পারি না।

বেশ, আজ তাহলে তোমার কাছে বসে তোমাদের কলকাতার কথা শুনব। তোমার মা বাবার কথা। অবশ্য সুধীরের কাছে অনেকটাই শুনেছি, কিন্তু তোমার মুখ থেকে শুনব।

অমিয় ঘাড় নাড়তে গিয়েই থেমে গেল।

বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিভা হাসিতে ভেঙে পড়েছে। সারা মুখ আরক্ত। খোঁপা খুলে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর।

কি হ'ল রে?

সুধীরের মার দৃষ্টি বিস্মিত সন্দিগ্ধ।

হাসতে হাসতেই নিভা বলল।

আচ্ছা মা, দুপুর বেলা দু'চোখ খুলে তুমি কলকাতার গল্প শুনতে পারবে। লেটে ভাত পড়লেই তো তোমার দুটি চোখ বুঁজে আসবে আর রাকের নানারকম বায়না শুরু হবে।

কপট ক্রোধে সুধীরের মা তর্জনী তুললেন।

থাম। আমার কথগুলো মাঝে মাঝে বলে।

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর অমিয় টেবিলের ওপর একটা বই নিয়ে পড়ছিল। তার নিজের বই।

সুধীরের অনেক বই রয়েছে আলমারিতে, টেবিলের ওপর কিন্তু সে সব বেশীর ভাগই রহস্যকাহিনী। যেটা অমিয় একেবারেই পছন্দ করে না। বৈজ্ঞানিক তুলক্রটিতে ভরা আজগুবি উপাখ্যান।

বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে খাতায় নোটস্ লিখছিল তন্ময় হয়ে, একটু পরে মাথা তুলেই দেখতে পেল জানলার ওপারে নিভা।

অমিয়র সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই নিভা বলল।

বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি আপনার খেয়ালই নেই। পড়ার সময় আপনার কোন দিকে নজর থাকে না, তাই আপনি ক্লাসের সেরা ছেলে।

এ প্রশংসায় অমিয় কোন উত্তর দিল না।

সে বলল, এস, ভিতরে এস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

পায়ে পায়ে নিভা ভিতরে এল। টেবিলের একটা কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

কি তোমার মা ডাকছেন আমাকে?

না, না, নিভা ঘাড় নাড়ল, মা এখন মনের আনন্দে ঘুমাচ্ছে। বললাম না তখন আপনাকে, দুপুরবেলা মা চোখ খুলে রাখতে পারে না।

অমিয় মৃদুকি হাসল, তুমি ঘুমাও না?

না, আমি আলো থাকলে ঘুমোতেই পারি না। কিছুক্ষণ শুয়ে ছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না, তাই আপনার কাছে চলে এলাম।

ভালই করেছ। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বাইরে এলোমেলো বাতাসে গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। আরো দূরে কোথাও গাছের বাকলে কাঠ-ঠোকরা পাখী ঠক্ ঠক্ করে চঞ্চুর ঘা পরীক্ষা করে চলেছে। এ সময় পার্বতী নদীর পথ নিঝুম। শান্ত মেয়েটির মতন দুপুরের রৌদ্রে নিজেকে মেলে শুয়ে আছে।

বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে অমিয় ঘরের মাঝা দেখল।

নিভার কপালে অল্প ঘামের বিন্দু। নাকের ডগাতেও। চুলের গোছা এলোখোঁপার ধরনে বাঁধা। টানা দুটি চোখে অপূর্ব মমতার ছাপ। ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির আভাস।

প্রথম প্রথম নিভা কাছে আসত না। কথাও বলত না। চকিতের জন্য দেখা দিয়েই সরে যেত। অচেনা সুধীরের পক্ষে সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

তারপর আজকাল কথা বলে। সেই ব্যাপারের পর আজকাল বেশী করেই কথা বলছে। কাছে আসছে। বোধ হয় সেদিনের লজ্জা ঢাকবার জন্যই।

তাছাড়া সুধীর নেই, যাবার সময় সুধীরই হয়তো বোনকে বলে গেছে, অমিয়কে সঙ্গ দেবার জন্য, যাতে সে

নিঃসঙ্গ বোধ না করে।

আচ্ছা, আপনার তো বোন নেই? ভাই না?

বইটা বুকে রেখে অমিয় বলল, না, বোন নেই, ভাইও নেই।

আপনার খুব একলা মনে হয় না?

উঁহুঁ, বরং মা বাপের আদরের কোন ভাগীদার নেই, ভাবতে ভালই লাগে।

ওমা, কি হিংসুটে আপনি। আমার তো দাদা না থাকলে ভীষণ খারাপ লাগে।

অমিয় দেখল, নিভা টেবিলের ওপর নিজের হাত দুটো প্রসারিত করে দিয়েছে। সরু, লম্বা আঙুল। এ রকম আঙুলকেই অমিয়র মা বলে, চাঁপার কলির মত আঙুল। কে জানে। আঙুলের গড়নের কথা অমিয় জানে না, কিন্তু নিভার গায়ের রং চাঁপার মতন। কনকচাঁপা।

তোমার নামটা কিন্তু ভারী মিষ্টি।

আমার পুরো নামটা তো আপনি জানেন না। শুধু নামের অংশটা শুনেছেন।

তোমার পুরো নাম?

হ্যাঁ, আমার পুরো নাম, চিরনিভা। একজন শুধু আমাকে পুরো নামে ডাকেন।

আশ্চর্য, ঠিক বুকের বাঁদিকটায় অমিয়র যেন জ্বালা করে উঠল। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে। পুরো নাম ধরে ডাকা মানেই যেন মানুষটাকে পাওয়া।

কে ডাকে পুরো নাম ধরে?

আমার পাওঠ মশাই। তিনি বলেন, অমি চিরানন্দে!

আহা হাসল। কথাটা শুনেই নয়, সেই সঙ্গে বুক থেকে যেন একটা গুরুভার সরে গেল।

তোমার আঙুলগুলো কিন্তু ভারী সুন্দর।

অমিয় নিভার আঙুলগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল।

আপনার আজ কি হয়েছে বলুন তো? আমার নাম সুন্দর, আমার আঙুলগুলো সুন্দর। সব সুন্দর দেখছেন?

কি করে নিভাকে বোঝাবে অমিয়। পুরুষ মানুষের এমন এক সময় আসে যখন সব কিছু ভাল বলতে ইচ্ছা করে। চারপাশের সব কিছু সুন্দর দেখে, সবুজ চশমা চোখে দিয়ে বাইরের সব কিছু সবুজ দেখার মতন। যৌবন নতুন রংয়ের প্রলেপ মাখায় চোখে, বুকে নতুন প্রীতির আবেশ আনে।

কেন, তোমার আঙুলগুলো বুঝি সুন্দর না?

অমিয় নিজেও ভাবে নি। আচমকা সামনে ঝুঁকে পড়ে একটা হাতে নিভার আঙুলগুলো তুলে নিল। আস্তে চাপ দিল। সত্যি কি নরম! আর বিদ্যুৎবাহী।

নিভার সারা মুখে লালের ছোপ। সে তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নেই। এ সময় কেউ এখান দিয়ে আনাগোনা করে না। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। প্রায় সবাই ঘুমের কোলে অচেতন।

আহা, আপনি যেন কি!

একটু জোর দিয়ে নিভা হাতটা ছাড়িয়ে নিল। হাই তুলল। মুখে হাতচাপা দিয়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুব ঘুম পাচ্ছে। শুতে যাই।

অমিয়কে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই নিভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাতে মাথাটা গুঁজে অমিয় চুপচাপ বসে রইল, মনে হল, আজকের হাওয়াটা যেন বেশ গরম। এভাবে চেয়ারে বসে থাকতে ভাল লাগল না। নিভা সব আনন্দ, সব স্বাচ্ছন্দ্য, সব প্রাণবন্তা যেন মুছে নিয়ে গেল।

অমিয় বুঝতে পারল, নিভা পালাল। অমিয়র দৃষ্টি থেকে, তার স্পর্শ থেকে।

নিজেকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করল অমিয়। কেন, এমন হয়। সুধীরের সঙ্গে একান্তে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে। নিকট সান্নিধ্যে। কত রকমের আবোল-তাবোল কথা। কাজের, অকাজের।

কিন্তু নিভা কাছে এলে কেন এমন ভার হয় মনের? ভয় করে, অথচ ভাল লাগে। একেবারে শিশু নয় অমিয়। নারী পুরুষের সম্পর্ক, তাদের আকর্ষণের কথা তার অজানা নয়। পূর্বরাগের ব্যাপারেও তার পরোক্ষ জ্ঞান আছে। অতীত পুরুষের নামান্তরে।

নিভাকে তার ভাল লাগে। ভাল লাগছে।

সহপাঠিনীরা কেমন অনাবৃত, অতিমাত্রায় সাহসিনী। প্রেমাস্পদের হাতে ধরে ঘোরাঘুরি করে। নিজেদের ভাল লাগাকে প্রকাশ করে উন্মুক্ত ভাবে। লাইব্রেরিতে, রেঁস্তরাঁয়, পার্কে তারা এসব বিষয়ে বড় বেশী সোচ্চার।

কিন্তু নিভার মুখ্চা, সংযতস্বভাবের মতন উজ্জ্বল আলোকে আচ্ছন্ন হবার প্রয়াস অমিয়র ভাল লাগে। অবারিত নয়, উদ্দাম নয়, অস্ফুট কলির মতন এখনও সুবাসসুরভি হয় নি, কিছু রহস্যময়তা রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। তার ভীরুতাই বুঝি তার সৌন্দর্য।

একদিনেই অমিয়র যেন ক্লান্তি এসে গেল। সুধীর না থাকাতে বেশ একটু অসুবিধা। অবশ্য সুধীরের মা প্রহরে প্রহরে খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু তবু সুধীরের সঙ্গে যেমন বাইরে বের হওয়া যায়। হাঁটা যায় গ্রামের পথ ধরে, কোন বিষয় নিয়ে তর্কের অবতারণা, আর কারো সঙ্গে তো এসব চলে না।

বিকালে রোদের তাপ কমতে অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে পার্বতী নদীর ধারে এসে বসল। পাশ বাঁধানো চাতালের ওপর নয়, এদিকে সবুজ ঘাসের ওপর।

একটা সজনে গাছের ডাল অজস্র ফুল নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলের ওপর। তার ঠিক নীচে অমিয় বসে পড়ল।

দু-একটা ডেলে ডিঙি চলেছে নদীর বাকখান দিয়ে। মাঝিরা গান গাইছে। গানের কথা এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না, শুধু একটা সুরের মায়া তরঙ্গ জলের ওপর দিয়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

বাবা, আপনি এখানে? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

অমিয় পিছন ফিরে দেখল নিভা এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ী। পায়ে আলতা। সুন্দর করে কবরী রচনা করেছে। কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

অমিয় উত্তর দিল না। মৃদু হাসল।

আপনি জলখাবার খান নি। মা ডাকছেন আপনাকে।

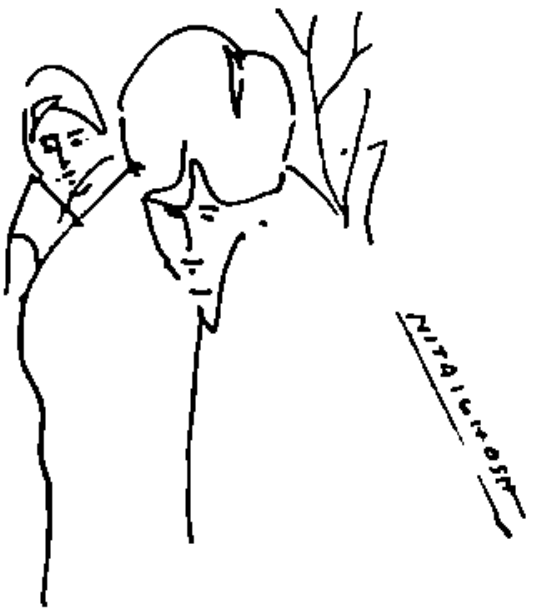

আজ আর জলখাবার খেতে ইচ্ছা করছে না। বস না এখানে।

দাঁড়ান আসছি।

নিভা দ্রুত পায়ে রোদের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিনিট দশেক, তার বেশী নয়। তার মধ্যেই নিভা ফিরে এল।

হাতে থালার ওপর সযত্নের গ্লাসে আর একটা রেকাবীতে জল আর মিষ্টি।

একি, ছি, ছি, তুমি কষ্ট করে এখানে এসব আনতে গেলে কেন?

অমিয় বিব্রত কণ্ঠে বলল।

তাতে কি হয়েছে? আমরা তো রোজ এখানে বসে বসে বিকালের খাবার খাই। বাবা, মা, দাদা আর আমি।

অমিয় আর কিছু বলল না। রেকাবীটা টেনে নিল।

থালাখানা একটু বাঁকাভাবে রেখে নিভা বলল মৃদু।

তোমারটা?

আমি খেয়েছি।

উঁহুঁ, তা হবে না। তোমাকেও খেতে হবে।

অমিয় জলের একটা টুকরো তুলে নিয়ে কাছে ধরল।

সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি খেয়েছি।

বিশ্বাস করছি। তা হলেও এত আমি খেতে পারব না। তুমি সাহায্য কর।

নিভা আর আপত্তি করল না। ফলের টুকরোটা হাতে নিল।

খেতে খেতেই অমিয় স্মরণ করিয়ে দিল।

কি কথা ছিল মনে আছে?

কি কথা?

বলেছিলে, বিকালে গান শোনাবে।

নিভা পিছন দিকে দেখল। কেউ নেই। এদিকে কারো আসবার কথাও নয়। তবু নিভা বলল, কে শুনতে পাবে। আমার ভারী লজ্জা করে।

লজ্জা আবার কি? পাখীরা সকাল-সন্ধ্যা গান শোনায়, তারা কি লজ্জা করে? বেশ, তুমি আস্তে আস্তেই গাও।

মাথাটা নীচু করে নিভা হাত দিয়ে কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ল তারপর খুব চাপা গলায় গাইতে আরম্ভ করল। তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিটি কলি বার দুয়েক নিভা গাইল। সহসে এ গান কেমন লাগত অমিয় বলতে পারবে না। অজস্র ঢেউয়ের কণ্ঠাকত গলতে গলতে। উজ্জ্বল সঙ্গীতের পরিবেশে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবেশে, নদী, আকাশ, বনানীর আবেষ্টনীতে সহজ সরল অন্তরের এই দুর্লভ প্রকাশ অমিয়র কানে অদ্ভুত সুন্দর ঠেকল।

সে ঘাটুর ওপর মুখটা রেখে চুপ করে শুনল। নদীর জলে জলতরঙ্গের আভাস। বাতাসেও হালকা বাঁশীর রেশ।

গান থামতে অমিয় বলল।

কি চমৎকার তোমার গলা। তুমি কারো কাছে গান শেখ বুঝি?

না, নিভা মাথা নাড়ল, মার কাছে আসে শিখতাম। এখন নিজে নিজেই গাই।

সত্যি ভারি মিষ্টি লাগল।

আপনার ভাল লেগেছে?

অমিয় একটা দুঃসাহসের কাজ করল। নিভার দিকে একটু হেলে বলল, আচ্ছা তুমি আমাকে আপনি বল কেন? সুবীরকে যেমন তুমি বল, সেইরকম তুমি বলতে পার না?

পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের মেঘ নদীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পরপারের গাছপালার ওপর রঙের পাণ্ডুবর্ণ।

সেই রঙের আঁচড়ে নিভার মুখে চোখে।

বাবা আর মা যা বলেছে তা যদি হয় তো আমিও তুমি বলব।

অমিয় বিস্মিত হল। সুবীরের মা বাবা আবার কি বলল তার সম্বন্ধে।

কি বলেছেন তোমার বাবা আর মা?

দু' হাতের তালুতে নিভা মুখ ঢাকল।

যান আমি বলতে পারব না। আমার লজ্জা করে।

লক্ষ্মীটি বল। প্লিজ।

নিভা মুখ তুলল না।

অমিয় একবার এদিক ওদিক দেখল। না, ধারে কাছে কেউ নেই।

সে একটা হাত দিয়ে নিভার বাহুমূল স্পর্শ করল।

এই বল। বলবে না?

নিভা এঁকেবেঁকে অমিয়র কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

অমিয় নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

আজ দুপুরেও নিভা এভাবে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। এবারেও তাই।

কি বলেছেন সুবীরের মা আর বাবা। যা বলেছেন তার সঙ্গে নিভার কি সম্পর্ক।

অমিয় উঠে দাঁড়াল। পায়ের কাছে ঘাস আর রেকাবীটা পড়ে রয়েছে। নিভা চলে গেল। এগুলো কি এভাবেই পড়ে থাকবে এখানে?

অমিয় বাড়ীর দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

বিরাট একটা মল্লিকার ঝাড়। বাঁশের বাঁচা আশ্রয় করে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তার এদিকে লতাগুচ্ছের

একপাশে নিভা দাঁড়িয়ে। নিভার ধারণা, তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আত্মগোপন করতে পেরেছে মল্লিকা বল্লরীর অন্তরালে।

পা টিপে টিপে অমিয় কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পিছন থেকে দুটো হাত দিয়ে নিভার দুটো কাঁধ আঁকড়ে ধরে বলল।

এইবার।

নিভা পালাবার চেষ্টা করল। পারল না।

অস্ফুটকণ্ঠে বলল, এই ছেড়ে দিন, কে দেখতে পাবে।

আগে বল কথাটা। তোমার মা আর বাবা, কি বলেছেন?

আগে ছাড়ুন, তারপর বলব।

অমিয় ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। কিন্তু পালাবার পথ আগলে।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে বারবার নিভা মুখটা মুছে নিল। বলার চেষ্টা করেও যেন বলতে পারছে না। সেইকালে অনেক কষ্টে থেমে থেমে উচ্চারণ করল কথাগুলো।

মা বলছিল বাবাকে দু' জনে বেশ কিন্তু মানায়।

অমিয় জেনেও না জানার ভান করল।

কার সঙ্গে কার মানায়?

নিভা আচমকা ধাক্কা দিয়ে অমিয়কে সরিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অমিয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিভার সঙ্গে তার খুব মানায়, এই কথাটাই সুধীরের মা আর বাবা বলেছেন। তার মানে, তাঁদের মনের গোপন আশা বুঝি এই যে নিভা অমিয়র অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী হবে, সুখ দুঃখে চিরসাথী।

বধূরূপে নিভাকে কল্পনা করার চেষ্টা করল অমিয়। মাথায় ঘোমটা, সীমন্তে সিন্দুর, পরণে বেনারসী, পায়ে নূপুর পরে না। এমন কি নিভার যতন আলতার রেখাও পায়ে আঁকে না।

কিন্তু তবু অমিয়র মনে হ'ল নূপুর পড়লে নিভাকে ভালর মানাবে। এ ঘর থেকে আর এ ঘরে যাবার সময় পথ হবে রুন রুন রুন। নিভার অবস্থিতি বুঝতে খুব সুবিধা হবে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামতে অমিয় সরে এল।

ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়িতে পা রেখে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্পন্দন যে দ্রুততর হচ্ছে, সেটা অনুভব করতে পারল।

চাতালের ওপর সুধীরের মা দাঁড়িয়ে।

অমিয়কে দেখে বললেন, বন্ধুর জন্য মন খুব খারাপ তাই না অমি। সুধীও যাবার সময় অনেকবার বলেছে, অমি কি করে একলা থাকবে।

অমিয় কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এল।

কথা বলবার অমিয়র উপায় নেই। সারা শরীর কাঁপছে। অব্যক্ত একটা বেদনার মোচড় দিয়ে উঠছে শরীরের গ্রন্থি।

এ সুখাবেশ তুলনারহিত। ভাল পরীক্ষা দিয়ে এলে, কিংবা সাফল্যের সংবাদ পেলে ঠিক এ ধরণের আনন্দ হয় না। এ আনন্দের জাত আলাদা।

অমিয় কাছে দাঁড়াতেই সুধীরের মা হেসে উঠলেন।

একি, কোথায় গিয়েছিলে?

অমিয় লজ্জিত হ'ল। মল্লিকাকুঞ্জের মধ্যে নিভাকে অন্বেষণ করতে যাওয়াটা কি সুধীরের মার চোখে পড়েছে? বারান্দা থেকে তিনি দেখেছেন কিছু?

কেন, বলুন তো? খুব নিস্তেজ গলায় অমিয় উচ্চারণ করল।

সুধীরের মা অমিয়র খুব কাছে সরে এলেন, তারপর তার মাথায় হাত দিতে একরাশ মল্লিকা ফুল ঝরে পড়ল।

সেই দিকে চেয়ে অমিয় বলল।

ওই যে মল্লিকা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। বাতাসে ফুলগুলো মাথার ওপর ঝরে পড়েছে।

সুধীরের মা হাসতে হাসতেই বললেন।

সে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কি বলছি ফুল তুমি চুলে গুঁজেছ?

অমিয় আর কিছু না বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। নিজের ঘর মানে যে ঘরে সে আর সুধীর শোয়।

কিছুটা গিয়েই কথাটা মনে পড়ে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল।

ব্লাস বেকারী সব কিছু নদীর ধারে পড়ে আছে।

নদীর ধারে ?

হ্যাঁ, নিভা আমার জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিল।

ও:, ঠিক আছে। তুলসীকে বলছি নিয়ে আসতে।

অমিয় আর দাঁড়াল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ারে বসল। একটু পরেই উঠে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে আবার এসে বসল চেয়ারে।

পরের দিন নিজের নোট বইটা খুলে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল। সংহত করার প্রয়াস করে নিজেকে।

এই ধরণের এলোমেলো চিন্তা খুবই ক্ষতিকর। ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়ন শুরুর সামিল এ ভুলনা সে কালে যেমন সত্য ছিল, একালেও তেমনই! বং নিয়ে আলনা ঝাঁকার বয়স এটা নয়। নিভার মা বাবা কি বলেছেন, সেটাই গলমালা করা মূর্খামির পরিচায়ক। অমিয়র সামনে শুধু একটি স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়ে থাক, সে স্বপ্ন তার জীবনকে ঘিরে। সফল কৃতী জীবন।

সে জীবনের আশে পাশে নিভার মতন মেয়েদের ছায়া পড়াও অন্যায়।

একটু পরেই অমিয়র খেয়াল হ'ল নোটবই খুলে এতক্ষণ সে অর্থহীন কথাই চিন্তা করছিল। বইয়ের একটি অক্ষরও তার মাথায় ঢোকে নি।

টান হয়ে বসতে গিয়েই পিছনে পদশব্দ কানে এল। খুব আস্তে বারান্দা থেকে কে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কে আসছে বুঝতে অমিয়র একটুও অসুবিধা হ'ল না। কে জানে, তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুন্দর, আমার সাধের সাধনা এ গানটা নিভা অমিয়কে লক্ষ্য করেই গেয়েছে কিনা।

সন্ধ্যার মেঘ মানে বিচিত্র রংয়ে রঞ্জিত মেঘের স্তূপ, কিন্তু সে রং, সে মেঘ যে ক্ষণস্থায়ী এ কথা কে বলে দেবে নিভাকে।

পায়ের শব্দ আরো কাছে। নোটবইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে অমিয় পড়ার ভান করল।

চেয়ার টানার শব্দ। নিভা বুঝি পাশের চেয়ারটা টেনে বসল।

একটু একটু করে মেয়েটার সাহস বাড়ছে। প্রথমে সামনেই আসত না, তারপর বেশ্যা থেকে কণ্ঠস্বর শোনাল, এখন তো অনেক এগিয়েছে। অন্তরঙ্গ কথা বলারও চেষ্টা করছে।

তোমার পড়ার ক্ষতি করলাম বোধ হয় ?

কণ্ঠস্বরে অমিয় চমকে মুখ ফেরাল।

না, নিভা নয়, নিভার মা।

বসেছেন।

হাত দিয়ে নোটবইটা সরিয়ে দিয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি বলল।

না, না, আমি পড়ছিলাম না। একলা একলা ভাল লাগছিল না, তাই বই নিয়ে বসেছিলাম।

সুধীরের মা হাসলেন।

আমার আজ ছুটি। নিভা আজ আমাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কথাটা মিথ্যা জেনেও অমিয় বিস্মিত হবার ভান করে বলল।

কেন ?

ও বুঝি কি নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছে। আমি থাকলে ওর লজ্জা করবে। তাই ভাবলাম তোমার কাছে একটু বসি।

ভালই করেছেন।

অমিয় নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে সুধীরের মার মুখোমুখি হবার চেষ্টা করল।

তোমার বাবার তো বিরাট কারখানা ?

বিরাট নয়, মাঝারি এক ওষুধপাতির কারখানা আছে বেলুড়ে।

তোমার বাবাই সব দেখাশোনা করেন।

না, আরো লোক আছে। টেকনিকাল কাজ জানা অনেক লোক। ইঞ্জিনীয়ার, কেমিস্ট, মিস্ত্রিরা।

তুমি বড় হয়ে সেই কারখানাই দেখবে ?

বাবার তাই ইচ্ছা। আমি কারখানার নতুন কোন

বিভাগে গড়ে তুলি। নানা রকমের ধাতুর সংমিশ্রণে নতুন ধাতুর সৃষ্টি সম্ভব। নতুন ধাতু খুব জোরালোও যেমন হতে পারে তেমনি বিশেষ কাজের উপযোগী। বাবা চান, আমি রিসার্চ করে তেমন কোন নতুন ধাতু আবিষ্কার করি যা লোহা বা ইস্পাতের চেয়েও মজবুত।

অমিয় যখন কথাগুলো বলছিল, তখন সুধীরের মা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিলেন। স্বভাবলাজুক ছেলেটি এই সময়ে যেন চেহারা পালটে ফেলে। জ্বলে জ্বলে ওঠে দুটি চোখ, আবেগে দুটো ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপে।

মনে হয় এ কথাগুলোর পিছনে বিশ্বাসের শক্ত মাটি রয়েছে, সেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে অমিয় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছে সব কিছু।

বাবার সঙ্গে বহুবার এ নিয়ে অমিয়র আলোচনা হয়েছে। তার বাবা ঠিক কি চান সেটা যেন অমিয়র এখনও বোঝা নয়। শুধু বছরের পর বছর পাশ করা নয়। প্রাইজের বই বা পদক কুক্ষিগত করে পরীক্ষার বেড়া টপকানোই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

নতুন কিছু করতে হবে, প্রচারে আলোকপাতে নতুন সূত্র কিংবা পুরাতনের নবরূপায়ণ।

ওঁরও ইচ্ছা সুধী চাষবাসের কাজে ওঁকে সাহায্য করুক।

হ্যাঁ, সুধীর আমাকে বলেছে সে কথা। খুব ভাল তো। মাটিই তো সোনা।

কি জানি, এমনই তো লোকটা উদ্ভ্রান্ত পরিশ্রম করছেন। একটু বিশ্রামেরও সময় পান না, তারপর ছেলেটাও ওই এক ধাত হবে।

পরিশ্রমই তো আনন্দের উৎস। জানেন মাসিমা, ল্যাবরেটরিতে যখন পরীক্ষা করে সফল হই, মানে আমাদের পরীক্ষা সামান্য ব্যাপার, গবেষণা তো নয়, তাতেই কত আনন্দ বোধ হয়। আর নিজের কাজে আনন্দ তো বেশী হবেই।

ও আনন্দ জানিনা অমিয়, আমার শুধু এই ভেবেই আনন্দ, ছেলে দূরে যাবে না চাকরি করতে। এইখানেই আমার কাছে থাকবে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। সুধীরের মা নয়, অমিয়ও না। দুজনে চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল। সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তায় অভিভূত হয়ে।

তারপর সুধীরের মা বললেন। খুব মৃদুকণ্ঠে। প্রায় অস্পষ্ট সুরে।

মেয়েকে তো চিরদিন কাছে রাখতে পারব না। সে চলে যাবেই। মনের মতন পাত্রের হাতে পড়ে এইটুকুই কামনা করব।

অমিয় সাহস সঞ্চয় করল। একটানা অনেক কথা বলে নিজের ওপর ভরসা ফিরে এসেছে।

নিতা তো ছোট। এখনই ওর বিয়ের কথা ভাবছেন কেন?

ছোট আর কোথায়। পনেরো পার হয়েছে। তোমার মেসোমশাইয়ের একটু তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা, অবশ্য যদি সৎপাত্র পাওয়া যায়।

অমিয় কিছু বলল না। এরপর তার কিছু বলাও শোভা পায় না।

বস অমিয়, আমি একবার রান্নাঘরের দিকে যাই। দেখি মেয়েটা কি কাণ্ড করছে।

সুধীরের মা উঠে গেলেন।

অমিয়ও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কোথা থেকে একটা ঘুঘু করুণ উদাস কণ্ঠ বাতাসে ভেসে আসছে। একটানা।

অমিয়র আবার নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল। মা আর বাবার কথা। বাবা নিজের কারখানায় ব্যস্ত। মা চুপচাপ বসে আছেন কৌচে কিংবা সোফায়। অমিয় এখানে আসুক, এতদূরে এটা তার মার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, অমিয়র বাবাই বারণ করবেন। অমিয়র যাওয়া হবে না। কিন্তু অমিয়র বাবা যে এক কথায় এভাবে রাজী হয়ে যাবেন, তা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

বলা যায় না, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে হয়তো কথা কাটাকাটি হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন দেশভ্রমণের

উপকারীতার কথা, আর না বিশেষ বিকুঁয়ের হাজার অনুরোধ কিরিস্তি দিয়েছেন।

কি আর স্নান বন্ধ নাকি?

নিভার কণ্ঠ শুনে অমিয় ঘুরে দাঁড়াল।

আঁচলটা কোমরে জড়ানো। কপালে ঘামের মুক্তা চুল এলোমেলো। কোন প্রসাধন করে নি নিভা, কিন্তু তবু তাকে অপরূপ মনে হ'ল।

অমিয় হাসি চেপে বলল।

আজ স্নান করব কিনা ভাবছি।

ওমা কেন?

স্নান সেরে এলেই তো আবার খেতে বসতে হবে।

বসবেন। না খেয়ে থাকবেন নাকি?

সেই ভয়ই তো করছে। আজকের রান্না নাকি মারাত্মক হয়েছে। মুখে দিলেই অজ্ঞান।

প্রথমে নিভা বুঝতে পারে নি। অমিয় যে এ ধরণের কথা বলবে, বলতে পারে, তা সে আশাই করে নি। কথাগুলো ভাল করে শুনে নিভা হেসে গেল।

দুই বন্ধু ঠিক একরকম। মানুষের পিছনে লাগতে পারলে আর কিছু চান না। কেন, আমি বুঝি রাঁধতে জানি না?

সংক্ষুব্ধ করে বলব।

নিভা অবাক চোখে চেয়ে রইল।

অমিয় বলল, ফলেন পরিচীয়তে।

বেশ, আপনি স্নান করে আসুন তো।

অমিয় ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্যদিন এর চেয়ে দেরীতে খেতে বসে, কিন্তু সুধীরের বাবা নেই, সুধীর নেই, কাজেই খাওয়া দাওয়ার পাট বোধহয় তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চায়।

অমিয় ভেবেছিল, সে আর নিভা দুজনে পাশাপাশি খেতে বসবে, কিন্তু এসে দেখল মোটে একটি আসন পাতা হয়েছে। আসনের কাছে নিভা দাঁড়িয়ে।

তুমি বসবে না?

আপনি বসুন। আমি মার সঙ্গে বসব।

অমিয় আর কিছু বলল না। আসনের ওপর বসে পড়ল।

সুধীরের মা এলেন থালা নিয়ে। থালার ওপর তরকারির বাটি বসানো। নিভা আসনের কাছে বসল হাতে পাখা নিয়ে।

অমিয় হাত নেড়ে বারণ করল।

না, না, পাখার দরকার হবে না। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

হাওয়া অবশ্য ছিল, কিন্তু অল্প।

অমিয় বারণ করতে নিভা পাখাটা রেখে দিল।

অমিয় নিভার মার দিকে চেয়ে বলল।

নিভা কোন তরকারিটা রেঁধেছে মাসিমা?

নিভা ছুটে মার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত দিয়ে তাঁর একটা হাত জাপটে ধরে বলল, বলবে না মা, খবরদার বলবে না।

না, না বলব না। মা হাসতে লাগলেন।

অমিয় বলল, ঠিক আছে, আপনি কিছু বলবেন না। আমি মুখে দিয়েই বুঝতে পারব।

ডালমাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলেই অমিয় একবার মা আর মেয়ের দিকে দেখল। দুজনেরই মুখ নয় যেন মুখোশ। কোন অনুভূতির আঁচড়ও নেই।

তারপর বেশুন ভাজা, সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি। কিছুই বোঝা গেল না। মা রেঁধেছেন, না মেয়ে।

তারপরের ব্যঞ্জনটি অমিয়র অতি প্রিয়। এঁচোড়ের তরকারি। এতে লবণ না দেওয়া থাকলেও তার ভাল লাগবে। শেষ পাতে দুধ আর সন্দেশ।

খাওয়া প্রায় শেষ হতে অমিয় বলল।

কোনটা তোমার রান্না ঠিক করে বল তো?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিভা বলল।

দুধটা। ওটা আমি জ্বাল দিয়েছি।

মেয়ের কথায় মাও হেসে উঠলেন।

অমিয় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে মা বললেন, এঁচোড়ের তরকারিটা তোমার কেমন লাগল সত্যি করে বল।

অমিয় নিভার দিকে চোখ ফেরাল। নিভা অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে।

অমিয় বলল, না, নিভা কিছু মন্দ রাঁধে না।

দুপুরে নিভা অমিয়র ঘরে ঢুকল।

অমিয় জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল, পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

আপনি ঘুমাবেন নাকি?

না, অমিয় ঘাড় নেড়ে চেয়ারের ওপর বসল।

নিভাও বসল উল্টোদিকের চেয়ারে

কাল মা কি বলছিল আপনাকে?

তুমি আড়ি পেতে শুনেছিলে বুঝি।

মোটেই না। আমি এমনিতেই, দেখলাম মা বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছে।

অমিয় এদিক ওদিক দেখল, নিভার মা আসছে কিনা, তারপর বলল, আমার মা বাপের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি যত ছোট ছিলাম, এই সব।

আপনাদের মত বাড়ী, তাই না।

তোমাদের মতন এত বড় নয়। এই বাড়ি তুমি তো নয়ই।

তবু সেতো শহরের বাড়ী।

তোমার বুঝি শহর খুব ভাল লাগে?

আমার শহরের কথা মনে নেই,- খুব ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। খুব ভীড় আর ভীষণ পথ, এইটুকুই শুধু মনে আছে।

বেশ তো চল আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়ী।

ধ্যাৎ অসভ্য।

নিভা আঁচলের অনেকখানি মুখে পুরে দিল। লজ্জায় সারা মুখে সিঁদুরের আভা।

কথাটা বুঝতে অমিয়র বেশ সময় লাগল। এমন কি বলেছে অমিয় যে নিভা এত সঙ্কুচিত হল। আস্তে আস্তে করে অন্ধকার কেটে যাওয়ার মতন কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ অমিয়র সামনে ফুটে উঠল। এক রাতের মা বাপের কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিভা বুঝি সব কিছুর বিচার করছে। অমিয়র সঙ্গে শহরে যাওয়ার সেই অর্থই নিভা বুঝেছে।

কেন, অমিয় নিজেকে সামলে নিল, তুমি আমি আর সুধীর তিনজনে যেতে পারি শহরে। সুধীরের হোস্টেলে তো মেয়েদের থাকতে দেয় না, কাজেই তোমাকে আমাদের বড়ীতে থাকতে হবে।

নিভা কি বুঝল কে জানে। তার মুখের রং স্বাভাবিক হ'ল। চাপা গলায় বলল, মা আমাকে যেতে দেবে না। যার সঙ্গে ছাড়া আমি কোথাও যাই না।

অমিয় চেয়ারে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে নিভাকে দেখল। সত্যি যদি নিভা যেত তার সঙ্গে। যার সামনে দাঁড়িয়ে বলত, কে এসেছে দেখ মা। সুধীরের বোন। মা নিভার চিবুক ধরে আদর করে বলতেন, বা, কি সুন্দর দেখতে যে হয়েছে। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। আর কি বলতেন মা! আর কি ভাবতেন! যে কথা সুধীরের মা আর বাবা বলাবলি করেছেন, সেই কথা তার মা বাবাও ভাবতে পারেন। বলতে পারেন।

কি ভাবছেন?

নিভার প্রশ্নে অমিয় সচেতন হ'ল।

বলল, ভাবছি, পরশু দিয়ে এই গাছপালা, পাখীর নদী, পাখীর ডাক, প্রকৃতির সকরুণ সব মনে পড়বে। তোমার মা বাবা, তোমার কথা। ইঁট কাঠের বন্দীশালায় বসে এসব ভাবতে খুব ভাল লাগবে। এত রং আমরা শহরে দেখতে পাই না।

নিভা হাসল। মৃদু লাজুক হাসি।

পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেলে আপনি সব রংয়ের কথাই ভুলে যাবেন।

বেশ দেখো। আমি তোমাকে, মানে তোমার মাকে চিঠি লিখব। কিন্তু তুমি তো আমার কথা রাখলে না।

কি কথা? নিভা একটু যেন বিস্মিত হ'ল।

আমাকে আপনি বলতে বারণ করেছিলাম যে? সুধীরকে যেমন তুমি বল, তেমনই আমাকেও তুমি বলবে।

এর পরের বার যখন আসবেন, তখন বলব। ঠিক বলব, দেখবেন।

অমিয় কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

নীচে থেকে সুধীরের মার গলা।

নিভা।

যাই মা।

নিভা উঠে গেল।

চিন্তার আঁচড় পড়ল অমিয়র কপালে। এভাবে তার সঙ্গে নিভা একলা নিরালায় বসে কথা বলছিল বলেই বুঝি তার মা তাকে ডাকলেন। ছি, ছি, অমিয় নিভাকে ডাকে নি, আসতে বলে নি, তবু সে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল।

একটু পরেই নিভা আবার ঘরে ঢুকল। হাতে একটা খাম।

আপনার চিঠি।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে অমিয় খামটা নিল। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে পড়তে শুরু করল। মা লিখেছেন। অমিয়র চিঠির উত্তর।

পড়তে পড়তেই অমিয়র ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শেষের ক' লাইনের ওপর সে আবার চোখ বোলাল।

দাদু এসেছেন। অমিয়র দাদু অর্থাৎ অমিয়র বাবার

মামা। লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপনা করেন। অমিয় তাঁর নাম শুনেছে কিন্তু কোনদিন চোখে দেখে নি। অবসর গ্রহণ করে দাদু লক্ষ্ণৌতেই ছিলেন। তিনি অমিয়কে দেখতে চান। খুব বেশীদিন থাকতে পারবেন না। কতকগুলো বই ছাপার ব্যাপারে কলকাতায় এসেছেন। অমিয় যেন পত্র পেয়েই রওনা হবার ব্যবস্থা করে, নয়তো দাদুর সঙ্গে দেখাই হবে না। তাঁর বয়স হয়েছে। আবার দেখা হবে কিনা স্থিরতা নেই।

অমিয় মুখ তুলল। দেখল নিভা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

অমিয় বলল, মার চিঠি। আমাকে চলে যেতে লিখেছে।

কারো অসুখ বিসুখ নয়তো?

না, অমিয় মাথা নাড়ল, অসুখ নয়। আমার দাদু এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে। বেশীদিন থাকবেন না। আমাকে দেখতে চান।

শাড়ীর আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে নিভা বলল, আপনি তবে যাবেন?

বেশি সুধীর আসুক। তোমার বাবা আসুন, তাদের বলে যেতে।

নিভা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। অমিয়র কোন দিকে দৃষ্টি নেই। একমনে মার চিঠি পড়ছে।

এক সময়ে নিভা উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। অমিয় লক্ষ্য করল না।

অনেকবার চিঠিটা পড়ে খামের মধ্যে বন্ধ করতে যাবার সময় অমিয়র খেয়াল হ'ল, সামনের চেয়ার খালি। নিভা কখন উঠে গেছে।

চিঠিটা হাতে নিয়েই অমিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঘর মধ্যাহ্নের তাপে প্রায় পালাও যেন ঘুমঘুম। পাখীর কাকলী শোনা যাচ্ছে না। পার্বতী নদীর ওপর যেন ছপার পাত কেউ ফেলে রেখেছে।

এই মুহূর্তে নিজেকে অমিয়র ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হ'ল। গৃহের জন্ম, আত্মীয়বর্গের জন্ম প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

পরের দিন সকালে হৈ চৈ চীৎকারে অমিয়র ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে বারান্দায় দিয়ে দেখল, ঘাটে নৌকা লাগানো। সুধীর, তার বাবা, মা চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে। একটু দূরে নিভা।

এত তাড়াতাড়ি যে সুধীর ফিরে এল? চাকর-বাকরেরা সবাই মুটি বোঝাই মালপত্র নামাচ্ছে নৌকা থেকে। তাদের চীৎকারই অমিয়র কানে গিয়েছিল।

অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নামতেই রাজপথে সুধীরের সঙ্গে দেখা হ'ল। সেও ছুটে ওপরে উঠছিল।

অমিয়র কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে সুধীর জিজ্ঞাসা করল।

এই তুমি নাকি কলকাতায় ফিরে যাবে এর মধ্যে?

হ্যাঁ, কিন্তু নামতে না নামতেই কে দিলে খবরটা?

নিভা বলল। তোমার দাদু এসেছেন কোথা থেকে।

লক্ষ্ণৌ থেকে। দাদু মানে মায়ের মামা। আমি কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

তোমার যাওয়া খুব দরকার?

যাওয়াটা উচিত তাই সুধী। মা লিখেছে, দাদুর বেশ বয়স হয়েছে, আর দেখা হবে কিনা বলা মুস্কিল।

সুধীর কিছু বলল না, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'ল সংবাদটা শুনে সে খুব মুষড়ে পড়েছে।

দুজনে বারান্দায় দাঁড়াল। বেলিংয়ে ভর দিয়ে।

এইবার অমিয় প্রশ্ন করল।

তুমি যে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?

এবারেও বহু কষ্টে আলাদা হওয়াটা আটকানো গেল। লিলিয়ার অসুখ হয়েছিল, সব ছেলে ঘিরে বসেছিল তাঁকে। সেই সময় বাবা অনেক বুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করেছে।

নৌকাটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ঘাট থেকে। দাঁড়ের ঘায়ে ছলাৎ ছল শব্দ হচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে অমিয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ক'দিনই বা তুমি রইলে? শিবমন্দির দেখা হ'ল না। কতকিছু দেখা বাকী রইল।

আমি আবার আসব।

এর বেশী অমিয় আর কিছু বলতে পারল না। এ কটা কথা বলতে গিয়েই মনে হ'ল কে যেন সবলে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে আসতে দৌড়।

সুধীরের বাবা উঠে এলেন। পিছন পিছন মা।

কি ওনছি অমিয়বাবু, তুমি এসেই পালাই পালাই করছ।

অমিয় মাথা নুয়ে কথা আবার বলল।

মুস্কিল। তোমাকে থাকতে বলিই বা কি করে? তুমি কবে যাবে মাকে লিখেছ?

না, কাল চিঠি পেয়েছি। আজ জানিয়ে দেব। আমার ইচ্ছা কালই চলে যাই।

সুধীরের বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন।

তোমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিলে নিশ্চয় যেতে পারবে?

কিছু না ভেবেই অমিয় বলল, হ্যাঁ, খুব পারব।

অবশ্য ভাববার আছেই বা কি। মাঝখানে তো বলা করার কোন প্রশ্ন নেই। পাঞ্জাবপোতায় উঠে একেবারে শেয়ালদায় নামা।

সুধীরের বাবা চলতে চলতে বললেন।

কদিনের জন্য এসে আমাদের মনটা খারাপ করে দিয়ে গেলে। ক'মনের ছুটিতে আসবার চেষ্টা ক'র।

অমিয় ঘাড় নাড়ল।

সারাটা দিন সুধীর সঙ্গে সঙ্গে রইল। নিভাকে কিন্তু ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

একবার মুখ ফুটে অমিয় বলেই ফেলল।

নিভাকে দেখছি না?

সুধীর একবার এদিক ওদিক দেখল। পরে বলল, আছে কোথাও।

সুধীর অমিয়র সঙ্গে কথায় এত ব্যস্ত যে নিভার ব্যাপারে সে বেশী আমলই দিল না। কলকাতায় কতকগুলো বই তার কেনা দরকার, কিছু পড়ার বই, কিছু স্পোর্টস-এর। সেই সম্বন্ধেই সে অমিয়কে বোলছিল। কোন দোকানে পাওয়া যেতে পারে কিংবা হস্টেলের কোন ছেলের কাছে।

রাত্রির খেলা এক এলাহি কাণ্ড।

খেতে বসে অমিয় অবাক হয়ে গেল। থালার চারপাশে কেবল বাটির সার। মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই।

একি করেছেন? অমিয় হাত গুটিয়ে নিল।

পাশেই সুধীর বসেছিল। উল্টোদিকে সুধীরের বাবা।

বাবার কান বাঁচিয়ে সুধীর বলল, তোমার বিদায় ভোজ।

অমিয় অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, লাই সাপার বলে মনে হচ্ছে।

অনেকক্ষণ ঘরে সবাই বসে বসে খেল, কিন্তু নিভাকে একবারের জন্যও দেখা গেল না। সে যেন উবে গেছে। সুধীরের মা বাপের সামনে অমিয় লজ্জায় নিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারল না।

এক বিছানার শুয়ে দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল। সুধীর আর অমিয়। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুজনের গায়ের ওপর। প্রতি দশ মিনিট অন্তর সুধীর মনে করিয়ে দিল যে অমিয়কে খুব ভোরে যাত্রা করতে হবে, তাই তার তাড়াতাড়ি ঘুমানো দরকার। কিন্তু সুধীরই সব ভুলে অনর্গল কথা বলে গেল।

এক সময়ে অমিয়র উত্তর না পেয়ে সুধীর উঠে বসল অমিয়র দুটি চোখ নিমীলিত, সে ঘুমে অচেতন।

সুধীরও ঘুমাবার চেষ্টা করল।

খুব ভোরে উঠে অমিয় স্নান সেরে নিল। আশ্চর্য, ভেবেছিল এই পল্লী প্রকৃতি ছেড়ে যেতে তার খুব কষ্ট হবে, এ কদিনের স্মৃতি তাকে পীড়িত করবে, কিন্তু শহরে ফিরে যাবার, নিজের মা বাপের সান্নিধ্যে পৌঁছাবার ব্যাকুলতায় সে সব কিছু ভুলল। বার বার ভাবতে লাগল, এই ভ্রান্তিকর গল্পর গাড়ীর যাত্রাটুকু যদি না থাকত। একেবারেই সে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত। একবার ট্রেনে উঠলে, জানলার ধারে বসতে পারলে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে শেয়ালদা পৌঁছতে মোটেই দেরী হবে না।

সুধীর বারান্দায় ছিল। সে বলল, তুমি একেবারে পোশাক পরে ফেল অমি। গাড়ী এসে গেছে। আমি আর বাবা তোমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাব। ট্রেনে তুলে দেব তোমাকে।

অমি আর বাবা? কেন নিতাই যেতে পারত। গরুর গাড়ীতে এক সঙ্গে রেলস্টেশন পর্যন্ত। পথে দু একটা কথা হ'ত। নিতাইকে অমির দেখতে লাগত। কাল থেকে তাকে ছায়াও দেখতে পায় নি।

কিন্তু এ কথা তো সুধীরকে বলা যায় না। কাউকে বলা যায় না।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অমির পোশাক পরতে আরম্ভ করল। সুটকেসটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখা।

অমি। অমি।

বাইরে থেকে সুধীরের মার গলা।

যাই মাসিমা।

প্যান্ট পরে নিয়ে অমির দরজা ঠেলে খুলে দিল।

এস, খেয়ে নেবে, এস।

অমির আশ্চর্য হল। সুধীরের মার কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন। দুটি চোখ আরক্তিম।

কদিনের পরিচয়। কিসেরই বা সম্পর্ক। বাংলার মাটি জলের মতনই কোমল বাঙালী মায়ের মন। অমির চ'লে যাবে, তাইতেই সুধীরের মার দুটি চোখে অশ্রু ঘনিয়ে এসেছে।

খাবার সময়ও অমির কোথাও নিতাইকে দেখতে পেল না।

প্রণামের পালা শেষ হ'ল। সুধীরের মা আর বাবাকে।

মা অমিয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আবার আসবে অমি। এ আসা কিন্তু বহুৎ হ'ল না। দুটি হলেই আসবে।

কোন রকমে ঘাড় নেড়ে অমির সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এল।

রাস্তার ওপর গরুর গাড়ীর কাছে সুধীর দাঁড়িয়ে। সুধীরের বাবা গাড়োয়ানের সঙ্গে কি কথা বলছেন। সুধীরের মা সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর নামেন নি।

অমির এগিয়ে গেল। বকুল গাছের তলা দিয়ে, ছোট ছোট নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে। বিশ্রী একটা শব্দ উঠছে জুতোর চাপে। এ রকম আওয়াজ না হলেই যেন ভাল হ'ত। অমিয়র ভাল লাগত। তাহলে মন নিয়ে নিঃশব্দে চলে যেতে পারত।

মল্লিকা-ঝাড়ের কাছে এসেই অমির থমকে দাঁড়াল।

এত দ্রুত যে ভাল করে কিছু দেখতেই পেল না। হলুদ একটা শাড়ীর কিছুটা, কালো চুলের বেণী, কাজলপরা আয়ত দুটি চোখ।

নিচু হয়ে প্রণাম করে অমি হয়ে গেল।

যাবার সময় একটা কথাও তো বলতে পারত। কথা না হয় একটু হাসি। এ কদিনের পরিচয়ের স্বীকৃতির নিশানা।

অমির দাঁড়িয়ে মল্লিকা-ঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল অন্য কোন দিক দিয়ে বের হবার পথ নেই। নিতাইকে এদিক দিয়েই বের হতে হবে। অমিয়র মুখোমুখি।

অমিয়, তাড়াতাড়ি কর। ফেরে অনেকটা সময় লাগবে।

সুধীরের বাবার গলা।

অমির সচেতন হ'ল। জোরে জোরে পা ফেলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

গরুর গাড়ী চলতে শুরু করতে সুধীর অমিয়র হাঁটুতে মৃদু চাপ দিয়ে বাড়ীর দিকে ফেরাল।

অমির নীচু হয়ে পিছন দিকে দেখাল। গাড়ী মোড় ঘুরছে। সুধীরদের বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

না, নিতাই নয়। বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে সুধীরের মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে। লালপাড় পরনের শাড়ী, কাজল কালো দুটি চোখ; চূর্ণ কুন্তল বাতাসে কাঁপছে।

একরাশ তালের গাঢ় এ ছবি মুছে দিল।

অমির সোজা হয়ে বসল।

আসবার সময় পথটা যেমন দীর্ঘ মনে হয়েছিল, যাবার সময়ে মোটেই কিন্তু ততটা দীর্ঘ মনে হ'ল না। সুধীরের সঙ্গে এলোমেলো কয়েকটা কথা, কিছুটা সময় অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বাইরের দৃশ্য দেখা, বাস তারপরই ষ্টেশন এসে গেল।

তারপরের ব্যাপার একেবারে মামুলি। ট্রেন এল। সুধীরের বাবা সাধ্যমতে যাবার নির্দেশ দিলেন। আবার আসবার অনুরোধ।

সুবীর শুধু জানলার পাশে অমিয়র কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রেন ছাড়ার আগে পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করে।

ট্রেন ছাড়তে সুবীর বলল, একটা চিঠি লিখ অমি। পৌঁছে চিঠি দিও।

একদল যাত্রী প্ল্যাটফর্মে স্টেশন পিছনে সরে গেল। সুবীরের বাবা আর সুবীরও। সুবীর একলা থাকলে অমিয় নিশ্চয়ই রুমাল বের করে নাড়ত, কিন্তু সুবীরের বাবার সামনে পারল না। লজ্জা হ'ল।

সুবীরের বাবা টিকেট কিনে দিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাসের। অমিয় পয়সা ফেরার কথা বলেছিল, ছেলে অমিয়র পিঠ চাপড়েছেন।

পয়সা যে তিনি নেবেন না সেটা অমিয়র জানা ছিল। আসবার সময় সুবীরের টিকেটের দাম অমিয়র বাবা দিয়েছিলেন। প্রকারান্তরে সেটাই ফেরত দেওয়া হ'ল।

বাইরের দৃশ্য আর অমিয়র ভাল লাগল না। কিছু নতুনত্ব নেই। সেই ধানক্ষেতের বিস্তার। মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা। ঢুকে ঘরে কাঠামো।

নিভার চোখে কিন্তু জল ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে হলেও সেটুকু অমিয়র নজর এড়ায় নি। অনায়াসেই নিভা একটা কথা বলতে পারত। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না তার সঙ্গে। ছুটি হলেই অমিয় সুবীরের সঙ্গে তাদের গাঁয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা কম।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়ী আসতে উঁকি দিয়ে দেখেই অমিয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার বাবা নিজে এসেছেন স্টেশনে।

অমিয় নেমেই বাপের পায়ের ধুলো নিল।

বাবা বললেন, তোমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হ'ল। বন্ধুর বাড়ী বেশীদিন থাকতে পারলে না। উপায় ছিল না। বাবা এসে গেলেন।

অমিয় বলল, ভালই করেছ। আমার খুব ভাল লাগছিল না।

ভাল লাগছিল না?

না, মানে, গ্রাম তো দুদিনেই দেখা শেষ হয়ে যায়। শহরের মতন গ্রাম বদলায় না। নিত্য নতুন তার চেহারা নয়।

বাবা আর কিছু বললেন না।

বেরিয়ে এলেন।

মোটরে বসে শহরের চৌরাস্তা পার হতে হতে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অমিয়। কি মসৃণ গতি, বসবার আয়োজন কত আরামপ্রদ। গরুর গাড়ীর মত চিমেতাল নয়, বন্ধুর পথের জন্য প্রতি আবর্তনের সঙ্গে প্রাণান্তকর ঝাঁকানি নেই। গাছপালার চেয়ে মানুষ অনেক জীবন্ত।

তোমার দাদুর সঙ্গে কিন্তু কাল দেখা হবে।

জানলা দিয়ে চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বাবা বললেন।

কাল? কেন?

আজ ভোরে তিনি তোমার কাকার বাড়ী গেছেন। কাল ফিরবেন।

অমিয়কে নামিয়ে দিয়েই বাবা কারখানায় চলে গেলেন। বেলুড়ে।

চাকর সুটকেশ নিয়ে গেল ওপরে।

অমিয় নেমেই অবাক হ'ল। মা একেবারে প্রায় পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। বেটা এ বাড়ীর বেওয়াজ নয়।

ইস্, কি রোগা হয়ে গিয়েছিস রে?

মা অমিয়কে আদর করতে করতে বললেন।

তাই বই কি। রোজ কতবার করে তোকে আর কত বেশী ভুলতে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

সারাটা দুপুর মা আর ছেলে বসে বসে কথা হ'ল। সুবীরের মা যেমন অমিয়দের বাড়ী সম্বন্ধে বাড়ীর লোকজন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, অমিয়র মার কৌতূহলও তার চেয়ে কম নয়।

সব কথা, সকলের কথা অমিয় বলল, কেবল নিভার কথা খুব সংক্ষেপে সারল। তার বয়স, রূপের কথা একেবারেই বলল না। অমিয়র মাও নিভার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। তাঁর প্রবল উৎসাহ শুধু সুবীরের মায়ের সম্বন্ধে।

বিকালে বাড়ীর কাছাকাছি পার্ক থেকে বেড়িয়ে যখন অমিয় বাড়ী ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বারান্দার দু পাশে টবে দু জাতের ক্যাকটাস গাছ। তার মাঝখানে অমিয় এসে দাঁড়াল রেলিং ধরে।

বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েই বিস্মিত হ'ল।

আশপাশের বাড়ী থেকে উজ্জ্বল আলোর রেখা এসে পড়ছে। রেডিওর গান, লোকের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের সুরেলা চীৎকার সব মিলিয়ে বিচিত্র একটা নিস্তব্ধতা। শব্দেরও রূপ আছে, মাদকতারও আবরণ। জীবনের স্পন্দন, জীবিতের চাঞ্চল্য। পার্বতী নদীর তরঙ্গভঙ্গের চেয়েও আরও দুরন্তগ্রাহী।

মুগ্ধ হয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

হাঁস হ'ল যার জন্যে।

আজ পড়তে বসি না অমি।

যাই মা!

অমিয় নিজের পড়ার ঘরে ঢুকল। ইতিমধ্যে মা-ই বোধ হয় সুটকেস থেকে তার বইগুলো বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছেন।

অমিয় পদার্থ বিজ্ঞানের মোটা বইটা টেনে নিল।

লাইট-এর অ্যাঙ্গল থেকে নোট্স্ লিখছিল সুবীরের বাড়ীতে বসে, খুব অল্পই লিখতে পেরেছিল, সে নোট্স্টা শেষ করতে হবে।

কয়েকটা পাতা উল্টেই অমিয় চমকে উঠল।

ছোট একটা কাগজ। নীল রংয়ের। ভাঁজ করা।

এদিক ওদিক চেয়ে অমিয় কাগজটা খুলল।

সুন্দর হাতের লেখা। শুধু একটি লাইন। কয়েকটি সাজানো অক্ষর।

আমাকে ভুলে যেওনা—চিত্রলিপা।

এ চিঠি বইয়ের ফাঁকে নিতা কখন রেখে গেল! চিঠি তো নয় নিতার হৃদয়। বইয়ের পাতাটে কখন নিভৃতে রেখে গেছে।

আলোর বন্যায় আমূল, কোলাহলমুখরিত এ শহর থেকে অমিয়কে, অমিয়র মনকে কে যেন টেনে ছিঁড়ছে অনেক দূরের প্রকৃতিবেষ্টিত নিরালা এক পল্লীগ্রামে নিয়ে গেল। আম্রতলোচন, সুগৌরবর্ণা, কাজল কেশ এক কিশোরীর সান্নিধ্যে। যাকে কেন্দ্র করে সে উর্ণ-তন্তুতে যতন দিনের চিন্তা আর রাঙের স্বপ্ন রচনা করবে।

হঠাৎ সঙ্গীতের সুর কানে যেতেই অমিয় উঠে দাঁড়াল। কান পাতল জানলার কাছে। না, সে গান নয়। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা' এই ভাবনাক্রান্ত গানের কথা নয়, অন্য কি একটা গান বাজছে পাশের বাড়ীর রেডিওতে।

কিংবা কিছুই বুঝি বাজছে না। অমিয় ছুটি কান ভরে এই সঙ্গীতের সুর আর কথা নিয়ে এসেছে। তারই গুঞ্জন চলেছে ইথারে ইথারে। তুমি আমারি, তুমি আমারি।

অমিয় আবার টেবিলের কাছে ফিরে এল।

কাগজের টুকরোটা স্পর্শ করে বলল।

চিত্রলিপা, আমি তোমায় কখনও ভুলব না। কোনদিন নয়।

॥ শেষ ॥

স্কেচ ॥ নিতাই ঘোষ (পেন্টারস ক্যালকাটা)

বাজারের সেরা খাঁটি সরিষার তৈল
আপনার কি চাই ?

তা হ লে

আজই অবিলম্বে যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাঁটি সরিষার তৈল প্রতিষ্ঠান

ত্রিদীপ অয়েল মিলস

৯২, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৫
ফোন : ৫৫-১২০১

চেনা অচেনা

নিখিল চন্দ্র সরকার

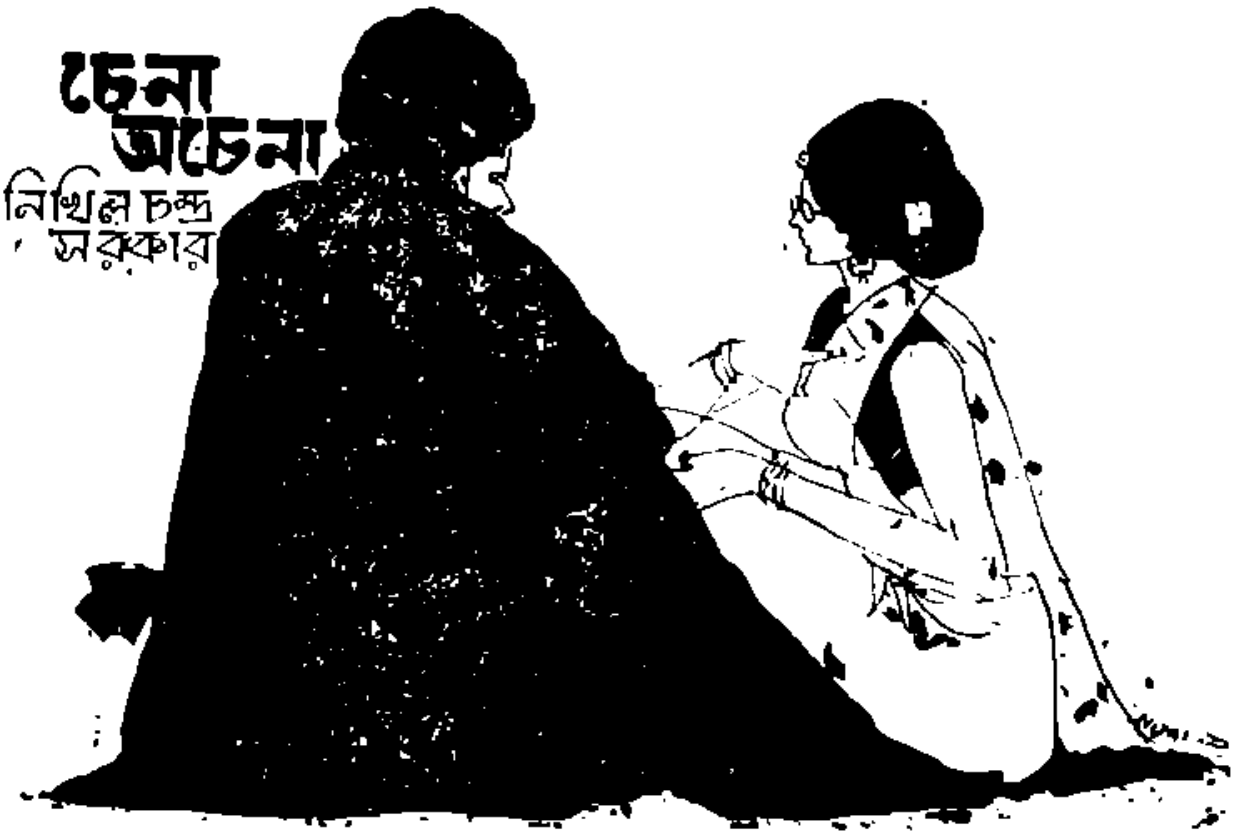

ছুটো ট্রাক বালই রাস্তার ধারে বড় এক কটা দেবদারু গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। লোকজন নেমে পড়েছে। সবার চোখে মুখে এক ধরণের আবেশ ও বিস্ময়। চারদিকে পাহাড় আর গাছগাছালি চোখে পড়ছিল। সব কেমন শান্ত ও স্তব্ধ। আমাদের সাড়া পেয়ে কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছিল মাথার ওপর দিয়ে। কিছু গাছের পাতার আড়ালে ঝিঁচির ঝিঁচির শব্দ তুলেছে। মনে হচ্ছিল, আমাদের উপস্থিতিতে জায়গাটা আচমকা যেন জেগে উঠেছে। তবু চোখের কোণে আলস্য, জড়তা। পুবের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। কুয়াশার ভাঁজগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিল। সারা গায়ে তার হালকা সবুজ লাল ছিট ছিট দাগ। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আশপাশের গাছের ডালে পাতার বিশেষ ফুঁক, পাহাড়ের গায়ে তখনও শীতের জড়সড় আচ্ছাদন ছিল। গাছের পাতা থেকে অল্প অল্প শিশির ঝরছিল। পায়ের ধুলো ভেজা, ঠিক চেনা একটা গন্ধ ছিল জায়গাটায়। আমাদের সামনেই ছিল গাইড। সে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এই সেই লোলতাবাদ ফোর্ট। এর গুরুত্ব আজ কিছুই নেই, কিন্তু একদিন ছিল। আমাদের চোখের সামনে ইতিহাসের একটা আবছা অধ্যায় যেন ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে বাতাসের ছুঁয়ে পালার মতো লাগছিল। গাছের পাতা কাঁপছিল। এখান থেকেই ফোর্টের চূড়োটা দেখবার চেষ্টা করলাম একবার। এখানটাতেই আমরা উঠবো। কেমন এক আবেশ ও শিহরণ অনুভব করছিলাম আমি। বাইরের দেয়াল ভেঙে গেছে। কিন্তু লোক পুরনো দিনের ছবি ও টাকা পয়সা দেখাচ্ছিল পয়সা নিয়ে। যত এগোচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে, একটা কি যেন আমাদের আচ্ছন্ন করছে।

মুমন্ত অতীত যেন চোখ মেলেছে। এখনও বুঝি কান পাতলে অন্ধকারের স্তব্ধ মিলিয়ে যাওয়া শব্দ, বহু মানুষের হই হট্টগোল শোনা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর ছবিটা মনে পড়েছে। সব ঠিক আছে. ঘোড়া শালে ঘোড়া, হাতী শালে হাতী, লোক লস্কর সবই রয়েছে, শুধু প্রাণের সাড়া নেই। এখন মনে হচ্ছিল, কিছুই যেন পুরনো হয় নি। জায়গায় জায়গায় দীর্ঘ সময়ের ক্লান্তি ও জরা জড়ো করা রয়েছে।

লোহার ফটক পেরিয়েই একটু ফাঁকা অন্তত জায়গা। উঁচু একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে গাইড আমাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদূর এগোলেই আর একটা বিরাট দরজা পড়বে; কোথায় প্রথম কামানটা পড়বে, কোথায় গুড়ম পথের ফাঁদ, কোথায় গুহা, কোথায় একটা ব্রিজ পড়বে। বেরে ফে আকৃষ্ণ করতে এসে পরাজিত হয়েছে, কোন্ কোন্ নবাব বাদশা এর ওপর কর্তৃত্ব করেছে, তার বিস্তারিত ইতিহাস বলে গেছে গাইড। সব শেষে সাবধান করে দিয়েছে, অন্ধকার গুহাটা পেরোতে গিয়ে যেন হাত পা না কাটি, একদল মশাল জ্বালিয়ে আগে আগে চলবে; সব সময়ই তাকে যেন আমরা অনুসরণ করি। ব্রিজটা যেন সাবধানে পেরোই, পা ফসকালে আর উপায় নেই, নীচেই গভীর খাদ। যাদের সাহস আছে, সব শেষে একমাত্র তারাই যেন ওপরে উঠে। আমাদের দলের আগে আগে সেই লোকটি, যার হাতে রয়েছে মশাল। প্রথম কামানটা দেখে অনেকেই আর ভেতরে গেল না; এবার সেই গুহা। মশাল জ্বালানো হলো। আমি দলের একেবারে পেছে। কিছুদূর গিয়েই পথটা বেঁকে গেছে। মশালের আলো আড়ো ভাবে এসে পড়ল আমাদের ওপর। এক সময় আর তাও থাকল না। এবার শুধু জমাট অন্ধকার। মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বালাচ্ছি। আর একটু অন্ধকার হলেই গুহার পথ শেষ হবে। আমরা খুব সাবধানে এগোচ্ছিলাম। এক সময় টের পেলাম, একটি মেয়ে এসে আমার গায়ের ওপর পড়েছে। আমারও সরবার আর কোন উপায় ছিল না। ওর চুলের শরীরের একটা নেশা নেশা গন্ধ পাচ্ছিলাম। গুহাটা পেরোতেই দেখলাম মেয়েটি নেপালী। দেখতে সুশ্রী, সুঠাম শরীর। ওর মা বাবা একটু দূরে অপেক্ষা করছিল। আমার দিকে চেয়ে মেয়েটি হেসে ফেলেছিল। তারপর ওর মা বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে ওপরে উঠছিল। মাঝে মাঝে কৌতূহলী চকল চোখে আমাকে লক্ষ্য করছিল ও।

আমার আগেই ওরা ওপরে উঠে গেল। আমি মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ছিলাম। সুরাসার ঘুমের অপরিচ্ছন্ন ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। শীতের এই সকালেও আমি ঘামছিলাম। সূর্যের আলোয় ভরে গেছে চারপাটা। মাঝে মাঝে আমি নীচের দিকে তাকাচ্ছিলাম। রাস্তা, মানুষজন খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছিল। দু একজন নামতে সুরু করেছে তখন। আমার আর দেরি করা উচিত নয়। একাই সঙ্গে আবার ইলোরা যেতে হবে; সন্ধে যাতে আগে দু তিন জায়গায় থামবে। এক জায়গায় বেশি সময় নিলে, অসুবিধে আমাদেরই। এবার তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলাম। আমি যখন ওপরে উঠলাম, তখন ওই নেপালী পরিবারটি নেমে যাচ্ছে। দু তিনবার মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে আমার। বড় কামানটার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে আমি সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম। হাওয়া ছিল এলোমেলো। আরো কয়েকজন বসে আছে আমার উল্টো দিকে মুখ করে। তিন চারটি যুবতী ও কটি পুরুষ। একবার তাকালাম ওদের দিকে। সকলেই হাসাহাসি ও ইয়ারকি কাজলামি করছিল। পুরুষদের মধ্যে একজনেরই বয়স একটু কম মনে হলো, আর সবাই আধাবয়সী। একজনকে বাঙালী বলে মনে হলো, আর সবাই অবাঙালী। যুবতীদের তিনজনকে এক নজরে দেখলাম। একজনকে বেশভূষার মুখের আড়ালে বাঙালী বলে মনে হলো আবার। কিন্তু সকলেই হিন্দীতে কথাবার্তা ও রঙ্গ রসিকতা করছিল। আর একজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার শরীরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। আমি বোধ হয় একটু নির্লজ্জের মতন তাকিয়েছিলাম ওদের দিকে। ওদের দলের একজন, পাশের একজনকে ইসারা করল, কানল। মেয়েরাও মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখল, এ ওর গায়ে চিমটি কাটল। মজা করে হাসল। মুহূর্তের জন্যে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম আমি। ওই দলটিও এবার উঠে পড়ল। ছেলেরা আগে আগে চলতে লাগল। আর

কোন লোকজন নেই। শুধু আমরা। সবাই নেমে গেছে। যে মেয়েটিকে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না ভাল করে, এবার মুখ তুলতেই ওর মুখের ওপর আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে মুখের হাসি কে যেন কেড়ে নিয়েছে। কেমন বিহ্বল ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে মেয়েটি। আমি একটা স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকলাম ওর মুখের দিকে। কোন কথা বলতে পারলাম না। বুকের ভেতরে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। আজ এতদিন পর এভাবে, এই পরিবেশে সম্পূর্ণ অপরিচিতজনের মধ্যে সীমাকে দেখবো, ভাবি নি। এরকম যোগাযোগ কখনো হতে পারে, আগে জানা ছিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুধোলাম, "তুমি ?"

সীমার চোখে কালো চশমা ছিল। আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না ও। মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কিছু আগাছা উপড়াচ্ছিল। ওর বন্ধুরা অবাক হয়ে গেছে। ইশারায় ওদের এগিয়ে যেতে বলল সীমা।

চশমাটা খুলে এবার সোজা আমার চোখে চোখে তাকাল সীমা। খানিক আগের আড়ষ্ট ও অপ্রস্তুত ভাবটা আর নেই এখন। ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি অবাক হয়েছি; না, তার চেয়েও বেশী দুঃখ হয়েছে আমার। চেহারার এমন পরিবর্তন আমি আদৌ কল্পনা করি নি। চোখের নীচে পুরু হয়ে কালির দাগ পড়েছে। চোখ দুটোও অনেক ভেতরে ঢুকে গেছে; আলগা মিছির মনে হয়। গলার চামড়া শুকনো, লাবণ্যহীন। কপালের ওপর ছোট ছোট ঘুমুরির দানা। গলার কাছে নাড় দুটো বেতসভাবে বেরিয়ে আছে। চোখের কোলে মুখের রেখায় ক্লান্তি, শরীর ও মনের অটিল হিজিবিজি যন্ত্রণার ছোপ ছোপ দাগ ফুটে রয়েছে। মোট কথা, সমস্ত চেহারায় বেহিসেবী এলোমেলো জীবন কাটানোর একটা কালচে মলিন রুক্ষ ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। আগের চেয়ে অনেক রোগা লাগছিল ওকে। হাতের নীল শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে। পরনে কষাপাড় রংয়ের সিল্কের একটা শাড়ী। ঠোঁটে লিপস্টিক থাকায় আরো বিশ্রী লাগছিল যেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছি। আমার খারাপই লাগছিল। কেন না, সীমার সম্বন্ধে এতকাল ধরে আমার যে ধারণাটা তৈরী হয়েছে সকলের অগোচরে; ওর রূপ যৌবন নিয়ে যে চেহারাটি আমার মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, তার সঙ্গে আজকের চেহারার কোন মিল ছিল না। বরং অমিলটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আজ। আমার কাছে এ অপ্রত্যাশিত ও বেদনার। একটা কথা কেন কেন আমার এই মুহূর্তে মনে হলো, সীমার যৌবনটা অকালেই ক্ষত ক্ষয় হয়ে গেছে, অথচ এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ার চেহারা ওর ছিল না। স্বাস্থ্যবতী গড়ন ছিল দেহের। যাই হোক, ওর এই ক্ষীয়মান যৌবনটাকে ধরে রাখার একটা আপ্রাণ চেষ্টা ওর বেশভূষায় ও প্রসাধনে স্পষ্ট। এ সম্পর্কে সীমাও সচেতন। আবহে কষ্ট হচ্ছিল আমার, অস্বস্তিকর করার মতন কি এমন আর কোন ঐশ্বর্য ওর আছে? বাইরে থেকে যতই ও ভেতরের রিক্ততা ঢাকবার চেষ্টা করুক না, এতদিন পরেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি সীমা। ঠোঁটের সেই বহুশ্রুত হাসি, চোখের চুলুচুলু মদির দৃষ্টি, তির্যক মনোহর ভ্রূবিলাস, চলচলে যৌবনের উচ্ছল উদ্দামভাব আর কতটুকু ওর মধ্যে অবশিষ্ট আছে? সীমার এই করুণ ও দীনতার বেশ আমাকে কষ্ট দিল। আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরও অনেকবার ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখা হয় নি আমাদের। পরে একরকম ধরেই নিয়েছিলাম, আর কখনো ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম: দেখা করাতো শুধু শুধু দুঃখ বাড়ানো, কি লাভ তাতে; তার চেয়ে এই-ই ভাল হলো। তবু একটা অতৃপ্তি ছিল আমার। ওদের বাড়ির মতটা আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম। শুধু সীমার কাছে মতামতটা একবার জানবার সাধ ছিল। সবটাই কি তার অভিনয় ছিল? শুধুই প্রতারণা? বুঝতে পারছিলাম, একটা ভাবনা থেকে আর একটা ভাবনায় দ্রুত উপকে উপকে এলোপাথারি পা ফেলেছি আমি, কোন একটায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি নিরুত্তর। পরিবেশটা হঠাৎ কেমন ভারী ও দুঃসহ মনে হলো। সীমা মৃদু হাসল, হেসে চশমাটা পরে নিল আবার, বলল, "আমিও ভাবিনি, এতদিন পরে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।"

"আমিই কি ভেবেছিলাম!"

"হ্রীত ! অথচ দেখ, যখন খুব দরকার ছিল, তখন পাসলের মতন খুঁজেছি তোমায়, দেখা পাই নি। আর আজ বিনা দরকারেই দেখা হয়ে গেল। আমার ভাগ্যটাই এরকম।"

"আমার কাছে কি এমন তোমার দরকার ছিল ?" আমি ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। "হ্যাঁ, তোমাকেই সেদিন আমার সব চেয়ে প্রয়োজন ছিল" চোখ তুলে সীমা একবার দেখল আমাকে। কি ভেবে পরমুহূর্তেই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে সে। কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখে মুখে চাপা একরাশ ক্লেশ ফুটে উঠল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষিপ্ত গলায় বলল, "বুঝলে, আমার কপালটাই খারাপ তা না হলে দেখা হতো সেদিন ?" সীমা যেন পুরনো দিনের শ্বাস নিতে নিতে আমার একটু অন্যমনোযোগী হলো।

"আজ কি সে প্রয়োজন একেবারেই শেষ হয়ে গেছে ?" আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে আনলাম ওর মুখের ওপর থেকে। আমার কাছে ওর প্রয়োজন ছিল, আমাকে খুঁজে ছিল ইত্যাদি ঘটনাগুলো আমি জানতাম না আগে। শুনে আরো কষ্ট হচ্ছিল আমার।

সীমা নীরব থাকল কয়েক মুহূর্ত। একটু ইতস্তত করছিল জবাব দিতে। তার মুখের ওপর আবছা ধরণের এক সংশয় ও দ্বিধার ছায়া পড়েছে। মুহূর্তকের মধ্যেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠল ও, বলল, "হ্যাঁ, একরকম সেরেই ধরতে পারো।" গলাটা ধরা ধরা মনে হলো। "তবু তুমি না একবার।"

আমার চোখের দিকে চেয়ে এবার হেসে ফেলল সীমা, বলল, "বড্ড কৌতূহল তো দেখছি।"

"বারে, এমন একটা মজার খবর দিলে, আর কৌতূহল হবে না !"

"কি হবে শুনে, তাতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না" ওর কণ্ঠস্বর এবার আর্দ্র ও বেদনার্ত শোনালো।

"বেশ বলো না তবে।"

"তবু তবু রাগ করছো তুমি।" বলতে বলতে কণ্ঠা এগিয়ে গেল সীমা, অস্ফুটে বলল, "তুমি বুঝবে না, এবে কী কষ্ট আমার।"

"শুনি তবে।" আমিও পাশাপাশি হাঁটছিলাম, পরে একসময় বললাম, "জান, এখন আর কোন ব্যাপারেই রাগি না আমি।" আমার বলার মধ্যে একটু উদাস ও নৈর্ব্যক্তিক একটা ভাব ছিল।

"দেখছি, অনেক পালটে গেছ তুমি। অত শান্ত তো ছিলে না আগে।"

"চপলতার বয়েস কি আর আছে ?" আমি চোখে চোখে চেয়ে শুধোলাম।

"এটা একটু বাড়াবাড়ি তোমার।"

"বাড়াবাড়ি বলছো ? আচ্ছা, আমার এখন বয়েস কত বলছো ?"

"কত আর, বত্রিশ তেত্রিশ।"

"ওটা আবার আসছে মাসে হবে।"

একটু থেমে পরে হেসে বললাম, "সেল মাসের ষোল তারিখ থেকে ছত্রিশে পা দিয়েছি। কি, বিশ্বাস হলো ?"

আমি এবার গম্ভীর হলাম।

"বুড়ো সাজার পক্ষে এখনি তোমার আগে হয়ে গেল না।" সীমা অবিশ্বাসের গলায় বলে হাসল।

সত্যি বুড়িয়ে গেছি আমি। একসময় সুখ পেতাম এতে আজ কষ্ট হয়।" একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, "এখন আমার কেউ দেখলে বিশ্বাস করবে যে একদিনও শেব হয় নি আমার ?"

"আমার তো ভুল হয় নি।"

তুমি আমাকে চেন বলে ; যারা চেনে না, তারা ?"

"অত গম্ভীর হ'য়ে থাকো কেন ? ওতেই আরো বয়স্ক মনে হয়।"

"কি জানি কিছুই বুঝি টুঝি না।"

"আর কাজ নেই বুঝে ; এখন বলতো, হঠাৎ কি মনে করে ?"

"কি আবার মনে করে ; তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো, আমারও সেই একই কারণে।"

"ঘরে বুঝি কোন টান নেই ?" সীমা ঠোঁট কামড়ে হাসল।

"প্রশ্নটা তো আমিও করতে পারি ?"

"কোন লাভ নেই করে।" হেসে পরমুহূর্তেই গলা পালটে ফেলো। "বিয়ে করেছো ?"

"কই আর করলাম।"

"আর দেরী না করে, এবার করে ফেল।"

"আমাকে যে খুব বড় বড় উপদেশ দিচ্ছ, তুমি নিজে করেছো?"

"করি নি বলেই তো বলছি।"

"ঠিক আছে ভেবে দেখবো।"

"দেখো, ভাবতে ভাবতে না আবার বেলা বয়ে যায়। ঠিক আছে, তোমার ঠিকানাটা দিও, আমি নিজে গিয়েই মাসীমাকে বলবো।"

"বেশ বছর এগার পিছে যা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।" একটু থেমে ফের বলল, "তোমার কথা যাকে মাঝে মা বলতো।"

"আমারই দুর্ভাগ্য।" অস্ফুটে কথাটা বলে চুপ করল সীমা। আমার এই দুঃসংবাদ শুনে সে যেন বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছে।

আমরা কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বললাম না। নিজের নিজের ভাবনার ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ নীরবে হেঁটে এলাম। সবাই নেমে গেছে। এতক্ষণে আমাদের খেয়াল হলো, সীমার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। সীমার যেন হুঁশ হলো। চমকে উঠে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "এই, তাড়াতাড়ি পা চালাও।"

"চলো।"

একটু পরে যেতে যেতে সীমাই আবার কথা বলল, "এখান থেকে আর কোন্‌দিকে যাবে?"

"সোজা কলকাতা ফিরবো। তোমরা?"

"আপাতত বোম্বে, দেখা। তারপর কোন ঠিক নেই এখনও।"

"সারাদে এত ঝক্কি নইতে?"

"কি আর করবো, পারতেই হবে।"

"কিন্তু কিন্তু এখনও তো দিন বুড়ির যাক?"

"তাতো হবেই।"

"এই দেখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, তোমার অ্যাড্রেসটা কি?"

"পার্ক ষ্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাট। আসবে নাকি একদিন?"

"ঠিকানাটা দিও, যেতে পারি।"

"এলো না, কষ্ট পাবে।" বোঝা গেল না সীমার এটা কৌতুক না আসল কথা। একটু গম্ভীর হলো।

"কেন, তোমার যা দাদারা থাকে না?" আমি ওর মুখের দিকে চাইতে চাইতে শুধোলাম।

"যা নেই, দাদারাও অনেকদিন হয়েই আর খোঁজ নেয় না আমার।"

"সে কি?"

"অবাক হচ্ছো তো! আমার অনেক কিছুই তুমি জান না, জানলে ভাল লাগবে না তোমার।"

"তোমার মুখে প্রথম দিকে কিছু কিছু উড়ো কথা মাঝে আমার কানে আসতো, বিশ্বাস করি নি।"

"উড়ো কথাগুলো কি শুনি?" সীমার মুখটা কেমন নির্জীব ও পাণ্ডুর মনে হলো।

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলাম না আমি, অপলকে ওকে দেখলাম একটুক্ষণ। পরে কণ্ঠে গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, "উঁহুঁ, অত কৌতূহল থাকা ভাল নয়।"

"যাও, তোমাকে বলতে হবে না কিছু।"

"বলছি তো, পরে বলবো।"

"দরকার নেই।"

"কেমন একটা খটকা লাগছে আমার।"

"কিসের খটকা?"

"আচ্ছা, তোমার সঙ্গে তো দেখছি অধিকাংশই অবাঙালী, এদের সঙ্গে জুটলে কি করে?"

এবার জোরে হেসে উঠল সীমা, চশমাটা খুলে ফেলল। পরে চোখ দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, "মজরটা তো দেখছি ঠিক আছে।" একটু থেমে পরক্ষণই আবার ও বলল, "ওরা আমার বন্ধু।"

"তোমার বন্ধু!"

"কেন, বিশ্বাস হয় না?"

"ওই আধাবয়সী লোকগুলো কি করে তোমার বন্ধু, মাথায় আসছে না আমার।"

"চ্যা গো, বিশ্বাস কর। ওরা আমার হিতাকাঙ্খী

বন্ধু।" বলতে বলতে ওর চেহারাটা পলকের মধ্যে কেমন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে আচ্ছন্ন মনে হলো। আবার যেন কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে সীমা। এই মুহূর্তে কেমন দূরের মনে হচ্ছিল ওকে।

"লোকগুলোর চোখ মুখ দেখে তো সুবিধের মনে হয় না।"

"আর বলো না, তোমার চেয়ে আমি কম চিনি না ওদের। এর মধ্যে আমারও কম অভিজ্ঞতা হলো না, জেনে রেখো।"

"খুবই স্বাভাবিক। তাহলে, তোমার বন্ধুদের কোন কষ্ট দিচ্ছি না আমি।"

"ছাঃ, না জেনে না শুনে হট করে কারো সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়।" সীমার গলাটা কেমন রূঢ় শোনাল।

"কোন মন্তব্য তো করি নি আমি। ওদের হাসি ইয়ার্কির মধ্যে তোমাকে কেমন আলাদা আলাদা লাগছিল। কোনদিক দিয়েই তোমার সঙ্গে ওদের মিল নেই।"

"ও সব নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ো না। কোন লাভ নেই তাতে।"

"ভুল করছো সীমা এতদিন পরে কোন লাভের প্রতিই আর লোভ নেই আমার। লোকসান যা হবার, তা তো অনেক আগেই হয়েছে।"

"ওকি শুধু তোমার একার, আমার নয়?" সীমার চোখের কোল দুটো কেমন ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে, আশ্চর্য! সামান্য আগের রুক্ষ কর্কশ ভাব এখন নরম ও শান্ত হয়ে এসেছে। মনের ভেতরে একটা গাঢ় কষ্ট বোধ ওকে কেমন অসহায় করে তুলেছে। আমার সঙ্গে দেখা না হলেই বোধ করি ওর মঙ্গল হতো। সীমা আমার আগে আগে হাঁটছিল। সামান্য ঝুঁকে রাস্তার ধারের কিছু অচেনা ফুল তুলে নিল। হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিল। এক সময় ধীরে ধীরে অনুচ্চ গলায় বলল, "কেউ জানেও না, কেমন করে ঘরে যাচ্ছি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীমা আমার ওপর নম্র বেদনাতুর একজোড়া চোখ রাখল এক পলক। একটু নীরব থেকে ফের ও বলল, "কি, আমার কথায় রাগ করি নি তো?"

"বলেছি তো, সে বয়েস পেরিয়ে এসেছি। এখন আর ছেলে মানুষী সাজে না।"

"জান, আমারও না মেজাজটা কেমন বিচ্ছিরী ও খিটখিটে হয়ে গেছে। আমি নিজেই তা টের পাই; তবু সামলাতে পারি না।"

"পরে আরো হবে, কোন দোষও নেই তোমার। আগের চেহারাও তো নষ্ট হয়ে গেছে।"

"কিছুই আর নেই এখন।" একটু থেমে সীমা গভীর ভাবে কি ভাবল কিছুক্ষণ। পরে হাঁটতে হাঁটতেই আবার বলল, "তুমি জান না অমল, এর জন্যে কি মূল্য দিতে হয়েছে আমার।"

"তোমরা ওই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যে চলে গেলে!"

"সে অনেক কথা, পরে বলবো। ওই ঘটনার পর তুমিও তো আর এলে না।"

"এসেছিলাম; একদিন নয়; অনেক দিন, ঢুকতে পারি নি।"

কারা যেন কথা বলতে বলতে উঠে আসছিল। আমার মনে হলো, সীমাকে খুঁজতে ওদের দলেরই কেউ আসছে। সীমা এবার এগিয়ে গেল দ্রুত, চাপা গলায় বলল, "ইস, কি দেরী হলো বল তো।" কি মনে পড়ায় কাছে এসে এবার ফিস ফিস করে সাবধান করে দিল, "পরে আরো কথা হবে; ওদের সামনে কিছু বলো না আবার।"

মনে হলো, একটু যেন ভয় পেয়েছে সীমা। আর সামান্য আমলেই দেখলাম, একটি লোক ওকে বীভিমতন ধমকাচ্ছে। লোকটি বাঙালী। ওর কথাবার্তায় কেমন ইতর রসিকতা ও নির্লজ্জতা ছিল। সীমা যেন ভ্রুক্ষেপ করছে না কিছু। এক সময় একটু ভাঁড়ের সঙ্গে বলল, "মেলা, ক্যাচ ক্যাচ করো না তো। ওদের মুখ আমটা ঘরে গিয়ে করো।" এবার আর কিছু বলল না লোকটি। বিরক্তি ও অসন্তোষ চলতে গিয়ে বারে উঠল। সীমাও উঠল।

সীমা আমার দিকে তাকালও না একবার। আমি যেন ওর কাছে কোন কালেই পরিচিত ছিলাম না। ওর এই আচরণে আরো বিস্মিত হয়েছি আমি। এতে লুকো-

চুরিরই বা কি আছে। কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে কখনো সখনো পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং অনেক সময়ই সেটা আনন্দের ও উল্লাসের হয়। কিন্তু সীমার সঙ্গে আমার আচমকা এই সাক্ষাৎ কেমন যেন সংকোচের ও অস্বস্তিকর। ওরা না সীমার বন্ধু? ওদের সামনে আমার এই পরিচয় কি নিয়েই কোন গ্লানির ব্যাপার, সঙ্কুচিত হওয়ার মতন কিছু? আমার কেমন খারাপ লাগল। ওর সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আমি শুনেছি। বিশ্বাস যে করেছি তা নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম একটু। ওদের বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। তাকিয়ে দেখি সবাই অসহিষ্ণু ও বিরক্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। কেউ কেউ নিজেদের ভাষায় বিরূপ মন্তব্য করল বোধ হয়। সেই নেপালী মেয়েটি কিন্তু প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। আমার দিকটা ওর দেখাই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ও চোখ সরিয়ে নিল লজ্জায়। ওর এই চোখের খেলা আমার ভাল লাগল। আমি বসতেই ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে আস্তে করে, স্পষ্ট বাংলায় বলল, "আপনার জন্যেই বাসটা দেরী করে ছাড়ল।"

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম। তারপর হেসে ফেলে বললাম, "সবটাই আমার দোষ নয়, এ জায়গাটাও অনেকখানি দায়ী হচ্ছে।"

"ঠিক বলেছেন। এত তাড়াতাড়ি দেখা হয় কিনা?"

দেখলাম, বাসের অনেকেরই জিজ্ঞাসু কৌতূহলী দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছে। চোখ সরিয়ে আনতে আনতে বললাম, "একদিনে এত দেখতে গেলে কিছুই দেখা হয় না।"

"আমারও সেই মত।"

বলতে বলতে অন্য বাসটার পিছনে এসে আমাদের বাস দাঁড়াল। এখানে আবার কি?

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি ক্ষেত্র। মাথার ওপর খোলা আসমান, কিছু সবুজ ঘাস মাটি সমতের চৌহদ্দি বাঁচিয়ে আছে। এখানে বিরাজ করছে। বড় অদ্ভুত বিচিত্র সম্রাটের এই অন্তিম সাধটি। কোন আড়ম্বর নয়, কোন সমারোহ নয়। ইতিহাসের অটিল বহুস্তরের চরিত্র, সম্রাট-আলমগীর। কি এর তাৎপর্য? কেনই বা এই অভিসার? মনে মনে বিড়বিড় করলাম, কেউ তোমায় বুঝতে পারেনি সম্রাট? একটু তুমি দুর্জ্ঞেয়? কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি সীমা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ছোট্ট করে একটা চিমটি কাটল ও, বলল, "কি, বুদ্ধটা এখন গোছগা করে নেবেন কি?" বলেই আর দাঁড়াল না সীমা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের দলে গিয়ে মিশে গেল।

এরপর আরো কয়েকটা জায়গায় গাড়ি থামিয়েছি। কোনখানেই ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। ইচ্ছাময় শুধু আমার কি যেন একবার বলেছিল সীমা। ওর এই আচরণ আমার কাছে একটু অদ্ভুত ও অশোভন লেগেছে। হঠাৎ আমার মনের ওপর পাতলা, আবছা একটা সন্দেহের ছায়া ফেলেছে। যেন যেন একটা কথা আমার বারবারই মনে হয়েছে, সেদিনের সীমার সঙ্গে আজকের সীমার পার্থক্যটা অনেক। শুধু চাইবেই নয়, ভেতরেও দুটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র জগৎ। কেন জানি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যটুকু আমি সমারই অবিশ্বি আছে ওর একদিন যে আভিজাত্য ও অহংকার ওর ভেতরে দেখেছিলাম, আজ যেন তা অনেকখানিই ফুরিয়ে গেছে।

অথচ আমার সঙ্গে ওর পরিচয় স্বাভাবিক কারণেই ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়েছিল। আমরা ওদের বাড়িতেই থাকতাম। আমার বাবা ওদের জমিদারীর কাজ করত। ওদেরও অবস্থা পড়ে এসেছে তখন। একে একে অনেক কিছুই বিক্রী ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভেতরে অনেক-গুলো মহল। পুরনো ঐশ্বর্যের ভগ্নাংশ তখনো অন্ধ অন্ধ সমস্ত মর্যাদা লুকনো ছিল। একটা আবহাওয়া ছিল ওদের। ভাল জাতের ঘোড়া ছিল কয়েকটা, জুড়ি গাড়ি ছিল দু তিনটে। খুব ছোটবেলাতেই বাবা আমাকে নিয়ে দিয়েছিল, ওদের অন্দরমহলে কখনো যেন না যাই। সুতরাং ভেতরবাড়ি সম্পর্কে স্বভাবতই আমার একটা কৌতূহল ও ভয় ছিল। ও বাড়ির ছেলে মেয়েরা আমার

সঙ্গে মিশতে দেবেন, কিন্তু বাবার ভয়ে আমি কখনোই ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারতাম না। সীমার ঠ্যাটপুটো খুবদুরো চাইনা মাঝে মাঝে খেলা ফেলে রেখে গিয়ে আমায় মারধোর করত। বলত, সীমা একটে ভূতের ঘরকার। এমন কি বাড়িতে বলে দেওয়ার ভয়ও দেখাত। ওরা চলে গেলে সীমা একদিন বলেছিল আমায়, "আচ্ছা, তুমি মার খাও কেন?" আমি কোন জবাব দিই নি একথার, বরং মারো ভয় পেয়েছিলাম। আর একদিন বলেছিল, "তুমি আমাদের বাড়ির ভেতরে আস না কেন? চলো, আজই তোমাকে আমার মার কাছে নিয়ে যাবো।" পরে আমাকে ও একদিন ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। ওর মা খুব আদর করেছিলেন আমায়। সীমার বাবা ছিল না। এরপর মাঝে মাঝেই আমি ওদের মহলে গেছি। সীমাও আমাদের ঘরে এসেছে। মার সঙ্গে গল্প করেছে। কখনো কখনো ও মার হাতের রান্না খেয়েছে লুকিয়ে দেখতাম, মা-ও কেমন ভয় পেত ওকে। বুঝতে পারতাম না, ওকে ভয় কেন? ওরা বড়লোক বলে? আমার বাবা ওদের এখানে কাজ করে বলে? একটু বড় হয়ে বুঝেছিলাম, ওদের মান মর্যাদা বনেদীয়ানার সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই চলে না। বোল দুর্গোৎসব লেগেই আছে ওদের বাড়িতে। ঠাকুরদালানে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ। দুর্গাপুজোর সময় বিরাট আয়োজন করে সাবেকী প্রতিমা তৈরী করিয়ে পুজো হতো ওদের ওখানে। পুজোর সময় সীমার মা তাঁর অন্য ছেলেদের সঙ্গে কোন পার্থক্য করতেন না আমার। এমনি করেই আমরা বড় হয়ে উঠছিলাম। যৌবনে পা দিয়ে একদিন বুঝেছিলাম, সীমার সঙ্গে অজান্তে আমার নিবিড় নিভৃত একটা ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। কিন্তু এর পরিণতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। মাঝে মাঝে এর জটিল চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন ও শংকাকুল করেছে। বাবার কথা যে তখন মনে না পড়েছে, এমন নয়। কিন্তু সীমার প্রেম আমায় আরো দুর্বল করছিল। ওর চলাফেরার মধ্যেও আগের চপলতা ছিল না। কেমন শান্ত ও নম্র হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে কেমন শুশ্রী ও সুন্দরী হয়ে উঠল সীমা। সমস্ত অবয়বে যৌবনের শ্রী। অন্তঃপুরের বাইরে ও কদাচিৎ আসে। মাঝে মাঝে চাকর দিয়ে খবর পাঠায় আমার কাছে। ডেকে নিয়ে যায়। সীমা ক্রমশই তখন আমাকে আচ্ছন্ন করছিল। আমার জন্যে কিছু কথা অনুরাগ অভিমান ওর চোখের নত পাতার তলায় লুকিয়ে রাখত। আমিও গোপনেই সেগুলোর স্বাদ নিতাম। একদিন মনে হলো, ওর মা-র চোখে আমি ধরা পড়েছি। বোধ করি আমার চলাফেরা ও কথাবার্তায় ঘোর লাগা একটা মানসিক চিন্তা ফুটে উঠেছিল। ওর মার চোখে কেমন সন্দেহ উঁকি দিত। তখন আর সহজ হতে পারতাম না শত চেষ্টা করেও। বরং আরো যেন আলো আড়িয়ে পড়তাম। আমাকে একদিন আড়ালে সীমা বলেছিল, "মা-র কাছে অমন করছিলে কেন? এত নার্ভাস তুমি?"

একটা দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। বিকেল হয়ে গেছে। চাকর এসে খবর দিল, একুণি একবার ভেতরে যেতে হবে। একটু আগেই আমি কলেজ থেকে ফিরেছি। গিয়ে দেখি, শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে সীমা। আমাকে দেখে চোখ না তুলেই বলল, "বসো।"

"কি ব্যাপার? এত জোর তলব?"

"তিন দিন দেখা নেই কেন?" এবার বইটা এক পাশে রেখে দিল সীমা। আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ।

"ভাল করেই তো জান।"

"জানি বলেই তো বলছি, তুমি আসবে, আর মাথা উঁচু করেই আসবে।" একটু হেসে আবার বলল, "কি পারবে না?"

"বেশ আসবো, কিন্তু তোমার মাকে দেখছি না কেন?"

"মা একটু ও-বাড়ি গেছে, আসতে দেরি হবে।"

"এ অবেলায় শুয়ে আছো যে, শরীর খারাপ নাকি?" আমার কেমন একটু ভয় করছিল। বাড়িতে কেউ নেই, এসময়ে যদি কেউ আসে, তাহলে কি ভাববে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

"কি করবো, ভাল লাগছে না কিছু।"

"আমাকে ডাকলে কেন?"

"এমনি। গল্প করার জন্যে। খালি বাড়ি, একা একা ভাল লাগে!" সীমা যেন দুঃখের নীচে আরো কি লুকিয়ে রেখেছে। ঠোঁটের ওপর পাতলা হাসিটা আমাকে আরো বিভ্রান্ত করেছিল। একটু সময় আমাকে দেখে নিয়ে সীমা আবার বলল, "তুমি ঠিকই বলেছো, আমার শরীরটা ভাল নেই। দেখ, আমার পা-টা কেমন গরম লাগছে।" বলে একটা হাত একরকম জোর করেই টেনে নিল। ওর বুকের ওপর রাখল আমার হাতটা। আমার চোখের দিকে চেয়ে এবার রহস্য গলায় বলল, "তুমি না আজ একটা ইয়ে—।" আমার হাতটা তখনো ওর বুকের ওপর। আবার বলল, "আমার কান দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে।" বলতে বলতে উঠে বসল সীমা। ঘরে তখন একটু একটু করে বাইরের আবছা অন্ধকার আসছে। মুহূর্তে আমার কি যেন হলো। আমিও হাঁপাচ্ছিলাম। চোখ দুটো জ্বালা করছে আমার, গায়েও জ্বর এসে গেছে যেন। আমার হাতটা ও আরো জোরে চেপে ধরেছে। আমি এবার ওকে আবেগে উত্তেজনায় জড়িয়ে ধরলাম। আস্তে আস্তে সে ঘর আরো অন্ধকারে ভরে গেছে একসময়। সীমা সেদিন অনেক কিছুই আমাকে দিয়েছিল। কোন ছাঁশ ছিল না আমাদের। কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল। সীমা তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিকঠাক করে ঘরের বাতি জ্বেলেছে। ওর মা এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হলেন। আমি তাকাতে পারছিলাম না। কেমন আড়ষ্ট ও বিব্রত বোধ করছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, সীমা যে এতক্ষণ ধরে আমায় এক অনাস্বাদিত সুধাপাত্রে মত্ত করেছে, তার ছিঁটে ফোঁটা নেশা বুঝি এখনো আমার চোখের তারায় লেগে রয়েছে। সীমাকে ধমকানোর সুরে তিনি বললেন, "এতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি, শুনিস নি? কি করছিলি তোরা।"

"কি আবার করবো, গল্প করছিলাম।" সীমা সহজভাবে হেসে হেসে জবাব দিল।

এরপর আর বেশিক্ষণ বসি নি আমি। আমার মনে হয়েছিল, তিনি সব বুঝতে পেরেছেন। সীমার ওপর ইয়েছিল আমার। কদিন আর কেউ ডাকতে এলো না আমায়।

কিছুদিন পর আমি আবার একবার ভেতরে গিয়েছিলাম, ওই আমার শেষ। সীমা ঘরে ছিল না তখন। টুকটাক কিছু কথার পর সীমার মা সোজাসুজি আমাকে বলেছিলেন, "ও আমাকে সব বলেছে; আমিও কিছুটা আঁচ করছিলাম। কিন্তু এ হয় না বাবা; সীমাও যে এটা জানে না তা নয়, তবু কেন যেন ও এই ভুলটা করলো, জানি না।" একটু থামলেন তিনি। আমাকে দেখলেন অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে, পরে আস্তে আস্তে বললেন, "এ রকম কোনদিনই এটা সম্ভব হবে না। বড় ভুল করেছো তুমি। তুমি জান না, তোমাদের এই মেলামেশা নিয়ে ওপাড়ার কী কথা শুনতে হয়েছে আমাকে। ওরে তুমি চেন না বাবা, ওরা পারে না হেন কাজ নেই।" আবার কি যেন ভাবলেন তিনি। ভেবে নিয়ে অল্প পরে বললেন, "গরীবের ছেলে তুমি, বাপ মার মাথা ভরসা। আমি চাই না, এসব ঝামেলার পড়ে তোমাদের একটা সর্বনাশ হোক। তোমার বাবা বহুদিন হয়ে এখানে আছেন। তাছাড়া আমিও ঠিক করেছি, কিছুদিনের মধ্যে এবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবো।" থেকে থেকে কথাগুলো আমায় বলেছিলেন তিনি। আমি নীরবে সব শুনে নিয়েছি। ধীরে ধীরে ওখান থেকে পরক্ষণেই চলে এসেছিলাম। শুধু সীমার কাছে শেষ কথাটা শোনার বাসনা ছিল। আমার সে সাধ আর পূর্ণ হয় নি।

এতদিন পর সীমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আবার দেখা।

ওদের সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বাবার চাকরি গেল। শেষ বয়সে বাবার কাছে এ শোকটা বড় পীড়াদায়ক হয়েছিল। এ আঘাত আর সামলাতে পারে নি বেশি দিন। আমার ঠিকানাটা আর কোন দিনই জানাতে পারি নি সীমাকে।

ইলোরা পৌঁছে আমার মতো ভাঙল। হাত পা ছড়াবার একটু অবসর পেলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিলাম। তারপর গাইড আমাদের নিয়ে চলল, এক একটা গুহা দেখাতে দেখাতে। বৌদ্ধ জৈন হিন্দু, বিভিন্ন

. বর্ষের প্রভাব গুহাগুলোর গায়ে গায়ে। কোন সময়ে কারা কিভাবে এর কাজ সুরু করেছিল, কত সময় লেগেছিল এর কারুকর্ম শেষ করতে, কোন ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করেছে এই ভাস্কর্যকে, তার বিস্তারিত আলোচনা করে গাইড আমাদের সামনে যেন ইতিহাসের অবগুণ্ঠন খুলতে লাগল। ক্রমশই আমরা বিমনাযিই হলাম। একটা গুহা শেষ করে যখন অন্য একটায় যাবো : এমন সময় সীমা পেছন থেকে আমার একটা হাত ধরে টান দিল। আস্তে করে ও বলল, "ওরা যাক, আমরা আর যাবো না।"

"কি ব্যাপার, ওদের সামনে যে আমায় চিনতেই পারছো না ?"

সীমা হেসে ফেলল, আমাকে দেখতে দেখতে বলল, "কি দরকার : ওদের সঙ্গে এসেছি, ওরা আবার কি ভাববে !"

"এখন ভাববে না ?"

"টেরও পাবে না, আর পেলেও বলে এসেছি একজনের ও ম্যানেজ করবে !"

"এত ভয়ের কি ?"

"ভয় আবার কাকে ?"

"হয়েছে, আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না।"

"ছাড় তো ও সব, চলো যদি কোথাও।"

"চলো, ওই পাথরটায় গিয়ে বসি চলো, গাছের ছায়াও আছে ওখানে।"

আমরা একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি এসে বসেছি। সামনে গুহাগুলো চারদিকে শুধু পাহাড় আর গাছগাছালি। সূর্য একটু হেলে পড়েছে। অল্প বাতাসে লাল ধুলো উড়ছিল। আমাদের গাগুলোও ধুলোয় ভরা কিছু পাখীর কিচির মিচির শব্দ ছড়ানো ছিল আয়গাটায়। রোদের তেজটাও ভারী ও সামান্য নিস্তেজ, বিষণ্ণ হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় সীমা আমায় শুধালো, "বললে না তো কি শুনেছো আমার নামে।"

"আরে কিছুই নয়, ও তোমায় এমনি বলেছি।"

সীমা চুপ করে থাকল। আর কোন কৌতূহল দেখাল না। কেমন যেন একটু ম্লান। ও অন্য কথা হয়তো ভাবছিল। চোখে মুখে আবার যেন মালিন্যের একটা ছাপ ফুটে উঠেছে। আমি ওর চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "ও বাড়ি বিক্রী হয়ে যাওয়ার পর তোমরা কোথায় উঠে গেলে ?"

"উত্তরপাড়া।"

"অনেককেই জিজ্ঞেস করেছিলাম ; কেউ তোমাদের ঠিকানা দিতে পারল না।"

"কেউ জানত না। এ-বাড়ি এক মাড়োয়ারীর কাছে বিক্রী হলো বটে, কিন্তু আমাদের ভাগে টাকার অঙ্কটা সামান্যই পড়েছিল, আসলে ওরা আমাদের ঠকিয়েছে। ওদের থেকে তাই দূরেই সরে গিয়েছিলাম আমরা। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর রাখি নি তখন।" একটু থামল সীমা। আবার কি ভাবল পামান্ত সময়। আঁচলটা দিয়ে একবার মুখ মুছল। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মা-ও ও টাকাটা বেশি দিন রাখতে পারে নি। জোরজার করে দাদারা কিছুদিনের মধ্যে সব ফতুর করেছিল। মা আমার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে চেষ্টা করে ছিলেন তখন, কিন্তু ভাগ্যের জন্যে কিছুই হলো না। সে সময়টায় খুবই খুঁজেছিলাম তোমায়।"

"এই নাম বোধ হয় ভাগ্য। তা না হলে, দেখা হতো। অথচ দুজনই দুজনকে খুঁজেছি।"

"একটা সময় এসব ভেবে খুব মন খারাপ হতো, আজকাল আর হয় না। কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছি।"

"দেখে তো মনে হয়, কঠিন কোন রোগে ভুগছো।"

"হ্যাঁ, এবার ছেড়ে পারলেই বাঁচি, আর ইচ্ছে করে না বাঁচতে।" উদাস ও বিষণ্ণ শোনাল গলা।

"এ শরীর নিয়ে অত ঘোরাঘুরি করছো কেন ?"

সীমা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ঝর ঝর করে এবার কেঁদে ফেলল ; কি একটা কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপল তার, পরে অস্ফুটে বলল, "শুধু বাঁচার জন্যে, বিশ্বাস করো শুধু বাঁচার জন্যে। ফুঁপে ফুঁপে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সীমা। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল। আবেগের জোয়ার কিছুটা কমলে একসময় ধীরে ধীরে বলল, "আমার নামে তুমি কি শুনেছো।

জানি না। তবে তুমি যাকে একদিন চিনতে, ভালবাসতে সে সীমা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, যাকে এখন দেখছো, ওর সঙ্গে তোমার এই প্রথম আলাপ।"

কিছু না বলে আমি অবাক চোখে ওকে দেখছিলাম। আমার চোখে চোখে চেয়ে ও বলল, "হ্যাঁ, আমার সব কথা শুনলে তুমি ঘৃণা করবে আমায়।"

গলাটা ফিরে আসছিল আবার। এবার আমাদের জেরার পালা। একটু চুপ করে থেকে বললাম, "তোমার বন্ধুরা এভাবে এসে ফেরলে আরো রাগ করবে।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে সীমা কি দেখল, যেন অনিমেষে। তারপর ধরা গলায় বলল, "ওরা আমার বন্ধু নয়, তোমাকে ওদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি। কোনকালেই চিনতাম না ওদের, কিনে গিয়েও আর কখনো চিনবো না।" বলতে বলতে চোখ দুটো আবার ভিজে উঠছে ওর। গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গেছে। আর অপেক্ষা করল না সীমা। উঠে দাঁড়াল। এমন করুণ বিষণ্ণ চেহারা আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার। আস্তে আস্তে হেঁটে ও চলে গেল।

আমি উঠলাম না। ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ, খুব খারাপ লাগছিল আমার। বুকের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে। কি করে ভুলবো, এই সীমাই একদিন আমার মধ্যে একটা পবিত্র প্রেমের জন্ম দিয়েছিল। আজ ও এভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সেই প্রেমের ছিন্নভিন্ন পাতাটি এখনো সঞ্চিত হয়েছে। আমার কাছে কি তার শেষ সম্বলটুকুও রেখে দিয়ে আজ নিঃস্ব হয়ে গেল? আমার কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ, সারা গায়ে টন টনে একটা ব্যথা। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো আমার, সত্যিই এ সীমাকে আগে চিনতাম না, আমি যাকে জানতাম, সে এ নয়; এর সঙ্গে আজই আমার নতুন করে পরিচয় হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সূর্যের আলো মরে আসছে। পাখি ফিরে এসেছে জানালাটায়। পাহাড়ের মাথায়, গাছের ডালে পাতায়, ঘাসের ওপর ঝিম ঝিম করছে ঝুরঝুরে, কি এক গভীর বিষাদে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে পাহাড়, ওরা, ঘাস মাটি, শুকনো আকাশ; এখানকার সব কিছু। ধুলো উড়ছিল। আর কখনো কি আমার সীমার সঙ্গে দেখা হবে? ট্রেইলার হর্ণ বাজছিল। এবার উঠে দাঁড়ালাম আমি।

টুটু আমার ছেলে।—সম্প্রতি বড়দাকের শক্ত একটা অসুখ থেকে উঠেছে, এখনও খুব কাহিল। বেশিরভাগ সময় বিছানায় এলিয়ে শুয়ে থাকে, খিদে পেলে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে, পেট ভরা থাকলে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তার মাথায় কদম গাছের রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি, পাখিটাখির খেলাটেলা দেখে। টুটু যখন ঘাড় উঁচু করে তাকায় তখন বুঝতে পারা যায়, কি ভীষণ অসুখ করেছিল ওর।—হাত পা সরু সরু প্যাকাটি, মাথা বড়, উঠে বসলেই ঢিলঢিল করে, মনে হয় এখুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে বুঝি।

ভগবান খুব রক্ষে করেছেন, নইলে কি যা হতে পারত! আর চিরকালের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতাম। ছোট্ট মাটির ভিজেলে ঘুঁটের জ্বালে গলা-গলা গোছের ঝোল আর পাবদে একটু টাটকা মাছের ঝোল, সেটুকু সকাল সকাল খাবার জন্যে কি রকম হ্যাংলামো করে টুটু। তবু নিত্য এই টাটকা মাছটুকু জোগাড় করা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমার কর-

খাবার কাঁচ, জোর দুটার মধ্যে বাড়ি থেকে বের না হলে দেরী হয়ে যায় তাও পড়ি-কি-মরি করে গেলেও, অত সকাল সকাল বাজারে মাছ পাইনা। আমার মা একে একে তাকে ঘরে ঘরে যা আনান তাতে কখনও পথ্য হয় না। তবুও রাতে ফেরার পথে আমি আনবো, তাও সারাদিনের কাজ কর্মের পর নিত্য হয়ে ওঠেনা। তাই কিছু আগুনা মাছ এনে জলের চাঁড়িতে জিইয়ে রাখি। কিন্তু সে মাছ কোটাই সমস্যা। মা একে বুড়ি মানুষ তায় চোখে চালশে, হাড়ি থেকে জিয়ানো মাছ ধরে কুটতে পারেন না, মাছের মাথায় বাড়ি মারতে গেলে হাত কাঁপে, চাক করে ছড়কে পালিয়ে যায়, কোনদিন মাছের কাঁটা ফুটে কেলেঙ্কারী।

ওকে নাতমাসের মেয়ে ওর মা স্বর্গে যান। সে আজ অনেক বছরের কথা। সেই থেকে আমার মা টুটুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করছেন। তা টুটু, যেন ওর মাকে ভুলতে পারে না। এক এক সময় আমার খুব আশ্চর্য লাগে, বোধ হয় প্রত্যেক সন্তানের কাছে মায়ের একটা বিশেষ স্বাদ, স্পর্শ ও গন্ধের অনুভূতি থাকে। কণপ্রভা চলে যেতে টুটুকে নিয়ে বড় বিপদে পড়তে হয়েছিল। স্তনের সময় বোতলের দুধ খেলেও টুটু মার বুকের দুধের জন্য ছুঁকছুঁক করত, সে দুধে যে মানুষ-মানুষ গন্ধটা থাকত টুটু যেন বোতলের দুধে সে গন্ধটা পেতনা, পেতনা উষ্ণতা কি মমতাও। টুটু একটু বেলা আর খেতে চাইত না, বিরক্ত করত, কাঁদত। মা মনে মনে গজ গজ করতেন, আমি শুনতে পেতাম,—ঠাকুর। কত অপরাধই যে করেছি!—সে লক্ষীছাড়ী চলে গেল আর আমি এ বোঝা বয়ে বেড়ানর জন্যে পড়ে রইলাম। কোনদিন বা আমাকে বলতেন,—আমি আর পারিনা সুরেন, এবার তুই বিয়ে-থা কর। এ দুধের ছেলেকে কি মানুষ করা আমার কাজ।

কিন্তু আমার আর বিয়ে করবার মন ছিল না। কণপ্রভা চলে গেলে, তার চকিত আলোয় আমি বসেই থাকলাম, নতুন কোন লক্ষী কি লক্ষকে তার শূন্য স্থানে এনে বসাতে ইচ্ছা হল না। আমার ভালবাসার কণাটুকু প্রভা সকল করে নিয়ে চলে গেছে, একমাত্র এই রক্ত-মাংসের দেহটা পড়ে আছে। ভালবাসা ছাড়া শুধু দেহ সকল প্রস্তাবনা উচিত নয়, অন্যায়, আমি ভাবতাম।

প্রথম যৌবনে বিয়ে করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বন্ধু বান্ধব ইয়ার বক্সী নিয়ে জীবনটা মন্দ কাটত না, শেষে মায়ের ধান ধান, সংসারী হওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ও শূন্য শয্যায় একা রোধের নিদারুণ ক্লান্তি আমাকে উত্যক্ত করে তুলল। রাত্রি যেন কালো একটা মেয়া টোপ মশারি, নিশ্ছিদ্র, বাতাসবিহীন,—আমার দম আটকে আসত, আমি হাঁসফাঁস করতে করতে চিৎকার করে জেগে উঠতাম, ঘামে জবজবে শরীর, আমি নিঃসঙ্গ, একা যেমনা বোধ করতাম।

কণপ্রভা ছোট খাট, গোটগোটে মানুষটি। গায়ের রঙ, মং উজল বর্ণ, সাঁঝের মত মুখ, টিকালো নাক। শাহকোনের বেঁধে সে যখন লক্ষ্মীজের প্রখর সূর্যালোকে কি সন্ধ্যার আসছা অন্ধকারে খুবসুরে পায়ে ছোটাছুটি করে বেড়াত তখন খুব মজা লাগত। মনে হত কোন ঘরের পাখি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বউ-মানুষ হয়ে টুকটুক করে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

আদুরি আদুরি ভাব, কোন কথা কণপ্রভাকে জোর করে বলার জো ছিল না। যদি একটু চেঁচিয়ে কিছু বেগে আমি কথা বলতাম তাহলেই ওর পাপড়ি ফুরফুরে গোলাপি ঠোঁট দুটো বাতাসের ফোল্লা মারা ফুলের পাপড়ির মত কেঁপে কেঁপে উঠত। কণপ্রভার চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ত খানিক, বার দুঁচার কেমন যেন চমকে চমকে উঠত সে। মুখে কা বলতে না, কেবল অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না, নিজেকে কোথায় যে গোপন করত কে জানে!

কণপ্রভা খুশী থাকলে, খুব মজা করত। বয়সের ভার ওর ছিল না, ছোট ছেলের মত সে সব সময় হৈ চৈ করে বেড়াত, সব সময়ই হাসত। ও কখনও জোরে জোরে কথা বলে হাসত না, হাসিটা ওর সারাদেহে ঝিলমিলে ফোয়ারার মত ঝুলে উঠত, আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম।

অনমবয়সের জন্য আমার ক্ষোভ ছিল। কখনও

সেদিন আমি বলেছিলাম,—তোমার মত দুধের বাচ্চাকে বিয়ে করা আমার উচিত হয়নি।

কণপ্রভা একমুখ হেসে বলত,—একটা আধভুমড়ো মেয়ে দেখে বিয়ে করলেই পারতে, প্রথম দিনই আঁচলে বাক্সপ্যাটরার চাবি খুলিয়ে গিন্নী হয়ে বসতাম।

আমি হাসতাম, বলতাম,—আমি তো বুড়ো প্রভা।

দু হাত কপালে ঠেকিয়ে কণপ্রভা বলত,—সেই ছ'বছর বয়স থেকে যোলশ মাসে শিব গড়ে পুজো করে আসছি আমার বর বুড়ো হবে না তো কি কার্তিক ঠাকুরটি হবে।—বলার সাথে সাথে কণপ্রভা কড়ে আঙুলটি তুলে ধরে নাচাত, আর দুলে দুলে হাসত। সে হাসিতে যোগ দিয়ে আমারও বয়সের ভার কমে যেত যেন, হালকা বোধ করতাম।

বছর খানেক খুব আনন্দে কাটল, তারপর টুটু পেটে এল। কণপ্রভাকে দেখে আমার বড় কষ্ট হত। আমার সঙ্কোচ বোধ হত, নিজের লোভী আনন্দের জন্য কণপ্রভার ওপর অন্যায় করেছি এমন কিছু মনে হত আমার। কণপ্রভা সে কথা শুনে এলিয়ে হাসত।—তোমার আধার সবটাতেই ইয়ে মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ টুটুর থা কিন্তু সবটাই কি কষ্ট? তুমি বলনা, তোমার-আমার মা দিদিমারা এ কষ্ট সহ্য করেনি, তোমার-আমার মেয়ে-বৌ করবে না?

ঠিক সময়ে টুটু হল। সাধ্যি-সোধ্যি। আমার মত দশা চওড়া, বাপের মত রং। সব মিলিয়ে সুন্দর একটা ছুটফুটে বাচ্চা, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে, আদর করতে ভাল লাগে। কিন্তু তাকে প্রসব করেই প্রভার শরীর ভেঙে গেল। ওর শরীরে কোথায় যে একটা টুনকো ভঙ্গুর পদার্থ ছিল, সে কথা আগে বোঝা যায়নি। এখন বোতলের নৈতা বের হয়ে আসতেই কাঁচের বোতল টুনকো টুকরো হয়ে গুড়িয়ে গেল।

আমার মা টুটুকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলতেন,—রাক্কস! রাক্কস আমন সোনার মাটিকে খেলে। আমি বুঝতাম কণপ্রভা রোগশয্যায় শুয়ে ভুগছে। টুটুকে চোখের আড়াল করতে চাইত না প্রভা। কতদিন গভীর রাতে টুটুর ঘুমন্ত মুখের দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে থাকত প্রভা, যেন দেখে আশা মিটছে না! টুটু মেয়না করলে প্রভা হাসছে, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস চাপছে।

প্রভা বোধ হয় কিছু বুঝেছিল। একদিন আমাকে বলল—দেখ আমি চলে গেলে টুটুর বড় কষ্ট হবে।

আমি বলেছিলাম,—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সে আমার কথার উত্তর দিল না, ক্ষণকে কিছুক্ষণ টুটুর মুখে তাকিয়ে থেকে বলল,—আমাকে একটা কথা দাও তুমি।—আমি চলে গেলে তুমি খোকাকে অবহেলা করবে না, দেখবে, ভালবাসবে।

কি যা তা বকছো। আমি রাগ করেছিলাম। —ও কি শুধু তোমার ছেলে, আমার নয়?

প্রভা আমার চোখে চেয়ে হাসল, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। আমার হাত ধরল প্রভা।—এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।

আমি বুঝতে পারিনি প্রভা সত্যি সত্যি চলে যাবে। যমরাজের শমন নিয়ে পেয়াদাগুলো অনেকদিন ধরেই ঘোরাফেরা করছিল, ঠিক মতন ধাপে পাচ্ছিল না। কিন্তু টুটু যখন সাত মাসের, নবে অন্নপ্রাশন হয়েছে, তখন একদিন জলের কলসী কাঁকালে নিয়ে দাওয়ায় উঠতে গিয়ে প্রভা পড়ে গেল, আর ঠিক সেই সময়েই পেয়াদাটা এসে হাতেনাতে শমনটা ধরিয়ে দিল প্রভার। কয়েক ঘণ্টা আনচান করে প্রভা চলে গেল। যাবার আগে জ্ঞানের মত হল একটু। প্রভা আমার চোখে চোখ রেখে অস্ফুটে যেন বলল,—এত সুখ, এত ভালবাসা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু উপায় নেই। টুটুকে দেখ তুমি। —দেখবে?

সে মুহূর্তে প্রভার দিকে তাকিয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললাম,—ভয় নেই প্রভা। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি। তোমার টুটুকে আমি দেখব—দেখব—দেখব। আমার গলা জলে ভরে আসছিল।

গত দু'দিন ধরে টুটুর খাওয়ায় বড় গোল হয়েছে। এমনিতে কাহিল ছেলে আরও কাহিল হয়ে পড়েছে যেন, গলার নীলচে শিরাগুলো যেন ফুলে ফুলে ওঠে, চোখ দুটো বের হয়ে আসছে, মনে হয় এখুনি যেন দম বন্ধ হয়ে নীল হয়ে যাবে ছেলেটা।

আজ এই ছুটির সকালে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছিলাম। মা বললেন,—ওখানে পরে যাস। আগে আমার একটু টাটকা মাছ এনে দে।—আহা-হা! ছেলেটা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। দু'টি ভাত দি' মুখে।

বাজারের থলি নিয়ে আমি টুটুর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার পায়ের শব্দে টুটু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আশ্চর্য! কত রোগাই না হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, মুখ কত যেন লম্বাটে, গালের ভেতর গাল, নাক খাঁড়ার মত। অমন যে বড় টুটুর ভাত যেন হাতের পালকের মত সাদা। টুটু মুখে বুড়ো আঙুল দিয়ে চুষছিল। আমাকে দেখে টুটুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুধের সরের মত শাদা একটু হাসি, টুটু ফিসফিস করে বলল,—বাপি!

টুটুকে অকৃত্রিম শরীরে ভালবাসার হাত রেখে আমার মায়া হচ্ছিল।—ইস্! কি চেহারাই হয়েছে ছেলেটার।

টুটু বলল,—বাপি!

উম।

মিমি আসবে না?

এই তো যাচ্ছি বাবা।—এক্ষুণি মিমি আসবে।

টুটুর চোখ দুটো চকিতে ঝলসে উঠল। তারপর বলল,—বাপি মামি আসবে না?

আমি টুটুর মাথায় হাত বোলাচ্ছিলাম।—আসবে রে। আসবে।—তোর জন্যে একটা ভাই আনতে গেছে যে।

ভাই? টুটুর চোখ বড় বড় দেখাল।

হ্যাঁরে! ভাই! তুই খেলা দিবি, খেলা করবি।

টুটু বলল,—বেশ হবে। তারপর আবার বলল,—যাও বাপি মিমি আন। মাহকে টুটু মিমি বলে।

এই তো যাই।

না। একটি যাও। টুটুর গলায় যাইনা, ধরটা কেমন কান্না কান্না শোনাল।

রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই নিচে এসে টুটুর মামির বাড়ির দিকে তাকালাম। তখন টুটুর দাঁত ওঠার সময়, আমার অবর্তমানে ও বাড়ির বৌটি বেঁচেই আছে না। টুটুর তখন দিনে দশবার দাস্ত হচ্ছে, প্যাচপেচে সবুজ রং, বজবজে ঘেন্না। আমার তো আমার জেরবার,—কি হবে? কি করবো? ডাক্তারে কি বলল?

মা বলতেন,—তুই খুব সুখের। তোর আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনা। তুই আমার পেটে হয়েছিলি না আমি তোর পেটে?

একগলা ঘোমটা দিয়ে বৌটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা'র কথা শুনছিল। শুনে খিলখিল করে হেসে বসে উঠেছিল,—মামা যেন কি! এ সময় ওরকম হয় জানেন না?

ও মেয়েটি বড় ভাল। টুটুকে বড় ভালবাসে। টুটু যখন ছোট তখন সারাদিন নিয়ে থাকত, কখনও চন্দন পরাত, কখন শাড়িনের জামা পরিয়ে মাথায় চুলে ঝুঁটো বেঁধে বিড়িপুচ্ছ গুঁজে কোলে নিয়ে কখন কমর করে পা দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াত, যেন একবাশ গহনা পরে হাঁটছে।

টুটু বড় হচ্ছে। হামাগুড়ি ছেড়ে দাঁড়াল ছেলে টলমল করে হাঁটে, আছাড় খায়, আবার হাঁটে, আলমাটি চাল করে বেড়ায়। একটু একটু আধো আধো কথা বলে, আমার মা'কে বলে, 'ঠামুমা,' মেয়েটিকে 'মাছি', আমাকে বলে 'বা-আ-আ।' দিনরাত ঘর ঘর লেগেই আছে, তাকে নিয়ে সবাই শশব্যস্ত।

এক একদিন মা রেগে যেতেন। একে বয়েস হয়েছে, চোখে চাপলে, তার শোকতাপা মানুষ, ব্লাডপ্রেসার আছে, উপোষটুপোষ। এক একদিন আর পারতেন না। বলতেন,—আমি আর পারিনা সুরেন। তুই এবার বিয়ে কর।

এ রকম কথা কোনদিন মেয়েটি শুনে থাকবে। একদিন বলল,—ঠাম্মা! তুমি বাবাকে 'বিয়ে কর, বিয়ে, কর' বলে দিনরাত কেন তাক কর বল দিকিনি?

সেদিন ছুটির বার, আমি ঘরে শুয়ে। মা দাওয়ায় বসে বাছিলেন, মেয়েটি টুটুকে কোলে নিয়ে আত দি—দুধ দি—মাছ দি—বলে কাতাকুতু দিয়ে খেলা করছিল। মা তাদের ছিবড়ে চিবোতে চিবোতে বললেন,—আমার ছেলের বিয়ে দেব, তা তুই বলার কে লা!

বৌটি সরলা। টুটুকে বুকে চেপে ধরে বলেছিল, —না বিয়ে হবে না। বিয়ে হলেই সে এসে আমার সোনার টুটুকে কেড়ে নেবে।

মায়ের চোখ চিকচিক করে উঠেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও। মা বলেছিলেন,—পরের ছেলে কোলে নিয়ে ক'দিন আর সাধ মেটাবি বৌ। এরপর যখন তোর নিজের হবে?

হলেই বা! কি হয়েছে!

আজ কিবা দিন কিবা রাত্রি। তখন যে বুকে জোড় বাঁধবে না, বৌটা ছেটে দূর করবে। সে যে বাড়ীর টান বাছা, তখন কি আর এসব ভাল লাগবে।

আমার মনে হল বৌটির মুখ বোধ হয় এতোটুকু হয়ে গেছে।—তুমি বড় একালবেঁড়ে মা। বৌটি বলেছিল।

টুটু যত বড় হচ্ছিল তত দুষ্টুমি বাড়ছিল। আমার বাড়ি পালাবার উপায় নেই। টুটু নিত্য হাজির।—বাপি আমি লালি কানাব;—চুলির দিয়ে আমাকে ঘোড়া বানত। মুখে লাগাম দেবার মত একটা গামছা গলা দিয়ে ঘুরিয়ে টানত,—হেট ঘোড়া! হেট!

টুটু অসুখে পড়লে আমি বড় বিপন্ন বোধ করলাম। আমার চাকরি, মা বুড়ো মানুষ, টুটুর বাপি ও বাড়ি। অনেকদিন বাদে প্রথম পোয়াতি হয়েছে, বাপ মা এসে নিয়ে গেছে। যাবার দিন সে কি কান্না বৌটির। টুটুর শরীর তার আগে থেকে খারাপ যাচ্ছিল। টুটু আঁকড়ে ধরেছে,—বাপি তুমি যেওনা, বাপি যেওনা।

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল বৌটি, আমাকে প্রণাম করল, বলল,—দাদা দেখবেন টুটুকে। আমি যত শিগ্‌গীর পারি আসব। তারপর কি যেন কানে কানে বলে ভোলাল টুটুকে। টুটু হেসে বলল,—আচ্ছা। বেশ।

টুটুর অসুখ বাড়ছিল। একটা অশরীরি ভয় মাকড়সার জালের মত আমাকে ছেঁকে ধরত। এক একসময় অসহায় বোধ হত। আমার মনে হত প্রভা যেন আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কথা আদায় করে নেবার জন্যে কাছে পিঠে কোথাও লুকিয়ে আছে। আমাকে পরীক্ষা করছে, বলছে,—তোমার মুরোদ বোঝা গেছে। একটা দুধের বাচ্চাকে ঘরে রাখতে পারলে না তো! আমাকে আবার ছুটে আসতে হল।—প্রভাকে আমার ঈর্ষা হত, আবার ভালবাসাও হত। স্বর্গ থেকে প্রভা সাহায্য না করলে টুটুকে কি আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারব?

টিনের গামলায় রাখা জলে চাপড় মেরে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল,—বাবু মাছ! কোলের ছেলের মত খলবল করছে।—অ্যাত! বাবু অ্যাত!

আহা হা! অ্যাত। বিঘৎ খানেক লম্বা লম্বা চাটকা পোনার চারা। চিকণ গায়ে রোদের আভা ঝলমলি আলোয় জলে ছলছল করছে। সরুটা পোনার ঠোঁটে তখন কালচে আভা ফোটেনি, ঠোঁটের রং সাদা, ডিগডিগে পাখনাগুলো বুঝি ছুঁ দিয়ে ছেঁড়া যায়। বুক ফেরা সোল গোল মণি, পুটুস-পুটুস করে তাকাচ্ছে, দেখলে মায়া হয়।

আমার কি রকম যেন মনে হল। টুটু তো একলা একলা বিছানায় শুয়ে থাকে, বের হতে পারে না, সঙ্গী নেই, সাথী নেই, খালি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা। তাকিয়ে তাকিয়ে, একা একা কদম গাছের মাথায় রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি, কি পাখিটাখির খেলাটেলা দেখা। কখনও কখনও দিদিমণি যখন সুর করে টেনে টেনে বানানটানান কি বাবারটাবার বিক্রী করে, তার সেই সুরেলা শব্দ শোনা;—বানান—নে—বে—গো—বা—ল—ন—তারপরই কাঁসির ঠং ঠং বাজনা, কিবা বরফ চাই, —কুলপী বা-বা-ই-ই।

মা মরা এই নিঃসঙ্গ একা ছেলেটার কথা ভেবে বুকের মধ্যে আমার হু হু করে উঠল। আহা! আজ অবশ্যই নিয়ে যেতে পারলে বেশ হবে। নিয়ে গিয়ে একটা বালতিতে ছেড়ে দেব। বালতি ভর্তি জল, জলের মধ্যে

তরতর করে জল কেটে খেলা করবে, লাফিয়ে উঠবে, সাঁতার দেবে। বেশ হবে, বেশ মজা, টুটু, খুব খুশী হবে, হাসবে। কল্পিকের সে হাসি মনে করে আমার বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠল।

বাড়ি এসে আমার আর তর সইল না। আমি ডাকলাম,—টুটু! টুটুন! দেখ কি এনেছি।

কি কি এনেছ? টুটু তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

এনেছি মাছ এনেছি।—এই দেখ জলে ছেড়ে দেব কেমন নড়বে, খেলবে, সাঁতার দেবে।

যাঃ। টুটুর চিকন গলার স্বরে অবিশ্বাসের সুর।

যাঃ। নয় সত্যি, দাঁড়া এক বালতি জল আনি।

জল এনে খলি থেকে মাছগুলো উপুড় করে ঢেলে দিলাম। টুটু কাৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখতে থাকল। বুড়ো আঙুল মুখে, আঙুল চুষছে টুটু। মুখে কেমন একটা ধমথমে ভাব, চোখ জ্বলছে। গাল অল্প অল্প লাল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। মাছির ভন-ভনানির মত আওয়াজ হচ্ছে, টুটু সুর টেনে টেনে বলছে, —জি জি!···জি-ই-জি-ই-ই!···

ছুটো মাছ জলে পড়ে একবার লেজের পাখনা নাড়ল, তারপর পাথরের টুকরোর মত সোঁ করে নিচে নেমে গেল, অপর ছুটো বেশ খানিক নীচে নেমে গিয়ে ঘুঁড়িয়ে ঘুঁড়িয়ে উপরে উঠে আসতে থাকল। স্থির স্থির করে পাখনা নড়ছে, জলে ঢেউ জাগছে। টুটু হেসে উঠল। আগে ও খিলখিল করে হাসত, এখন জোরে হাসতে পারে না, জোরে হাসতে গেলে দমবন্ধ হয়ে আসার মত হয়, কষ্ট পায়। হাসতে হাসতে টুটু বিষম খেল একটা, বিষম খেয়ে কফিয়ে উঠল। আমি তাকিয়ে দেখলাম টুটু তন্ময় দৃষ্টিতে মাছের বালতির দিকে চেয়ে আছে, চোখের পলক পড়ছে না, নিশ্বাস বড় বড় পড়ছে।

মাছ ছুটো জলের ওপর উঠে এসেছে। ওদের ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট কাঁপছে, চোখের সাদা সাদা অংশ আরও সাদা, ওরা অতি কষ্টে বাইরের আলো দেখতে চাইছে, বাবি খাচ্ছে, জল কাটার পুট পুট শব্দ উঠছে, পিঠের জোড়া পাখনা একবার জাপানী প্রাখার মত খুলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে।

প্রথমের নীচে নিশ্বাস ফেলতে আলো যেমন চমকে ওঠে তেমনি চমকে উঠল টুটু। নিশ্বাস ফেলে টুটু আর্তনাদ করে উঠল,—বাপি ডিজি মরে যাচ্ছে।—বাপি!

দূর বোকা! কে বলল? আমি হাতের খাবার জল নেড়ে দিলাম। সোনা ছুটো চমকে ফেলে উঠল, ওদের ঘুম-ঘুম ভারী দেহে কে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিল, জোরে জোরে বাবি খেল ছু'চার বার, তারপর একটা চক্কর কাটল।

আমি বললাম,—কেমন!

টুটুর চোখ বড় বড়, কোটর থেকে বের হয়ে আসছে, মুখ হাঁ, ঠোঁটের কোন বেয়ে লালা গড়াচ্ছে, মুখের রঙ লাল, টুটু হাসছে। ওর চোখে মুখে যারা রয়েছে সে হাসি চলকে পড়ছে, জোরে জোরে হাততালি দিল টুটু, সে হাততালি শুকনা বাঙ্কানের মত কাঠ কাঠ শোনাল।

জোড়ার সিঁড়ির মত একটা মাছ ঘুরছে। অন্যটা গোল হয়ে মেঝে যাচ্ছে, সাঁতার দিচ্ছে না। একটু একটু করে নিজের ভারেই নীচে নামছে। দু এক ফোটা বুদবুদ টুপটাপ, পুটপাট করে ফুটে উঠল, টুটু নিশ্বাস ফেলে দেখছিল, —বাপি।

অন্যটাও ঘামতে সুরু করেছে, আমি হাত দিয়ে আবার জলটা নেড়ে দিলাম, অন্য মাছটাও বাবি খেতে খেতে নীচে নামতে থাকল। টুটু এবার বিষম চীৎকার করে উঠল, —বাপি!

—টুটুর সে চীৎকারে ভূবন মানুষের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা ছিল।—তুমি ভুল বলেছ,—মিথ্যে বলেছ,—ওগুলো মরে গেছে বাপি, মরে গেছে।

হু হু করে কেঁদে উঠল টুটু। চোখের জলে গাল ভাসছে, গলার নীল নীল শির ফোলা ফোলা, মুখে প্রলয় করছে, মুখ রক্তলাল, চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসছে, মুখ হাঁ করে ওই শোনাগুলোর মত বাবি খাচ্ছে টুটু, এক ফোটা বাতাসের অভাবে সমস্ত শরীর ছমড়ে মুচড়ে বেঁকে বেঁকে উঠছে।

আমি ঠিক তখন কিছু দেখছিলাম না, আমার দৃষ্টি জলে ঝাপসা হয়ে আসছিল, কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কান ভোঁ ভোঁ করছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমার আর টুটুর মধ্যে

অকলাস্ত বাবধান, জলের এপারে তীরে আমি বসে আছি আর জলের নীচে এক কোটা বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে খির হয়ে আসছে টুটু।

কোথাও যেন শাড়ির খস খস শব্দ, চুড়ির টিংটিং আওয়াজ। ছমছমে আলোয় ঘর ভরা, দুই একটা প্রদীপে আধার ঠেকানো আছে। আমার দু'হাতের মুঠোয় মরা মাছগুলো। বোবা চোখে সেদিকে তাকিয়ে নিশ্বাসের মত ফিস ফিস করে আমি বললাম,—আমাকে তুমি ক্ষমা কর প্রভা। তুমি ওকে নাও।—কেউ না কই থেকে।

আমার গলা পুড়ে যাচ্ছিল,—চোখ জ্বলছিল। বহুদূর থেকে প্রভার নিষন্ধ হাসি শোনা গেল যেন,—থাক। তোমার অনুরোধ রাখা হয়েছে। ঘর শুধু, শান্ত, কোথাও কিছু শোনা যাচ্ছিল না, দু একটা শব্দের বুদ বুদ তখনও যেন টুপটাপ করে জলের বালতিতে ফুটছিল। টুটু কি তখনও আমায় ডাকছিল?—বাপি। বা—পি—ই—ই—ই করে ডাকছিল?

স্কেচ। নিতাই ঘোষ (পেন্টাসে ক্যালকাটা)

হৃদয় নিয়ে

সত্যেন্দ্র আচার্য

আলস্য, যেন পালক ঝরার মত ঝরে ভোর হয়ে গেল। কিঁকে জ্যোৎস্নায় রুপালী আস্তরণের বাইরে কাল কাল জমাট অন্ধকার একটু আগেও দাঁড়িয়েছিল গাছেদের মত। আলো ফুটল এখন। বাইরে তাকিয়ে তা নির্নিমেষ চোখে দেখছিল অমিতেশ। সাদা থেকে আরো সাদা হচ্ছিল ভোরের আলো। অমিতেশের চোখের ওপর থেকে অন্ধকার একসময় সরে গেলে আকাশ নিষ্কৃতি পেল। আরো সাদা হল।

কোমল বিছানার ওপর আলস্য পাশ ফিরল অমিতেশ এখন। ঠিক পাশে নয় কিন্তু ইচ্ছার কাছেই সুমিত্রা শুয়ে আছে। পাশের খাটে। অমিতেশ লক্ষ্য করছিল, সুমিত্রার একটা ঘুমন্ত হাত খাটের ওপর থেকে মেঝের দিকে ঝুলে আছে। আরেকটা বেঁকে কেমন ধনুক হয়ে বুকের কাছটাতে পড়ে। বাসি কাজল-রেখা বোজানো চোখে ঠিক যেমন রাত্রে না। আবির রঙের টিপ ঈষৎ মুছে গেছে। দামী পাউডারের প্রলেপ মুমূর্ষুর মত। তবু এখনো গলা জড়িয়ে। দামী স্নীপিং গাউনের জৌলুষ, কারুকাজ যেমন অমিতেশ। সুমিত্রার ঘুমন্ত চোখ। ভুরু। অমিতেশ কাল রাতে এখানে উঠে আসার সময় যেমনটি দেখেছিল, এখনও তেমনি আছে। বুকের ওপর গাউনের ফাঁস খোলা। হাঁ হয়ে আছে।

অমিতেশ তাকাল। খুব লোভী চোখে অমিতেশ এখন পাশের খাটে এল।

না। সুমিত্রা অমিতেশের স্পর্শে চোখ খুলল এখন। খুলে একটা হাত বুকের ওপর চাপা দিয়ে বলল, না। আর না। ফাঁস লাগাতে চাইল।

খালি দুষ্টুমি। অমিতেশ ঠোঁটের ওপর থেকে মুখটা তুলে নিয়ে বলল। সুমিত্রাকে পাশ ফিরতে না দিয়ে কানে

কাছে বলল, কেন ভাল লাগে না ?

জানি না। সুমিত্রা পাশ ফিরল না। অলসভাবে চোখ বুজিয়ে বলল।

ভোরের আলো ফুটছিল। এত কাছের, এত আপনার জেনেও তবু কেমন সংশয় অমিতেশের। তবু কেমন মনে হয় সব যেন বলছে যাচ্ছে ওই আলোর মতন। বড় বড় হচ্ছে, ফুপলী চিত্তাবলা বলে বড় দুনাম বাড়ছে এবং অর্থ, তত যেন নিয়মগুলো বদলাচ্ছে। তত যেন উত্তাপহীন হয়ে পড়ছে অমিতেশ। আর তখনি এই অধিকারকে বাচাই করতে চায় অমিতেশ। অমিতেশ অনেকক্ষণ বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে বলল, কি জানি, যেন খালি মনে হয় তুমি বড় দূরে সরে যাচ্ছ। এক এক সময় মনে হয় যেন এক বছর আগেও আমরা আরো কাছের ছিলাম সুমিত্রা।

সুমিত্রা বাঁ হাতে যেন ভর দিয়ে উঠে বিছানার উপর বসল। ঘড়ি দেখল। বলল, তুমি হলে একজন নায়কের কিন্তুটারের স্বামী, মানে হাসব্যাণ্ড, না? লোকের চোখে তুমি কত বড় বলত? বলে হাসল।

কিন্তু তোমার চোখে? অমিতেশ সংশয়ের সুর আনল গলায়। এসে নিজের খাটে উঠে এল। একটা সিগারেট জ্বালাল। অমিতেশের মনে হয় সুমিত্রা ছবিতে নামার পর থেকে, নাম এবং অর্থের পর থেকে যেই সিনেমার মতই যেন তার সঙ্গে অভিনয় করে চলেছে। আর তখনি মনে হয় স্বামীর থেকে, কর্তৃত্ব থেকে যেন পিছিয়ে পড়ছে অমিতেশ। একটা বোধ, সংশয়, একটা জ্বালা কেমন হঠাৎ মাথার ভেতর তখন উঠে আসে। তারপর রক্তে, রক্ত থেকে শিরায় এবং পায়ে সারা শরীরের ভেতর বিদ্যুতের মতন কেমন ছড়িয়ে পড়ে। কী জানো, অমিতেশ সিগারেট থেকে ধোঁয়া চুষে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বলল, আমি যেন তোমার চোখের ওপর একটা অর্থহীন ভাবে বেঁচে আছি। আর এক ঝলক ধোঁয়া গলার ভেতর তুলে নিল অমিতেশ। বলল, যার কোন মানে নেই, যেন ক্রীতদাস হয়ে আছি। কেমন একটা অস্পষ্ট যেদনা মিশিয়ে অমিতেশ বলল, সাধারণ মানুষের সামনে তুমি যাবেনা বলে কি আমাকেও তার মাশুল দিতে হবে? আমি যেন পশু হয়ে গেছি।

সুমিত্রা বুকের কাঁস লাগাচ্ছিল। হাটুর দিকে গাউনটা টেনে একটু নামিয়ে দিল। দিয়ে হাসল। বলল, ওতে একটা চা তৈরী হয়। একটা ইনিউনন।

এই হাসি, ভঙ্গি, এই কথা বলার চঙ, সব যেন খুব নকল, খুব কৃত্রিম বলে ইদানীং মনে হয় অমিতেশের। অমিতেশ একটু কঠোর গলায় বলল, কথা বললেই যে হাসতে হবে তার কি মানে আছে? এটা তোমার স্টুডিও নয়। ফ্লোর নয়।

সুমিত্রা এবার অমিতেশের চোখের ওপর ঘুমের পোশাক খুলে ফেলছিল। তারপর বাতিরেই সযত্নে লাগিয়ে রেখে যাওয়া টেবিলিনের স্কীন-টাইট ল্যাকেটটা পরে নিয়ে আয়নায় মুখ ফিরে নিজেকে দেখল। দেখে নিয়ে বলল, গুড মর্নিং ডার্লিং, বাই বাই।

অমিতেশ কথাগুলোয় যেন ভ্রুক্ষেপ করল না। কিন্তু একটা জ্বালা অনুভব করল। সুমিত্রা দ্রুত পায়ে নেমে গেলে খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল না অমিতেশ। যদিও অমিতেশ জানে এ সময়টা সুমিত্রার শরীর চর্চার। আধিব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার। তাই যখন সময়ে মোটর বাইক চেপে এক, দুই, তিন করে দশ অবধি গোনবার জন্যে শহরের দামী ব্যায়ামবিদ দামী টাকায় লোভে মোভদার ঘরে এসে বসে আছে। দেহ লাবণ্যের জন্য সুমিত্রা তার চোখের ওপর এখন আসন করবে। খুচরো দু' একটা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত পা চোখের ওপর তুলবে। তারপর দামী টাকায় ব্যায়ামবিদ দেহ লাবণ্যের মত শরীরময় ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল সুমিত্রা। বাথরুম ঢুকে স্নানঘরে ঢুকবে। সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে দু' জন পরিচারিকা। একজন ম্যাসাজ-মালিশ করবে। তারপর সে চলে গেলে অন্যজন স্নান করিয়ে দেবে। জলের সঙ্গে রূপচর্চার উপকরণ যে-টুকু এবং যা যা মেশানো দরকার তা কথামত সব মিশিয়ে রাখবে সেই দুধ না ভিজিয়ে সাওয়ার নেবে সুমিত্রা। দশ মিনিট। তারপর খাবার টেবিল। খাদ্য বিচারের

তালিকা মাসে মাসে বদলে দেবেন ডক্টর, ডি. এম, আর, পি, পি, ডাঃ সেন। হাসির জন্যে চাই ভাইটামিন এ। সুঠাম অথচ মেদহীন স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার প্রোটিন। কিন্তু ভিটামিন বি। টেবিলে ইদানীং আর নজর দেয় না অমিতেশ।

অমিতেশের একটুক্ষণ পরে খেয়াল হল সিগারেটের অসতর্ক আগুনে বাঁধী বেডকভারটা আঙুলসমান মত ফুটো হয়ে গেছে। ফুটোটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে অতীতের কথা ভাবছিল অমিতেশ।

এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে সুটিং দেখার জন্য স্টুডিওতে ঢুকছিল অমিতেশ। আর ঢোকার মুখেই দেখা। 'আরে, অমিতেশ না?

আপনি! অমিতেশ অবাক গলায় বলেছিল।

সুটিং আছে আমার। সুমিত্রা উজ্জ্বল হয়ে বলেছিল। কাকুর মুখে শুনেছিলাম আপনি নাকি বিলেতে গেছেন?

অমিতেশ উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। অবাক চোখে দেখছিল। সুমিত্রা বলেছিল, কী দেখছেন ওমনি হাঁ করে, অবাক দিচ্ছেন না যে?

এত সুন্দর আপনি আগে কিন্তু মনে হয়নি। অমিতেশ উচ্চারণে রসিকতার টান করেছিল।

যোৎ, এতো মেক-আপ। মেক-আপে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে। আসল রূপ খানিকটা চাপা পড়ে কিনা। সুমিত্রা আবার হেসেছিল। তেমনি উজ্জ্বল হেসে আবার বলেছিল, কিন্তু আমার জবাব দিচ্ছেন না যে? সুন্দর করে চোখের ওপর আবার হেসেছিল সুমিত্রা।

না খাইনি। ভাল লাগল না।

ভাল লাগল না? একটু টেনে টেনে উচ্চারণ করেছিল সুমিত্রা। মাই গুডনেস, কি টেষ্ট! সেই খামখেয়ালী আজও আপনি ছাড়তে পারলেন না। যাক্‌গে সওগোল আপনার।

অমিতেশের সব কেমন ভাল লাগছিল। এই পরিচিত স্বর, এই হাসি। সেই পরিচিত শরীরের ওপর অত লাবণ্য দেখছিল অবাক হয়ে অমিতেশ। সুমিত্রা বলেছিল, ওমনি করে তাকিয়ে আছেন যে বড়। চলুন; কী ভাববে লোকে।

তারপর সুটিং-এর এক ফাঁকে একটু অবসরের ভেতর সুমিত্রা বলেছিল, কাকুর মুখে তবু আপনার খবর পেতাম। কাকু আমেরিকা, আপনি সেই থেকে ডুব। ডুবেই গেছেন একেবারে।

ভুলি নি, সত্যি। অমিতেশ চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিল, সময় পেতাম না তাই।

মিথ্যুক। সুমিত্রা খুব ঘনিষ্ঠভাবের উচ্চারণ করেছিল। বেশতো, এখন কথা দিন যাবেন।

যাব।

তারপর দেখতে দেখতে সুমিত্রার কত নাম হল। তবুও সুমিত্রা বলত, বয়ে তো করলে একজন শিল্পী হব বলে। না?

কে বললে?

নইলে করতে? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ভুরু ওপরে তোলে সুমিত্রা।

তার চেয়ে আরো বড় তুমি। অমিতেশ অপলক তাকিয়ে বলত, এই চোখ দুটোর অন্তত। করতাম না মানে।

আচ্ছা—

কী। তেমনি অপলক তাকাত অমিতেশ।

আর যদি কাল না পাই, না নাম হয় আর?

তাহলে কি আমার চোখে তুমি ছোট হয়ে যাবে?

তখন দুঃখ করবে না তো?

কিসের দুঃখ।

সত্যি দুঃখ হয় এক এক সময়, তুমি আমাকে কত ভালবাস। আমার জন্য কত ছেড়েছ তুমি। অনেক সহ্য করেছ। বুকের ওপর মাথা রাখতো সুমিত্রা। সত্যি, কত ভালবাস তুমি।

অমিতেশ কপালের ওপর মুখ ঘষত। তুমি আমাকে সব দিয়েছ সেটাও কি কম লাভ আমার? প্রতিদিন মনে হয় তুমি যেন নতুন করে বাঁচিয়ে রাখছ আমায়। সাদা ঘাড় দেখত অমিতেশ। চোখ, ভুরু। দেখতে দেখতে এক সময় তন্ময় হয়ে চোখে গলায় খুঁজে মুখ ডুবিয়ে বলত, তুমি যে এত কাছের আমার, তা যেন ভাবতেই পারি না সুমিত্রা।

এতক্ষণ পরে ভাবনা শেষ করে অমিতেশ দেখল সুমিত্রা সামনে দাঁড়িয়ে। পরিপাটী বেশ বিন্যাসে সুমিত্রা কথা বলল, আরে আরে, এ কি ?

কি ? যেন একটু চমকে তাকাল অমিতেশ। কী ?

দামী শাড়িটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সুমিত্রা একটা নিটোল ছন্দ তুলেছে শরীরের ওপর। একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছে ব'লে ব্লাউজের ক্রসটা বুকের ওপর বেশ আছে। সুমিত্রা জিভের ওপর একটা শব্দ তুলল বলল, ইস্! সেই অত সময় একটা ছুটো চাদরের ওপর বসে আছ ?

হুঁ।

গা ঘিন ঘিন করেনা ?

না।

ওটা টেম্পারামেন্টের ব্যাপার। সোজা হয়ে দাঁড়াল সুমিত্রা। কারো কারো করে, কারো করেনা। ক্রসটাও সোজা হল।

অমিতেশ কথা বলল না। সুমিত্রা আলত ধা

এই—

কী।

ভাখো।

কী।

একটা নতুন ধরনের খোঁপা। কেমন তুলে উঁচু করে বেঁধেছি বলত ?

তুলেটুলে উঁচুহুচু করে বাঁধতে বেশ ওস্তাদ তোমরা। ও ব্যাপারে মেয়েদের প্রশংসার অভাব নেই। তুমিই বা কম্‌তি যাবে কেন ?

ভাল লাগছেনা ?

অমিতেশ এবার অন্য কথায় গেল। বলল, তুমি হঠাৎ এত কালচু সময় কোথায় পেলে ? অমিতেশ চা-এর কাপের ভেতরই সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, তোমার স্পোকন ইংলিসের টীচার আসেনি আজ ?

না, কাল।

নাচের মাষ্টার ?

কী জানি, না বোধ হয়। তা হলে তো মিঃ সামন্ত জানাতেন। ডান হাতের কব্জি ঘুরিয়ে বেশ বড় গোছের চৌকো ঘড়িটা দেখল সুমিত্রা। এ্যাই—

কি।

সেন্টটা দেখ।

ওর তো আয়না আছে।

সে তো আর কথা বলে না ? কি যে তুমি, এই বলা ? বড় করে তাকাল সুমিত্রা।

ঠিক আছে।

ঘুরে দাঁড়াল সুমিত্রা। তুমি বললে ভাল লাগে। আবার ঘড়ি দেখল সুমিত্রা। পুশবটন টিপে টেলিফোনে যোগাযোগ করল নিচের ঘরে, মিঃ রায় ?

ইয়েস ম্যাডাম।

আজ ভেট আছে না ?

আগেই তো জানিয়েছি ম্যাডাম।

ইন না আউট ?

ইনডোর।

এনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট ?

আছে। ছ' টায়।

কী ব্যাপার ?

ইন্টারভিউ, ফিল্ম জার্নাল। মিঃ মুখার্জী।

লেটার্স এনি ?

নো, ম্যাডাম। জরুরী কোন চিঠি তেমন নেই।

গাড়ী রেডি ?

রেডি। আসুন।

ব্যাগটেউ রিসিভার নামিয়ে রেখে সুমিত্রা অমিতেশের গালে একটা কিস্ করল। করে বলল, গুডবাই।

চোখ বুজে সুমিত্রার যাওয়া দেখল অমিতেশ। চোখ বুজিয়েই দেখতে পেল মুঠিভরা কোমর। সাদা ঘাড়। চাঁদের মত এক চিলতে ব্লাউজ। সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের শেষ থেকে কোমরের অনেক নিচে পর্যন্ত দেহের নগ্ন অংশটুকু চোখ বুজিয়ে দেখল। নিভৃতে। শেষে চোখ খুলে উঁচুহুচু খোঁপার ওপর রাখতে না রাখতেই চোখের ওপর থেকে সুমিত্রা অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমিতেশ আর এক কাপ চা-এর কথা বলে ফিরে আবার নতুন করে সিগারেট ধরাল। তারপর সুমিত্রার গাড়ীর

শব্দে চোখ রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বুঝল, বেশ বেলা বেড়েছে। নিঃঝুম ঘর। নির্জন দুপুর নামবে একটু পরেই, মরুভূমির মত অসহ্য নিঃসঙ্গতা। এই রোদ, এই বেলা বড় হবে, তারপর বিষাক্ত একটা যন্ত্রণায় ভেতর এরা কেমন ঠেলে দেবে অমিতেশকে। তখন অই লাল বাড়। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোর সঙ্গে খেলা করবার জন্যে রাজ্যের হুজুরেরচ-এর শৌখিন বাড়। সুস্মিতার নির্দেশে কিনে দিয়েছে ম্যানেজার। অঢেল বই দেশী বিদেশী। ঘরে ঘরে সময় কাটানোর অজস্র উপকরণ। ট্রানজিস্টর। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার। টেপ রেকর্ডার। মোটালা ভাল না লাগলে ভিনতলা। শিকারের সরঞ্জাম দেখানে। আসী হাজারের ওপর ব্ল্যাক মানিতে বিদেশী পুতুলের কিউরিও। ভাল না লাগলে ব্যালকনি। ফুল। মন না বললে নিচে। দামী গাড়ী আছে গ্যারাজে।

এ ঘর থেকে সে ঘর, সে ঘর থেকে ও ঘর এবং ঘর যখন ভাল লাগে না তখন বাইরে তাকায়। ফুল দেখে। পাখি। প্রজাপতি খোঁজে মনের ওপর। ফড়িং সবুজ ঘাসের ভেতর। খুঁজতে খুঁজতে তন্ময় হয়ে গেলে অন্য একটা ঘর চোখের ওপর ফুটে ওঠে। কচি কচি শিশুর চোখ ভাসে। প্রণয়, সুখ কলহ, প্রীতি। আত্মীয় স্বজনের কিছু মুখ চোখের ওপর ফুটে ওঠে আতিথেয়তা। ভালবাসা। তখন ছাদে ওঠে। আকাশ দেখে। মেঘ। রাধাচূড়া ছাড়িয়ে, রেল কেবিন পেরিয়ে এক খণ্ড মেঘ কোথায় যেন ভেসে চলেছে। খুব ভয় হয় তখন। দুঃখ হয়। আর তখনি ভীষণ একাকীত্ব অনুভব করে অমিতেশ। তার ইচ্ছা, আবেগ, স্নেহ, মমতা সব সব কেমন মরে যাচ্ছে। সে পশু হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ নিষ্ঠুর হতে চেষ্টা করে তখন, অমিতেশ।

সে যে আসে তখন। পর্দা-সুন্দরী সুমিত্রার ঘরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনি কেমন দুর্বল লাগে। ভীষণ অসহায় বলে মনে হয় তখন। তখন রেডিও খোলে। বন্ধ করে। উপন্যাসের পাতা ওলটায়। বন্ধ করে। গুন গুন করে কবিতা পড়ে। প্রতিধ্বনিটা ভীষণ পীড়া দেয় কানে। তখন চীৎকার করে ডাকে, ম্যানেজারবাবু—

বলুন স্যার। ছোট্ট উত্তর—ওপরে চলে আসে তক্ষুনি।

কোন চিঠি আছে আমার? মানে অমিতেশ মুখার্জীর। অমিতেশ একটু মুখ বাড়িয়ে বলে।

নেম সাহেবের।

খোসাল। দাঁতে দাঁত ঘষে অমিতেশ। তীক্ষ্ণ গলায় বলে, পাঠিয়ে দিন সব।

সাত্বনা, সান্ত্বনা, সান্ত্বনা। এই পর্যাপ্ত সুখ থেকে নিষ্কৃতি চায় তখন। এই সুখকে ঘিরে যে যন্ত্রণা তা থেকে মুক্তি চায় তখন। অমিতেশ ভাবে আজ হয়ত কেউ তাকে লিখবে। অন্তরঙ্গ চিঠি। অমিতেশ তার জবাব দেবে। কুশল নেবে। কিন্তু না, কেউ লেখে না। তাই নতুন বাড়ীতে চলে আসার পর সবাই যেন ভুলে গেছে। কিংবা ভয় করছে। ইন্দ্রেশ, মানিক, দিব্য, অবিতার কেউ না। পার্বতী, কোকিলা, কেউ না। সেই বেনারসে আলাপ মুহূর্তের সঙ্গিনী, যার উজ্জ্বল ছায়া আজও মনের ব্যালকনিতে গাঁথা আছে, সেই পর্ণালীও না। কেউ, কেউ না। ফুলপুরের মুক্তি মাসিমা, ডার্লিঙ্গি-এর সোমনাথবাবু, কেউ না। তখন মনে হয় অই সুমিত্রা তার অবাধ বিচরণের পরিমণ্ডলকে ছোট করে দিয়েছে। সবাই তাকে ত্যাগ করেছে। সে একা, অসহায়, যেন এই পৃথিবীর ওপর বড় করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে সে।

ঘৃণায় অজস্র চিঠির ভেতর থেকে হাত ডুবিয়ে একটা চিঠি তুলে নেয় অমিতেশ। ক্যানসের চিঠি। ঠিকানাবিহীন আতিশয্যে ভরা অজস্র চিঠি আসে প্রতিদিন। কেউ লেখে, "আপনি কই যাচ্ছ ভালবাসেন কিনা", কেউ, "আপনি কি বীজ রং পছন্দ করেন?" কারো চিঠি দুঃখের, "আপনাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।" এছাড়া কিছু অশ্লীল মন্তব্য, "আপনার এক নাইটের কি কত", অথবা "পিরিয়ডের সময় ঠেট নেন কিনা।" একটা চিঠি তুলেছিল, না পড়েই ঘৃণায় ছুড়ে ফেলে দিল অমিতেশ।

দেখতে দেখতে চোখের ওপর এক সময় বিকেল মরে গেলে সুমিত্রা ফিরল। তাকিয়েছিল তাকাল অমিতেশ।

কী অত ভাবছিলে চোখ বুজিয়ে। সুমিত্রা ভ্যানিটি

ব্যাগটা সোফার ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে অমিতেশের পাশে এসে বসল।

কোন জবাব দিল না অমিতেশ।

রাগ? সুমিত্রা হাসল। সুমিত্রা আরো কাছে সরে এসে বসল। অত রাগ কর কেন? কিসের এত দুঃখ তোমার?

থাক। কাঁধের ওপর থেকে সুমিত্রার আঙুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল, সান্ত্বনা দিচ্ছ? এরপর বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, আমি তো দু' বছরের। পুরনো হয়ে গেছি এখন।

হাসল সুমিত্রা। হাত ধরল অমিতেশের। গায়ের সঙ্গে মেশে নিয়ে বলল, খুব আমি বদলে গেছি, না?

হাত ছাড়। তোমার গায়ে পুরুষের গন্ধ।

ইস্! এ সব কী বলছ তুমি?

অমিতেশ মাথা নিচু করে বসেছিল। বলল, স্বর্গের লালসের চাইতে নরকের স্বাধীনতা অনেক বড়। ছাড়।

সুমিত্রার চোখ জলে ভরে গেল এবার। চিবুক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে সুমিত্রা বলল, কী এত দোষ আমার, যার জন্যে তুমি এত কষ্ট পাও। আমার ভালবাসা তোমাকে কোনদিন খাটো করেছে বলতে পার? কাঁপছিল সুমিত্রা। বলল, তুমি পছন্দ কর বলে আজও আমি আবির রঙের টিপ পরি তোমার। ভুলে ভুলে কাঁদছিল সুমিত্রা। রজনীগন্ধা তুমি ভালবাস, নিজে হাতে কিনে এনে তোমার ভালবাসার সম্মান দিই। তুমি দুঃখে রং পছন্দ করনা, কোনদিন পরতে দেখেছ আমাকে। বলনা কী অপরাধ আমার? বুকের ওপর মুখ ঘষছিল সুমিত্রা। ক্লান্ত শরীর আর ইচ্ছা না চাইলেও, বলতে পার, তোমার কামনাকে আমি উপবাসী ফিরিয়ে দিয়েছি কোনদিন।

একটক্ষণ পরে অমিতেশ, হাসল। অন্ধকারে ঘর তখন ভরে গেছে। সুমিত্রাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। অমিতেশ অন্ধকারের ভেতর নিজে হাতে সুমিত্রাকে স্পর্শ করল, করে বলল, একএক সময় মনে হয় তুমি কত বড়, তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে বেঁচে আছি। অমিতেশ এবার অন্ধকারে চিবুক ছুঁল সুমিত্রার। ছুঁয়ে বলল, কিন্তু এখন জেনেছি, তুমি আমার ছায়া হয়ে আমাকে ঘিরে আছ। আমি বেঁচে আছি।

গলাভর্তি অভিমান নিয়ে অন্ধকারে বুকের ওপর মুখ ঘষে ঘষে চোখের জল মুছছিল সুমিত্রা। অস্পষ্ট বলল, ঘষে গেছে। মোটেই না।

। শেষ।

স্কেচ। পি, কি

বাড়িতে, বেশ আমিয়ে

সেইরকম এ ক টি

পরেছেন।

আচ্ছা এখন দেখুন পরের

বা র বী যা চ্ছে ন

দেখুন বাসবী যাচ্ছেন মার্কেটিং

করতে।

শেষ থেকে শুরু ?

না, শুরু থেকে শেষ

বিনুনি পাকাও, ঝোঁপা
হোলো, এই আয় বিয়ে পরান্ত

ভুল হয়ে গেল। নাও আবার
গোড়া থেকে আরম্ভ কর।

না, এইবার বেশ হয়েছে,
আসা হয়েছে।

হেরিয়া মুকুরে মুখ
উপজিল মহা সুখ—
মনে হয় এ সুখের নাহিক তুলনা।

ওনো চুলকেও তাকে বেশি সময়
দিতে নারাজ বোধহয়, তাই
শুকনো হেয়ার ড্রেসারের সাহায্যে

[illegible]

[illegible]

ছবি ঘ্রাণ।২— শুকুমার রায়

(২৫২ পৃষ্ঠার পর)

সেই বাসনীয়? বিয়ে হয়েছে মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে। তাবা যায় না। জীবনে অনেক কিছু ঘটল যা অভাবনীয়। বিমল বোকার মত মুখ নীচু করে বসে রইল।

দুই বলল, তারপর? কেমন আছেন?

বিমল বলল, ভাল।

আপনি সেরকম সাহুকই আছেন। তারপর একটু থেমে বলল, আজকাল আগের মতো প্রতিজ্ঞা এখনো করেন? বিমল থেমে উঠল, বিমলের নিজেকে খুব ছোট লাগতে লাগল, বাধো বাধো গলায় বলল, বিশ্বাস করবেন না, এখন হল কোলকাতায় এসে এমন ঝামেলায় পড়লাম, কি করে যে দিন গুলো কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আপনাকে যে একটা চিঠি লিখব তারও সময় করে উঠতে পারলাম না।

দেওঘরে যখন ওকে দেখেছি তখনও দুই সুন্দরী ছিল, সপ্রতিভও ছিল, এখন মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পেয়ে ওর চেহারায় চলনে বলনে দারুণ এক ব্যক্তিত্ব এসেছে। ওর চোখের দিকে চাইলে চোখ সসম্মানে আপনি থেকে সরে আসে।

দুই বলল, তাতে কি? আমি কিন্তু আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম—তিনটি। সবকটি চিঠি ফেরৎ এসেছিল। ঠিকানা ভুল ছিল।

কেন? কোন্ ঠিকানায় লিখেছিলেন? অবাক হয়ে বিমল বলল।

আপনি যে ঠিকানা নিজে হাতে আমাকে লিখে দিয়ে গেছিলেন। রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর ঠিকানা।

বিমল, ছট্‌ফট করে উঠল, বলল, সেকি? সে তো বাড়ি বদলে আমরা ত নিউ আলিপুর নিজেদের বাড়িতে উঠে গেছিলাম দেওঘর থেকে ফিরেই।

দুই বলল, তা হবে হয়ত, কিন্তু আপনি আমাকে পুরানো ঠিকানাই দিয়েছিলেন।

বিমল ধাক্কি খেয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না যে বাবা অত তাড়াতাড়ি গৃহ প্রবেশ করবেন। আমাদের রাসবিহারি এ্যাভিন্যুর বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাবার কথা হয়েছিল তার কলে নতুন বাড়িতে যাওয়ার পর পুরানো বাড়িতে ঠিকানায় যেসব চিঠি একটিও আমার হাতে আসেনি।

দুই বলল, হয়ত তাই হবে। সব কপাল। ফেরৎ-আসা চিঠি গুলি আমি এখনো রেখে দিয়েছি। আমার কাছে আছে।

বিমলের চোখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, আমাকে দেখতে দেবেন? দুই হাসল। বলল, এখন দেখে আর কি করবেন। এখন ও সব ত ছেলেমেয়ের অফিসের সম্পত্তি। নাই বা দেখলেন। ঠিকানাটাই ভুল হয়ে গেল। ঠিকানা ঠিক না হলে কখনো খুঁজে পাওয়া যায়?

বিমল চুপ করে রইল।

দুই বলল, থাক ওসব কথা। কি খাবেন বলুন?

বিমল বলল, কিছু না। আমি এই ব্রেকফাষ্ট করে এলাম।

শুধু চাও না?

চা খেতে পারি।

দুই বেয়ারাকে ডেকে চা দিতে বলল।

বিমল হঠাৎ বলে ফেলল, দেওঘরে সেই রাতে চা খাইয়েছিলেন মনে আছে? লাইনের আলোয়? তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার দিদিমা কেমন আছেন?

দুই বলল, নেই। তিনি গত বছরে মারা গেছেন। ওঁর আপনাকে খুব ভাল লেগেছিল। আমার কাছে প্রায়ই আপনার কথা বলতেন।

আরো অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। কি বলবে কেউই খুঁজে পেল না। বিমল বলল, ডিলারিয়া পাহাড়ের কথা মনে আছে?

দুই ডান হাতে কপালে-পড়া অলক সরাতে সরাতে বলল, আমার মনে আছে। মনে রাখবার জন্যে আমার প্রতিজ্ঞা করতে হয়নি ত কিছু। তাই হয়ত মনে আছে।

তারপর অনেকক্ষণ ওরা দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

বেয়ারা ট্রে-তে বসিয়ে টি-পট এবং চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে

গেল। থুই চা বানাল। বিমল চুপচাপ চা খেল। থুই নিজেও এক কাপ চা নিল।

চা খাওয়ার পর, বিমল বলল, গান কি এখন বাজবে?

থুই ওর দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, বাজবে, তবে এখানে নয়—। তারপরে একদিন রিহার্সাল ঠিক করব—তার আগে আমি নিজেই বেছে রাখব এখন। আপনিও নিজে কিছু বেছে রাখবেন। এখানে, মানে আপনি আর আমি দুজনে মিলে গান বাজাব গান এবং আপনি, অন্তত দুইয়ের কারো প্রতিই আমার কুবিচার করা হবে না।

বিমল মুখ নীচু করে নিল।

থুই বলল, তাহলে?

বিমল পরিষ্কার বুঝতে পারল, যে এই 'নইলে' বলার পেছনে 'এবার উঠুন' এই বক্তব্য প্রকট।

হঠাৎ ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত বিমল একটি ধাক্কা খেল। এবং সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত বলল, চলি।

থুই বলল, আচ্ছা। খুব ভাল লাগল এতদিন পর আপনাকে দেখে। তারপর থুই বিমলকে বারান্দা অবধি এগিয়ে দিল।

বিমলের দু কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। এই অনুভূতিকে কি নামে ডাকবে বিমল জানে না। কিন্তু বিমলের দুকান গরম হয়ে লাল হয়ে উঠল—মনে হল হঠাৎ ওর খুব জ্বর এসেছে।

বাগানের গেট পেরিয়ে পথে পড়ল বিমল। গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় বেয়ারা এসে বলল, মেমসাব সেলাম দিয়া।

আবার বিমল ফিরে গেল। কেন জানে না, বিমলের বুকটা এক অদ্ভুত আশায় ভরে উঠল। পায়ের জুতা ছেড়ে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে।

থুই বারান্দার অলিন্দে থেকে ঝোলানো একগুচ্ছ দোপাটী অর্কিডের নীচে দাঁড়িয়েছিল। বিমল কাছে গিয়ে পৌঁছতেই থুই মুখের রেখা কঠোর করল। ওর হাত দিয়ে যা হাতের চুড়ির সোনা নাড়তে নাড়তে বলল, শুনুন, আপনি ভবিষ্যতে আর আমার কাছে আসবেন না। কোনো দিনও না।

ঠিক এই কথা শোনার জন্যে বিমল তৈরী ছিল না।

এবার বিমলের মুখের রেখাও কঠিন হল। বিমল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয়েছিল আমি রোজ রোজ আসব? থাক্ ওসব তাগিদ নিজের থেকেই বললেন।

কি করে কথাটা এমন করে গুছিয়ে বলল, বিমল জানেনা। সম্মান রক্ষার জন্যে কে যেন কথাগুলি ওর ঠোঁটের কাছে পৌঁছে দিল।

তারপর বিমল বড় বড় পা ফেলে ফেলে গেট পেরিয়ে বাইরে মিলিয়ে গেল। ওর পায়ের ছেড়ে-যাওয়া জুতা আবার ফিরে এল।

বেয়ারাকে চায়ের বাসন নিয়ে যেতে বলে, থুই একরকম হঠাৎই এসে বাথরুমে ঢুকল। খোলা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে রাস্তায় বিমলকে আর একবার দেখা যায় কিনা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু বিমলের অপসৃয়মান গাড়ীর লাল ধুলোর মেঘ দেখতে পেল শুধু। বাথরুমের জানলার পাশের হাসনুহানার ঝোপ থেকে একটি বুলবুলি পাখি থুইকে মুখ বাড়াতে দেখে ভয় পেয়ে ফর-ফরর্ করে উড়ে গেল।

অনেকক্ষণ বেসিনের সামনের আয়নার চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল থুই। একদৃষ্টে নিজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দু ফোঁটা জল হঠাৎ গড়িয়ে গেল চোখের কোণা বেয়ে।

সন্ধ্যার ছায়ায় ছায়ায় গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে বিমল ভাবল, ওর বোধহয় কোনোদিনও কোনো সত্যিকারের ঠিকানা ছিল না। মন্ত্রিয়া, থুই, এমনকি ও নিজেও বরাবর ওকে ভুল ঠিকানাতেই খোঁজ করে এসেছে। আসলে থুইয়ের কোনোই দোষ নেই। এই মুহূর্তে ওকে কোন্ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় তা বিমল নিজেই জানে না।

॥ শেষ ॥

জেল খানার লেখক

রবিদাস সাহারায়

জেলখানার শাস্তিভোগ অনেকের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে, এমন নজীর রয়েছে অনেক। তাঁদের এক একটি জীবন এক একটি ইতিহাস।

আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনাই হয়েছিল কারাগারে। জেলখানায় বসে সাহিত্য রচনা করে পরবর্তী কালে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হয়েছেন এমন ঘটনাও পৃথিবীতে বিরল নয়।

ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের লেখক ও'হেনরীর জীবন আলোচনা করলেই এই সত্যটি প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না।

ও'হেনরী জীবনে ভাল করে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পান নি। কলেজে পড়া দূরের কথা উঁচু স্কুলেও ঢোকেন নি কখনও।

শুধু অর্ধশিক্ষিত হলেও বলা যায় যে তিনি কখনও কখনও গোপনে পড়াশোনা করে শিক্ষার অভাব পূরণ করেছেন। কিন্তু তাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সদাই দেখা যেত নানা রোগে শরীর নিয়ে বিব্রত হয়ে শুয়ে আছেন এমন কি এক সময়ে ডাক্তাররা একথাও ভেবেছিল যে ক্ষয়রোগে তাঁর পরমায়ু কমে গেছে। জীবন দীপ নিভে যেতে আর বেশি দেরী নেই। তখন তাঁর আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে টেক্সাস সহরে পাঠিয়ে দিলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। সেখানে গিয়ে ও'হেনরী একটা খোঁয়াড়ে ভেড়া দেখার কাজ নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন টেক্সাসে থাকার ফলে সেখানকার ভাল বাতাসে ও'হেনরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। তখন ভেড়া আগলানোর কাজ ছেড়ে অন্য কোন কাজের চেষ্টায় তিনি

ঘুরতে লাগলেন। খোঁজ করতে করতে একটা কাজের খবরও পাওয়া গেল। কাজটা হল একটা ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারের চাকরি। টাকা নিয়ে বসে থাকতে হবে। মক্কেলদের টাকা জমা নিতে হবে আর চেক কেউ ভাঙাতে এলে টাকা দিতে হবে। দিনের শেষে হিসাবনিকাশ বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

টেক্সাস প্রদেশে অধিকাংশ লোকেরই ছিল গরু ভেড়ার বড় বড় খোঁয়ার। তাদের কারবারই ছিল গরু জানোয়ার বিক্রি করে বাহবা করা। এই কাজ করতে হলে যে সব পরিচারককে নিযুক্ত করতে হয় তাদের কাজ হল ঘোড়ায় চড়ে এক ভেড়ার চারিদিকে ঘুরে তাদের আগলে রাখা। তাদের বলা হয় কাউ বয়।

এই সব কাউ বয়রা ছিল বড় বেপরোয়া প্রকৃতির। কাউকে ভয় পেতো না। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব খরচে। মাসের শেষে মাইনে পেলে অল্পদিনেই তা খরচ করে ফেলতো। তখন তারা স্থানীয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে খরচ চালাতো আর মাসের শেষে এসে শোধ দিত। অনেক সময় ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার নিজের দায়িত্বে তাদের টাকা দিত কোন রকম মূল্যবান বন্ধক না রেখেও। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়মে এভাবে টাকা দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

ও'হেনরী ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার হবার পর প্রচলিত অভ্যাস মত নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউ বয়দের টাকা দিয়ে দেবেন। আবার যখন তারা তা ফেরৎ দিত, সেই টাকা ও'হেনরী ক্যাসে জমা করে নিতেন।

কিন্তু বিপদ ঘটল একদিন।

হঠাৎ একদিন ইন্সপেক্টর এসে ক্যাস চেক করতে শুরু করলেন। ক্যাস গোনা শেষ হলে দেখা গেল বেশ কিছু ঘাটতি আছে। খাতায় লেখা আর ক্যাসে থাকা টাকার পরিমাণে গরমিল থাকায় সব দোষ এসে পড়ল ও'হেনরীর উপর। তাঁকে তহবিলের লাখে অভিযুক্ত করেন তিনি। বিচারে তাঁর শাস্তি হল পাঁচ বছরের জেল।

জেলে যাবার আগের দিন অবধি ও'হেনরীর নাম কেউ জানতো না। কেউ মুহূর্তের জন্যে ভাবতে পারেনি জেল থেকে বেরিয়ে ও'হেনরী বিখ্যাত হয়ে উঠবেন। প্রথার সাধারণ মানুষ তাকে নিয়ে আলোচনা করবে।

কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনাও ঘটল। কারাগার থেকে যখন ও'হেনরী বেরিয়ে এলেন তখন সঙ্গে নিয়ে এলেন হাতে লেখা অসংখ্য কাগজের বান্ডিল। এই বান্ডিলগুলো ও'হেনরী একজন পুস্তক প্রকাশককে দিলেন। প্রকাশক সেই সব লেখা পড়ে তাড়াতাড়ি ছাপতে দিলেন প্রেসে।

একে একে বেরোতে লাগল ও'হেনরীর ছোট গল্পের বই। পাঠকরা পড়ে ধন্য ধন্য করে উঠল। অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় অপরাধের মুকুট মাথায় নিয়ে যে ব্যক্তি একদিন জেলের বাইরে পা দিয়েছিলেন রাতারাতি লোকে তাঁকে চিনে ফেলল ও'হেনরী বলে। অথচ তাঁর আসল নাম ও'হেনরী নয়। বইতে ছদ্মনাম হিসাবে এই নামটি ছাপা হয়েছিল। আর এই ছদ্মনামে আজ তিনি সকলের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন।

আর একজন ইংরেজ লেখকের কথা বলব। অবশ্য ও'হেনরীর মত জেলে যাবার আগে তিনি অখ্যাত ছিলেন না। তিনি হলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে।

এলিজাবেথের সময় তাঁর নাম ছিল সকলের মুখে মুখে, পোশাক পরিচ্ছদে তাঁর মত বাবু খুব কম দেখা যেত। তিনি যে জুতো পরে চলতেন সেই জুতোয় হীরে লাগানো থাকতো। আর তাঁর কানে থাকতো মুক্তো।

একবার রাণী এলিজাবেথ যখন পথ দিয়ে হাঁটছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী হিসাবে আর সভাসদগণের সঙ্গে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেও ছিলেন। পথের মাঝে একজায়গায় জল কাদা হয়েছিল। সেই কাদার ওপর দিয়ে রাণী হাঁটবেন কি করে? তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সভাসদেরা মাথা চুলকে ভাবতে লাগলেন এই সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে এই সমস্যার সমাধান করে রাণী এলিজাবেথের কৃপাদৃষ্টি লাভ করলেন। তাঁর গায়ে ছিল এক মহামূল্য আবরণ। সেটি তাড়াতাড়ি খুলে সেই কাদার ওপর দিয়ে দিলেন। তখন মহারাণীর হেঁটে যাওয়ার আর কোন অসুবিধা রইল না।

এ ভাবে মহারাণীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করার ফলে তাঁর ওয়াল্টার রাজসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সভাসদের দৃষ্টিশূল হয়ে পড়লেন। তাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কি ভাবে পথ থেকে সরান যায় তার জল্পনা কল্পনা শুরু করলেন।

শেষ অবধি তাঁদের অনুরোধে মহারানীর মন স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। আর এই কারণেই এক সামান্য ছুতোর ভিত্তি ধরে ওয়াল্টারের দীর্ঘ বছর কারাবাসের আদেশ হল।

তখনকার দিনে কারাগারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। কারাকক্ষের মেঝে ছিল স্যাঁতসেঁতে। দেয়ালের গা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ত। অন্ধকার ঘরে ছিল ইঁদুরের উৎপাত। কারাগারের অবস্থা এমন খারাপ করে রাখার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুক্তি পেয়ে কয়েদীরা কারাগারে থাকার ভয়ে আর অপরাধ না করে।

যা হোক্, এই রকম কারাগারে বন্দী হয়ে কিছুদিন থাকার পর স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। তাঁ হাতে কাজের অফুরন্ত অবসর পড়ে রয়েছে। শুধু ছেলে বসে তিনি ইতিহাস লিখতে শুরু করলেন।

অনেক দিন হল স্যার ওয়ালটার র‍্যালে মারা গেছেন। কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের অনেক স্কুলে তাঁর লেখা ইতিহাস পড়ান হয়।

জেলে থাকার আগে স্যার ওয়ালটারের লেখক বলে নাম ছিল না। কিন্তু জেলে বন্দী অবস্থায় তাঁর লেখা শুরু হল।

শুধু স্যার ওয়ালটার নয়, Pilgrims Progress-এর লেখক জন বানিয়ন জেলে বসেই এই বইটি লিখেছিলেন। 'ডন কুইকসোট'ও লেখকের জেলে বসে লেখা বই। তা ছাড়া গলটিয়ার, অসকার ওয়াইল্ড প্রভৃতি আরো লেখকের প্রতিভার বিকাশ জেলের মধ্যেই হয়েছিল।

। শেষ ।

স্কেচ : ব্রজগোপাল (পেন্টাগ্রাফ কলকাতা)

ক্রন্দন সংগীত

ভারতপুত্রম্

ভোর না হতেই তৈরী হয়েছিলেন চণ্ডীদাস, দূরের পথ। সকাল সকালই বেরুতে হবে, নইলে সময় মতো গিয়ে পৌঁছানো যাবে না দরবারে। গৌড়ে। সেখান থেকে ডাক এসেছে, রাজা নিজে গান শুনতে চেয়েছেন! চণ্ডীদাস কি আর না যেতে পারেন।

রামী ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে। বললে, 'ঠাকুর, একি!'

'কি দেখলে?'

'সাজ-গোজ কেন? আবার কোন্ মথুরায় চললে!'

একটু হাসলেন চণ্ডীদাস। হাসিতে কপাল দু'খানিতেও হাত বুলালো। রামীর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'না, ভয় নেই, মথুরায় নয়, যাবো গৌড়ে, রাজদরবারে।

'রাজদরবারে? কেন?'

'গৌড়েশ্বর ডেকেছেন। গান শোনাতে হবে।'

'গান।' বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেলো রামীর। চোখ দু'টি যেন ছলছল করে উঠলো। ঘুলের সাজিটি আঙিনায় রাখতে রাখতে বললে, গান? এ গানই তোমায় পাগল করলে ঠাকুর! এ গান ছাড়া আর কিছু তুমি জানো না কিছু তুমি বোঝ না। চণ্ডীদাস বললে, 'বুঝিনে? কে বললে, 'বুঝিনে!'

'ছাই বোঝ। যদি জানতে, যদি বুঝতে…'

'তাহলে কেন গেলুম না, গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরতুম না, নয়?'

রামীর কথা নিজেই শেষ করেন চণ্ডীদাস, শেষ ক'রে চেয়ে থাকেন রামীর মুখের দিকে।

রামী কাঁদছে। শাদা টুলটুকে দু'খানি কপোল বেয়ে চিকচিকে দু'টি জলের রেখা নেমে এসেছে। দূরন্ত ভোরের হাওয়ায় ক'টি চূর্ণকুন্তল উড়ে এসে লেপটে আছে তার সঙ্গে। মুক্তা-শুভ্র দাঁতে পাপড়ি ঠোঁটে চেপে ছলে উচ্ছ্বাসকে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে রামী, পারছে না।

বারে বারে বাঁধ ভাঙছে। সেই অদূর পথে হৃদয়ে চাপা আবেগ বেরিয়ে আসছে। বাঁধ ভাঙা নদী স্রোতের মতো।

দুটি ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

চণ্ডীদাস বললেন, 'কাঁদছো সখি, ছিঃ, কেঁদো না। রাজলীর আদেশে তোমার আমার অনুরাগ, তোমার ভয় কিসের? যতদূর যাই, যেখানেই থাকি আকাশের চাঁদের মতো তুমিও আমার সঙ্গে থাকো। তোমার চোখে জল কেন?'

কেন? কে তা বুঝবে! কে তার উত্তর দেবে। রামীও তার উত্তর দিতে পারলো না। জলে ভেজা আঁচলায় দু'টি দৃষ্টি তুলে সে শুধু তাকিয়ে রইলো চণ্ডীদাসের দিকে।

চণ্ডীদাস রওনা হলেন।

গান শুরু হলো রাজে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, মাটিতে আলোর জল, অতুল সৌরভে গৌড় ভরবার যো নো। এপাশে নবাব ও তাঁর পার্শ্বচরেরা। বেগম মহলে চিকের আড়ালে অনেক অনেক জোড়া চোখের ঝিলিক, গান গাইছেন চণ্ডীদাস। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ, বাতাসে সুরের ঝারা। কথায় হৃদয়ের ছাপ। চোখে চোখে অশ্রু রেখা। হঠাৎ চিকের আড়ালে চোখ পড়লো চণ্ডীদাসের। একজোড়া আশ্চর্য চোখ, একজোড়া আশ্চর্য কালো তারা জ্বলছে। একখানি সুন্দর মুখ চিকের পিছে ছেড়ে ছেড়ে আবেদনে করুণ হয়ে উঠছে।

চণ্ডীদাস গাইলেন:

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
যখন তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিনু সুখ।

সেই মুখ সেই চোখ আরও—আরও যেন ঘনতমসা হয়ে উঠলো, গান শেষ হলো। সভা ভাঙলো।

বাইরে এলেও সে চোখকে ভুলতে পারলেন না চণ্ডীদাস। সে দৃষ্টি যেন ভ্রমরে রেখে গেছে, সে সুর যেন মনে লেগে আছে। সত্য চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

বাসরীকুঞ্জে একা একা ফিরছিলেন চণ্ডীদাস, মধুমাস। ফুলের ভিড়। মলয় বাতাস, চাঁদের আলো, রাসকলঙ্কিনী। ধরনী, আনমনে গান ভেঁজে চলছিলেন চণ্ডীদাস। সে সুরের মায়া কাঁপন তুলছিল বাসরীকুঞ্জের পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে। পেছনে কার সুরেলা কণ্ঠ: 'কবি!'

চমকে উঠলেন চণ্ডীদাস। থমকে দাঁড়ালেন। ফিরে দেখলেন, চিকের আড়ালে জ্বলে-ওঠা সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ, সেই রমণীয় মুখ, চাঁদের আলোর রূপোলী রঙে রূপের মোহ। অপূর্ব।

ধীরে ধীরে সে মুখ কাছে এলো। পাশে দাঁড়ালো। মাথার উত্তরীয় আকাশী রঙের ওড়নাটা সরিয়ে নিল, সূর্যা টানা তারার তারার সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ তুলে আবদারে: 'কবি!'

বেগমসাহেবা!'-

'কবি!'

'বেগমসাহেবা, আপনি!'

'তোমার গান আমায় টেনে এনেছে কবি। ও গান ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না।'

চণ্ডীদাস নির্বাক। হাওয়া মন্থর। এমাথে সেই আশ্চর্য দু'টি চোখ ছলছল করে উঠল।

জল নামলো। নরম নরম দাড়া রাঙা দু'টি গাল ভিজে গেলো।

বেগমসাহেবা বললেন, 'তুমি আমাকে সঙ্গে নাও কবি।' আর কিছু নয়, আর কিছু চাইনে। শুধু তোমার গান শোনবার অধিকারটুকু দাও।'

—'তা হয় না বেগমসাহেবা।' উদাসী বৈরাগীর কণ্ঠ চণ্ডীদাসের।

—'কেন হয় না কবি?'

—'আপনি রাজ্যেশ্বরী, আপনার—'

চণ্ডীদাসের কথা শেষ হল না। বেগমসাহেবা কথা কেড়ে নিলেন। বললেন, সব মিছে, বুঝলে কবি সব মিছে, রাজ্য মিছে, ঐশ্বর্য মিছে, এই বুকের জ্বালা শুধু জ্বালা। শুধু আগুন। তুমি আমায় শান্তি দিতে কবি, তুমি আমায় সঙ্গে নাও।' বলতে বলতে দুটি সজল দৃষ্টি চণ্ডীদাসের মুখের উপর ফেলেই আবার সরিয়ে নিলেন বেগমসাহেবা।

বেগমসাহেবাকে আর কথা বলা হলো না। সেই রাতেই গৌড় ছাড়লেন চণ্ডীদাস। ভাবলেন বেগমসাহেবার গানের মোহ দু'দিন পরেই কেটে যাবে। তাই হোক। তাই হোক। বেগমসাহেবার কান থেকে গানের সুর মুছে যাক! শান্তি পাক বেগমসাহেবা।

কিন্তু গানের কথা ভুললেন না বেগমসাহেবা। ভুলতে পারলেন না। বরং তাঁর মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মনে মনে তিনি বললেন, 'কবি, তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারলে, কিন্তু আমি তো তোমায় ছেড়ে দিতে পারবো না কবি। তোমায় ছেড়ে যে আমি বাঁচবো না কবি।' বলতে বলতে আবার জল নামলো সেই আশ্চর্য দুটি চোখে। রক্তিমতর হলো সেই রক্তিম দু'খানি নরম নরম গাল।

সত্যি পারেন না বেগমসাহেবা। ঘরে থাকতে পারেন না। মাঝে মাঝেই তিনি ঘর ছেড়ে যান। ছদ্মবেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরেন। সেই গানের সুরের, সেই গানের মানুষটির অনুসন্ধান করেন।

মনে মনে দিনরাত কেবল কবির কথাই ভাবেন বেগম সাহেবা। আর সবের কথা ভুলে যান।

বেগমসাহেবার আচরণে অবাক হয়েছিলেন বাদশা। তিনি সব বুঝেছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি। ভেবেছিলেন, ও মোহ এ চোখের নেশা দু'দিন পরেই কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না। দিন তিন ছেড়ে চললো। অভিসারের কথাটাও একদিন জেনে ফেললেন বাদশা। ক্ষেপে উঠলেন।

গৌড়েশ্বরের রোষ। তার কিনা এক ভিখিরী বৈরাগীর কাছে প্রেম প্রার্থনা। ব্যাভিচার। কথাটা ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝনঝন করে উঠলো বাদশার। রক্ত টগবগ করে উঠলো। লাল লাল দুটো চোখ যেন একেবারে জ্বলে গেলো।

বেলার ছাহেবা গান শুনে বিমুগ্ধ হলেন। বললেন, 'ডাকলেন না কেন?' ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেলেন বেলাসাহেবা। চোখ খুলে দেখলেন মাধবা। সব কথাই বললেন, 'আমায় ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ,

'কেন?'

'রোজ রোজ কোথায় যাওয়া হয়?' বলার ভঙ্গিতে একটু মানের ছাপ।

আবার চোখ বুজলেন বেলাসাহেবা। একজন ছয়া কালো দুই চোখের তারায় একটা কি আগুনের খেলা চলছে। বললেন, 'আপনি যে, সব জানেন মাধবদাস!'

'হুঁ, জানি, কিন্তু কতকাল এ চলবে?'

'ঈশ্বর জানেন।'

'কিন্তু...'

'না, কিন্তু নয়।' বলেই হাতে তিনি বাঁধার দুই তারে ঝঙ্কার তুলে গাইতে শুরু করলেন। গাইলেন বেলা সাহেবার মুখে শোনা সেই ভজনটি যার শেষে...

সহসা থেমে যায় মধুর চণ্ডীদাসকে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তাঁর আর ফিরে পড়িতেকে। সৌভেশ্বরের মুখের কালিমাছায়া। ছায়াবন্ধনের চোখের সামনেই চাপকে ধরে কঠিন মাটি।

...

ধীরে ধীরে বলা শুরু করলো চণ্ডীদাসকে। সামনে ছায়াচিত্রের মতো। একটি নাম বেলাসাহেবা। রামী ধোপা কন্যা। ছোট্ট বাঙালী ব্রাহ্মণ শুধু তাকেই ভালবাসতে চেয়েছিল; কেন, তুমি তাঁর কথা শুনলে না? তাকে তুমি পাও কথা কথা শুনলে না?'

ধীরে ধীরে দুই চোখ মেলে চণ্ডীদাস শুধু তাকিয়ে রইলেন ছায়াচিত্রের দিকে। সে চোখ শান্ত। একটু বেদনা নেই।

সৌভেশ্বর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুকুম করছিলেন বেলাসাহেবা। ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, 'আপনি, কবিকে ছেড়ে দিন, কবিকে ছেড়ে দিন।'

এক ঝাটকায় বেলাকে ঠেলে দিলেন মাধবা। একমুহূর্ত ভুলের মত তাঁর নরম দেহ কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল। বেলাসাহেবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

মাধবা হুকুম দিলেন,—'কোড়া চালাও, কোড়া চালাও।' কোড়া চললো। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেন চণ্ডীদাস। রক্ত ছুটলো বেলার পিঠে।

চণ্ডীদাসের মুখে কথা নেই। যেন তাঁর আর দেখা নেই। চোখে পড়ছে ছায়াচিত্রে ঐ বিশ্বাসঘাতক রামীর দিকে তাকালেন চণ্ডীদাস। তারপর ধীরে একবার তাঁর দৃষ্টি ঘুরে এলো বেলাসাহেবার।

...

...আপনার, আপনার দুঃখের [illegible] আপনি মোক্ষ দিন। দুর্বলেন না। কিন্তুর ক্ষমতা নিলেন না।'

...সৌভেশ্বর কঠিন হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো। বেলা ফুলে উঠলেন।

...সৌভেশ্বর বেলাসাহেবার কাছে গেলেন। ...বেলাসাহেবা। কাঁদছেন বেলাসাহেবা। কাঁদা নেই। চণ্ডীদাসের দিকে তাঁর পাশ্চি কখন উঠে গেছে। তাঁর যেন নিজে বেলা-সাহেবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করা উচিত। চোখের দুফোঁটা চোখের জল ফেললেন। তারপর এক কথা সাহেবার পথ ধরে হওনা হলো সে। আর পিছন ফিরে চাইলে না।

কত দিনের কথা। কত কালের কাহিনী। তবু আজও মনে হলে চোখের জল আসে। রামীর সেই মুখের কান্না মনে যেন বড় লাগে।

আমা মুখ চাওয়া গঙ্গাস্নিগ্ধ হওয়া,
রজনীর কাল-পাখে
রাজা সৌভেশ্বর দুই ভুজের
বেড়না বুঝালো তাকে।

এ চিত্র কি ভোলা যায়?

সম্পাদক : আশীষকুমার মুখোপাধ্যায়

দাম : ৩০০

শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এডিনিয়া প্রিন্টার্স ২৩৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক কালিকাটা প্রেসের এড ভার্টাইজমেন্ট এজেন্সি পক্ষে ২১৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।
একমাত্র পরিবেশক—ডায়া কাইলাস এন্ড মার্কেটিং এজেন্সী প্রা: লি: ২৫৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।